কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি-২

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম-দশম শ্রেণি

লেখক

মাহবুবুর রহমান

M.Sc Computer (Std.), IT-Management (AOTS-Japan)

সম্পাদক

ইঞ্জি. ড. শান্তি রঞ্জন সরকার

চীফ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)

মানিকগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মানিকগঞ্জ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগারি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর মৌলিক বিষয়	২
দ্বিতীয়	সংখ্যা পদ্ধতি ও কোড	৬
তৃতীয়	ডিজিটাল লজিক	২৮
চতুর্থ	স্টোরেজ মিডিয়া	৪৫
পঞ্চম	কম্পিউটার পেরিফেরালস	৫৭
ষষ্ঠ	পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেম	৭৯
সপ্তম	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স	৮৫
অষ্টম	কম্পিউটার সফটওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স	৯৭
নবম	কম্পিউটার ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস	১০১
দশম	কম্পিউটার পরিচালনায় রিস্ক অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি	১১০
	ব্যবহারিক	১২৩

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কম্পিউটার সিস্টেমের স্পেসিফিকেশন	
দ্বিতীয়	মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশের পরিচিতিও ইন্সটলেশন	২৪৯
তৃতীয়	কেসিং ও মাদারবোর্ডে পেরিফেরালস সংযোজন	২৬৩
চতুর্থ	কম্পিউটারের বায়োস (ইওঙঝ) কনফিগারেশন	২৭৩
পঞ্চম	কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন	২৮০
ষষ্ঠ	প্যাকেজ সফটওয়্যার ইনস্টল করা	২৯৪
সপ্তম	উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের অ্যাডভান্সড ফিচারসমূহ	৩০০
অষ্টম	কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রাথমিক ধারণা	৩১২
নবম	ইন্টারনেটের প্রাথমিক ধারণা	৩১৯
দশম	ই-মেইলের প্রাথমিক ধারণা	৩২৯
একাদশ	ওয়েবসাইট ব্রাউজিং	৩৩৭
দ্বাদশ	আউটসোর্সিং	৩৪৩
	ব্যবহারিক	৩৪৯

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি—২

প্রথম পত্র

প্রথম অংশ : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স

অধ্যায়–১

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর মৌলিক বিষয়

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১.১. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর সংজ্ঞা প্রদান করতে পারব।
১.২. ডিজিটাল ও এনালগ সিগনালের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
১.৩. ডিজিটাল মোডে কাজ করার সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
১.৪. ডিজিটাল যন্ত্রাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

ইলেকট্রনিক্স

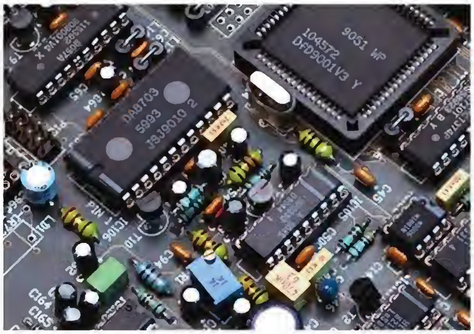

Electronics শব্দটি গ্রিক শব্দ Elektron হতে উদ্ভূত। Elektron শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগকৃত তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রে পরমাণুর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা। ইলেকট্রনিক্স তড়িৎ প্রকৌশলের একটি শাখা যেখানে ভ্যাকিউম টিউব অথবা অর্ধপরিবাহী (semi conductor) যন্ত্রাংশের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ আলোচিত হয়। ইলেকট্রনিক প্রকৌশল প্রধানত ইলেকট্রনিক বর্তনীর নকশা প্রণয়ন এবং পরীক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রনিক বর্তনী সাধারণত রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, ডায়োড প্রভৃতি দ্বারা কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য তৈরি করা হয়। ১৯০৪ সালে জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং দুইটি তড়িৎ ধারক (electrodes) বিশিষ্ট সম্পূর্ণ বদ্ধ কাচের এক প্রকার নল (vacuum tube) উদ্ভাবন করেন ও তার মধ্য দিয়ে একমুখী তড়িৎ পাঠাতে সক্ষম হন। তাই সেই সময় থেকে ইলেকট্রনিক্সের শুরু হয়েছে বলা যায়।

১.১ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি বিদ্যার এমন একটি শাখা যেখানে ডিজিটাল সিগনাল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সার্কিট ও যন্ত্রপাতির ডিজাইন, গঠন, কার্যপ্রণালি, ব্যবহার, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়।

ডিজিটাল সিগনাল

আঙ্কিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্রম-পরিবর্তনশীল এনালগ সংকেতের পরিবর্তে স্তর-পরিবর্তনশীল সংকেত ব্যবহার করা হয়। এই সংকেতকে ডিজিটাল বা বাইনারি (binary) সংকেত বলা হয়। বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সিগনালকে ডিজিটাল সিগনাল বলা হয়। দুইটি পৃথক অবস্থায় কাজ করে এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের ব্যবহারে এই সংকেত পাওয়া যায়। যেমন ট্রানজিস্টরের অন (on) এবং অফ (off) অবস্থা দ্বারা দুইটি পৃথক অবস্থা বোঝানো সম্ভব। প্রজ্বলিত বাতি এবং নির্বাপিত বাতি অথবা টেপের চুম্বকায়িত অবস্থা এবং অচুম্বকায়িত অবস্থা দিয়ে ডিজিটাল সংকেতের স্তর দুইটিকে সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব। ডিজিটাল সংকেতের স্তর দুইটিকে 0 এবং 1 দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

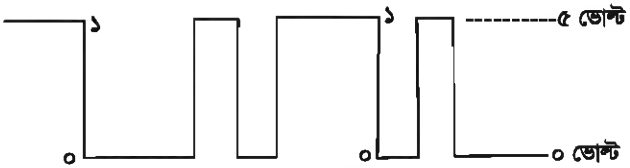

চিত্র : ডিজিটাল সংকেত

এনালগ সিগনাল

এনালগ সিস্টেমে ক্রম-পরিবর্তনশীল এনালগ (analogue) বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়। অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সিগনালকে এনালগ সিগনাল বলে। উত্তাপ, চাপ, প্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল কয়েকটি এনালগ সংকেতের উদাহরণ। এসব সংকেতকে ভোল্টেজে রূপান্তরিত করলে যে ক্রম–পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা এনালগ সংকেতের উদাহরণ চিত্রে এ ধরনের সংকেত প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিবর্ধক, ফিল্টার প্রভৃতি এনালগ বর্তনী ব্যবহার করা হয়। রেডিও, টেপ রেকর্ডার, এনালগ কম্পিউটার কয়েকটি এনালগ পদ্ধতির উদাহরণ।

চিত্র : এনালগ সংকেত

১.২ ডিজিটাল সিগনাল ও এনালগ সিগনালের মধ্যে পার্থক্য

ডিজিটাল সিগনাল	এনালগ সিগনাল
১. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে ক্রম–পরিবর্তনের বদলে সিগনালের স্তর পরিবর্তন ঘটে।	১. এনালগ পদ্ধতিতে ক্রম–পরিবর্তনশীল এনালগ (analogue) বৈদ্যুতিক সিগনাল ব্যবহার করা হয়।
২. ডিজিটাল সিগনালের দুইটি মাত্র নির্ধারিত স্তর থাকে। যেমন : 0 ও 1।	২. পর্যায়ক্রমে উঠা–নামা করে। ফলে এই সংকেতে অনেকগুলো পর্যায় থাকে।
৩. এই সিগনালের পরিমাপে কোন অনিশ্চয়তা বা অজানা অবস্থা থাকে না।	৩. এই সিগনাল পরিমাপে অনিশ্চয়তা বা অজানা অবস্থা থাকে।
৪. কম ব্যয়বহুল।	৪. বেশ ব্যয়বহুল।
৫. সংখ্যা বা পরিমাণ পঠনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।	৫. সংখ্যা বা পরিমাণ পঠনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৬. এই পদ্ধতিতে অতি সহজে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।	৬. তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল।
৭. ডিজিটাল বর্তনীতে সংকেতের 0 এবং 1 এই দুইটি মাত্র অবস্থা থাকায় ভুল নির্ণয় সহজ।	৭. এনালগ বর্তনীতে বিভিন্ন স্থানে সিগনালের মানের বিভিন্নতার জন্য ভুল নির্ণয় কষ্টকর।

১.৩ ডিজিটাল মোডে কাজ করার সুবিধা

১. **বৈদ্যুতিক শোর বা ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ :** দুইটি মাত্র স্বীকৃত স্তর থাকায় ডিজিটাল সংকেত অবাঞ্ছিত বৈদ্যুতিক শোর দ্বারা কম আক্রান্ত হয়।

২. **খরচ :** এনালগ বর্তনীর যন্ত্রাংশ, যেমন বিবর্ধক, ফিল্টার ইত্যাদি বেশ ব্যয়বহুল। অপরপক্ষে ডিজিটাল বর্তনীর প্রকৃতি সরল এবং বাণিজ্যিক হারে একীভূত বর্তনী বা ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (Integrated Circuit— IC) হিসেবে অনেক বর্তনী তৈরি হয় বলে দামেও সস্তা।

৩. **প্রদর্শন :** ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংখ্যা বা পরিমাণ পঠনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৪. **একক বৈশিষ্ট্যের অনেক বর্তনী :** ডিজিটাল বর্তনীতে সংকেতের মান দুইটি নির্ধারিত স্তরের কাছাকাছি থাকলেই চলে। সেইজন্য একই বৈশিষ্ট্যের বহু ডিজিটাল বর্তনী সহজে তৈরি করা সম্ভব।

৫. **তথ্য সংরক্ষণ :** ডিজিটাল পদ্ধতিতে অতি সহজে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু এনালগ পদ্ধতির তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল।

৬. **নির্ভরশীলতা :** অধিকাংশ ডিজিটাল বর্তনী একীভূত বর্তনী দিয়ে তৈরি হয়, ফলে সংযোগ খরচ কম হয় এবং পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে নির্ভুলভাবে কাজ করে। সময়ের সাথে বর্তনীর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন, পুরান বা পুড়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ এবং যন্ত্রাংশে গরম হওয়া প্রভৃতি কারণে এনালগ বর্তনীর নির্ভরশীলতা অনেক কম।

৭. **ভুল নির্ণয় ও রক্ষণাবেক্ষণ :** ডিজিটাল বর্তনীতে সংকেতের 0 এবং 1 এই দুইটি মাত্র অবস্থা থাকায় ভুল নির্ণয় সহজ। এনালগ বর্তনীতে বিভিন্ন স্থানে সংকেতের মানের বিভিন্নতার জন্য ভুল নির্ণয় কষ্টকর। মোটকথা ডিজিটাল বর্তনীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এনালগ বর্তনীর তুলনায় অনেক সহজ।

১.৪ ডিজিটাল যন্ত্রাদির একটি তালিকা

বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগ বলা হয়। আমাদের চারিপার্শ্বে অনেক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি রয়েছে। নিচে কয়েকটির তালিকা দেওয়া হলো :

১. কম্পিউটার, ২. মোবাইল ফোন, ৩. ডিজিটাল ঘড়ি, ৪. পিডিএ, ৫. ডিজিটাল ক্যামেরা, ৬. মাইক্রোওভেন, ৭. শরীরের প্রেসার মাপার ডিজিটাল যন্ত্র, ৮. বিভিন্ন ডায়াগনসিস যন্ত্রপাতি (যেমন– ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র), ৯. টেলিফোন সেট, ১০. ডোর সিকিরিটি পদ্ধতি, ১১. ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

অনুশীলনী–১

■ **অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কী?
২. ডিজিটাল সিগনাল বলতে কী বোঝায়?
৩. এনালগ সিগনাল কী?
৪. কয়েকটি ডিজিটাল যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
৫. এনালগ সিগনালের কয়েকটি উৎসের নাম লেখ।
৬. ডিজিটাল সিগনালের অবস্থা দুইটি কী কী?

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. ডিজিটাল সিগনাল ও এনালগ সিগনালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২. ডিজিটাল সিস্টেমের সুবিধাগুলো কী কী?
৩. ডিজিটাল যন্ত্রাদির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

■ **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. চিত্রসহ এনালগ সিগনাল ও ডিজিটাল সিগনালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
২. ডিজিটাল মোডে কাজ করার সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

অধ্যায়–২

সংখ্যা পদ্ধতি ও কোড

■ **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**

২.১. সংখ্যা পদ্ধতি কী তা জানতে পারব।
২.২. বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব।
২.৩. বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে পারব।
২.৪. বাইনারি যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এর কার্য সম্পাদন করতে পারব।
২.৫. ১ এর পরিপূরক ও ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ করতে পারব।
২.৬. BCD, ASCII ও UNICODE সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব।

২.১ সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস (History of Number System)

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে হিসাব–নিকাশ করার ধারণা জন্মায়। আগেকার দিনে মানুষ গণনার কাজে হাতের আঙ্গুল, নুড়িপাথর, দড়ির গিট ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করত। উন্নতির ধাপে ধাপে গণনার জগতে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন পদ্ধতি।

সহজ ভাষায় কোন সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে। সংখ্যা তৈরি করার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে অঙ্ক। যেমন– ২৩৫ সংখ্যাটি ২, ৩ ও ৫ আলাদা তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত হয়েছে। সংখ্যা পদ্ধতিতে কিছু নির্দিষ্ট অঙ্ককে নিয়মিত সাজিয়ে বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায়। এসব সংখ্যাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গণনার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়। সংখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি হলো সংখ্যা প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম যাতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে–

১. সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
২. সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
৩. সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋণাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়ামাবলি।

ডিজিট বা অঙ্ক : কোন সংখ্যা পদ্ধতি লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত মৌলিক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ডিজিট বা অঙ্ক বলা হয়। যেমন : বাইনারি সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য 0, 1 ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে ডিজিট বা অঙ্ক। **উদাহরণ :** ৬২৩৪৫ সংখ্যাটি ৬, ২, ৩, ৪ ও ৫ এই পাঁচটি আলাদা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি (Base) : কোন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। যেমন–দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এই দশটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ১০। অনুরূপভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ২, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হলো ৮ এবং হেক্সাডেসিমাল এর বেজ ১৬। কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যে কোনো সংখ্যাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়।

নিচে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির নাম, প্রতীক, বেজ ও উদাহরণ দেখানো হলো।

সংখ্যা পদ্ধতি	বেজ বা ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
বাইনারি	2	0, 1	$(110110)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(287)_8$
দশমিক বা ডেসিমাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(397)_{10}$
হেক্সা-ডেসিমাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(5AD)_{16}$

বিট (Bit) : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 এবং 1 এই দুইটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

বাইট (Byte) : আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলে। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

২.২. বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচিতি

১. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Numbering System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীন ভারতে এই পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় বলে একে হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 10 বিধায় এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে দশ গুণ করে।
উদাহরণ : $(420)_{10}$।

দশভিত্তিক একটি সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

786 একটি দশভিত্তিক সংখ্যা। এ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। দশভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দশ বা তার গুণিতক। পূর্ণাংশে ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান 10^0, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^1, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^2 এবং ভগ্নাংশে বাম দিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-1}, দ্বিতীয় অঙ্কের স্থানীয় মান 10^{-2}, তৃতীয় অঙ্কের মান 10^{-3}। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে। যেমন– 786 সংখ্যাটি–

শতক	দশক	একক
7×10^2	8×10^1	6×10^0
7×100	8×10	6×1
700	80	6

একক + দশক + শতক $= 6 + 80 + 700 = 786$

> দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিকে হিন্দু–আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ও আরবীয়দের মধ্যে এ সংখ্যা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত আরবীয় গণিতবিদ আল খোয়ারিযমী আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতির উপর ৮ম শতকে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১১ শতকের দিকে তাঁর রচিত গ্রন্থ স্পেনে অনূদিত হলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন পরিপূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত।

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

১. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি হচ্ছে 10।
২. এ পদ্ধতিতে 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট 10টি মৌলিক অঙ্ক আছে। যথা– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9।
৩. ভিত্তিক সংখ্যার প্রচলনই সর্বাধিক। অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে লিখিত সংখ্যার মান বোঝার জন্য আমরা তা ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করে নেই।

২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Numbering System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুইটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ডিজিট দুইটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে কম্পিউটারসহ অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো 0 এবং 1। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 2।

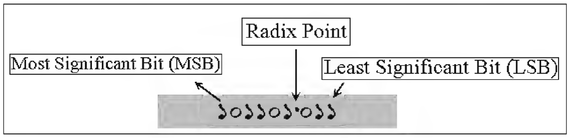

দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

১০১১১০ বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান দুই বা তার গুণিতক। ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের স্থানীয় মান $২^০$। দ্বিতীয় অঙ্কের মান $২^১$ এবং তৃতীয় অঙ্কের মান $২^২$। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে।

$১০১১১০ = ১\times২^৫ + ০\times২^৪ + ১\times২^৩ + ১\times২^২ + ১\times২^১ + ০\times২^০$

সপ্তদশ শতকে বাইনারি সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন গটফ্রিড লিবনিজ। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ০ অথবা ১ অঙ্ককে সংক্ষেপে বিট (Bit বা Binary digit) বলে। বিট হলো ডেটা ও তথ্য সংরক্ষণ, ডেটা কমিউনিকেশন ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মৌলিক একক। বাইনারি পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন করতে মূলত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পন্ন হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

১. বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের বেস বা ভিত্তি হচ্ছে 2।
২. এ পদ্ধতিতে 0 এবং 1 মোট 2টি মৌলিক অঙ্ক আছে।
৩. বাইনারি সংখ্যার মাধ্যমে কম্পিউটারের সমস্ত যোগ-বিয়োগ ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

৩. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Numbering System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ডিজিটগুলো হলো ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ৮।

আট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

৪৫৭ অক্টাল সংখ্যা। এ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। আটভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান আট বা তার গুণিতক। যেমন– ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান $৮^০$। দ্বিতীয় অঙ্কের মান $৮^১$ বা তৃতীয় অঙ্কের মান $৮^২$। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে। যেমন–

$৪৫৭ = ৪ \times ৮^২ + ৫ \times ৮^১ + ৭ \times ৮^০$

স্থানীয় মান : অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি ডিজিটের স্থানীয় মান (Value) হচ্ছে নিম্নরূপ :

অক্টাল বিন্দু

(Most Significant Bit) MSB ⟵ $৮^৩$ $৮^২$ $৮^১$ $৮^০$ | $৮^{-১}$ $৮^{-২}$ $৮^{-৩}$ ⟶ LSB (Least Significant Bit)

নিম্নে একটি অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় করে দেখানো হলো।

$$(৫৬০)_৮ = ৫ \times ৮^২ + ৬ \times ৮^১ + ০ \times ৮^০$$
$$= ৫ \times ৬৪ + ৬ \times ৮ + ০ \times ১$$
$$= ৩২০ + ৪৮ + ০ = (৩৬৮)_{১০}$$

অক্টালের সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

১. অক্টালের বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের বেস বা ভিত্তি হচ্ছে ৪।
২. এ পদ্ধতিতে 0 থেকে 7 পর্যন্ত মোট ৪টি মৌলিক অঙ্ক আছে।
৩. দশমিক সংখ্যার পাশাপাশি বিধায় কম্পিউটার সিস্টেমে মাঝে মাঝে অক্টাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

৪. হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Numbering System)

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10 টি অঙ্ক এবং A থেকে F এই 6টি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি 16। কম্পিউটারে হেক্সা-ডেসিমাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভুলের সম্ভাবনা কমানো যায়, মেমরি এড্রেস ব্যবহার করা যায় এবং কালার কোড নির্ধারণ করা যায়।
উদাহরণ : $(1A3)_{16}$ একটি হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা।

হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

১. হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বেস হচ্ছে 16।
২. কারণ এ পদ্ধতিতে মোট 16টি মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক আছে। যথা– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ও 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.
৩. কম্পিউটার সিস্টেমে হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

ষোলভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির গঠন বিশ্লেষণ

AF৯ একটি হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা। এ সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ষোলভিত্তিক একটি সংখ্যার অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান ১৬ বা তার গুণিতক। যেমন– ডান দিক থেকে প্রথম অঙ্কের মান $১৬^০$। দ্বিতীয় অঙ্কের মান $১৬^১$ এবং তৃতীয় অঙ্কের মান $১৬^২$। প্রতি ক্ষেত্রে সূচক বা ঘাত গুণিতক প্রকাশ করে।

AF৯ $= A \times ১৬^২ + F \times ১৬^১ + ৯ \times ১৬^০$

স্থানীয় মান : এ সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি ডিজিটের স্থানীয় মান হচ্ছে নিম্নরূপ—

হেক্সাডেসিমাল বিন্দু

(Most Significant Bit) MSB $১৬^{২}$ $১৬^{১}$ $১৬^{০}$. $১৬^{-১}$ $১৬^{-২}$ $১৬^{-৩}$ LSB (Least Significant Bit)

নিম্নে একটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় করে দেখানো হলো।

$(২C১)_{১৬} = ২\times১৬^{২} + C\times১৬^{১} + ১\times১৬^{০} = ২\times২৫৬ + ১২\times১৬ + ১\times১ = ৫১২ + ১৯২ + ১ = (৭০৫)_{১০}$

একটি ছকের মাধ্যমে বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি/বেজ, ব্যবহৃত ডিজিট এবং উদাহরণ দেওয়া হলো—

সংখ্যা পদ্ধতি	ভিত্তি	ব্যবহৃত ডিজিটসমূহ	উদাহরণ
বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি	2	0 এবং 1	$(1011)_2$
অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এবং 7	$(23)_8$
দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9	$(720)_{10}$
হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E এবং F	$(25D)_{16}$

বাইনারি, অক্টাল, দশমিক, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছক

বাইনারি পদ্ধতিতে মাত্র দুইটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাই এর ভিত্তি (Base) ২। দশমিক পদ্ধতিতে ৯-এর পরে দশ লেখতে যেমন ১ এর পিঠে ০ দিয়ে লেখা হয় তেমনি বাইনারি পদ্ধতিতে ১ এর পরে দুই লেখতে ১-এর পিঠে ০ (১০) দিয়ে লেখতে হয়। তিন লেখতে ১-এর পিঠে (১১-তিন) দিয়ে লেখতে হয়। এখন চার লেখতে কীভাবে লেখব? আমরা দশমিক সংখ্যায় যেমন ৯৯ এর পর ১০০ লিখি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যার সমষ্টির পরে বামে একটি সংখ্যা বাড়িয়ে ডানদিকে শূন্যতে ফিরে যাই তেমনি বাইনারিতে ১১ (তিন) এর পরে চার লিখতে সর্ববামে একটি ১ বসিয়ে অন্য দুইটিকে শূন্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একইভাবে অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাও তৈরি করা হয়।

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

২.৩. বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)

এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। সাধারণভাবে আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ হিসাবাদি করার সময় ডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে হয়। কম্পিউটারের জন্য বাইনারিতে লেখা প্রোগ্রাম অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যায় লিখলে যে বিশাল আকার ধারণ করত তাকেই সংক্ষিপ্তাকারে প্রকার জন্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

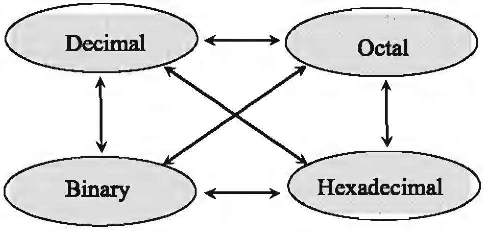

দশমিক সংখ্যা থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর

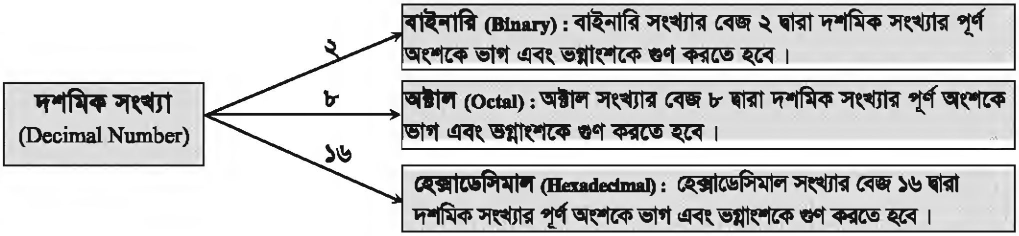

১. দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর (Convert decimal number into binary number)

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
২. ভাগফলকে পুনরায় ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না ভাজ্য ০ হয়।
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে ১ ও ০ এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

> বিঃ দ্রঃ ভিন্নভাবে বলা হলে ভাগশেষগুলোকে পেছন দিক থেকে পড়তে হবে। কারণ, সর্বশেষে প্রাপ্ত ভাগশেষ সংখ্যা সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন অঙ্ক। এ অংশটি কেবলমাত্র পূর্ণ সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য।

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. ভগ্নাংশ অংশকে ২ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ ১) তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি না থাকে তবে ০ সংরক্ষণ করতে হবে।
২. অবশিষ্ট ভগ্নাংশটিকে পুনরায় ২ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ ১) তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্ণ অংশ না থাকে তবে ০ সংরক্ষণ করতে হবে।
৩. এভাবে পুন পুন চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে পরিণত হয়।
৪. সংরক্ষিত পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে অর্থাৎ উল্টো করে পড়তে হবে।

উদাহরণ–১ : $(২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর ।

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ
২	২৫		
২	১২	–	১ (সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক)
২	৬	–	০
২	৩	–	০
২	১	–	১
	০	–	১ (সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক)

(ভাগশেষ নিচ থেকে উপরের দিকে ↑)

∴ $(২৫)_{১০} = (১১০০১)_২$

উদাহরণ–২ : $(.৮১২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর ।

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.৮১২৫×২ =	১.৬২৫	.৬২৫	১ ← সর্বোচ্চ গুরুত্বের অঙ্ক
.৬২৫ × ২ =	১.২৫	.২৫	১
.২৫ × ২ =	.৫০	.৫০	০
.৫০ × ২ =	১	০	১ ← সর্বনিম্ন গুরুত্বের অঙ্ক

∴ ফলাফল : $(.৮১২৫)_{১০} = (.১১০১)_২$

উদাহরণ–৩ : $(৩০.১২৫)_{১০}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর ।

পূর্ণ সংখ্যা অংশ :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল		ভাগশেষ
২	৩০	–	
২	১৫	–	০
২	৭	–	১
২	৩	–	১
২	১	–	১
	০	–	১

(ভাগশেষ নিচ থেকে উপরের দিকে ↑)

প্রাপ্ত সংখ্যা = $(১১১১০)_২$

ভগ্নাংশ :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.১২৫×২ =	০.২৫	০.২৫	০
.২৫×২ =	০.৫০	০.৫০	০
.৫০×২ =	১.০০	০.০০	১

(পূর্ণসংখ্যা উপর থেকে নিচের দিকে ↓)

প্রাপ্ত সংখ্যা : $(.০০১)_২$

∴ ফলাফল $(৩০.১২৫)_{১০} = (১১১১০.০০১)_২$

২. দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ করে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায় । ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুন পুন ভাগ করতে হয় । পরিশেষে ভাগশেষসমূহ শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজালে অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে । দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টালসংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য উক্ত সংখ্যাকে ৮ দিয়ে গুণ করে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করতে হবে । গুণফলে যদি ভগ্নাংশ থাকে, তবে তাকে পুনরায় ৮ দিয়ে গুণ করতে হবে । নিম্নের উদাহরণ দেওয়া গেল ।

উদাহরণ : $(১৭৫.১৫)_{১০}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর ।

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ
৮	১৭৫	
৮	২১	– ৭
৮	২	– ৫
	০	– ২

(ভাগশেষ নিচ থেকে উপরের দিকে ↑)

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.১৫ ×৮
১	.২০ ×৮

(পূর্ণ সংখ্যা উপর থেকে নিচের দিকে ↓)

১	.৬০ ×৮
৪	.৮০ ×৮
৬	.৪০ ×৮
৩	.২০

শুরু শেষ থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে সংখ্যা = $(.১১৪৬৩...)_{৮}$

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে সংখ্যা হয় = $(২৫৭)_{৮}$

$\therefore (১৭৫.১৫)_{১০} = (২৫৭.১১৪৬৩...)_{৮}$

৩. দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে ভাগ করে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুন পুন ভাগ করতে হয়। পরিশেষে ভাগশেষসমূহ শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজালে সমমানের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য উক্ত সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে গুণ করে গুণফল থেকে পূর্ণসংখ্যা আলাদা করতে হবে। পূর্ণ সংখ্যা না হওয়া পর্যন্ত ১৬ দিয়ে পুন পুন গুণ করতে হয়।

নিম্নে উদাহরণ দেওয়া গেল :

উদাহরণ : $(২৪৭৯.৫০)_{১০}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(২৪৭৯.৫০)_{১০} = (?)_{১৬}$

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

১৬	২৪৭৯	
১৬	১৫৪	— ১৫ (F)
১৬	৯	— ১০ (A)
	০	— ৯

$\therefore (২৪৭৯)_{১০} = (৯AF)_{১৬}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.৫০ × ১৬
↓৮	.০০

$\therefore (.৫০)_{১০} = (.৮)_{১৬}$

$\therefore (২৪৭৯.৫০)_{১০} = (৯AF.৮)_{১৬}$

দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

৪. বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

আমরা জানি যে, দশমিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে একক, দশক, শতক এভাবে কোন সংখ্যার স্থানীয় মান নির্ণয় করতে হয়। পূর্ণ বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মান নির্ণয় করতে সংখ্যার ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ঘরের মান $১০^{০}$ (১), দ্বিতীয় ঘরের মান $১০^{১}$ (১০), তৃতীয় ঘরের মান $১০^{২}$ (১০০), চতুর্থ ঘরের মান $১০^{৩}$ (১০০০) এভাবে নির্ণয় করা যায়। বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি দুই, তাই স্থানীয় মান দুই এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন– প্রথম ঘর $২^{০}$ (১), দ্বিতীয় ঘর $২^{১}(২ \times ১ = ২)$, তৃতীয় ঘর $২^{২}$ $(২ \times ২ = ৪)$, চতুর্থ ঘর $২^{৩}$ $(২ \times ২ \times ২ = ৮)$ ইত্যাদি দিয়ে।

$২^{৪}, ২^{৩}, ২^{২}, ২^{১}, ২^{০}$ অর্থাৎ ১৬, ৮, ৪, ২, ১

বাইনারি অঙ্কগুলোকে নিজস্ব স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলেও বাইনারি সংখ্যাটির সমান দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন, $(১০০১)_{২} = (?)_{১০}$

$(১০০১)_{২} = ১ \times ২^{৩} + ০ \times ২^{২} + ০ \times ২^{১} + ১ \times ২^{০}$

$= ৮+০ + ০ + ১\times১ = ৮+১ = ৯ \quad \therefore (১০০১)_{২} = (৯)_{১০}$

উদাহরণ–১ : $(১১০১)_{২}$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(১১০১)_{২} = (১\times২^{৩}) + (১\times২^{২}) + (০\times২^{১}) + (১\times২^{০})$

$= ১ \times ৮ + ১ \times ৪ + ০ \times ২ + ১ \times ১ = ৮ + ৪ + ০ + ১ = ১৩$

$\therefore$ **ফলাফল : $(১১০১)_{২} = (১৩)_{১০}$**

৫. অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে গুণফলসমূহ যোগ করে অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হলো।

উদাহরণ : $(২০৬.৬৪)_৮$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর।

$(২০৬.৬৪)_৮ = ২\times৮^২ + ০\times৮^১ + ৬\times৮^০ + ৬\times৮^{-১} + ৪\times৮^{-২}$

$= ২\times৬৪ + ০\times৮ + ৬\times১ + ৬\times১/৮ + ৪\times১/৬৪$

$= ১২৮ + ০ + ৬ + ০.৭৫ + ০.০৬২৫ = (১৩৪.৮১২৫)_{১০}$

সুতরাং, $(২০৬.৬৪)_৮ = (১৩৪.৮১২৫)_{১০}$

৬. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি থেকে দশমিক কিংবা অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তরের মতো একই নিয়মে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়।

উদাহরণ : $(৯AF.৮)_{১৬}$ সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(৯AF.৮)_{১৬} = ৯\times১৬^২ + A\times১৬^১ + F\times১৬^০ + ৮\times১৬^{-১}$

$= ৯\times২৫৬ + ১০\times১৬ + ১৫\times১ + ৮\times১/১৬$

$= ২৩০৪ + ১৬০ + ১৫ + ০.৫০ = (২৪৭৯.৫০)_{১০}$

$\therefore (৯AF.৮)_{১৬} = (২৪৭৯.৫০)_{১০}$

৭. বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে ০ থেকে ৭ পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যাগুলোর বাইনারি মান মনে রাখলে সুবিধা হবে। নিচের টেবিলে অক্টাল অঙ্কগুলোর বাইনারি মান দেওয়া হলো। বাইনারি সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করতে হলে পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রতি তিন বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়। এ মান অবশ্যই ০ থেকে ৭ এর মধ্যে হবে। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মানসমূহ সাজালে অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

উদাহরণ : $(১১০১০১)_২$ এর অক্টাল মান নির্ণয়

$(১১০১০১)_২ = ১১০\ ১০১ = (৬৫)_৮$

$(১০০১০১০০)_২ = ০১০\ ০১০\ ১০০ = (২২৪)_৮$

বাইনারি	তিন সংখ্যা করে বিভাজন	অক্টাল সংখ্যা
১১০১০১	১১০ ১০১	$(৬৫)_৮$
১০০১০১০০	০১০ ০১০ ১০০	$(২২৪)_৮$
.০১০১১০	.০১০ ১১০	$(.২৬)_৮$
১০০১১.১০	০১০ ০১১ .১০০	$(২৩.৪)_৮$

৮. বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি পূর্ণ সংখ্যাকে ডান থেকে বামে এবং বাইনারি ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে চারটি ডিজিট নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করতে হয়। এরপর প্রতিটি ভাগের হেক্সাডেসিমাল মান বসিয়ে মানগুলোকে একত্রিত করলে বাইনারি সংখ্যাটির সমমানের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ : $(১০১১০১১০)_২ = (?)_{১৬}$

১০১১ ০১১০

১১/B ৬

$\therefore (১০১১০১১০)_২ = (B৬)_{১৬}$

৯. অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।

উদাহরণ : $(১৭৫)_৮$ এবং $(৫২৭.০৬)_৮$ এর বাইনারি মান নির্ণয় কর।

১ ৭ ৫

(০০১ ১১১ ১০১)

$\therefore (১৭৫)_৮ = (০০১\ ১১১\ ১০১)_২$

৫ ২ ৭ . ০ ৬

(১০১ ০১০ ১১১ . ০০০ ১১০)

$\therefore (৫২৭.০৬)_৮ = (১০১\ ০১০\ ১১১\ .\ ০০০\ ১১০)_২$

অক্টাল সংখ্যা	সমতুল্য তিন বিট বাইনারি মান	বাইনারি
175	001 111 101	1111101
.023	.000 010 011	.000010011
12.46	001 010 .100 110	1010.100110

১০. হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে আলাদাভাবে চার ডিজিটের বাইনারিতে পরিবর্তন করে একত্রিত করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সমমানের বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

নিম্নে উদাহরণ দেওয়া গেল।

উদাহরণ : $(A০৯.E২)_{১৬} = (?)_২$

A ০ ৯ . E ২

$(১০১০\ ০০০০\ ১০০১\ .\ ১১১০\ ০০১০)_২$

$\therefore (A০৯.E২)_{১৬} = (১০১০\ ০০০০\ ১০০১\ .\ ১১১০\ ০০১০)_২$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারিতে বিভাজন	বাইনারি সংখ্যা
B5D	1011 0101 1101	$(101101011101)_2$
.0F2	.0000 1111 0010	$(.000011110010)_2$
AB.50	1010 1011 .0101	$(10101011.0101)_2$

১১. অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম : প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল রূপান্তর করতে হবে।

উদাহরণ : $(৫২৭.৩৭৫)_৮$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

সমাধান :

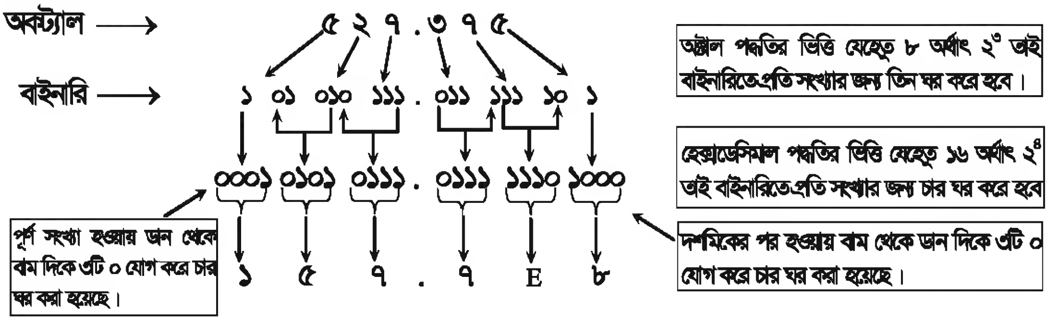

$(৫২৭.৩৭৫)_৮ = (১৫৭.৭E৮)_{১৬}$

১২. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

নিয়ম : (1) হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে।
(2) বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল ⟶ বাইনারি ⟶ অক্টাল

উদাহরণ—১ : $(২০৭.৫৪)_{১৬}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর।

সমাধান :

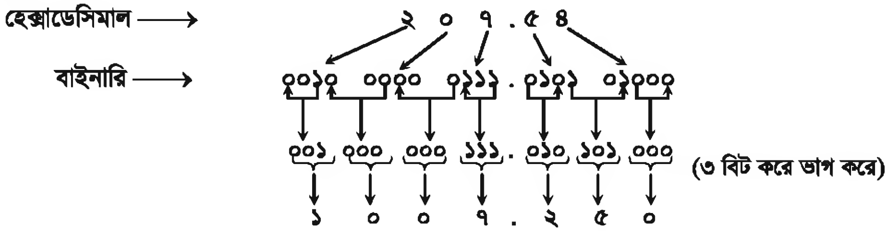

$\therefore (২০৭.৫৪)_{১৬} = (১০০৭.২৫০)_৮$ **(উত্তর)**

উদাহরণ—২ : $(৩৫৭.৫৪)_{১৬}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন।

সমাধান :

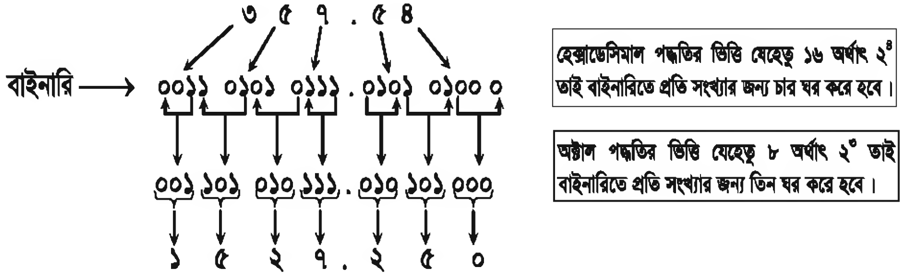

$\therefore (৩৫৭.৫৪)_{১৬} = (১৫২৭.২৫০)_৮$

গ্রুপ–১	এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর			
রূপান্তর	**নিয়ম**	**পূর্ণাংশ**	**ভগ্নাংশ**	**ফলাফল**
দশমিক – বাইনারি $(৩৮.০৫)_{১০}=(?)_{২}$ **D – B**	• ভাজ্য ০ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • ভগ্নাংশ : অংশকে ২ দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (১) সংরক্ষণ। যদি না থাকে তবে ০ সংরক্ষণ। • এভাবে পুন পুন চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (১ এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।	অবশিষ্ট ২ | ৩৮ – ২ | ১৯ – ০ ২ | ৯ – ১ ২ | ৪ – ১ ২ | ২ – ০ ২ | ১ – ০ – ১	পূর্ণসংখ্যা | ভগ্নাংশ | .০৫ × ২ ০ | .১০ × ২ ০ | .২০ × ২ ০ | .৪০ × ২ ০ | .৮০ × ২ ১ | .৬০	$(৩৮.০৫)_{১০}=$ $(১০০১১০.০০০০১....)_{২}$
দশমিক – অক্টাল $(১৭৫.১৫)_{১০}=(?)_{৮}$ **D – O**	• ভাজ্য ০ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .	৮ | ১৭৫ ৮ | ২১ – ৭ ৮ | ২ – ৫ ০ – ২	পূর্ণসংখ্যা | ভগ্নাংশ | .১৫×৮ ১ | .২০×৮ ১ | .৬০×৮ ৪ | .৮০×৮ ৬ | .৪০×৮ ৩ | .২০	$(১৭৫.১৫)_{১০}=$ $(২৫৭.১১৪৬৩...)_{৮}$
দশমিক – হেক্সা $(২৪৭৯.৫০)_{১০}=(?)_{১৬}$ **D – H**	• ভাজ্য ০ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .	১৬ | ২৪৭৯ ১৬ | ১৫৪ – ১৫ (F) ১৬ | ৯ – ১০ (A) ০ – ৯	পূর্ণসংখ্যা | ভগ্নাংশ | .৫০×১৬ ৮ | .০	$(২৪৭৯.৫০)_{১০}=(৯AF.৮)_{১৬}$
গ্রুপ–২				
বাইনারি – দশমিক $(১১১১০.০০১)_{২}=(?)_{১০}$ **B – D**	▪ স্থানীয় মান ২এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন– প্রথম ঘর $২^{০}$ (১), দ্বিতীয় ঘর $২^{১}$(২ × ১ = ২), তৃতীয় ঘর $২^{২}$ (২ × ২ = ৪)... ▪ দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান $২^{-১}$, দ্বিতীয় ঘরের মান $২^{-২}$, তৃতীয় ঘরের মান $২^{-৩}$, চতুর্থ ঘরের মান $২^{-৪}$ এভাবে . . .	$= ১×২^{৪} + ১×২^{৩} + ১×২^{২} + ১×২^{১} + ০×২^{০}$ = ১৬ + ৮ + ৪ + ২ + ০ = ৩০	$= ০×২^{-১} + ০×২^{-২} + ১×২^{-৩}$ = ০ + ০ + ১/৮ = .১২৫	$(১১১১০.০০১)_{২}=$ $(৩০.১২৫)_{১০}$
অক্টাল – দশমিক $(২০৬.৬৪)_{৮}=(?)_{১০}$ **O – D**	▪ স্থানীয় মান ৮এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= ২×৮^{২} + ০×৮^{১} + ৬×৮^{০}$ = ২×৬৪+০×৮+৬×১ = ১২৮ +০+৬ = ১৩৪	$= ৬×৮^{-১}+৪×৮^{-২}$ = ৬×১/৮ +৪×১/৬৪ =০.৭৫+ .০৬২৫=.৮১২৫	$(২০৬.৬৪)_{৮}=$ $(১৩৪.৮১২৫)_{১০}$
হেক্সা – দশমিক $(৯AF.৮)_{১৬}=(?)_{১০}$ **H – D**	▪ স্থানীয় মান ১৬ এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= ৯×১৬^{২} + A×১৬^{১} + F×১৬^{০}$ = ৯×২৫৬ + ১০×১৬ + ১৫×১ = ২৩০৪ + ১৬০ +১৫= ২৪৭৯	$= ৮× ১৬^{-১}$ = ৮/১৬ = ০.৫০	$(৯AF.৮)_{১৬}=$ $(২৪৭৯.৫০)_{১০}$
গ্রুপ–৩				
বাইনারি – অক্টাল $(১১০১০১)_{২}=(?)_{৮}$ $(.০১০১১০)_{২}=(?)_{৮}$ **B – O**	পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রতি ৩ বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$= ১১০\ ১০১ = (৬৫)_{৮}$ (যেহেতু, $(১১০)_{২}=(৬)_{৮}$ এবং $(১০১)_{২}=(৫)_{৮}$	=.০১০ ১১০ = ২৬ (যেহেতু, $(০১০)_{২}=(২)_{৮}$ এবং $(১১০)_{২}=(৬)_{৮}$	$(১১০১০১)_{২}=(৬৫)_{৮}$ $(.০১০১১০)_{২}=(২৬)_{৮}$
বাইনারি – হেক্সা $(১০১০১১০)_{২}=(?)_{১৬}$ $(.০১০১১১)_{২}=(?)_{১৬}$ **B – H**	পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রতি ৪ বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$(১০১০১১০)_{২}$ ০১০১ ০১১০ ↓ ↓ ৫ ৬	$(.০১০১১১)_{২}$.০১০১ ১১০০ ↓ ↓ ৫ ১২/C	$(১০১০১১০)_{২}=(৫৬)_{১৬}$ $(.০১০১১১)_{২}=$ $(.৫C)_{১৬}$
গ্রুপ–৪				

অক্টাল – বাইনারি $(৫২৭.০৬)_{৮} = (?)_{২}$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।	৫ ২ ৭ → ১০১ ০১০ ১১১	.০৬ → ০০০ ১১০	$(৫২৭.০৬)_{৮}$ = $(১০১০১০১১১.০০০১১০)_{২}$
হেক্সা – বাইনারি $(A০৯.E২)_{১৬} = (?)_{২}$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।	A ০ ৯ → ১০১০ ০০০০ ১০০১	.E২ → ১১১০ ০০১০	$(A০৯.E২)_{১৬}$ = $(১০১০ ০০০০১০০১.১১১০০০১০)_{২}$
রূপ–৫				
অক্টাল – হেক্সা $(৫২৭.৩৭৫)_{৮} = (?)_{১৬}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল রূপান্তর করতে হবে।	৫ ২ ৭ → ০০০ ১০১ ০১০ ১১১ → ১ ৫ ৭	.৩ ৭ ৫ → ০১১ ১১১ ১০১ ০০০ → ৭ ১৪/E ৮	$(৫২৭.৩৭৫)_{৮} = (৭E৮)_{১৬}$
রূপ–৬				
হেক্সা – অক্টাল $(২০৭.৫৪)_{১৬} = (?)_{৮}$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।	২ ০ ৭ → ০০১০ ০০০০ ০১১১ → ১ ০ ০ ৭	.৫৪ → ০১০১ ০১০০ ০ → ২ ৫ ০	$(২০৭.৫৪)_{১৬}$ = $(১০০৭.২৫০)_{৮}$

২.৪ বাইনারি যোগ–বিয়োগ, গুণ–ভাগ

বাইনারি সংখ্যার যোগ

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই। নিচের টেবিলটি বাইনারিতে যোগ করার জন্য সহায়ক হবে।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	Carry (হাতে)
0	0	0	নেই/০
0	1	1	নেই/০
1	0	1	নেই/০
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

১. 11	২. 101	৩. 1100101	৪. 1101	৫. 10011	৬. 11.10
+01	+001	+1010101	+1011	+1001	+101.01
100	110	10111010	11000	11100	1000.11

৭. 11011.101	৮. 1001110	৯. 11101.01001	১০. 11101.101
+10110.110	+110111	+1111.10000	+1001.001
110010.011	10000101	101100.11001	100110.110

1 + 1=10, বসে '0' হাতে থাকে '1' অনুরূপভাবে,1+ 1+1 = 11, বসে '1' হাতে থাকে '1'

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ

নিচের টেবিলটি বাইনারিতে বিয়োগ করার জন্য সহায়ক হবে।

ক	খ	বিয়োগফল = ক – খ	ধার
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

১. 111 − 101 = 010

২. 1101 − 1011 = 0010

৩. 1100 − 101 = 0111

৪. 1011011 − 101110 = 101101

৫. 11011.001 − 1011.110 = 1111. 011

৬. 110101.101 010110.110 = 011110.111

৭. 110101 10110 = 011111

৮. 10101 1010 = 01011

৯. 11101.101 1001.001 = 10100.100

১০. 10000.11100 101.01001 = 1011.10011

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে গাণিতিক কাজে সংখ্যার মানের দুইটি অবস্থা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বোঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে চিহ্ন + বা – থাকে।

বাইনারি সংখ্যার গুণ

বাইনারি সংখ্যার গুণ ও ভাগ দশমিক সংখ্যার অনুরূপ। তবে কম্পিউটার গুণ করার কাজটি পুন পুন যোগ আর ভাগের কাজটি পুন পুন বিয়োগ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

উদাহরণ–১ : $1001_{(2)}$ কে $1101_{(2)}$ দ্বারা গুণ কর

```
     1001
   × 1101
   ------
     1001
    0000×
   1001×
  1001×
  -------
  1110101
```

নির্ণেয় গুণফল = $1110101_{(2)}$

উদাহরণ-২ : $1001_{(2)}$ কে $1101_{(2)}$ দ্বারা গুণ কর

11001× 1001

প্রথমে দশমিক গুণন পদ্ধতিতে গুণ করা হলো।

```
    11001
    ×1001
    -----
    11001
   00000×
  00000×
 11001×
 --------
 11100001
```

অর্থাৎ 110012 × 10012 = 111000012

বাইনারি সংখ্যার ভাগ

আমরা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যেভাবে ভাগ করি, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতেও একই নিয়মে ভাগ করা যায়। বাইনারি ভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, ভাগফলের কোন অঙ্কই ১ এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। ভাজ্য বা ভাজকে বাইনারি বিন্দু থাকলে দশমিক পদ্ধতির মতোই একই নিয়মে ভাগ করতে হবে। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

উদাহরণ–১ । 110111100 ÷ 1100 = ?

```
1100) 110111100( 100101
      − 1100
      ------
        1111
```

```
  – 1100
     1100
   – 1100
```

∴ ফলাফল : 100101

উদাহরণ—২ । 100010.011 ÷ 11001 = ?

```
11001 ) 100010.011 ( 1.011
        – 11001
         100101
        – 11001
           11001
         – 11001
```

∴ ফলাফল : 1.011

উদাহরণ ৩ । $11100_{(2)}$ কে $100_{(2)}$ দ্বারা ভাগ

```
100)11100(111
    100
    110
    100
     100
     100
      ×
```

সুতরাং নির্ণেয় ভাগফল = $111_{(2)}$

২.৫ ১ এর পরিপূরক ও ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ

আমরা বাইনারি গণিতের ব্যবহার শিখেছি। কম্পিউটারে আমরা কোনো সংখ্যার সাথে কোনো সংখ্যা যোগ–বিয়োগ করার নির্দেশ দিলে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি সংখ্যার 1 বা 0 এক এক বিট জায়গায় থাকে। আট বিট মিলে হয় এক বাইট। কম্পিউটারে সংখ্যা আট বিটে বিন্যস্ত হয়। ধনাত্মক সংখ্যাটি যদি ছোট হয়, তাহলে ডানদিক থেকে সংখ্যা বসে বামদিকের বাকি ঘর শূন্য (০) দিয়ে পূরণ করে। তবে বাইনারি পদ্ধতিতে সংখ্যাটি কী ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা বুঝানোর জন্য সর্ববামের এক বিট ব্যবহার করা হয়। এ বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক ও 1 হলে সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক ধরা হয়। চিহ্ন রাখার জন্য সর্ববামের এ বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়। ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ছাড়া বাকি অংশটি সংখ্যার মান জ্ঞাপন করে। ঋণাত্মক সংখ্যার পরিণত করার মান জ্ঞাপনের জন্য দুইটি গঠন পদ্ধতি হলো—

১. 1 এর পরিপূরক গঠন (1'S Complement form) ও
২. 2 এর পরিপূরক গঠন (2'S Complement form)

২-এর পরিপূরক গঠন (2's Complement Structure)

বাইনারি সংখ্যাকে 1 এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে বাইনারি সংখ্যার 2 এর পরিপূরক পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারে 2-এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।

২-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

- ২-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- ২-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়। যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিতে কাজ করে।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়।

উদাহরণ : 26-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

26-এর বাইনারি সংখ্যা = 11010

8-বিট রেজিস্টারের জন্য এ সংখ্যা = 00011010

অর্থাৎ, +26 = 0 0 0 1 1 0 1 0

1 1 1 0 0 1 0 1 (1–এর পরিপূরক)

+1

1 1 1 0 0 1 1 0 (2–এর পরিপূরক)

সংখ্যাটি রেজিস্টারে সজ্জিত থাকে এভাবে–

1	1	1	0	0	1	1	0

চিহ্ন-বিট চিহ্ন বিট যেহেতু ১ তাই, 1 1 1 0 0 1 1 0 = –26

উদাহরণ : 12, 22, 8-এর 2-এর পরিপূরক গঠন

12 ডেসিমাল সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা হলো 1100। ধনাত্মক 12 সংখ্যাটিকে রেজিস্টারে রাখা হয় এভাবে :

+12 →	0	0	0	0	1	1	0	0

↑ চিহ্ন-বিট

কিন্তু –12 ঋণাত্মক সংখ্যাটি 2 এর পরিপূরক হয়ে থাকে এভাবে, ⟶

–12 →	1	1	1	1	0	1	0	0
+22 →	0	0	0	1	0	1	1	0
–22 →	1	1	1	0	1	0	1	0

12 = 1100 = 00001100 (৮-বিট হিসেবে সাজিয়ে)

11110011 (১ এর পরিপূরক করে)

+1

(–12) = 11110100 (২ এর পরিপূরক)

22 = 10110 = 00010110 (৮-বিট হিসেবে সাজিয়ে)

11101001 (১ এর পরিপূরক করে)

+ 1

(–22) = 11101010 (২ এর পরিপূরক)

ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়। নিচে আরও কয়েকটি সংখ্যার উদাহরণ দেওয়া হলো।

	চিহ্ন	পরিমাণ		চিহ্ন	পরিমাণ
+12 =	0	0 0 0 1 1 0 0	এবং –12 =	1	1 1 1 0 1 0 0
+8 =	0	0 0 0 1 0 0 0	এবং –8 =	1	1 1 1 1 0 0 0
+22 =	0	0 0 1 0 1 1 0	এবং –22 =	1	1 1 0 1 0 1 0

2 এর পরিপূরকের গাণিতিক কাজ

২-এর পরিপূরক যোগ

২-এর পরিপূরক যোগের সময় বিটের সংখ্যা সমান হতে হয়। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলে।

- সাধারণ বাইনারি যোগ করে।
- ঋণাত্মক সংখ্যাকে 2 এর পরিপূরক করে যোগ করে।
- চিহ্ন বিটের পর ক্যারি বাদ দেওয়া হয়। (ফলাফলের ক্যারি বিট ওভার ফ্লো হলে তা বিবেচনা করা হয় না)
- ফলাফল ঋণাত্মক হলে (চিহ্ন বিট 1 হলে) তা 2-এর পরিপূরক আকারে হয়।

নিচের 8 বিট সংখ্যার জন্য যোগের প্রক্রিয়া দেখানো হলো।

উদাহরণ—১ : +22 ও +9 এর যোগফল নির্ণয়।

		চিহ্ন বিট	
+22	:	0	0010110
+ 9	:	0	0001001
+31	:	0	0011111

এখানে সংখ্যা দুইটি এবং যোগফলের চিহ্ন বিট 0। সুতরাং, সংখ্যাগুলো ধনাত্মক।

উদাহরণ—২ : +22 ও −13 এর যোগফল নির্ণয়।

		ক্যারিবিট	চিহ্নবিট		
+22	:		0	0010110	
− 13	:		1	1110011	(দুই এর পরিপূরক)
+ 9	:	1	0	0001001	

13 = 1101 = 00001101
11110010
+1
$\therefore (-13)_{10} = (11110011)_2$

এখানে ক্যারি 1 ধরা হবে না। চিহ্ন বিট 0 বলে ফলাফল ধনাত্মক হবে। ∴ যোগফল = $(00001001)_2$ বা 9

2 এর পরিপূরক বিয়োগ (2's complement Substraction)

2-এর পরিপূরক বিয়োগ 2-এর পরিপূরক যোগের মতোই। এক্ষেত্রেও যোগ করে বিয়োগের কাজ করা হয়। প্রথম সংখ্যাটিকে বিয়োজক (Minuend) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে বিয়োজ্য (Subtrahend) বলা হয়। বিয়োগ করার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো মানতে হয় তা হলো—

- বিয়োজ্য সংখ্যাটির চিহ্ন পরিবর্তন করে (ধনাত্মক থাকলে ঋণাত্মক, ঋণাত্মক থাকলে ধনাত্মক করে) বিয়োজকের সাথে যোগ করতে হয়।
- যোগের মতোই সংখ্যাটি যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে এটির 2 এর পরিপূরক করা হয়।
- চিহ্ন বিটের অতিরিক্ত ক্যারি ধরা হয় না।

উদাহরণ—১ : + 22 থেকে + 13 বিয়োগ করতে হবে।

		চিহ্ন		
+22	=	0	0010110	
+13	=	0	0001101	
−13	=	1	1110011	[২ এর পরিপূরক]

22 − 13 = 22 + (−13)
13 = 00001101
11110010 [1 এর পরিপূরক করে]
+ 1
(−13) = 11110011 [2 এর পরিপূরক করে]

সুতরাং + 22 থেকে + 13 এর বিয়োগ + 22 এর সাথে +13 এর 2 এর পরিপূরক যোগ অর্থাৎ –

+ 22	=		0	0010110
– 13	=		1	1110011
+ 9	=	1	0	0001001
		ক্যারিবিট	চিহ্ন–বিট	

ক্যারি 1 বিবেচ্য নয়। সুতরাং, চিহ্ন বিট 0 তাই ফলাফল ধনাত্মক। ∴ নির্ণেয় যোগফল = $(00001001)_2$

উদাহরণ–২ : –13 থেকে –22 বিয়োগ করতে হবে।

–13 থেকে –22 বিয়োগ = (– 13) – (–22) = (–13) + 22

– 13	=	1	1	110011
+ 22	=	0	0	010110
+ 9	=	1	0	0001001
		ক্যারিবিট	চিহ্ন বিট	

13 = 00001101	
11110010	[1 এর পরিপূরক করে]
+ 1	
(–13) = 11110011	[2 এর পরিপূরক করে]

ক্যারি 1 ধর্তব্য নয়। তাই চিহ্ন বিট 0 হওয়াতে ফলাফল ধনাত্মক হবে।

∴ নির্ণেয় যোগফল, $9_{10} = (00001001)_2$ (উ:)

২.৬ BCD, ASCII, ও UNICODE সম্পর্কে ধারণা

কোড (Code)

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বিটের (0 বা 1) বিভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় (Unique) সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কোড বলে।

বিভিন্ন প্রকার কোডের নাম

প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কোড আবিষ্কৃত হয়েছে।

১. অকটাল কোড

২. হেক্সাডেসিম্যাল কোড

৩. বিসিডি কোড

৪. মোর্স কোড

৫. আলফানিউমেরিক কোড

৬. অ্যাসকি কোড

৭. ইবিসিডি কোড

বিসিডি (BCD) কোড

BCD শব্দ–সংক্ষেপেটির পূর্ণরূপ হলো Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করাকে BCD Code বলে। BCD কোড একটি চার বিট বিশিষ্ট কোড। 0 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্কগুলোকে 4 বিটের বাইনারিতে পরিবর্তন করে BCD কোড পাওয়া যায়। যেমন– 0 → 0000, 1 → 0001, 2 → 0010 ইত্যাদি।

$(395)_{10}$ কে বিসিডি কোডের মাধ্যমে দেখাও।

$(395)_{10}$ = 3 9 5
↓ ↓ ↓
0011 1001 0101

$\therefore (395)_{10} = (001110010101)BCD$

অ্যাসকি (ASCII) কোড

ASCII শব্দটির পূর্ণরূপ হলো– American Standard Code for International Interchange। অ্যাসকি একটি বহুল প্রচলিত কোড। এটি ৭ বিট নিয়ে গঠিত হয় যার বাম দিকের ৩টি বিটকে জোন এবং ডান দিকের ৪টি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট হিসেবে ধরা হয়। তবে একেবারে বামে একটি প্যারিটি বিট যোগ করে অ্যাসকিকে ৪টি বিট কোডে রূপান্তরিত করা হয়।

প্যারিটি বিট	৩ টি	জোন বিট		সংখ্যাসূচক বিট			
7	6	5	4	3	2	1	0

বিসিডি কোড ও বাইনারি কোডের মধ্যে পার্থক্য

বিসিডি কোড ও বাইনারি কোডের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বিসিডি কোড	বাইনারি কোড
১. বিসিডি কোনো সংখ্যা পদ্ধতি নয়।	১. বাইনারি একটি সংখ্যা পদ্ধতি।
২. এটি দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।	২. এ সংখ্যা পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দুইটি (0, 1) সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।
৩. দশমিক সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশ করা খুব সহজ।	৩. দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করা সহজ নয়।
৪. কোনো সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশের জন্য বেশি বিট লাগে।	৪. কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশের জন্য কম বিট লাগে।

ASCII কোড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য

ASCII কোর্ড ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ASCII কোড	BCD কোড
১. ASCII এর পূর্ণরূপ হলো American Standard Code for Intormation Interchange।	১. BCD এর পূর্ণরূপ হলো Binary Coded Decimal।
২. ASCII একটি বহুল প্রচলিত ৭ বিট কোড।	২. BCD কোড ৪টি বিট নিয়ে গঠিত।
৩. এ ৭টি বিট দ্বারা মোট $২^৭$ বা ১২৮টি চিহ্ন নির্দিষ্ট করা যায়।	৩. এ ৪টি বিট দ্বারা ২৪ বা ১৬টি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করা যায়।
৪. বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার বিশেষ করে মাইক্রো কম্পিউটারের ASCII কোডের ব্যাপক প্রচলন আছে।	৪. দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্যই BCD কোডের ব্যবহার হয়।

কম্পিউটারে কোডের গুরুত্ব

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বিটের (0, 1) ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কোড বলা হয়। ইনপুটের জন্য এনকোডিং প্রয়োজন। প্রসেসিং শেষে আউটপুটে ডিকোডিং ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে কোডকে আবার বর্ণ, সংখ্যা এবং চিহ্নে রূপান্তর করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক চিহ্ন দুইটি (0, 1)।

কম্পিউটার কোডিং

কম্পিউটারের অভ্যন্তরে গৃহীত সকল প্রকার বর্ণ, চিহ্ন, সংখ্যা, প্রতীক ইত্যাদি সমতুল্য বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। রূপান্তর করার এই প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার কোডিং বলা হয়।

ইউনিকোড (UNICODE)

বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোড ভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছেন যাকে ইউনিকোড বলা হয়। ইউনিকোড–এর পূর্ণ অর্থ Universal Code বা সার্বজনীন কোড। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আসকি কোডের পাশাপাশি ইউনিকোড সিস্টেম চালু হয়েছে। ইউনিকোড হচ্ছে ১৬ বিট কোড। বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার ও টেক্সটকে প্রকাশ করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহার করা হয়। ইউনিকোডের মাধ্যমে $২^{১৬}$ = ৬৫৫৩৬ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর জন্য তাদের ভাষায় কম্পিউটিং করা সহজ করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে অ্যাপল কম্পিউটার কর্পোরেশন এবং Xerox Corporation–এর একদল কম্পিউটার প্রকৌশলী যৌথভাবে ইউনিকোড উদ্ভাবন করেন। Unicode Consortium–এর সদস্য হয়ে বাংলা ভাষাও ইউনিকোডভুক্ত হয়েছে।

ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা (Advantages of Uni Code)

১. এটা ১৬ বিট বিশিষ্ট কোড ফলে ৬৫,৫৩৬ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
২. বিশ্বের ছোট বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়।
৩. ক্যারেক্টারকে কোড করার জন্য ১৬ বিটই ব্যবহার করা হয়।
৪. ইউনিকোড ASCII কোডের সাথে কম্প্যাটিবল। অর্থাৎ ইউনিকোডের প্রথম ২৫৬টি কোড অ্যাসকি ২৫৬টি কোডের অনুরূপ।
৫. ইউনিকোড থেকে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড কোডে পরিবর্তন করা যায়।

ASCII কোড ও ইউনিকোড (Uni Code) এর মধ্যে পার্থক্য

ASCII কোড	Uni Code কোড
১. ASCII শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো–American Standard Code for Information Interchange.	১. Uni Code শব্দ–সংক্ষেপটির পূর্ণরূপ হলো–Universal Code.
২. ASCII কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।	২. Uni Code এর মাধ্যমে 2^{16} বা 65,536টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।
৩. American Standards Association এর অধীনে X3 নামক কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় এই কোড উন্নয়ন করা হয়।	৩. ইউনিকোডের দায়িত্বে রয়েছে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।
৪. কম মেমোরির প্রয়োজন হয়।	৪. বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়।
৫. শুধু আমেরিকান ইংলিশ বর্ণ চিহ্নের এনকোডের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, আসকি কোডে পাউন্ডের চিহ্ন ব্যবহার করে না।	৫. বিশ্বের শত শত ভাষার হাজার হাজার বর্ণ, চিহ্নের জন্য এ কোড ব্যবহৃত হয়।

ASCII কোড	Uni Code কোড
৬. সব সফটওয়্যার এবং ই–মেইল আসকি কোড বুঝতে পারে।	৬. কিছু কিছু সফটওয়্যার এবং ই–মেইল ইউনিকোড ক্যারেক্টার সেট বুঝতে পারে না।
৭. আসকি হলো ৭ বিট/৮ বিট কোড।	৭. বিভিন্ন উপস্থাপনায় ইউনিকোড ৮, ১৬ অথবা ৩২ বিট ক্যারেক্টার বেজ ব্যবহার করে।
৮. **উদাহরণ :** A = 65 = 01000001	৮. **উদাহরণ :** A = \u0041

প্রশ্নমালা–২

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
২. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
৩. ডেসিমাল, বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সা-ডেসিমালের বেস ও রেডিক্স কত?
৪. স্থানিক মান ও পরম মান বলতে কী বোঝায়?
৫. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
৬. মেশিন ল্যাংগুয়েজ বলতে কী বোঝায়?
৭. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার লেখ।
৮. বাইনারি ও ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির মূল পার্থক্য উল্লেখ কর।
৯. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
১০. অক্টাল ও বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?
১১. হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যা সিস্টেমে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো লেখ।
১২. কোড কী?
১৩. কোডের শ্রেণিবিভাগ লেখ।
১৪. বিসিডি (BCD) কোড বলতে কী বোঝায়?
১৫. ASCII এর পূর্ণরূপ কী?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নাম্বার সিস্টেমের পটভূমি লেখ।
২. ১ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগের ধাপসমূহ লেখ।
৩. ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগের ধাপসমূহ লেখ।
৪. ইউনিকোড কী?
৫. বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর :

ক. $(53.33)_{10}$ খ. $(47.85)_{10}$
গ. $(713)_8$ ঘ. $(2F8)_{16}$
ঙ. $(B.16)_{16}$ চ. $(123.33)_{10}$

৬. অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর :

ক. $(425)_{10}$ খ. $(269)_{10}$

গ. $(96)_{10}$ ঘ. $(1110101011101)_2$

৭. 306.625 কে হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

৮. $(1101)_2$ কে হেক্সা ডেসিমাল রূপান্তর কর।

৯. $(1101.1011)_2$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১০. $(1111110110101.1011101101)_2$ কে অস্টক (অক্টাল) সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১১. $(110.1010011)_8$ কে হেক্সা-ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১২. $(13.52)_8$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১৩. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে $(1011)_2$ এর সাথে $(110)_2$ যোগ কর।

১৪. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে $(10111.10)_2$ হতে $(10001)_2$ বিয়োগ কর।

১৫. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে $(1001)_2$ কে $(1101)_2$ দ্বারা গুণ কর।

১৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 11100_2 কে 100_2 দ্বারা ভাগ কর।

১৭. $(10101)_2$ সংখ্যাটির 1's কম্প্লিমেন্ট মান বের কর।

১৮. 1'S কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে $(11011)_2$ হতে $(01101)_2$ বিয়োগ কর।

১৯. $(5473)_{10}$ কে 8421 বিসিডি কোডে রূপান্তর কর।

২০. বিসিডি কোডের ব্যবহার উল্লেখ কর।

২১. অ্যাসকি (ASCII) কোডের ব্যবহার উল্লেখ কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

২. ১ এর পরিপূরক ও ২ এর পরিপূরক বিয়োগ পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. ১ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(11101)_2$ হতে $(01101)_2$ বিয়োগ কর।

৪. ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে $(1111)_2$ হতে $(0110)_2$ বিয়োগ কর।

■ গাণিতিক সমস্যা

১. $(123.135)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ কর।

২. $(25)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ কর।

৩. $(37)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ কর।

৪. $(21.625)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।

৫. $(910)_{10}$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

৬. $(269.58)_{10}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

৭. $(95)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

৮. $(307.625)_{10}$ কে সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

৯. $(110111)_2$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১০. $(1110101011101)_2$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১১. $(750)_{16}$ কে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

১২. $(13)_{10}$ এর ১ এর পরিপূরক বের কর।

১৩. ডেসিমাল 4952.63 কে বিসিডি কোডে রূপান্তর কর।

অধ্যায়–৩
ডিজিটাল লজিক

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–
- ৩.১. বুলিয়ান অপারেটর সম্পর্কে জানতে পারব।
- ৩.২. লজিক গেট ও এর শ্রেণিবিভাগ জানতে পারব।
- ৩.৩. ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান অ্যালজেবরা সম্পর্কে জানতে পারব।

৩.১. বুলিয়ান অপারেটর

প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল (George Boole) ১৮৪৭ সালে তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ "The Mathematical Analysis of Logic"–এ সর্বপ্রথম বুলিয় বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তার 'An Investigation of the Laws of Thought' গ্রন্থে বুলিয় বীজগণিত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে মূলত সত্য এবং মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয় বীজগণিতের সত্য এবং মিথ্যাকে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। বুলিয় বীজগণিতে শুধু বুলিয় যোগ এবং গুণ–এর মাধ্যমে সমস্ত অঙ্ক করার কাজ করা হয়। যোগ এবং গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মগুলোকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Postulates) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়–বুলিয়ান অ্যালজেবরার মাধ্যমে লজিক সমস্যা সমাধানের জন্য গাণিতিক অপারেটরের ন্যায় কিছু লজিক্যাল অপারেটরই হলো বুলিয়ান অপারেটর।

বুলিয়ান অপারেটরগুলোর নাম

বুলিয়ান অপারেটরগুলোর নাম নিম্নরূপ :
- ১. অ্যান্ড অপারেটর (AND Operator)
- ২. অর অপারেটর (OR Operator) এবং
- ৩. নট অপারেটর (NOT Operator) বা ইনভার্টার।

বুলিয় বীজগণিতের মূলকথা

সাধারণ বীজগণিতে কোনো চলক বা ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান হতে পারে। কিন্তু বুলিয় বীজগণিতে একটি চলকের কেবলমাত্র দুইটি মান "সত্য" (1) অথবা "মিথ্যা" (0) হতে পারে।

- 0 (0 Volt থেকে + 0.8 Volt)
  1 (2 volt থেকে + 5 Volt)
  কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স সার্কিটগুলো 0 এবং 1 এই দুই মানের মাঝামাঝি কোনো মান ধারণ করে না।
- বুলিয়ান বীজগণিতে তিনটি মৌলিক ক্রিয়া আছে। যথা–
  - ১. বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া (Logical OR Operation)
  - ২. বুলিয়ান গুণের ক্রিয়া (Logical AND Operation)
  - ৩. বুলিয়ান পূরকের ক্রিয়া (Logical NOT Operation)

- বুলিয় বীজগণিতে ভগ্নাংশ, ঋণাত্মক সংখ্যা, বর্গ ইত্যাদির ব্যবহার নেই।
  ১. OR কে $\vee$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ২. AND কে $\wedge$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ৩. NOT কে ~ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং, বুলিয় বীজগণিতে $a + b = c$ এ জাতীয় সমীকরণের তিনটি চলক a, b এবং c এর মান 1 এবং 0 হতে পারে। এ মানগুলো বসিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো হলো নিম্নরূপ–

$0+0$	$=0$	①
$1+0$	$=1$	②
$0+1$	$=1$	③
$1+1$	$=1$	④

প্রথম তিনটি সমীকরণ সাধারণ বীজগণিতের নিয়ম মেনে চলছে কিন্তু 4নং সমীকরণ $1 + 1 = 1$ এর সাথে সাধারণ বীজগণিতের কোনো মিল নেই। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগ (+) চিহ্ন সাধারণ + চিহ্নকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগকে বলা হয় Logical Addition অথবা Logical Or Operation। গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো নিম্নরূপ :

0.0	$=0$
1.0	$=0$
0.1	$=0$
1.1	$=1$

বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Boolean Algebra)

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধু 0 এবং 1 এ দুইটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- এ অ্যালজেবরায় শুধু যোগ এবং গুণের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয়।
- এতে কোনো ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না।
- এতে কোনো ধরনের জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
- এ অ্যালজেবরা দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় অনেক সহজ পদ্ধতি।

বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক (Boolean Constant and Variable)

সাধারণভাবে ধ্রুবক বলতে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মান স্থির বা অপরিবর্তনশীল থাকাকে বুঝায়। আর চলক বলতে এমন গাণিতিক রাশিকে বুঝায় যার মান সর্বদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ চলকের মান স্থির থাকে না। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত কোনো রাশির মান যদি শুধু 0 বা 1 নির্দেশ করে তবে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়। যেমন, শুধু $A = 0$ অথবা শুধু $A=1$ হলে A ধ্রুবক বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে রাশিটির মান যদি দুইটি ভিন্ন অবস্থার নির্দেশ করে (অর্থাৎ 0 ও 1) তবে তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়। যেমন $A = 0,1$ উভয়টি হলে A কে চলক বলা হবে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তণীর ইনপুট ও আউটপুটের লজিক অবস্থা নির্দিষ্ট করার জন্য চলক ও ধ্রুবক ব্যবহৃত হয়।

বুলিয়ান পূরক (Boolean Complement)

বুলিয় বীজগণিতে চলকের দুইটি সম্ভাব্য মান 0 এবং 1-কে একটিকে অপরটির পূরক (Complement) বলা হয়। অর্থাৎ, 1-এর পূরক 0 এবং 0-এর পূরক 1। অর্থাৎ সত্যকে উল্টিয়ে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে উল্টিয়ে সত্য করা।

গণিতের ভাষায় লেখা হয় এভাবে–

A-এর পূরক A' অথবা $\bar{A}$ (A' অথবা $\bar{A}$ কে "এ নট" বলা হয়।)

যদি A-এর মান 0 হয় তাহলে $A' = 1$, যদি A-এর মান 1 হয় তাহলে $A' = 0$ হবে।
বুলিয় বীজগণিতে পূরকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুলিয় বীজগণিতে অঙ্ক করতে গেলে প্রায়ই পূরক নির্ণয় করতে হয়।

দ্বৈত নীতি (Duality Principle)

AND এবং OR অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সূত্রকে দ্বৈত নীতি বলা হয়। AND এবং OR অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ দ্বৈত নীতি মেনে চলে। যেমন—

AND (·) এবং OR (+) পরস্পর বিনিময় করে। অর্থাৎ AND (.) এর পরিবর্তে OR (+) এবং OR (+) এর পরিবর্তে AND (.) ব্যবহার করে। যেমন—

$1+1 = 1$
$1 . 1 = 1$

1 এবং 0 পরস্পর বিনিময় (Interchange) করে। অর্থাৎ 1 এর পরিবর্তে 0 এবং 0 এর পরিবর্তে 1 ব্যবহার করে। যেমন—

$0 + 1 = 1$ এবং $0. 1 = 0$
$1 + 0 = 1$ $\quad 1. 0 = 0$

বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorems)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাধারণ উপপাদ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorem)	সহায়ক উপপাদ্য (Secondary Theorem)
• $A + 0 = A$	• $A + A.B = A$
• $A + 1 = 1$	• $\overline{\overline{A}} = A$
• $A + A = A$	**বিভাজন উপপাদ্য (Distributed Theorem)**
• $A + \overline{A} = 1$	• $A(B + C) = A.B + A.C$
• $A.A = A$	• $A + B.C = (A + B)(A + C)$
• $A.1 = A$	• $A + \overline{A}B = A+B$
• $A. \overline{A} = 0$	• $A.B + B. \overline{C} + BC = A.B + C$
• $A.0 = 0$	
বিনিময় উপপাদ্য (Commulative Theorem)	**ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De-Morgan's Theorem)**
• $A + B = B + A$	• $\overline{(A + B)} = \overline{A}.\overline{B}$
• $A.B = B.A$	• $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$
অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorem)	
• $A + (B + C) = (A + B) + C$	
• $A.(B.C) = (A.B).C$	

এসব উপপাদ্য দিয়ে যুক্তি রাশিমালা সরলীকরণ করা যায়।

সূত্র সমূহের ব্যাখ্যা :

ধরা যাক, $A = 0$, সুতরাং, $\overline{A} = 1$

- $A + \overline{A} = 0 + 1 = 1$
- $A. \overline{A} = 0.1 = 0$
- $\overline{\overline{A}} = \overline{1} = 0 = A$

ধরা যাক, $A = 1$, সুতরাং, $\overline{A} = 0$

- $A + \overline{A} = 1 + 0 = 1$

- $A \cdot \bar{A} = 1.0 = 0$
- $\bar{\bar{A}} = \bar{0} = 1 = A$

অর্থাৎ, $A + \bar{A} = 1$, $A. \bar{A} = 0$, $\bar{\bar{A}} = A$

ধরা যাক, $A = 0, B = 1$

- $A + A.B = 0 + 0.1 = 0 = A$ অর্থাৎ $A + A.B = A$
  যদি $A = 1$ এবং $B = 0$ হয় তাহলে, $A + A.B = 1 + 1.0 = 1 = A$
  সুতরাং $A + A.B = A$
- $A = 0, B = 1$ ধরে $A + \bar{A}B = 0 + 1.1 = 1$, $A + B = 0 + 1 = 1$
- $A = 1, B = 0$ ধরে $A + \bar{A}B = 1 + 0.0 = 1 + 0 = 1$
  $A + B = 1 + 0 = 1$
  সুতরাং $A + \bar{A}B = A + B$
- $AB + BC + \bar{B}C = AB + C(B + \bar{B})$
  $= AB + C.1 = AB + C$ [যেহেতু $A + \bar{A} = 1$]
- $A = 0$ এবং $B = 1$ ধরে
  $\overline{A + B} = \overline{0 + 1} = \bar{1} = 0$
  $\bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{0} \cdot \bar{1} = 1.0 = 0$
- $A = 1$ এবং $B = 0$ ধরে
  $\overline{A + B} = \overline{1 + 0} = \bar{1} = 0$
  $\bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{1} \cdot \bar{0} = 0.1 = 0$
- $\overline{AB} = \overline{1 \cdot 0} = \bar{0} = 1$
  $\bar{A} + \bar{B} = \bar{1} + \bar{0} = 0 + 1 = 1$
  সুতরাং, $\overline{A + B} = \bar{A} . \bar{B}$
- $\overline{A.B} = \overline{0.1} = \bar{0} = 1$ $\bar{A} + \bar{B} = \bar{0} + \bar{1} = 1 + 0 = 1$
  সুতরাং $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

সাধারণ অ্যালজেবরা এবং বুলিয়ান অ্যালজেবরার মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ অ্যালজেবরা	বুলিয়ান অ্যালজেবরা
১. যে কোনো অঙ্ক ব্যবহার করা যায়।	১. দুইটি অঙ্ক ০ এবং ১ ব্যবহার করা হয়।
২. যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া যেমন– যোগ, গুণ, ভাগ, বিয়োগ, বর্গ ইত্যাদি সম্ভব।	২. যোগ ও গুণ এ দুইটি গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্ভব।
৩. পূরক চলক বা কমপ্লিমেন্ট (Complement) নেই।	৩. পূরক চলক বা কমপ্লিমেন্ট (Complement) আছে।
৪. ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা যায়।	৪. ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা যায় না।
৫. জ্যামিতিক, ত্রিকোণমিতিক বা লগারিদম ইত্যাদি সূত্র ব্যবহার করা যায়।	৫. জ্যামিতিক, ত্রিকোণমিতিক বা লগারিদম ইত্যাদি সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
৬. গাণিতিক কাজ তুলনামূলক কঠিন।	৬. মাত্র দুইটি অঙ্ক থাকায় যোগ ও গুণের কাজ সহজ।

ডি-মরগ্যানের সূত্র ও প্রমাণ

ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান বুলিয়ান অ্যালজেবরার ক্ষেত্রে দুইটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারে উপপাদ্য দুইটিকে ডি–মরগ্যানের সূত্র বা উপপাদ্য বলা হয়। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দুইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুইটি হলো–

1. $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A}+\overline{B}$

ডি–মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ : A ও B দুইটি চলকের জন্য ডি–মরগ্যানের সূত্র দুইটির প্রমাণ সত্যক সারণির মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়। নিম্নে সারণি দেওয়া হলো–

১ম সূত্র ($\overline{A+B}$, $\overline{A}.\overline{B}$) ২য় সূত্র ($\overline{AB}$, $\overline{A}+\overline{B}$)

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$\overline{A+B}$	$\overline{A}.\overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

চিত্র : সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A ও B দুইটি চলকের সকল মানের জন্য–

1. $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$
2. $\overline{A\,B} = \overline{A}+\overline{B}$

সুতরাং ডি–মরগ্যানের সূত্র দুইটি প্রমাণিত হলো।

ডিজিটাল লজিক সার্কিটের মাধ্যমে প্রমাণ :

প্রথম উপপাদ্যের ব্যাখ্যা : A ও B দুইটি চলকের যোগফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের গুণফলের সমান।

দ্বিতীয় উপপাদ্যের ব্যাখ্যা : A ও B দুইটি চলকের গুণফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের যোগফলের সমান।

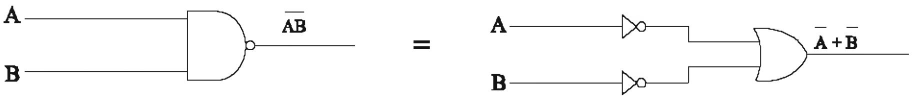

তিনটি বুলিয়ান চলকের ডি-মরগানের সূত্র প্রমাণ :

A, B ও C তিনটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের দুইটি নিম্নরূপ :

1. $\overline{A+B+C} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$
2. $\overline{A\,B\,C} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

নিম্নে সত্যক সারণির মাধ্যমে উপপাদ্য দুইটি প্রমাণ করা হলো–

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	$A+B+C$	$\overline{A+B+C}$	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1

0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

১ম সূত্র ২য় সূত্র

চিত্র : সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

উপর্যুক্ত সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A, B ও C তিনটি চলকের সকল মানের জন্য—

1. $\overline{A+B+C} = \overline{A}\,.\,\overline{B}\,.\,\overline{C}$
2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

সুতরাং ডি-মরগ্যানের সূত্র দুইটি প্রমাণিত হলো।

n সংখ্যক বুলিয়ান চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

n সংখ্যক বুলিয়ান চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুইটি নিম্নরূপ—

1. $\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + A_n} = \overline{A_1}\,.\,\overline{A_2}\,.\,\overline{A_3}\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ \overline{A_n}$
2. $\overline{A_1\,.\,A_2\,.\,A_3\,.\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots + \overline{A_n}$

লজিক ফাংশন সরলীকরণ (Simplification of Logic Function)

লজিক্যাল ফাংশনগুলো লজিক গেটের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। তাই লজিক্যাল ফাংশনগুলো সরল হলে বাস্তবে লজিক গেটের ব্যবহার সহজতর হয়। বুলিয়ান সূত্রের সাহায্যে জটিল লজিক্যাল এক্সপ্রেশন বা যুক্তি রাশিমালাকে সরলীকরণ করা যায়। বুলিয়ান রাশিমালাকে সরলীকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট লজিক গেটের সংখ্যা কম হয়, ফলে সময় এবং খরচ কমে।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে লজিক ফাংশন সরলীকরণ

বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে লজিক ফাংশন সরলীকরণের ক্ষেত্রেও কতগুলো নিয়ম মেনে চলা হয়। নিয়মগুলো হলো—

১. সরলীকরণ বাম থেকে ডানদিকে শুরু করতে হয়।
২. প্রথম বন্ধনীর ভেতরের কাজ আগে করতে হয়।
৩. পূরক (NOT) অপারেশন থাকলে তার কাজ আগে করতে হয়।
৪. তারপর (AND) অর্থাৎ (.) অপারেশনের কাজ করতে হয়।
৫. এরপর (OR) অর্থাৎ + অপারেশনের কাজ করতে হয়।

উদাহরণ–১ :

$$\begin{aligned}
F &= (A+B)(A+C)\\
&= AA + AC + AB + BC\\
&= A + AC + AB + BC \quad [\because\ A.A = A]\\
&= A(1 + C + B) + BC\\
&= A(1+B) + BC \quad [\because\ 1 + C = 1]\\
&= A.1 + BC \quad [\because\ 1 + B = 1]\\
&= A + BC\ \textbf{(Ans.)}
\end{aligned}$$

উদাহরণ—২ : $F = \overline{(A+B+\bar{C})}\,\bar{B}C$

$= \bar{A}\,.\,\bar{B}\,.\,\bar{\bar{C}}\,.\,\bar{B}C \qquad [\because \overline{A+B+C} = \bar{A}\,.\,\bar{B}\,.\,\bar{C}]$

$= \bar{A}\,.\,\bar{B}\,.\,C\,.\,\bar{B}C \qquad [\because \bar{\bar{A}} = A]$

$= \bar{A}\,(\bar{B}\,.\,\bar{B})\,.\,(C\,.\,C)$

$= \bar{A}\bar{B}C \qquad [\because \bar{B}.\bar{B} = \bar{B}$ ও $C.C = C]$

উদাহরণ—৩ : $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + AB$

$= \bar{A}\,(B+\bar{B}) + AB$

$= \bar{A}\,.\,1 + AB \qquad [\because A+\bar{A} = 1]$

$= \bar{A} + AB$

$= \bar{A} + B \qquad [\because A + \bar{A}B = A + B]$

উদাহরণ—৪ : $F = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$

$= BC(A+\bar{A}) + \bar{B}C\,(A+\bar{A})$

$= BC + \bar{B}C$ [যেহেতু $A+\bar{A} = 1$]

$= C\,(B+\bar{B})$

$= C.1 = C$ **(Ans.)**

উদাহরণ—৫ : $F = AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB$

$= A\bar{C}\,(B+\bar{B}) + AB$

$= A\bar{C}.1 + AB$ [যেহেতু $\bar{x} + x = 1$]

$= A\bar{C} + AB \qquad [\because x.1 = x]$

$= A\,(\bar{C}+B)$ **(Ans.)**

৩.২ লজিক গেইট ও এর শ্রেণিবিভাগ (Logic Gate and Classification)

লজিক গেইট এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট। বুলিয়ান অ্যালজেবরার গাণিতিক অপারেশনগুলোকে লজিক গেইটের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। **বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যে গাণিতিক ইলেক্ট্রিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় তাকে লজিক গেইট বলা হয়। লজিক গেইটের মধ্য দিয়ে এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে একটি আউটপুট পাওয়া যায়।** প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে এ গেইটগুলো রিলে (Relay) যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হতো। আধুনিক আইসি (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) প্রযুক্তিতে সব রকম ডিজিটাল গেইট আইসি হিসেবে তৈরি করা হয়।

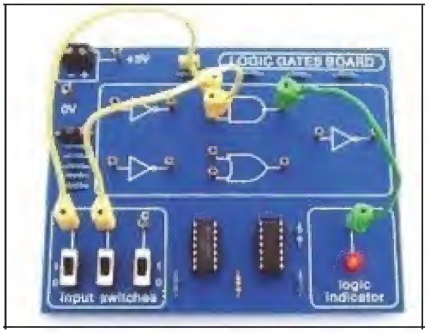

চিত্র : লজিক গেইট শেখার লজিক বোর্ড

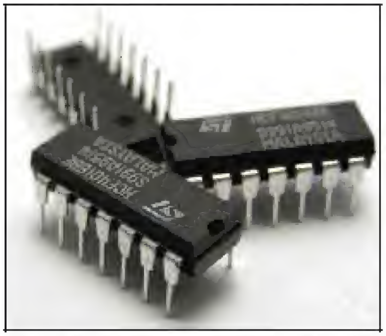
চিত্র : লজিক গেইট দিয়ে তৈরি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি)

লজিক গেইটের প্রকারভেদ (Types of Logic Gates)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় গাণিতিক অপারেশনগুলো সম্পাদন করা হয় মূলত তিনটি গাণিতিক অপারেশন দ্বারা। এগুলো হলো যোগ, গুণ ও পূরক। এছাড়া অন্য সব গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করা হয় উল্লিখিত তিনটি গাণিতিক অপারেশনের সমন্বয়ে। লজিক গেইটকে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. মৌলিক গেইট ও
২. যৌগিক গেইট।

১. **মৌলিক গেইট (Basic Logic Gates) :** এ গেইটগুলো এককভাবে গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করতে পারে। তিন প্রকার মৌলিক গেইটগুলো হলো :
   ১. অর গেইট (OR Gate) : যৌক্তিক যোগের জন্য।
   ২. অ্যান্ড গেইট (AND Gate) : যৌক্তিক গুণের জন্য।
   ৩. নট গেইট (NOT Gate) : যৌক্তিক পূরকের জন্য।
২. **যৌগিক গেইট (Compound Logic Gates) :** এ গেইটগুলো এক বা একাধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এগুলো হলো :
   ১. ন্যান্ড গেইট (NAND Gate) : AND গেইটের ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি।
   ২. নর গেইট (NOR Gate) : OR গেইটের ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি।
   ৩. এক্স—অর (X–OR Gate) : অর, অ্যান্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়
   ৪. এক্স—নর গেইট (X–NOR Gate) : এক্স-অর গেইটের সাথে NOT গেইট মিলিয়ে তৈরি হয়।

বিভিন্ন প্রকার গেইটের বিবরণ (Description of Different Gates)

নিচে তিন প্রকার মৌলিক গেইটের বর্ণনা দেওয়া হলো।

অর গেইট (OR Gate)

এ গেইটে দুই বা দুইয়ের অধিক ইনপুট থাকে এবং আউটপুট থাকে একটি। যেকোনো একটি ইনপুট সত্য (1) হওয়ার কারণে আউটপুট সত্য (1) হবে। এ গেইটে দুই বা ততোধিক সুইচ সমান্তরালে থাকে। চিত্রে অর গেইটের সমান্তরাল সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। এতে যেকোনো একটি সুইচ অন (ON) হলে বাল্বটি প্রজ্জ্বলিত হয়। অর গেইটের বীজগণিতীয় ফাংশন হলো $X = A + B$। যেখানে A ও B হলো OR গেইটের ইনপুট।

এখানে + (প্লাস) দিয়ে OR (অথবা) ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। A বা B যেকোনো একটির মান 1 হলে আউটপুট X = 1 হবে।

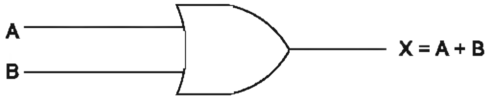

চিত্র : অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, $x = A \text{ OR } B = A+B$

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র : সত্যক সারণি

আমরা বাল্বটির নিম্নবর্ণিত চারটি অবস্থা পরীক্ষা করে দেখি :

i. A ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে
ii. A অফ ও B অন থাকলে, X অন থাকবে
iii. A অন ও B অফ থাকলে, X অন থাকবে
iv. A ও B অন থাকলে, X অন থাকবে

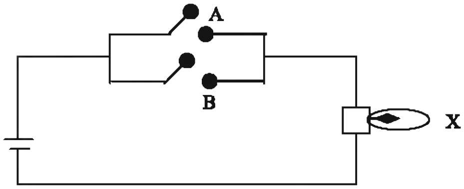

চিত্র : অর গেইটের সুইচিং সার্কিট

উপরে দুইটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইটের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন এবং সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

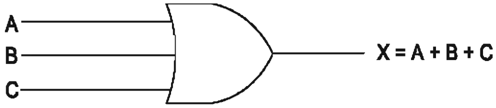

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X = A + B + C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের সত্যক সারণি

অ্যান্ড গেইট (AND Gate)

এ গেইটে দুই বা দুইয়ের অধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। যে কোনো একটি ইনপুট মিথ্যা (0) হলে আউটপুট মিথ্যা (0) হবে। সবগুলো ইনপুট সত্য (1) হলে আউটপুট সত্য (1) হবে। যদি দুইটি ইনপুট A এবং B হয় তাহলে এর আউটপুট হবে, $X = A.B$। এক্ষেত্রে ইনপুট $A = 1$ এবং $B = 1$ হলে কেবল আউটপুট $X = 1$ হবে। চিত্রে অ্যান্ড গেইটের সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। উভয় সুইচ অন হলে বাল্বটি প্রজ্জ্বলিত হয়।

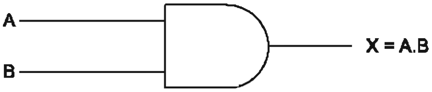

চিত্র : অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, $x = A \text{ AND } B = A.B = AB$

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র : সত্যক সারণি

নিম্নে বর্ণিত বাল্বটির চারটি অবস্থা হতে পারে :

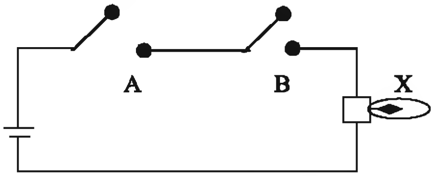

চিত্র : অ্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট

i. A ও B অফ থাকলে X অফ থাকবে
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অফ থাকবে
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অফ থাকবে
iv. A ও B অন থাকলে X অন থাকবে

তিনটি ইনপুট বিশিষ্ট এন্ড গেইটের আউটপুট X = ABC হবে। এখানে A, B এবং C হলো গেইটটির ইনপুট সংকেত এবং X হলো আউটপুট সংকেত।

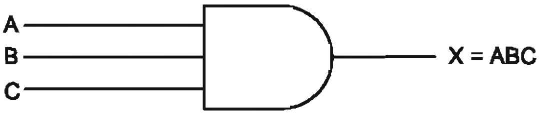

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X = ABC
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য এ্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

নট গেইট (NOT Gate)

এ গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। ইনপুটের বিপরীত হবে আউটপুট। সেজন্য এ গেইটকে ইনভার্টার (Inverter) বলা হয়। এ গেইটে ইনপুট সত্য হলে আউটপুট মিথ্যা, আর যদি ইনপুট মিথ্যা হয় তাহলে আউটপুট সত্য হয়। ইনপুট যদি A হয় তাহলে আউটপুট $X = \overline{A}$ (A এর উল্টো)। A = 0 হলে X = 1 এবং A = 1 হলে X = 0 হবে।

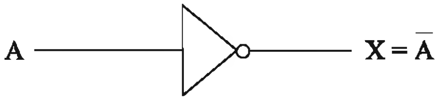

চিত্র : নট গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট	আউটপুট
A	$X = \overline{A}$
0	1
1	0

চিত্র : নট গেইটের সত্যক সারণি

সমীকরণ, $x = NOT(A) = \overline{A}$

এছাড়াও বাফার গেইট নামের আর একটি গেইট আছে। তবে এর ইনপুট যা দেওয়া হয় আউটপুটও তাই হয়। অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে এ গেইট ব্যবহার করা হয়।

ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)

অ্যান্ড গেইট হতে নির্গত আউটপুট সংকেতকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে ন্যান্ড গেইটের কাজ হয়। অর্থাৎ, AND Gate + NOT Gate = NAND Gate

যদি A এবং B দুইটি ইনপুট হয়, তাহলে ন্যান্ড গেইট $X = \overline{A.B}$ অর্থাৎ এ্যান্ড গেইটের বিপরীত। এক্ষেত্রে একাধিক ইনপুট সত্য হলে আউটপুট মিথ্যা এবং ইনপুট মিথ্যা হলে আউটপুট সত্য হবে।

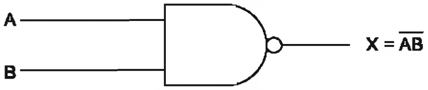

চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

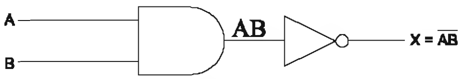

চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	$X = \overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

সমীকরণ, $X = \text{NOT (A AND B)}$

$= \text{NOT (A . B)} = \text{NOT (AB)} = \overline{AB}$

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে।
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অন হবে।
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অন হবে।
iv. A ও B অন থাকলে X অফ হবে।

নর গেইট (NOR Gate)

অর গেইটের পর নট গেইট সংযুক্ত করলে নর গেইটের কাজ হয়। অর্থাৎ OR Gate + NOT Gate = NOR Gate। যদি A ও B দুইটি ইনপুট হয়, তাহলে নর গেইট $X = \overline{A + B}$ অর্থাৎ অর গেইটের বিপরীত।

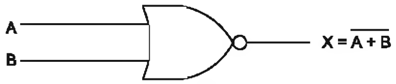

চিত্র : নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

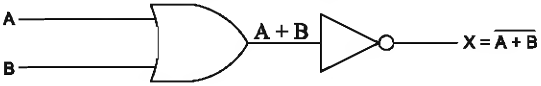

চিত্র : নর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

ইনপুট			আউটপুট
A	B	A + B	$X = \overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র : নর গেইটের এর সত্যক সারণি

সমীকরণ, $X = \text{NOT (A OR B)}$

$= \text{NOT } (A + B)$

$= \overline{A + B}$

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে।
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অফ হবে।
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অফ হবে।
iv. A ও B অন থাকলে X অফ হবে।

এক্স-অর গেইট (X–OR Gate)

Exclusive OR গেইটকে সংক্ষেপে X–OR Gate বলা হয়। ইনপুট A এবং B হলে এ গেইটের আউটপুট X যে বুলিয় নিয়মটি মেনে চলে তা হলো $X = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ এখানে $\oplus$ চিহ্ন দ্বারা X–OR ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। এ গেইটটি বহুল ব্যবহৃত হয় বলে একে অন্যান্য মৌলিক গেইটের মতোই গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর, এ্যান্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়, আবার এটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) বা একীভূত বর্তনী আকারেও পাওয়া যায়।

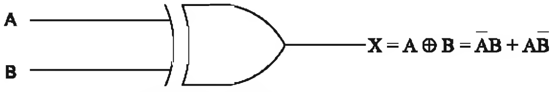

চিত্র : এক্স-অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র : এক্স–অর গেইটের সত্যক সারণি

উপরের সত্যক সারণি থেকে পাই যে,

$X = \overline{A}B + A\overline{B}$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

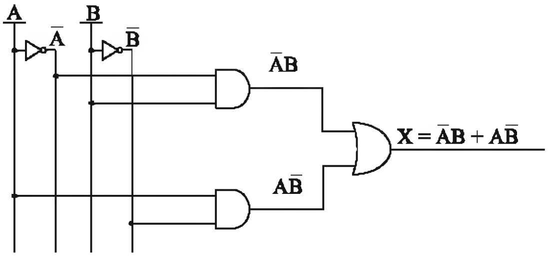

এক্স–নর গেইট (X–NOR Gate)

X–OR গেইটের সাথে NOT গেইটের সমন্বয়ে X–NOR গেইট গঠিত হয়। X–OR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে X–NOR গেইট পাওয়া যায়। দুইটি ইনপুট A ও B হলে X–NOR গেইটের আউটপুট X–এর মান বুলিয় বীজগণিত অনুযায়ী হবে, $X = \overline{A \oplus B} = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}} = \overline{A}\,\overline{B} + AB$
দুইটি ইনপুট বিশিষ্ট X–NOR গেইটের জন্য ইনপুট দুইটি একই হলে আউটপুট একই হবে। নিচের সত্যক সারণিতে লক্ষ কর। অর্থাৎ X–OR Gate + NOT Gate = X–NOR Gate.

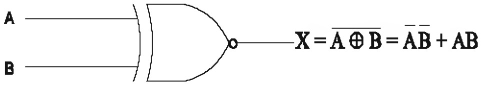

চিত্র : এক্স–নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

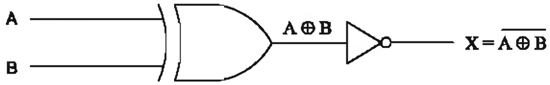

চিত্র : এক্স–নর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

ইনপুট			আউটপুট
A	B	$A \oplus B$	$X = \overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র : এক্স–নর গেইটের সত্যক সারণি

উপরের সত্যক সারণি থেকে পাই যে,

$$X = \overline{A}\,\overline{B} + AB$$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–

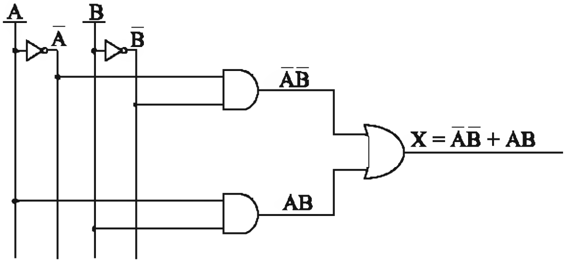

NOR ও NAND Gate দিয়ে মৌলিক Gate (AND, OR, NOT) বাস্তবায়ন

অর, এ্যান্ড এবং নট-এ তিনটি মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে যেকোন যুক্তিবর্তনী (Logic Circuit) তৈরি করা সম্ভব। আবার, শুধু ন্যান্ড গেইট দিয়েও যেকোনো বর্তনী তৈরি করা সম্ভব। কারণ, ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর, এ্যান্ড এবং নট গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব। তেমনি নর গেইট দিয়েও যেকোনো বর্তনী বাস্তবায়ন সম্ভব। এটি ন্যান্ড ও নর গেইটের সার্বজনীনতা নামে পরিচিত।

ন্যান্ড গেইটের সার্বজনীনতা/ন্যান্ড গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন–

ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিলে ন্যান্ড গেইট নট গেইটের মতো কাজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে ইনপুট দুইটি একই (A) হওয়ায় নট গেইট বাস্তবায়িত হয়েছে।

[যেহেতু বুলিয় সূত্রানুসারে A.A = A]

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে অর গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

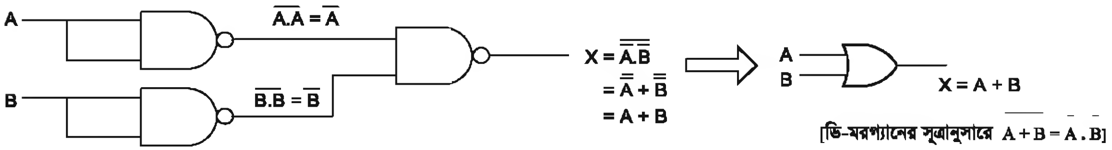

[ডি-মরগ্যানের সূত্রানুসারে $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$]

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে এ্যান্ড গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

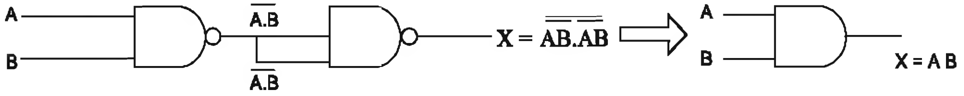

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

$X = \overline{\overline{AB}.\overline{AB}} = \overline{\overline{AB}} = AB$

যেহেতু ন্যান্ড গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও এ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু ন্যান্ড গেইট একটি সার্বজনীন গেইট।

নর গেইটের সার্বজনীনতা/নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন–

নর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে নট গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

চিত্র : নর গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

দুইটি ইনপুটই A হওয়ায় X = A + A, বুলিয় সূত্রানুসারে A + A = A। সুতরাং আউটপুট $X = \overline{A}$ অর্থাৎ অর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি হয়েছে।

নর গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিলে নর গেইট অর গেইট হিসেবে কাজ করবে।

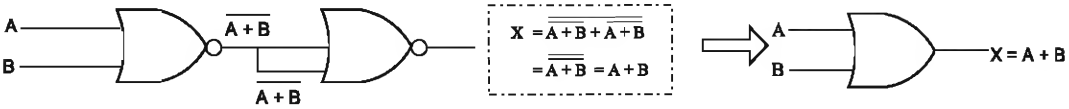

চিত্র : নর গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট তৈরি :

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে অর গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।

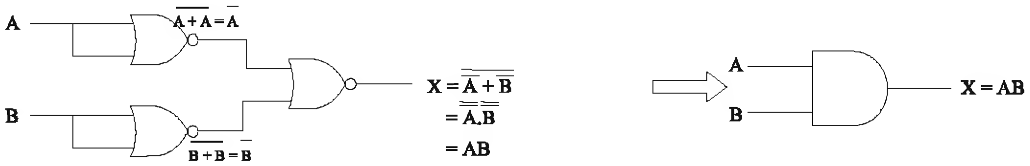

চিত্র : নর গেইট দিয়ে এ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

যেহেতু নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও এ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু নর গেইট একটি সার্বজনীন গেইট।

৩.৩ ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি (Truth Table)

বুলিয় চলকের মানের সম্ভাব্য সব বিন্যাসের জন্য বুলিয় ফাংশনের যে মান হয় তা দেখানোর টেবিলকে ট্রুথ টেবিল বলে। ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে বুলিয় সব সূত্র প্রমাণ করা যায়। সত্যক সারণিতে এক বা একাধিক ইনপুট থাকে যার মান 0 বা 1 হতে পারে। n–সংখ্যক চলকের জন্য সত্যক সারণিতে 2^n সংখ্যক সারি থাকবে। যেমন, কোনো লজিক বর্তনীতে 2টি ইনপুট A এবং B হলে উহার ইনপুটের অবস্থা হবে 4টি (00, 01, 10, 11)। আবার ইনপুট A, B এবং C হলে উহার ইনপুটের অবস্থা হবে 2^3= ৪টি (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)

ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণির ব্যবহার :

১. সত্যক সারণির মাধ্যমে সার্কিটটির আউটপুট কী ধরনের হবে তা ঠিক করা হয় এবং সেখান থেকে বুলিয়ান রাশি বের করা হয় এবং ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা হয়।

২. বুলিয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহার করা হয়।

৩. একটি বুলিয়ান রাশি সরলীকরণ করে নতুন একটি রাশিতে রূপান্তর করা যায়।

৪. সরলীকরণ সঠিক কীনা পরীক্ষার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহৃত হয়।

যেমন, A + A.B = A সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করা যায়।

$A + \overline{A}B = A + B$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রমাণ করা যায়।

A	B	AB	A + AB
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

উপরোক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে–

$A + A.B = A$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{A}B$	$A+\overline{A}B$	A+B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

উপরোক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে–

$A + \overline{A}B = A + B$

প্রশ্নমালা–৩

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ কী?
২. বুলিয়ান অপারেটরগুলো কী কী?
৩. লজিক গেইট কী?
৪. মৌলিক লজিক গেইট কত প্রকার?
৫. মৌলিক গেইট বলতে কী বোঝায়?
৬. যৌগিক গেইট কী?
৭. অ্যান্ড গেইট কী?
৮. অর গেইট কী?
৯. নট গেইট কী?
১০. ইনভার্টার কী?
১১. ন্যান্ড গেইট কী?
১২. নর গেইট কী?
১৩. এক্সক্লুসিভ অর/ এক্স-অর গেইট কী?
১৪. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী?
১৫. ডি মরগ্যানের প্রথম সূত্রটি লেখ।
১৬. ডি মরগ্যানের দ্বিতীয় সূত্র লেখ।
১৭. এক্সক্লুসিভ নর/ এক্স-নর গেইট কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যান্ড গেইটের প্রতীক অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
২. অর গেইটের প্রতীক অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৩. নট গেইটের প্রতীক অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৪. ন্যান্ড গেইটের প্রতীক অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৫. নর গেইটের প্রতীক অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৬. এক্সক্লুসিভ অর গেইটের প্রতীক অঙ্কন করে ট্রুথ টেবিল দেখাও।
৭. প্রতীক ও ট্রুথ টেবিল সহ ডি মরগ্যানের প্রথম সূত্রটি বর্ণনা কর।
৮. প্রতীক ও ট্রুথ টেবিলসহ ডি–মরগ্যানের দ্বিতীয় সূত্রটি বণনা কর।
৯. সরল কর : $\overline{A\overline{B}+C}$
১০. $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ রাশিমালাটির লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

■ **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. সমতুল্য ইলেকট্রিক সার্কিট অঙ্কন করে অ্যান্ড, অর এবং নট গেইটের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
২. প্রতীক ও ট্রুথ টেবিলসহ মৌলিক গেইটসমূহের অপারেশন বর্ণনা কর।
৩. সমতুল্য ইলেকট্রিক সার্কিট অঙ্কন করে ন্যান্ড গেইট এবং নর গেইট এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৪. এক্সক্লুসিভ অর/ এক্স-অর গেইটের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৫. দুই চলকের ক্ষেত্রে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য সত্যক সারণীর মাধ্যমে প্রমাণ কর।
৬. তিন চলকের ক্ষেত্রে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য সত্যক সারণীর মাধ্যমে প্রমাণ কর।
৭. এক্সক্লুসিভ নর/ এক্স-নর গেইটের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৮. NOR ও NAND Gate দিয়ে মৌলিক Gate গুলো (AND, OR, NOT) বাস্তবায়ন করে দেখাও।

দ্বিতীয় অংশ

কম্পিউটার পেরিফেরালস

অধ্যায়–৪
স্টোরেজ মিডিয়া

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–
- ৪.১. স্টোরেজ মিডিয়া ও এর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারব।
- ৪.২. প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারব।
- ৪.৩. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, অপটিক্যাল ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ (Flush Memory) এর ফাংশন সম্পর্কে জানতে পারব।
- ৪.৪. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, অপটিক্যাল ড্রাইভ এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারব।

৪.১ স্টোরেজ মিডিয়া ও এর শ্রেণিবিভাগ

উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ভৌত মাধ্যমকে স্টোরেজ মিডিয়া বলে। যেমন–

১. হার্ডডিস্ক,
২. ফ্লপিডিস্ক,
৩. ম্যাগনেটিক টেপ,
৪. কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি,
৫. রি–রাইটেবল সিডি,
৬. ডিভিডি,
৭. ফ্লাশ মেমোরি বা পেন ড্রাইভ,
৮. মেমোরি কার্ড ইত্যাদি।

স্টোরেজ মিডিয়া প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

১. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া বা মেমোরি এবং
২. সেকেন্ডারি স্টোরেজ বা মিডিয়া মেমোরি।

স্টোরেজ মিডিয়ার শ্রেণিবিভাগ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

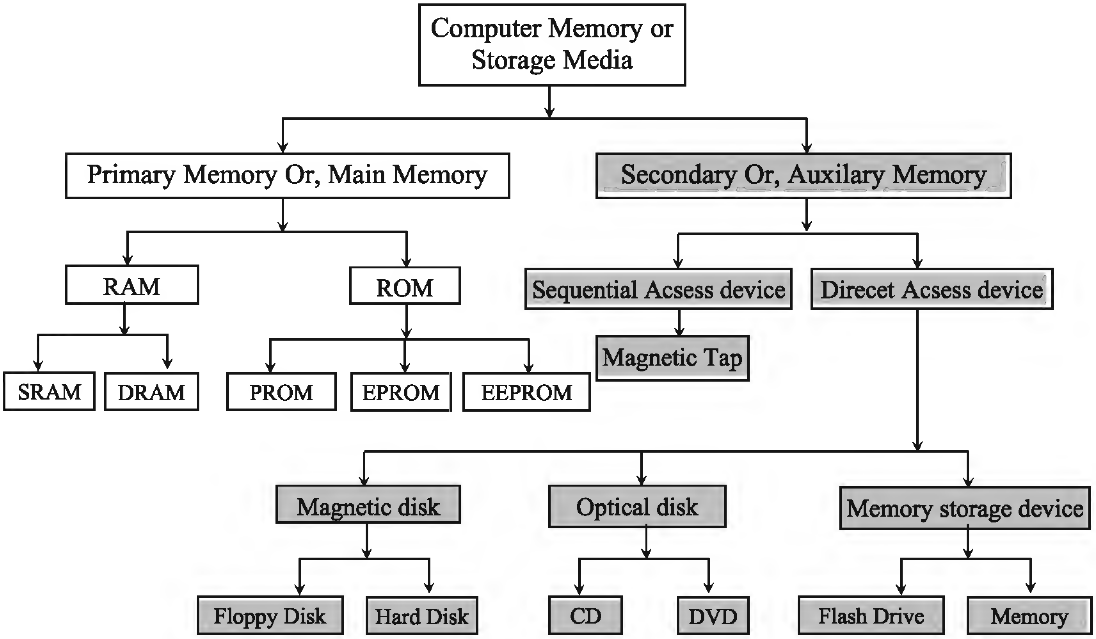

প্রাইমারি মেমোরি (Primary Memory)

যে মেমোরি সিপিইউ-এর গাণিতিক ও যুক্তি অংশের সাথে সংযুক্ত মেমোরিকে প্রাইমারি মেমোরি বা প্রধান মেমোরি (Main Memory) বলা হয়। চলমান প্রোগ্রাম, ডেটা, নির্দেশ, প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণে এটি ব্যবহৃত হয়। প্রধান মেমোরিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন হতে হয়। এজন্য এর ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম হয় কিন্তু খরচ বেশি হয়। সিপিইউ এর গাণিতিক/যৌক্তিক অংশ যখন যে গণনা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও নির্দেশ সহায়ক মেমোরি হতে সাময়িকভাবে প্রাইমারি মেমোরিতে উত্তোলন করে রাখা হয়। যেমন– র‍্যাম (RAM)।

প্রাইমারি মেমোরির বৈশিষ্ট্য

১. প্রাইমারি মেমোরি চলমান প্রোগ্রাম, ডেটা, প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল ইত্যাদি অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
২. প্রাইমারি মেমোরি উদ্বায়ী অর্থাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে সকল তথ্য মুছে যায়।
৩. এতে সঞ্চিত উপাত্তসমূহকে সিপিইউ সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে।
৪. প্রধান মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ ও তা পঠনের গতি দ্রুত হয়।

কম্পিউটারের প্রধান মেমোরির প্রকারভেদ

তথ্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. RAM (Random Access Memory)
২. ROM (Read Only Memory)

র‍্যাম (RAM)

মাদারবোর্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত যে মেমোরিতে রিড (পঠন) এবং রাইট (লিখন) দুইটি কাজই সম্পন্ন করা যায় সে মেমোরিকে র‍্যাম বলা হয়। এটি একটি অস্থায়ী মেমোরি। কম্পিউটারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ চালিত থাকে ততক্ষণ র‍্যাম–এ তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে র‍্যাম তার সমস্ত তথ্য মুছে ফেলে। তাই তাকে অস্থায়ী (Volatile) মেমোরি হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাধারণত তথ্যসমূহ পঠন ও পরিবর্তনে র‍্যাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অপারেটিং মোড অনুসারে র‍্যামের প্রকারভেদ

অপারেটিং মোড অনুসারে র‍্যামকে দুইভাগ করা যায়। যথা–

১. ডাইনামিক র‍্যাম (Dynamic RAM)
২. স্ট্যাটিক র‍্যাম (Static RAM)

ডাইনামিক RAM বা DRAM

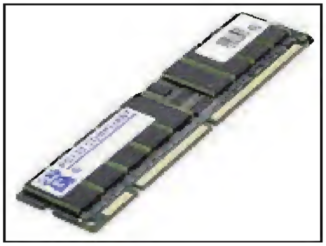

সাধারণত মসফেট (MOSFET-Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে এ ধরনের র‍্যাম তৈরি করা হয়। ক্যাপাসিটর চার্জ থাকলে 1 অবস্থা না থাকলে 0 অবস্থা বুঝায়। বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকা অবস্থায়ও ক্যাপাসিটরের চার্জ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কয়েক মিলি সেকেন্ড পর পর ড্রাম কন্ট্রোলারের সাহায্যে প্রত্যেক মেমোরি কাষে লেখা তথ্য নতুন করে লিখতে হয়। কমপিউটারের পরিভাষায় একে মেমোরি রিফ্রেশিং (Memory Refreshing) বলা হয়। নিশ্চল ও গতিশীল উভয় র‍্যামই উদ্বায়ী। এ সকল র‍্যামে তথ্য মুছে বার বার লিখা যায়। নতুন তথ্য লেখার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন তথ্য নিজে থেকেই মুছে যায়। মাইক্রো কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি হিসেবে সাধারণত (DRAM) ব্যবহার করা হয়।

স্ট্যাটিক RAM

সাধারণত টিটিএল (TTL-Transistor-Transistor Logic) বা মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর (Metal Oxide Semiconductor) দিয়ে এ ধরনের র‍্যাম তৈরি করা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ যতক্ষণ চালু থাকে ঠিক ততক্ষণ নিশ্চল র‍্যামে উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষিত থাকে। স্ট্যাটিক র‍্যাম অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন বলে এটা ভিডিও র‍্যাম, ক্যাশ মেমোরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। SRAM কম্পিউটারের ক্যাশ মেমোরি অথবা ভিডিও কার্ডের ডিজিটাল টু এনালগ কনভার্টারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সায়েন্টিফিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবসিস্টেমে, আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রনিক খেলনা, মোবাইল ফোন, সিক্রোনাইজার এবং ডিজিটাল ক্যামেরাতে SRAM ব্যবহৃত হয়। RAM এর ফ্রিকুয়েন্সি এবং ভোল্টেজ বিচারে ডেটারেট এর উন্নত রূপকে DDR1, DDR2, DDR3 এভাবে নামকরণ করা হয়। যেমন DDR1 RAM এর Frequency 100-400 MHz এবং Voltage : 2.5 -2.6, DDR2 RAM এর Frequency 533-800 MHz এবং Voltage : 1.8।

রম (ROM)

প্রধান স্মৃতির এই অংশটি স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও অধ্বংসাত্মক। কম্পিউটার তৈরি করার সময় এই স্মৃতিতে কিছু প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কম্পিউটার বন্ধ করলেও এই স্মৃতিতে রক্ষিত কোনো তথ্য মুছে যায় না। এটি একটি পঠন স্মৃতি। এই স্মৃতি থেকে উপাত্ত শুধু পড়া যায় লেখা যায় না। এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় না। কম্পিউটারে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও রম তার তথ্যসমূহ হারায় না।

চিত্র: র‍্যাম

চিত্র: রম

ROM এর শ্রেণিবিভাগ

রমের প্রকারভেদ : রম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে–

১. পিরম বা প্রম (PROM-Programable Read only memory)

২. ইপিরম বা ইপ্রম (EPROM-Erasable PROM)

৩. ইইপিরম বা ইইপ্রম (EEPROM-Electrically Erasable PROM)

PROM

তৈরি করার সময় রমের মধ্যে প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। PROM প্রথমে ফাঁকা থাকে। পরবর্তীতে ব্যবহারকারী তার নিজস্ব প্রোগ্রামকে বিশেষ ডিভাইস PROM প্রোগ্রামার বা বার্নারের PROM এ সংরক্ষণ করতে পারে। প্রমকে একবার প্রোগ্রাম করা হলে এতে সংরক্ষিত তথ্য আর পরিবর্তন করা যায় না অর্থাৎ প্রম তখন রমে পরিণত হয়ে যায় এবং এতে সংরক্ষিত তথ্য শুধু পাঠ করা যায়। রমের ন্যায় প্রমও অ-উদ্বায়ী অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় না।

EPROM

রম বা প্রমে একবার তথ্য সংরক্ষণ করা হলে আর পরিবর্তন করা যায় না। তাই এ অসুবিধা দূর করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের রম তৈরি করা হয়েছে যার নাম ইপ্রম (EPROM-Erasable Programble Read Only Memory)। ইপ্রমে সংরক্ষিত তথ্যকে মুছে আবার নতুন করে বিশেষ প্রোগ্রামারের সাহায্যে প্রোগ্রাম করা যায়। ইপ্রম উদ্বায়ী নয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে প্রোগ্রামকৃত তথ্য কোনো অবস্থায় মুছে যায় না। সাধারণত FET (Field Effect Transistor) ব্যবহার করে ইপ্রম তৈরি করা হয়।

EEPROM

ইপ্রম-এর প্রধান অসুবিধা হলো এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে অনেক সময় লাগে এবং আংশিকভাবে কোনো তথ্য মুছা যায় না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য ইইপ্রম (EEPROM–Electrically Erasable Programable Read Only Memory) তৈরি করা হয়েছে। এতে সংরক্ষিত সব তথ্য বা প্রয়োজন মতো এক বা একাধিক বিট বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা মুছে পুন পুন প্রোগ্রাম করা যায়। এজন্য এর নাম ইলেকট্রিক্যাল ইরেজিবল প্রম বা সংক্ষেপে ইইপ্রম (EEPROM)। প্রোগ্রাম করার সময় একে কম্পিউটার থেকে খুলতে হয়। এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে ইপ্রমের তুলনায় অনেক সময় কম লাগে।

সেকেন্ডারি মেমোরি (Secondary Memory)

ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম ও তথ্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে রাখার জন্য অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, কম গতিবিশিষ্ট ও কম দামের বিশেষ ধরনের মেমোরিকে সহায়ক মেমোরি বা সেকেন্ডারি মেমোরি বলা হয়। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ-এর সংগে এর কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই তবে সিপিইউ-এর নির্দেশে প্রধান ও সহায়ক মেমোরির মধ্যে উপাত্ত বা নির্দেশ চলাচল করে। হার্ডডিস্ক, ফ্ল্যাশডিস্ক, অপটিক্যাল ডিস্ক, চৌম্বক ফিতা ও ড্রাম হলো সেকেন্ডারি মেমোরির উদাহরণ।

সহায়ক স্মৃতির প্রকারভেদ ঃ

সহায়ক স্মৃতিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. ডাইরেক্ট স্মৃতি (Direct Access Memory)
২. অনুক্রমিক স্মৃতি (Sequential Access Memory)

১. **ডাইরেক্ট স্মৃতি (Direct Access Memory) ঃ** এই স্মৃতিতে যেকোনো তথ্যের সরাসরি প্রবেশ ও নির্গমন সম্ভব। এ স্মৃতিতে তথ্যের আদান-প্রদান অতি অল্প সময়ে হয়ে থাকে। যেমন- হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, সিডি, ডিভিডি, ফ্ল্যাশ ডিস্ক, মেমোরি কার্ড ইত্যাদি।

২. **অনুক্রমিক স্মৃতি (Sequential Access Memory) ঃ** এ স্মৃতিতে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে তথ্যের প্রবেশ ও নির্গমন হয়। ম্যাগনেটিক টেপ হলো একটি অনুক্রমিক স্মৃতি।

৪.২ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য

প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া : প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে কম্পিউটারে প্রোগ্রামের বিভিন্ন তথ্য ও ফলাফলকে অস্থায়ীভাবে প্রধান মেমোরি হিসেবে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইসসমূহকে প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া বলা হয়। যেমন– RAM ও ROM।

সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়া : ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম ও তথ্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে রাখার জন্য অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, কম গতিবিশিষ্ট ও কম দামের বিশেষ ধরনের মেমোরিকে সহায়ক মেমোরি বা সেকেন্ডারি মেমোরি বলা হয়। উদাহরণ : হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি, চৌম্বক ফিতা, ড্রাম ইত্যাদি।

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরির পার্থক্য :

প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া	সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়া
১. প্রাইমারি মেমোরি ও CPU এর মধ্য প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে।	১. সেকেন্ডারি মেমোরি ও CPU এর মধ্য প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না।
২. সাধারণত চলমান প্রোগ্রাম, উপাত্ত এবং অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে।	২. প্রোগ্রাম ও তথ্য এবং প্রসেসিং এর ফলাফল স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে।
৩. সিপিইউ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকায় এতে পঠন/ লিখনের গতি দ্রুত হয়।	৩. সিপিইউ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত না থাকায় পঠন/ লিখনের গতি ধীর হয়।
৪. প্রাইমারি মেমোরি উদ্বায়ী অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে সংরক্ষিত উপাত্ত ও তথ্য মুছে যায়।	৪. সেকেন্ডারি মেমোরি অনুদ্বায়ী অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে এতে সংরক্ষিত উপাত্ত ও তথ্য মুছে যায় না।
৫. প্রাইমারি মেমোরির এক্সেস টাইম ও ধারণক্ষমতা কম।	৫. সেকেন্ডোরি মেমোরির এক্সেস টাইম ও ধারণক্ষমতা বেশি।
৬. প্রাইমারি মেমোরি যেমন রম-এ ফার্মওয়্যার সংরক্ষিত থাকে।	৬. সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়াতে ফার্মওয়্যার সংরক্ষিত থাকে না।
৭. প্রাইমারি মেমোরিতে সংরক্ষিত উপাত্ত ও তথ্যাবলিকে সিপিইউ সরাসরি ব্যবহার করতে পারে।	৭. সেকেন্ডারি মেমোরিতে সংরক্ষিত উপাত্ত ও তথ্যাবলিকে সিপিইউ প্রথমে প্রাইমারি মেমোরিতে উত্তোলন করে, অতপর ব্যবহার করে।
৮. সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি, ম্যাগনেটিক কোর মেমোরি, পাতলা ফিল্ম মেমোরি ইত্যাদি প্রাইমারি মেমোরির উদাহরণ।	৮. ম্যাগনেটিক টেপ, ম্যাগনেটিক ড্রাম, হার্ডডিস্ক, ফ্লাশ মেমোরি, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, পাঞ্চ কার্ড ইত্যাদি সেকেন্ডারি মেমোরির উদাহরণ।

প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য : প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

১. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া সাধারণত সিপিইউ এর সাথে সরাসরি সংযোগ থাকে।
২. প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডেটা এবং কম্পিউটারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত কিছু প্রোগ্রাম প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়াতে ধারণ করে।
৩. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া থেকে ডেটা পড়তে বা লিখতে সিপিইউ এর কম সময় লাগে।
৪. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়ার ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে কিন্তু দাম বেশি।
৫. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়ার ডেটা চলাচলের গতি বেশি।

সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য : সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়া বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

১. কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ-এর সংগে এর কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই তবে সিপিইউ-এর নির্দেশে প্রধান ও সহায়ক মেমোরির মধ্যে উপাত্ত বা নির্দেশ চলাচল করে।
২. বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম এবং ইনপুটকৃত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াকরণের পর প্রক্রিয়াজাত তথ্যসমূহ সংরক্ষণের জন্য

সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়া ব্যবহৃত হয়।

৩. সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার ধারণক্ষমতা অনেকগুণ বেশি।

৪. সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

৫. এধরনের ডিভাইসের অ্যাকসেস সময় অনেক বেশি।

সেকেন্ডারি মেমোরির প্রকারভেদ

সেকেন্ডারি মেমোরি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন :

১. হার্ড ডিস্ক
২. কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা CD
৩. ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক বা DVD
৪. চৌম্বক টেপ
৫. চৌম্বক ড্রাম
৬. ফ্ল্যাশ ডিস্ক
৭. ফ্লপি ডিস্ক

চিত্র : হার্ড ডিস্ক

চিত্র : সিডি

চিত্র : ডিভিডি

চিত্র : ম্যাগনেটিক টেপ

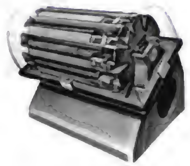

চিত্র : ম্যাগনেটিক ড্রাম

চিত্র : ফ্ল্যাশ ড্রাইভ (পেন ড্রাইভ)

৪.৩ হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, অপটিক্যাল ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ (Flush Memory) এর ফাংশন

হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

হার্ডডিস্ক পার্সোনাল কম্পিউটারের জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইস। হার্ড ডিস্কে রক্ষিত তথ্যসমূহ সহজে নষ্ট হয় না বলে প্রয়োজনীয় সকল প্যাকেজ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়। হার্ডডিস্ক নষ্ট হওয়া বা মোছনীয় কোনো কমান্ড ব্যতীত এখানকার তথ্যসমূহ নষ্ট হয় না। হার্ডডিস্ক হচ্ছে কম্পিউটারের স্টোরেজ মিডিয়াগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্টোরেজ মিডিয়া। হার্ডডিস্ক কতগুলো ট্র্যাক এবং ট্র্যাকগুলোর কয়েকটি সেক্টরের সমন্বয়ে গঠিত। ডিস্কের অপর পৃষ্ঠায় ডেটা রিড/রাইড করা সম্ভব। অন্যান্য সহায়ক মেমোরির তুলনায় হার্ডডিস্কের বৃহত্তর ধারণক্ষমতার কারণে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হার্ডডিস্ক ভিন্ন ভিন্ন ক্যাপাসিটির হয়ে থাকে। যেমন– ২০০ গিগাবাইট, ৫০০ গিগাবাইট, ১ টেরাবাইট ইত্যাদি।

হার্ড ডিস্কের সুবিধা :

১. স্টোরেজ মিডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত মিডিয়াটি।
২. স্টোরেজ মিডিয়া হিসেবে এটি অতুলনীয়।
৩. এর ডেটা অ্যাক্সেস টাইম খুবই কম।
৪. এতে যতবার খুশি সংরক্ষিত উপাত্ত মুছে ডিস্কটিকে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
৫. এতে ব্যবহারযোগ্য ডেটা সংরক্ষণ খরচও অপেক্ষাকৃত কম।

মেমোরির ধারণক্ষমতা

কম্পিউটার মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণের পরিমাণকে মেমোরির ধারণক্ষমতা বলা হয়। মেমোরির ধারণ ক্ষমতার একক হলো বাইট। আট বিট নিয়ে গঠিত শব্দকে বলা হয় বাইট। বাইনারি গণনা পদ্ধতির ০ এবং ১ এই দুইটি মৌলিক অঙ্ককে বলা হয় বিট। বর্ণ, অঙ্ক ও বিশেষ চিহ্ন নির্দিষ্ট করার জন্য বাইট ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটার মেমোরির ধারণক্ষমতা নির্ণয়ের এককগুলো হলো– কিলোবাইট, মেগাবাইট, গিগাবাইট ও টেরাবাইট। নিচে এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো।

৮ বিট = ১ বাইট = ১ অক্ষর
$২^{১০}$ বা ১০২৪ বাইট = ১ কিলোবাইট
$২^{২০}$ বা ১০২৪ কিলোবাইট = ১ মেগাবাইট
$২^{৩০}$ বা ১০২৪ মেগাবাইট = ১ গিগাবাইট
$২^{৪০}$ বা ১০২৪ গিগাবাইট = ১ টেরাবাইট

হার্ডডিস্কের ধারণক্ষমতা

হার্ডডিস্কের ধারণক্ষমতা নির্ভর করে মোট ব্যবহৃত ডিস্কের সংখ্যার উপর। ডিস্কের সংখ্যা যত বেশি হবে ডেটা ধারণের জন্য তত বেশি পৃষ্ঠ, Track ও Sector পাওয়া যাবে। নিম্নে হার্ডডিস্ক এর বিভিন্ন অংশ এবং Track ও Sector দেখানো হলো ঃ

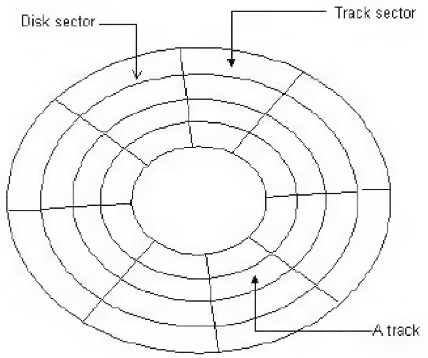

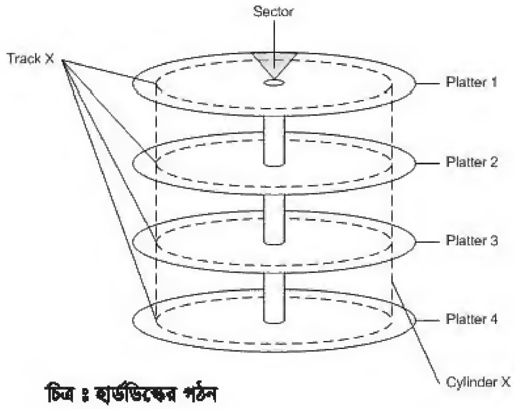

চিত্র ঃ হার্ডডিস্কের গঠন

ধরা যাক, একটি হার্ডডিস্কে ২০টি ডিস্ক আছে প্রতিটি ডিস্কে ১৫০টি Track আছে। প্রতি ট্র্যাকে 30টি সেক্টর এবং প্রতি সেক্টরে ২০০ বাইট তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ হার্ডডিস্কের ধারণক্ষমতা–

ধারণক্ষমতা= পৃষ্ঠের সংখ্যা × প্রতি পৃষ্ঠের ট্র্যাকের সংখ্যা × প্রতিটি ট্র্যাকে সেক্টরের সংখ্যা × প্রতি সেক্টরে বাইট সংখ্যা

= (৩৮ × ১৫০ × ৩০ × ২০০) = ৩৪২০০০০০ বাইট
= ৩৪২০০০০০ ÷(১০২৪× ১০২৪) মেগাবাইট
= ৩২.৬১ মেগাবাইট

সমস্যা-১ ঃ একটি হার্ড ডিস্ক ইউনিটে 20 টি ডিস্ক আছে, প্রতিটি ডিস্কে 150 টি ট্র্যাক আছে। প্রতিটি ট্র্যাকে 30 টি সেক্টর আছে এবং প্রতি সেক্টরে 200 বাইট ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ একটি হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা কত?

এখানে, ডিস্ক পৃষ্ঠ সংখ্যা = ডিস্ক সংখ্যা × 2 – 2 = 20 × 2 –2 = 38
ট্রাক সংখ্যা = 150 টি
সেক্টর সংখ্যা = 30 টি
প্রতি সেক্টরে বাইট সংখ্যা = 200 বাইট
আমরা জানি,
হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা = ডিস্ক পৃষ্ঠ সংখ্যা × ট্র্যাক সংখ্যা × সেক্টর সংখ্যা × প্রতি সেক্টরে বাইট সংখ্যা
= (38 × 150 × 30 × 200) বাইট
= 34200000 বাইট
= 34200000÷(1024× 1024) মেগাবাইট [আমরা জানি যে, 1024 বাইট = 1 কিলোবাইট]
= 32.615 মেগাবাইট [যেহেতু 1024 কিলোবাইট = 1 মেগাবাইট]

সমস্যা-২ ঃ একটি হার্ড ডিস্কে উভয় পৃষ্ঠ ব্যবহারযোগ্য 20 টি ডিস্ক আছে, ডিস্কের প্রতিটি পৃষ্ঠে 150 টি ট্র্যাক আছে। প্রতি ট্র্যাকে 30 টি সেক্টর আছে এবং প্রতি সেক্টরে 200 বাইট ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ একটি হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা কত?

আমরা জানি, হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা-
= ডিস্কের ব্যবহারযোগ্য পৃষ্ঠ সংখ্যা × ট্র্যাক সংখ্যা × সেক্টর সংখ্যা × প্রতি সেক্টরে বাইট সংখ্যা।
= (2 × 20 × 150 × 30 × 200) বাইট
= 3600000 ÷(1024× 1024) মেগাবাইট [আমরা জানি যে, 1024 বাইট = 1 কিলোবাইট]
= 3.43 মেগাবাইট [যেহেতু 1024 কিলোবাইট = 1 মেগাবাইট]

অপটিক্যাল ড্রাইভ

অপটিক্যাল মিডিয়া একটি বিশেষ ধরনের সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস। সাধারণত গোল্ডভিত্তিক রিফ্লেকটিভ লেয়ার ও প্লাস্টিক লেয়ার সাবস্ট্রেট লেয়ারের মাঝখানে একটি ডাই রেকর্ডিং লেয়ার ব্যবহার করে অপটিক্যাল সিডি তৈরি করা হয়। এর কম্পেক্ট ডিস্কের ধারণক্ষমতা ৬৫০ মেগাবাইট থেকে ৭০০ মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডব্লিউরম (WROM) এর ক্ষেত্রে এই ধারণক্ষমতা ১.৩ মেগাবাইট ও এমও (MO) ডিস্ক এর ক্ষেত্রে ২ মেগাবাইটের হয়ে থাকে। কম্পেক্ট ডিস্কে টেক্সট, সাউন্ড ও ভিডিও ধারণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য একে মাল্টিমিডিয়া স্টোরেজ ডিভাইসও বলা হয়ে থাকে। এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি। ফলে দীর্ঘমেয়াদে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। একে অপটিক্যাল আর্কাইভ স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অপটিক্যাল ড্রাইভ সহজে বহনযোগ্য ও দামে সস্তা। সিডি, ডিভিডি, ব্লু-রে ইত্যাদি অপটিক্যাল ডিস্ক।

সিডি রম

সিডি রম (CD–ROM)—এর পূর্ণনাম কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড অনলি মেমোরি (Compact Disk Read Only Memory)। সিডি রম একটি অপটিক্যাল মাধ্যম। অপটিক্যাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ এবং পঠন কাজ করার জন্য এতে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

সিডি রমের গঠন

- সিডি রম একটি অপটিক্যাল মাধ্যম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিডি রম অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের তৈরি হয়ে থাকে। সিডি রম চাকতিটির ব্যাস ৪.৭২ ইঞ্চি এবং পুরত্ব ১.২ মিলিমিটার। এর কেন্দ্রে ১৫ মিলিমিটার ছিদ্র থাকে।
- সিডির মধ্যবর্তী ছিদ্রের চারপাশে ৬ মিলিমিটার বেষ্টনীকে ক্লাম্পিং এরিয়া বলা হয়। এতে কোনো তথ্য থাকে না।
- এরপর ৪ মিলিমিটার বেষ্টনীকে VTOC (Volume Table of Contents) বলা হয়। এরপরের ১ মিলিমিটার এলাকাকে Lead In বলা হয়। এর পর থেকে তথ্য ধারণ এলাকা শুরু হয়। এবং ৩৩ মিলিমিটার এলাকা তথ্য ধারণ করে। এর পরের শেষ ১ মিলিমিটার এলাকাকে Lead Out বলা হয়। এটি সিডির শেষ সীমানা নির্দেশ করে।
- তথ্য সংরক্ষণ বা লিখার জন্য লেজার রশ্মি ঐ মাধ্যমের সারফেস বা আস্তরণের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন পুড়িয়ে দেয়। আবার ঐ সংরক্ষিত তথ্যকে পড়ার জন্য সিডি ড্রাইভ অন্য ধরনের লেজার রশ্মি ব্যবহার করে। এই রশ্মি সিডির আস্তরণকে স্ক্যান করে তথ্যকে চিহ্নিত করতে পারে।
- প্রথম প্রথম যেসব সিডি-রম বেরিয়েছিল তা থেকে শুধু তথ্য পড়া যেত, কিন্তু তাতে কোন তথ্য লেখা যেত না। বর্তমান নতুন ধরনের সিডি-রম বেরিয়েছে যাতে তথ্য বারবার লেখা যায় ও পড়া যায়; এগুলোকে বলা হয় সিডি-আর ।

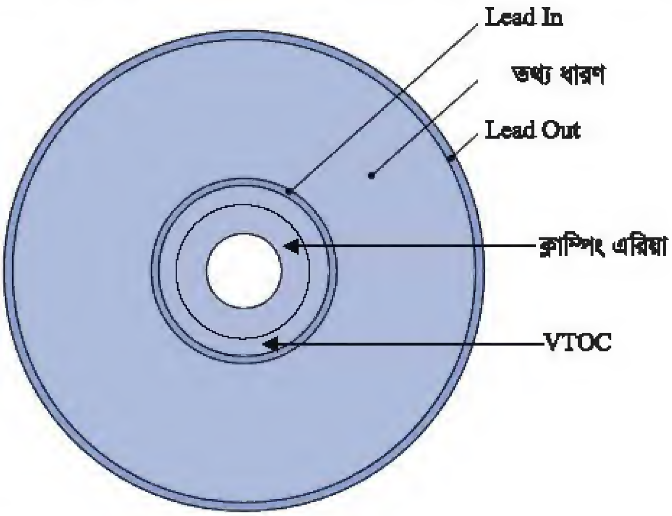

সিডি রম-এর ব্যবহার :

১. সিডিতে অনেক তথ্য রাখা যায় বলে এটি ডেটা স্টোরেজ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
২. বর্তমানে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সিডিতে পাওয়া যায়।
৩. বিভিন্ন অডিও ভিডিও অ্যালবামগুলো সিডিতে বাজারজাত করা হয়।
৪. বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বাণিজ্যিকভাবে সিডিতে বাজারজাত করা হয়।
৫. কম্পিউটার গেমস সাধারণত সিডিতে বাজারজাত করা হয়।
৬. শিক্ষামূলক বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া টিউটোরিয়ালসমূহ সিডিতে প্রকাশ করা হয়।

৭. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কিংবা বাংলাপিডিয়া-এর মতো সমৃদ্ধ প্রকাশনাগুলো সিডিতে পাওয়া যায়।
৮. আজকাল বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও বইপত্রের সহায়ক উপকারণগুলো সিডিতে প্রকাশ করা হয়।
৯. ডিজিটাল ব্রশিওর, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি সাধারণত সিডিতে করে প্রকাশ ও সরবরাহ করা হয়।

সিডি রম (CD–ROM) ড্রাইভ

কম্পিউটারে সিডিসমূহ চালানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ড্রাইভ হলো সিডি-রম ড্রাইভ। এই ড্রাইভটিতে সিডি প্রবেশ করালে ড্রাইভটি সিডির উপর লেজার রশ্মি ফেলে তাতে সংরক্ষিত ডেটাগুলো পড়তে পারে।

ডিভিডি (DVD)

ডিভিডি—এর পুরো অর্থ হলো ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক (Digital Versatile Disc)। এটিকে কখনো কখনো ডিজিটাল ভিডিও ডিস্কও বলা হয়। ডিভিডি-তে তথ্য ধারণক্ষমতা সিডি-এর চেয়ে প্রায় পঁচিশগুণ বেশি। ডিভিডি-এর ধারণক্ষমতা সাধারণত ৪.৭ গিগাইট হয়ে থাকে।

ডিভিডি ড্রাইভ

কম্পিউটারে ডিভিডি-সমূহ চালানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ড্রাইভ হলো ডিভিডি ড্রাইভ। এই ড্রাইভটিতে ডিভিডি প্রবেশ করালে ড্রাইভটি সিডির উপর লেজার রশ্মি ফেলে তাতে সংরক্ষিত ডেটাগুলো পড়তে পারে। সিডি—রম ড্রাইভ এবং ডিভিডি-রম ড্রাইভ দেখতে প্রায় একই রকম। তবে পার্থক্য হলো ডিভিডি ড্রাইভে সিডি এবং ডিভিডি দুটোই পড়া যায়। কিন্তু সিডি-রম ড্রাইভে ডিভিডি পড়া যায় না।

পেন ড্রাইভ বা ফ্ল্যাশ ডিস্ক

অত্যন্ত হালকা ও সহজে বহনযোগ্য ফ্লাশ মেমোরি ইউএসবি ইন্টারফেস ব্যবহার করে খুব দ্রুতই এর মাধ্যমে ডাটা কপি বা রিড করতে পারে। ইউএসবি পোর্ট থেকেই পাওয়ার গ্রহণ করে বলে এর আলাদা কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও প্রয়োজন হয় না। এতে আরো আছে রাইট/ডিলিট প্রোটেকশন সুইচ, শক রেজিস্ট্যান্স ইত্যাদি সুবিধা। ডুরেবল স্টোরেজ হিসেবেও এটি প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত ডাটা ধরে রাখতে পারে। হট প্লাগ এন্ড প্লে সুবিধার কারণে ইন্সটলে কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই।

চিত্র : বিভিন্ন ডিজাইনের পেন ড্রাইভ বা ফ্লাশ ডিস্ক

বর্তমানে কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের USB পোর্টে লাগিয়ে সহজে তথ্য লেখা ও পড়ার নতুন এক সহায়ক স্মৃতি মাধ্যম বের হয়েছে। অত্যন্ত হালকা ও সহজে বহনযোগ্য কলমের ক্যাপের মতো দেখতে এ মাধ্যমটিকে ফ্ল্যাশ ডিস্ক

বা পেন ড্রাইভ বা পেন ডিস্ক বলা হয়। বর্তমানে কয়েক গিগাবাইট হতে শুরু করে সর্বোচ্চ ২৫৬ গিগাবাইটের পেন ড্রাইভ বাজারে পাওয়া যায়।

পেন ড্রাইভের সুবিধা

১. এগুলো সহজে বহনযোগ্য। যেকোনো স্থানেই বয়ে নেওয়া যায়।
২. ইউএসবি ইন্টারফেস থাকার ফলে প্লাগ এন্ড প্লে সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. অতি দ্রুত ডাটা কপি বা রিড করা যায়।
৪. দেখতে ছোট হলেও এগুলোর ধারণক্ষমতা অনেক বেশি। সর্বোচ্চ ২৫৬ গিগাবাইটের পেন ড্রাইভও বাজারে পাওয়া যায়।
৫. ফুল স্পিডে এই ডিস্কগুলো ১২ মেগাবিটস পার সেকেন্ডে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে।
৬. আলাদা কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও প্রয়োজন হয় না।
৭. ডিউরেবল স্টোরেজ হিসেবেও এটি প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত ডাটা ধরে রাখতে পারে।
৮. উইন্ডোজ, ম্যাক ওএসএক্স কিংবা লিনাক্স সকল প্লাটফর্মেই এটি ব্যবহার করা যায়।

৪.৪ হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, অপটিক্যাল ড্রাইভের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

হার্ডডিস্কের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১. ধারণক্ষমতা অন্য যে কোনো স্টোরেজ মিডিয়ার চেয়ে বেশি।
২. এ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপরে ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপ দিয়ে হার্ডডিস্কে ডাটা সংরক্ষণ করা হয়।
৩. হার্ডডিস্ক দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রোগ্রাম ও ডাটা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরশীল।
৪. ডেটা রিড এবং রাইট করার গতি অনেক বেশি।

চিত্র : হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

চিত্র : ডিভিডি

চিত্র : ডিভিডি ড্রাইভ

অপটিক্যাল ড্রাইভের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১. তথ্য ধারণক্ষমতা অনেক (৭০০ মেগাবাইট বা তার চেয়ে বেশি)।

২. সহজে বহন করা যায়।
৩. স্থায়িত্ব অনেক এবং মূল্য কম।
৪. লেজার রে ব্যবহার করে ডেটা রাইট করা হয় এবং লেজার বিম দিয়ে ডেটা রিড করা হয়।
৫. একটিমাত্র সিডিতে প্রায় ৭০ মিনিটের চলচ্চিত্র এবং ১৮ শব্দ ধারণ করা যায়।

প্রশ্নমালা–৪

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্টোরেজ মিডিয়া বলতে কী বোঝায়?
২. কয়েকটি স্টোরেজ মিডিয়া এর নাম লেখ।
৩. দ্বিমুখী (Bidirectional) ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস বলতে কী বোঝায়?
৪. স্টোরেজ মিডিয়া প্রধানত কত প্রকার?
৫. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া বা প্রধান স্মৃতি বলতে কী বোঝায়?
৬. প্রাইমারি মেমোরি কত প্রকার ও কী কী?
৭. সেমিকন্ডাক্টর স্টোরেজ মিডিয়ার দুইটি উদাহরণ দাও।
৮. সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়া বা গৌণ স্মৃতি বলতে কী বোঝায়?
৯. ট্র্যাক ও সেক্টর বলতে কী বোঝায়?
১০. স্টেপার মোটরের কাজ কী?
১১. ডিস্ক প্যাক কী?
১২. হার্ড ডিস্কের ক্ষেত্রে সিলিন্ডার কী?
১৩. ডিস্ক প্যাকের ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
১৪. হার্ডডিস্ক কী?
১৫. কয়েকটি ফ্লাশ মেমোরির উদাহরণ দাও।
১৬. পূর্ণ নাম লেখ : ROM, RAM, SRAM, DRAM, CD–ROM, DVD, PROM, EPROM, EEPROM.

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. র‍্যাম ও রমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২. স্টোরেজ মিডিয়ার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
৩. হার্ডডিস্কের কাজ বর্ণনা কর।
৪. কমপেক্ট ডিস্কের (CD) কাজ বর্ণনা কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. পেনড্রাইভ বা ফ্লাশ মেমোরির কাজ বর্ণনা কর।
২. হার্ডডিস্কের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
৩. অপটিক্যাল মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

অধ্যায়–৫

কম্পিউটার পেরিফেরালস

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

৫.১. কম্পিউটার পেরিফেরালস কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
৫.২. কম্পিউটার পেরিফেরালস এর শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
৫.৩. হার্ড ডিস্কের প্রকারভেদ (SATA, PATA, ATA, SCSI) সম্পর্কে জানতে পারব।
৫.৪. হার্ডডিস্ক, ফ্লাশ ড্রাইভ, সিডিরম ড্রাইভ, ডিভিডিরম ড্রাইভ, ব্লু–রে ড্রাইভ, OMR, OCR–এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব।
৫.৫. একটি হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারব।
৫.৬. কীবোর্ড এবং মাউসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
৫.৭. কীবোর্ড এর বিভিন্ন কী (Key) এবং মাউসের বিভিন্ন বাটন এর কাজ সম্পর্কে অবগত হব।
৫.৮. CRT, LCD, LED ও AMOLED ডিসপ্লে ডিভাইস সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
৫.৯. প্রিন্টারের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
৫.১০. ডট ম্যাট্রিক্স, বাবলজেট/ইঙ্কজেট, লেজার প্রিন্টারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
৫.১১. রিবন, কার্টিজ এবং টোনার সম্পর্কে জ্ঞাত হব।

৫.১ কম্পিউটার পেরিফেরালস

পেরিফারাল হলো কম্পিউটারে সংযুক্ত অতিরিক্ত ডিভাইস যা নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। পেরিফারাল এর সাহায্যে কম্পিউটারে উপাত্ত ও নির্দেশ প্রদান, কম্পিউটার হতে ফলাফল গ্রহণ এবং ফলাফল সংরক্ষণ করা হয়। যেমন– প্রিন্টার, প্লটার ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, সিডি–রম ইত্যাদি।

৫.২ কম্পিউটার পেরিফেরালস এর শ্রেণিবিভাগ

কম্পিউটার পেরিফেরালসমূহকে কাজের উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ইনপুট ডিভাইস (Input Device)
২. আউটপুট ডিভাইস (Output Device) ও
৩. স্টোরেজ ডিভাইস (Storage Device)।

এছাড়া আরও কিছু পেরিফেরাল রয়েছে যা ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। যেমন-হেডফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা।

১. ইনপুট ডিভাইস (Input Device)

যেসব পেরিফেরালস বা যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার করে কম্পিউটারকে ডেটা প্রদান ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য কাজের নির্দেশ প্রদান করা হয় তাদেরকে ইনপুট ডিভাইস বলা হয়।

কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের নাম :

১. কীবোর্ড (Keyboard)
২. মাউস (Mouse)
৩. মাইক্রোফোন (Microphone)
৪ স্ক্যানার (Scanner)
৫. মডেম (Modem)
৬. গ্রাফিক্স ট্যাবলেট (Graphics Tablet)
৭. ওএমআর (OMR)
৮. ওসিআর (OCR)

৯. লাইটপেন (Light Pen)
১০. টাচস্ক্রিন (Touch Screen)
১১. ট্র্যাকবল (Trackball)
১২. ট্র্যাকপ্যাড (Trackpad) ইত্যাদি।

২. **আউটপুট ডিভাইস (Output Device)**

কম্পিউটারের যেসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সংরক্ষিত বা প্রক্রিয়াজাত তথ্য কম্পিউটার ইউজার (User) বা ব্যবহারকারীদের কাছে প্রদর্শন করা যায় তাদেরকে আউটপুট ডিভাইস বলা হয়।

কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম :

১. মনিটর (Monitor)
২. প্রজেক্টর (Projector)
৩. স্পিকার (Speaker)
৪. প্রিন্টার (Printer)
৫. প্লটার (Plotter)
৬. ইমেজ সেটার (Image Setter) ইত্যাদি।

৩. **স্টোরেজ ডিভাইস (Storage Device)**

উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ভৌত মাধ্যমকে স্টোরেজ মিডিয়া বলে। যেমন—

১. হার্ডডিস্ক,
২. ফ্লপিডিস্ক,
৩. ম্যাগনেটিক টেপ,
৪. কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি,
৫. রি—রাইটেবল সিডি,
৬. ডিভিডি,
৭. ফ্লাশ মেমোরি বা পেন ড্রাইভ,
৮. মেমোরি কার্ড ইত্যাদি।

৫.৩ হার্ডডিস্ক এর প্রকারভেদ (SATA, PATA, ATA, SCSI) সম্পর্কে ধারণা

হার্ডডিস্ক পার্সোনাল কম্পিউটারের জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইস। হার্ডডিস্কে রক্ষিত তথ্যসমূহ সহজে নষ্ট হয় না বলে প্রয়োজনীয় সকল প্যাকেজ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়। হার্ডডিস্ক নষ্ট হওয়া বা মোছনীয় কোনো কমান্ড ব্যতীত এখানকার তথ্যসমূহ নষ্ট হয় না। তবে ভাইরাসের আক্রমণে তথ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ভাইরাস থেকে সাবধান থাকলে হার্ডডিস্কের তথ্যসমূহ হারাবার ভয় থাকে না। ডিস্কটি অধিক ধারণক্ষম বিধায় এখানে অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। যে ডিভাইসের সাহায্যে হার্ডডিস্ক চালনা করা হয় তাকে হার্ডডিস্ক ড্রাইভ (Hard disk drive) বা সংক্ষেপে এইচডিডি (HDD) বলে। হার্ডডিস্ক ড্রাইভ এর কাজ হলো তথ্য লিখন ও পঠন এবং এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

হার্ডডিস্ক ব্যবহারের জন্যে আলাদা ড্রাইভের প্রয়োজন হয় না। ডিস্ক এবং ড্রাইভ একসাথেই সংযোজিত থাকে। এক্ষেত্রে একাধিক ডিস্ক একসঙ্গে পর পর রেখে লিখন ও পঠনের কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। কেসিং-এর মধ্যে কয়েকটি স্ক্রু দ্বারা এটি স্থাপন করা হয় বিধায় ফ্লপি ডিস্কের ন্যায় এটিকে সহজে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় না। অন্যান্য ডিস্কের তুলনায় হার্ডডিস্ক অনেক দ্রুতগতিতে কার্যাবলি সম্পাদন করে।

বিভিন্ন ধরনের হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

কম্পিউটারের হার্ডডিস্ককে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

১. আইডিই বা পাটা (IDE/PATA) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ
২. সাটা (SATA) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ
৩. স্ক্যাজি (SCSI) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ
৪. সাস (SAS) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ

আইডিই বা পাটা (IDE/PATA) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ

আইডিই হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের পুরো অর্থ হলো 'ইন্টিগ্রেটেড ড্রাইভ ইলেকট্রনিক্স (Integrated Drive Electronics)'। একে পাটা বা প্যারালাল অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাটাচমেন্ট (PATA– Parallel advance technology attachment) নামেও ডাকা হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. IDE/PATA ড্রাইভগুলোর সাধারণত ৪০টি পিন থাকে।
২. IDE/PATA ড্রাইভগুলো 133 MB/sec ট্রান্সফার রেট প্রদান করে।
৩. এই ড্রাইভ একই সময়ে ৮ বিট ডেটা প্রেরণ করতে পারে।
৪. PATA হার্ড ডিস্কগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য PATA ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। একটি একক PATA ক্যাবলে দুইটি ড্রাইভকে যুক্ত করা যায়। এদের একটি মাস্টার হিসেবে এবং অপরটি স্লেভ হিসেবে। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে জাম্পারসমূহের বিভিন্ন সমন্বয়ের মাধ্যমে মাস্টার ও স্লেভ কনফিগারেশন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

চিত্র : PATA হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

চিত্র : PATA ক্যাবল

সাটা (SATA) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

সিরিয়াল আটা বা সাটার পুরো অর্থ হলো 'সিরিয়াল অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাটাচমেন্ট ড্রাইভ (SATA – Serial Advance Technology Attachment Drive)'। এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে :

১. SATA ড্রাইভগুলো সাধারণত ৭ পিনের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ৪ পিন দুইটি জোড়ায় থাকে এবং বাকি ৩ পিন গ্রাউন্ডেড অবস্থায় থাকে।
২. SATA ড্রাইভগুলো সাধারণত 300MB/sec ট্রান্সফার রেট প্রদান করে।
৩. এটি ডেটাকে বিটের পর বিট আকারে প্রেরণ করে।
৪. SATA হার্ডডিস্কগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য SATA ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। একটি সাটা ক্যাবলে শুধু একটি ড্রাইভই সংযুক্ত করা যায়।

চিত্র : SATA হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

চিত্র : SATA ডেটা ক্যাবল

স্ক্যাজি (SCSI) হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ

স্ক্যাজি এর পুরো অর্থ হলো 'স্মল কম্পিউটার সিস্টেম ইন্টারফেস ড্রাইভ (Small Computer System Interface Drive)'। এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. SCSI ড্রাইভগুলোর সাধারণত ৫০টি থেকে ৬৮টি পিন থাকে।
২. SCSI ড্রাইভগুলো সাধারণত 640MB/sec ট্রান্সফার রেট প্রদান করে।
৩. এই ড্রাইভগুলো সোয়াপেবল (swappable) নয়।
৪. SCSI হার্ড ডিস্ক সংযোগের জন্য সাধারণত SCSI ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। একটি SCSI ক্যাবলে সর্বোচ্চ ১৬টি ড্রাইভ সংযুক্ত করা যায়। ক্যাবলে এর আইডেন্টিফিকেশনের জন্য প্রতিটি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের একটি ৮ বাইট হেক্সাডেসিম্যাল কোড রয়েছে যা WWN (world wide name) নামে পরিচিত।

চিত্র : SCSI হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

চিত্র : SCSI ক্যাবল

৫.৪ হার্ডডিস্ক, ফ্লাশ ড্রাইভ বা পেন সিডি রম, ব্লু–রে ড্রাইভ. OMR, OCR এর বৈশিষ্ট্য

হার্ডডিস্কের বৈশিষ্ট্য :

১. হার্ডডিস্ক একটি ম্যাগনেটিক ডিস্ক। সাধারণত এ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপরে ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপ দিয়ে হার্ডডিস্কে ডাটা সংরক্ষণ করা হয়।
২. হার্ডডিস্কের ধারণক্ষমতা এখনো পর্যন্ত অন্য যে কোনো স্টোরেজ মিডিয়ার চেয়ে বেশি। এ কারণে অপারেটিং পদ্ধতিসহ সকল এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার হার্ডডিস্কে ইনস্টল ও সংরক্ষণ করা হয়।
৩. হার্ডডিস্ক দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রোগ্রাম ও ডাটা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরশীল।
৪. হার্ডডিস্কের প্লেটগুলো বিশেষ চেম্বারে সিল করে আবদ্ধ থাকে। ফলে এটি ধুলিকণা ও ধোয়া হতে মুক্ত থাকে। স্পর্শজনিত কারণে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
৫. ডিস্কের প্লেটগুলো আলাদা করা যায় না। ওজনে ভারী হয় এবং ব্যাকআপ মিডিয়া হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য।
৬. On অবস্থায় নাড়াচাড়া করলে ডিস্কের সাথে হেডের সংঘর্ষের ফলে ডিস্ক নষ্ট হয়ে তথ্য মুছে যেতে পারে।

ফ্লাশ ড্রাইভ বা পেন ড্রাইভ এর বৈশিষ্ট্য :

১. এগুলো সহজে বহনযোগ্য। যেকোনো স্থানেই বয়ে নেওয়া যায়।
২. ইউএসবি ইন্টারফেস থাকার ফলে প্লাগ এন্ড প্লে সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. অতি দ্রুত ডাটা কপি বা রিড করা যায়।
৪. দেখতে ছোট হলেও এগুলোর ধারণক্ষমতা অনেক বেশি। সর্বোচ্চ ২৫৬ গিগাবাইটের পেন ড্রাইভও বাজারে পাওয়া যায়।

৫. ফুল স্পিডে এই ডিস্কগুলো ১২ মেগাবিটস পার সেকেন্ডে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে।
৬. আলাদা কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও প্রয়োজন হয় না।
৭. রিডাবেল স্টোরেজ হিসেবেও এটি প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত ডাটা ধরে রাখতে পারে।
৮. উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস এর কিংবা লিনাক্স সকল প্লাটফর্মেই এটি ব্যবহার করা যায়।

সিডি রম ড্রাইভ এর বৈশিষ্ট্য :

সিডি রম (CD–ROM)–এর পূর্ণনাম কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড অনলি মেমোরি (Compact Disk Read Only Memory)। সিডি রম একটি অপটিক্যাল মাধ্যম। অপটিক্যাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ এবং পঠন কাজ করার জন্য এতে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে সিডিসমূহ চালানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ড্রাইভ হলো সিডি-রম ড্রাইভ। এই ড্রাইভটিতে সিডি প্রবেশ করালে ড্রাইভটি সিডির উপর লেজার রশ্মি ফেলে তাতে সংরক্ষিত ডেটাগুলো পড়তে পারে।

সিডি রম এর বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. অপটিক্যাল মিডিয়া একটি বিশেষ ধরনের সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস। সাধারণত গোল্ডভিত্তিক রিফ্লেকটিভ লেয়ার ও প্লাস্টিক লেয়ার সাবস্ট্রেট লেয়ারের মাঝখানে একটি ডাই রেকর্ডিং লেয়ার ব্যবহার করে অপটিক্যাল সিডি তৈরি করা হয়।
২. রেকর্ডিং প্রসেস এর সময় লেজার লাইট দ্বারা ডাই লেয়ারটি হিটেড করে বা পুড়িয়ে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন এর দাগ কেটে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর অন্য একটি লেজার বিম দ্বারা ডাটা পড়া হয়।
৩. কম্পেক্ট ডিস্কের ধারণক্ষমতা ৬৫০ মেগাবাইট থেকে ৭০০ মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডব্লিউরম (WROM) এর ক্ষেত্রে এই ধারণক্ষমতা ১.৩ মেগাবাইট ও এমও (MO) ডিস্ক এর ক্ষেত্রে ২ মেগাবাইটের হয়ে থাকে।
৪. কম্পেক্ট ডিস্কে টেক্সট, অডিও ও ভিডিও ধারণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য একে মাল্টিমিডিয়া স্টোরেজ ডিভাইসও বলা হয়ে থাকে।
৫. অপটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে এতে কোনো মেকানিক্যাল হেড থাকে না। তাই ডিস্ক ক্র্যাশ করার সম্ভাবনা নাই। এক্ষেত্রে উপাত্ত লিখনে কোনো প্রকার ঝুঁকি থাকে না। সিডি মিডিয়াতে তথ্য মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এতে তথ্য ওভাররাইট হয় না।
৬. এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি। ফলে দীর্ঘমেয়াদে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। একে অপটিক্যাল আর্কাইভ স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৭. সহজে বহনযোগ্য ও দামে সস্তা।
৮. সিডি মিডিয়ার নির্ভরযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

ডিভিডি ড্রাইভ এর বৈশিষ্ট্য :

কম্পিউটারে ডিভিডি-সমূহ চালানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ড্রাইভ হলো ডিভিডি ড্রাইভ। এই ড্রাইভটিতে ডিভিডি প্রবেশ করালে ড্রাইভটি সিডির উপর লেজার রশ্মি ফেলে তাতে সংরক্ষিত ডেটাগুলো পড়তে পারে। সিডি-রম ড্রাইভ এবং ডিভিডি-রম ড্রাইভ দেখতে প্রায় একই রকম। তবে পার্থক্য হলো ডিভিডি ড্রাইভে সিডি এবং ডিভিডি দুটোই পড়া যায়। কিন্তু সিডি-রম ড্রাইভে ডিভিডি পড়া যায় না।

সিডি ও ডিভিডি এর মধ্যে পার্থক্য

সিডি (CD–ROM)	ডিভিডি (DVD)
১. CD–ROM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Compact Disk Read Only Memory.	১. DVD এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Digital Video Disk অথবা Digital Versatile Disk.
২. এতে এক স্তরে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।	২. এতে একাধিক স্তরে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।
৩. ডেটা রাইট করার জন্য ইনফ্রারেট রশ্মি ব্যবহার করা হয়, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৬৩৫ ন্যানোমিটার।	৩. ডেটা রাইট করার জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৭৮০ ন্যানোমিটার।
৪. ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম। ৭০০ মেগাবাইটের মতো।	৪. ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ৪.৭ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট বা তারও উপরে।
৫. সিডি–রম ড্রাইভে ডিভিডি চলে না।	৫. ডিভিডি রম ড্রাইভে সিডি চলে।
৬. ডিভিডি এর চেয়ে দাম কম।	৬. তুলনামূলকভাবে দাম বেশি।

ব্লু-রে ডিভিডি (Blue–Ray DVD)

ব্লু-রে ডিভিডি দেখতে সাধারণ ডিভিডি–এর মতো কিন্তু এর ধারণক্ষমতা অনেক। ১০০ গিগাবাইটের ব্লু-রে ডিভিডিতে অডিও, ভিডিও বা অধিক ডেটা সংরক্ষণ করা হয়। এটিও সাধারণ সিডি বা ডিভিডির মতো ১২ মি.মি. প্লাস্টিক ডিস্কের সাহায্যে তৈরি করা হয়। এর প্রতি লেয়ারের ধারণক্ষমতা ২৫ গিগাবাইট। ডিভিডিতে ৬৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল রঙের লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। ব্লু-রে ডিভিডিতে ৪০৫ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্লু রঙের লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এজন্য এ ডিস্কের নাম ব্লু-রে রাখা হয়েছে। ব্লু-রে ডিভিডির দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু অচিরেই এর দাম অনেক কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিডি, ডিভিডি ও ব্লু-রে ডিস্কের মধ্যে তুলনা

তুলনার বিষয়	সিডি–রম	ডিভিডি	ব্লু–রে ডিস্ক
চাকতির ব্যাস	১২০ মিলিমিটার	১২০ মিলিমিটার	১২০ মিলিমিটার
চাকতির পুরুত্ব	১.২ মিলিমিটার	১.২ মিলিমিটার	১.২ মিলিমিটার
পিটওল্যান্ডের দূরত্ব	১.৬ মাইক্রোন	০.৭৪ মাইক্রোন	০.৩২ মাইক্রোন
ডেটা ট্রান্সফারের বেজ রেট	১৫০ KB/s	১,৩৮৫ KB/s	৬.৭৪ MB/s
লেজার রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	৭৮০ ন্যানোমিটার	৬৩৫/৬৫০ ন্যানোমিটার	৪০৫ ন্যানোমিটার
তথ্য ধারণক্ষমতা	০.৭ গিগাবাইট	৪.৭ – ১৭ গিগাবাইট	১০০ গিগাবাইট
ঘূর্ণন গতি	২০০–৫০০ আরপিএম	৫৭০ – ১৬০০ আরপিএম	১০,০০০ + আরপিএম

ওএমআর (OMR)

ওএমআর (OMR) এর পুরো অর্থ হলো অপটিক্যাল মার্ক রিডার (Optical Mark Reader)। এটি এমন একটি ডিভাইস যা পেন্সিলের দাগকে শনাক্ত করতে পারে। ওএমআর এর জন্য ডিজাইন করা কম্পিউটার টেস্ট ফর্মগুলোকে 'এনসিএস (NCS) কম্পার্টিবল স্ক্যান ফর্ম' বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের ফর্মের উপর যেমন– জরিপ বা উত্তরপত্রের ফর্মের উপর থেকে পেন্সিলের দাগকে পড়ে নেওয়ার জন্য ওএমআর ব্যবহৃত হয়।

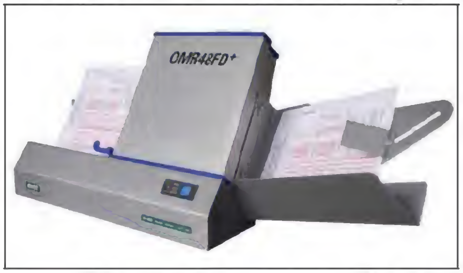

চিত্র : ওএমআর

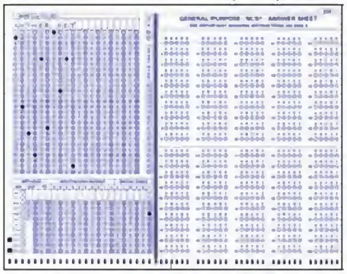

চিত্র : ওএমআর এর মাধ্যমে পড়ার উপযোগী বিশেষ উত্তরপত্র

কম্পিউটারের সাথে ওএমআর ব্যবহার করে নৈর্ব্যক্তিক টাইপ প্রশ্নের উত্তরের ফলাফল বের করা যায়। এই ব্যবস্থায় কাগজের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি ছকের বিভিন্ন গোলাকার বা বর্গাকার ঘর পেন্সিল কিংবা কলমের মাধ্যমে পূরণ করতে হয়।

ওএমআর (OMR) এর বৈশিষ্ট্য :

১. অপটিক্যাল মার্ক রিকগনাইজার (Optical mark recognizer) একটি বিশেষ ধরনের ইনপুট ডিভাইস OMR সিটে স্পষ্টভাবে দাগাংকিত বিশেষ ধরনের পেনসিল বা কলমের দাগ অনুধাবন করতে পারে।

২. এটি OMR সিটে ওপর প্রদত্ত বিশেষ ধরনের চার্জ এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অপটিক্যাল বিম দ্বারা স্ক্যান করে সমতুল্য বৈদ্যুতিক পালস উৎপন্ন করে।

৩. বিশেষ OMR সিটের মার্ককে পাঠ করে নির্দিষ্ট ফরম্যাটের ডাটা তৈরি করে। এজন্য ওএমআর–এ একটি আলোক উৎস থাকে। আলোতে উৎস থেকে নির্গত আলো মার্কসমূহকে স্ক্যানিং করে।

৪. নৈর্বাচনিক প্রশ্নোত্তরভিত্তিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন, জনসংখ্যা জরিপসহ অনুরূপ নানাবিধ কাজে ওএমআর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে এটা বিপুল পরিমাণ তথ্য অতিদ্রুত পাঠ করতে পারে। অর্থাৎ এ ডিভাইস

অতি অল্পসময়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য স্ক্যান করতে পারে। মার্ক করা কাগজে ময়লা হলে, ভাঁজ পড়লে বা মার্ক স্পষ্ট না হলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

ওসিআর (OCR)

ওসিআর (OCR) এর পূর্ণ নাম অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (Optical Character Reader)। কাগজে কালি বা পেন্সিলের দাগ ছাড়াও এ যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন আকৃতি এবং বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ও অক্ষর পঠন সম্ভব। ওসিআর হাতের লেখা, টাইপ করা লেখা অথবা প্রিন্ট করা লেখাকে পড়ে মেশিন এনকোডেড টেক্সটে রূপান্তরিত করে। হাতের লেখা অস্পষ্ট হলে ওসিআর তাও পড়তে পারে। ওসিআর—এর মাধ্যমে লেখা পাঠ করাতে হলে তা বিশেষ ধরনের টাইপফেস বা ফন্ট ব্যবহার করে মুদ্রণ করতে হয়। পূর্ব থেকে বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক সংকেত ওসিআর—এ রাখা হয়। ফন্টের গঠন অনুযায়ী ওসিআর বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে ঐ ধরনের ফন্টসমূহ পড়তে পারে।

ওসিআর (OCR) এর বৈশিষ্ট্য :

১. অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনাইজার বিশেষ ধরনের বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে অনুধাবন করে সমতুল্য বৈদ্যুতিক পালস উৎপন্ন করে। এ বৈদ্যুতিক পালস থেকে কম্পিউটার উপযোগী ডাটা তৈরি করে।

২. ওসিআর সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্ক্যানার হতে প্রাপ্ত ইমেজকে টেক্সট ফরমেটে রূপান্তর করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যায়।

৩. টাইপ রাইটার বা হাতের লেখা বর্ণসমূহকে রিড করার জন্য প্রতিটি বর্ণের আকার আকৃতি নির্দিষ্ট অবিকলের হওয়া প্রয়োজন।

৪. এ সিস্টেমে কাগজের উপস্থিতি কারেক্টারগুলোকে ওসিআর দ্বারা স্ক্যান করার পর একে কম্পিউটারে সংরক্ষিত কারেক্টার ফন্টের সাথে তুলনা করা হয়। যদি স্ক্যান করা কাগজের কারেক্টার এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত কারেক্টার ফন্ট মিলে যায় তবে কম্পিউটার স্ক্যান করা কারেক্টরকে সংরক্ষণ করে অন্যথায় উক্ত কাগজের তথ্য ভুল হিসেবে গণ্য করে।

৫. ওসিআর দ্বারা সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ২৪০০ কারেক্টার পড়া যায়। ব্যাংক, ইনসুরেন্স কোম্পানি, এয়ার লাইন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওসিআর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ওএমআর (OMR) এবং ওসিআর (OCR) এর মধ্যে পার্থক্য

ওএমআর (OMR)	ওসিআর (OCR)
১. ওএমআর এর পুরো অর্থ হলো অপটিক্যাল মার্ক রিডার (Optical Mark Reader)।	১. ওসিআর এর পূর্ণ নাম অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (Optical Character Reader)।
২. ওএমআর কেবল দাগকে শনাক্ত বা পড়তে পারে। যেমন– কালির সাহায্যে ভরাটকৃত কোনো বৃত্ত।	২. হাতে লেখা বা টাইপ করা বর্ণকে পড়তে পারে।
৩. ওএমআর কোনো বর্ণকে শনাক্ত করতে পারে না।	৩. এটি হার্ড টেক্সট হতে কোনো বর্ণকে শনাক্ত করতে পারে।
৪. জরিপ বা নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র পরীক্ষণে ওএমআর ব্যবহার করা হয়।	৪. হাতের লেখা, টাইপ করা লেখা অথবা প্রিন্ট করা লেখাকে পড়ে মেশিন এনকোডেড টেক্সটে রূপান্তরিত করে।

৫.৫ একটি হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারা

হার্ডডিস্ক পার্সোনাল কম্পিউটারের জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইস। হার্ডডিস্ক ব্যবহারের জন্যে আলাদা ড্রাইভের প্রয়োজন হয় না। ডিস্ক এবং ড্রাইভ একসাথেই সংযোজিত থাকে। এক্ষেত্রে একাধিক ডিস্ক একসঙ্গে পর পর রেখে লিখন ও পঠনের কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। কেসিং-এর মধ্যে কয়েকটি স্ক্রু দ্বারা এটি স্থাপন করা হয় বিধায় ফ্লপি ডিস্কের ন্যায় এটিকে সহজে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় না। অন্যান্য ডিস্কের তুলনায় হার্ডডিস্ক অনেক দ্রুতগতিতে কার্যাবলি সম্পাদন করে।

যে ডিভাইসের সাহায্যে হার্ডডিস্ক চালনা করা হয় তাকে হার্ডডিস্ক ড্রাইভ বা সংক্ষেপে HDD বলে। হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে আটকানো ডিস্ক প্যাক একটি ঘূর্ণায়মান দণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি স্পিন্ডল মটর, ডিস্ক বা ডিস্ক প্যাককে মিনিটে ৭২০০ বা ১০০০০ বার ঘুরায়। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে, স্পিন্ডল মটর, ভয়েজ কয়েল মেকানিজম, একচুয়েটর আর্ম, রিড/রাইট হেড, ডিস্ক প্যাক, হেড পজিশনিং ম্যাকানিজম, আইডিই কানেকটর, মাস্টার-স্লেভ জাম্পার ব্লক, পাওয়ার কানেকটর এবং বায়ু সঞ্চালক ও বিশোধক ইত্যাদি অংশ থাকে।

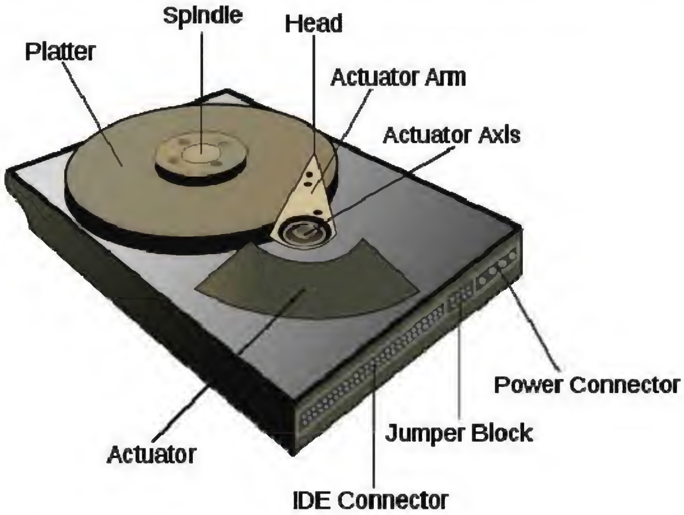

৫.৬ কীবোর্ড ও মাউসের বৈশিষ্ট্য

কীবোর্ড : কীবোর্ড হলো কম্পিউটারের অন্যতম একটি ইনপুট ডিভাইস যার মধ্যে বর্ণ, সংখ্যা, বিশেষ চিহ্নের বিভিন্ন কীগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে।

কীবোর্ড এর বৈশিষ্ট্য

- কীবোর্ড একটি অন্যতম ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের কীবোর্ডের কীগুলোর সাহায্যে টাইপ করা ছাড়াও কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- কীবোর্ডের মধ্যে বর্ণ, সংখ্যা, বিশেষ চিহ্নের বিভিন্ন কীগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে।
- বর্তমানে প্রচলিত কীবোর্ডগুলোতে সর্বোচ্চ ১০৫টি কী আছে। ইংরেজি বর্ণ ও সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত কীগুলো সাধারণ টাইপরাইটারের মতো এবং বিন্যাস বা সাজানোও একই রকম। কীবোর্ড প্রায় সব কম্পিউটারেই থাকে।
- প্রিন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে মনিটরে প্রদর্শিত স্ক্রিনকে ক্যাপচার করা।
- কীবোর্ডের কীগুলোর সাহায্যে অতি দ্রুত টাইপ করা যায়।
- কপি, পেস্ট, এম্পটি ট্র্যাশ ইত্যাদির মতো অসংখ্যা শর্টকাট প্রয়োগেরে জন্য কীবোর্ড ব্যবহার করা যায়।
- ডস কমান্ডসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেখানে মাউস ব্যবহার করা যায় না সেখানে কীবোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস হিসেবে ভূমিকা রাখে।
- কীবোর্ডের প্রত্যেক কী একটি বৈদ্যুতিক সুইচ-এর সঙ্গে একটি এনকোডার দ্বারা যুক্ত থাকে। কীবোর্ডের কোনো কী চাপলে এনকোডার সেই বর্ণের কোডের ডিজিটাল বৈদ্যুতিক সংকেত ০ বা ১ উৎপন্ন করে।
- তারবিহীন কীবোর্ড, ব্লুটুথ কীবোর্ড এবং ভ্রমণে কাজ করার জন্য পাতলা কীবোর্ড পাওয়া যায়।
- বিদ্যুৎ ছাড়া সোলার পাওয়ারে কাজের উপযোগি কীবোর্ড পাওয়া যায়।

মাউস এর বৈশিষ্ট্য

- কম্পিউটারের জন্য মাউস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ডিভাইস। এর সাহায্যে অতি সহজে ও খুব দ্রুত কম্পিউটারকে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদান এবং পূর্বনির্ধারিত কোনো কমান্ড বা ফাংশনকে সক্রিয় করা যায়।
- মাউস নড়াচড়া করে ইচ্ছেমত তীরটিকে দ্রুত স্থানান্তর করে কমান্ড অপশন অথবা আইকনের উপর নিয়ে মাউসের বাম বোতাম ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- মাউসের সাহায্যে পর্দায় লিখিত বিষয়, গ্রাফ, ছবি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণসহ আরও নানা প্রকার কাজ করা যায়।
- চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামে মাউস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- মাউস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। চলাচল নির্ণয়ের প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে মাউস যান্ত্রিক, আলোক যান্ত্রিক এবং অপটিক্যাল এই তিন ধরনের হয়ে থাকে।
- তারবিহীন ওয়্যারলেস মাউস এর ব্যবহার রয়েছে।

চিত্র : ট্র্যাকবল মাউস

চিত্র : অপটিক্যাল মাউস

কীবোর্ড এর বিভিন্ন কী এর কাজ :

১. **ফাংশন কী :** কীবোর্ডের একেবারে উপরের সারিতে বা বামদিকে F1 থেকে F12 চিহ্নিত কীসমূহ ফাংশন কী নামে পরিচিত। তথ্য সংযোজন বা ইনসার্ট করা, অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা এবং বিশেষ ধরনের নির্ধারিত নির্দেশ প্রদানের জন্য ফাংশন কী ব্যবহৃত হয়।

২. **টাইপিং কী :** বর্ণমালা গাণিতিক অঙ্ক এবং অন্যান্য চিহ্নসমূহ লেখার জন্য ব্যবহৃত কীগুলোকেই টাইপিং কী বলে। যেমন, A থেকে Z পর্যন্ত বর্ণ, ০ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্ক এবং বিরাম চিহ্ন কমা(,), কোলন(:), সেমিকোলন(;) ইত্যাদি এবং বিশেষ চিহ্নসমূহ টাইপিং কী এর অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র : একটি স্ট্যান্ডার্ড কীবোর্ড

৩. **Enter Key :** কোন কমান্ড কার্যকর করার জন্য ঐ কমান্ড লিস্টের আইটেম সিলেক্ট করে Enter Key চাপতে হয়।

৪. **Tab Key :** সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে (৫ ক্যারেক্টার) কার্সরকে স্থানান্তর করার জন্য Tab Key ব্যবহৃত হয়।

৫. **Space bar :** সাধারণত স্পেসবার একবার চাপলে এক ক্যারেক্টার স্পেস দেওয়া যায়। আবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন প্রয়োজনে স্পেস বারকে কাজে লাগানো যায়।

৬. **Shift key :** ডানে এবং বামে দুইটি শিফট কী আছে। শিফট কী তে চাপ দিয়ে ধরে রেখে A থেকে Z পর্যন্ত কীগুলোর যে কোন একটি Key তে চাপ দিয়ে বড় হাতের অক্ষর টাইপ হবে।

৭. **Caps Lock :** একবার ক্যাপস লক কী চাপ দিলে ক্যাপস লক লাইট জ্বলবে। দ্বিতীয়বার চাপ দিলে লাইট নিবে যাবে। লেখার সময় অক্ষরগুলো বড় হাতের টাইপ করার দরকার হলে শুধু একবার ক্যাপস লক কী তে চাপ দিতে হবে।

৮. **কার্সর মুভমেন্ট কী :** কার্সর হলো একটি ছোট আলোর রেখা। এ রেখা দিয়ে মনিটরের পর্দায় কাজের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।

৯. **নিউমারিক কী :** কীবোর্ডের ডান অংশে ক্যালকুলেটরের মত ০–৯ এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি চিহ্নিত কীগুলোকে নিউমারিক কী বলে।

মাউস ও এর বিভিন্ন বাটনের কাজ

মাউসে কয়েক ধরনের বাটন থাকে। প্রথম যখন মাউস আবিষ্কার হয় তখন এক বাটনের মাউস ছিল। এরপর দুই বাটনের মাউস আবিষ্কার হয়। বর্তমানে তিন বাটনের স্ক্রল মাউস ও পাঁচ বাটনের মাউস ব্যবহার করা হয়। স্ক্রল মাউস ব্যবহার করে মনিটরের দৃশ্যমান অংশের উপরের দিকে বা নিচের দিকে যাওয়া যায়।

১. **সিঙ্গেল ক্লিক :** মাউসের বাটন একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে সিঙ্গেল ক্লিক অথবা শুধু ক্লিক বলা হয়। কোনো বিষয়কে সিলেক্ট করার জন্যে মাউস পয়েন্টার সে বিষয়ের উপর নিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হয়।

২. **ডাবল ক্লিক :** অল্প সময়ের মধ্যে পরপর দুইবার চাপ দেওয়াকে ডাবল ক্লিক বলা হয়। কোনো বিষয়ে ঢুকার জন্যে ঐ বিষয়ের আইকনের উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে ডাবল ক্লিক করতে হয়।

৩. **রাইট ক্লিক :** মাউসের রাইট বাটনে একবার ক্লিক করাকে রাইট ক্লিক বলা হয়। কোনো প্রোগ্রামের মধ্যে এ বাটনে ক্লিক করলে একটি নির্দেশ তালিকা মেনু ওপেন হয়। মেনু থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নির্বাচন করা হয়।

৫.৮ CRT, LCD, LED ও AMO LED সম্পর্কে ধারণা

মনিটর (Monitor)

টেলিভিশনের মতো দেখতে কম্পিউটার ব্যবস্থার অংশটিকে মনিটর বলা হয়। টিভি কার্ড ব্যবহার করে মনিটর দিয়ে টিভির ন্যায় টেলিভিশন স্টেশন থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখা যায়। মনিটরের স্ক্রিনের এক কোণা থেকে অন্য কোণার মাপকে মনিটরের সাইজ হিসেবে ধরা হয়। সাধারণ মনিটরের সাইজ হলো ১৪, ১৫, ১৭ এবং ২১ ইঞ্চি। ডেস্কটপ পাবলিশিং এবং গ্রাফিক্সে কাজ করার জন্যে অথবা বড় স্প্রেডশিটে কাজ করার জন্যে বড় সাইজের মনিটর বেশি সুবিধাজনক।

মনিটরের প্রকারভেদ (Types of Monitor)

মনিটর সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. সিআরটি মনিটর (CRT Monitor)
২. এলসিডি মনিটর (LCD Monitor)
৩. এলইডি মনিটর (LED Monitor)
৪. এমোলেড মনিটর (AMOLED Monitor)

চিত্র : সিআরটি মনিটর

সিআরটি মনিটর (CRT Monitor)

ক্যাথোড রে টিউবযুক্ত মনিটরকে সিআরটি মনিটর বলা হয়। CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube। এ ধরনের মনিটরের পিছন দিকের ইলেক্ট্রন গান থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন ফসফরাসের উপর আঘাত আনতে থাকে। সাদা কালো মনিটরের ক্ষেত্রে একশটি মাত্র ইলেক্ট্রন গান থাকে। রঙিন মনিটরে তিনটি মৌলিক রঙ প্রদর্শনের জন্য তিন ধরনের ইলেক্ট্রন গান থাকে। রং তিনটি হলো সবুজ, নীল, লাল। সিআরটি মনিটরগুলো কম উজ্জ্বল ডিসপ্লের হয়ে থাকে। সিআরটি মনিটরের ওজন বেশি সহজে বহন করা যায় না। এলসিডি মনিটরের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ খরচ

হয়। দাম তুলণামূলকভাবে কম। বর্তমানে এ ধরনের মনিটর আর তৈরি হচ্ছে না। টিউবের ভিতরের দিকে ফসফরাস নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ লাগানো থাকে।

Cathode Ray Tube : ক্যাথোড রে টিউব (CRT) এ সবচেয়ে পুরানো ইলেকট্রনিক ইমেজ (Image) তৈরি করার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের ভ্যাকুয়াম টিউব যার আংশিক শূন্য এবং এই অংশটি খুব অল্প চাপে নিষ্ক্রীয় গ্যাস (Inert gas) ভরা থাকে। এই টিউব এ একটি নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রোড থাকে যাকে ক্যাথোড (Cathode) বলে। এই ক্যাথোড থেকে একটি ইলেকট্রন বিম (Electron beam) বা রে পজেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রোড এ্যানোড (Anode) এর দিকে নিক্ষেপ করে যা স্ক্রিন এ ডিসপ্লে আকারে দেখা যায়।

এলসিডি মনিটর (LCD Monitor)

এলসিডি মনিটরে এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহিতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটির পর্দা সমতল। একে ফ্লাট প্যানেল বলা হয়। ফ্লাট প্যানেল মনিটর সিআরটি মনিটরের চেয়ে ওজনে অনেক হালকা, অল্প জায়গা দখল করে এবং বিদ্যুৎ খরচ কম। ল্যাপটপ কম্পিউটারে এলসিডি মনিটর ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য বিভিন্ন মডেলের ফ্লাট প্যানেল মনিটর পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলোর দাম সাধারণ সিআরটি মনিটরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

Liquid Crystal Display (LCD)

LCD–এর পুরো নাম–Liquid Crystal Display। কম্পিউটারে ব্যবহৃত এক ধরনের ডিসপ্লে ইউনিট। এতে ব্যবহার করা হয় তরল কেলাস বা Liquid Crystal। তরল কেলাস হলো জড় পদার্থের এমন একটি অবস্থা যে অবস্থায় পদার্থ কঠিন ও তরল অবস্থার ধর্ম একইসাথে ধারণ করে। কম্পিউটারের এলসিডি ডিসপ্লেতে এই Liquid Crystal ব্যবহার করা হয় বিশেষ কৌশলে। এই উপাদানটি দুটো ট্র্যান্সপারেন্ট তড়িৎ-দ্বারের ভিতর রক্ষিত হয়। যখন একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এর উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন অণুগুলো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সাথে সমন্বিত হয়। এটি আলোক সঞ্চালনের ক্ষেত্রে মেরুকরণে সহায়তা করে। একটি পোলারাইজড ফিল্টার দ্বারা ইলেকট্রোড ব্লকের উপর আবরিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় লিকুইড ক্রিস্টাল সেল। এই সেলগুলো কলাম ও সারিতে বিন্যস্ত থাকে। এই সেলগুলো জ্বলা/নেভার মধ্য দিয়ে স্ক্রিনে ছবি ফুটে উঠে। অল্প বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় বলে কিছু কিছু কম্পিউটারে (ল্যাপটপ, নোট বুক, পিসি) এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ফ্লাট প্যানেল মনিটরে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : এলসিডি মনিটর

চিত্র : এলসিডি মনিটর

চিত্র : এলইডি মনিটর

এলইডি মনিটর (LED Monitor)

LED মনিটর LCD মনিটরের উন্নত ভার্সন যাতে ডিসপ্লের জন্য LED (Light Emitting Diode) ব্যবহার করা হয়েছে। এটি LCD মনিটরের মতোই কাজ করে কিন্তু এর ব্যাকলাইট ভিন্ন ধরনের। LCD মনিটর অপেক্ষা ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালো মানের এবং বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম। এটি চোখের জন্য বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং বেশিদিন লাস্টিং করে। তৈরি করার সময় LCD মনিটরের মতো মারকারি ব্যবহার করা হয় না বিধায় এটি বেশি পরিবেশ বান্ধব। এর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে দিন দিন যেভাবে এর ব্যবহার বাড়ছে তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে এর দাম দ্রুত কমে আসবে।

মনিটরের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার

১. কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল আউটপুট হিসেবে পর্দায় প্রদর্শন করানোর জন্য মনিটর ব্যবহৃত হয়। মনিটর ব্যতীত কম্পিউটারে কোনো ধরনের কাজ করাই সম্ভব নয়।
২. বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স, রেখাচিত্র, নকশা ইত্যাদি নিখুঁতভাবে তৈরির কাজে মনিটর ব্যবহৃত হয়।
৩. প্রকাশনা শিল্পে টেক্সট ও গ্রাফিক্স এর যাবতীয় সম্পাদনার কাজগুলো মনিটরের পর্দায় দেখে দেখে করা হয়ে থাকে। মনিটর ছাড়া এই কাজগুলো করা সম্ভব ছিল না।
৪. বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখা ও গেম খেলার জন্য মনিটর ব্যবহৃত হয়।
৫. মনিটরকে টিভিকার্ডের সাথে যুক্ত করে সেটিকে টিভিসেট হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সিআরটি মনিটর ও এলসিডি মনিটরের গুণগত পার্থক্য

সিআরটি (CRT) মনিটর	এলসিডি (LCD)মনিটর
১. CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube।	১. LCD এর পূর্ণরূপ হলো Liquid Crystal Display।
২. সিআরটি মনিটরের কালার দেখানোর ক্ষমতা অসীম।	২. এলসিডি মনিটর ১৬.৭ মিলিয়ন কালার দেখাতে পারে।
৩. সিআরটি মনিটরের ক্ষেত্রে পর্দায় দেখানো ছবি যেকোনো এঙ্গেল থেকে ভালো দেখা যায়।	৩. এলসিডি মনিটরের ক্ষেত্রে পর্দায় দেখানো ছবি সোজাসুজি না তাকিয়ে ভালো দেখা যায় না।
৪. কম উজ্জ্বল ডিসপ্লের হয়ে থাকে।	৪. বেশ উজ্জ্বল ডিসপ্লের হয়ে থাকে।
৫. ওজন বেশি সহজে বহন করা যায় না।	৫. ওজন কম তাই সহজে বহন করা যায়।
৬. এলসিডি মনিটরের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়।	৬. অনেক কম বিদ্যুৎ খরচ হয়।
৭. দাম তুলণামূলকভাবে কম।	৭. দাম তুলণামূলকভাবে বেশি।
৮. ল্যাপটপে সিআরটি ব্যবহৃত হয় না।	৮. ল্যাপটপে এলসিডি ব্যবহৃত হয়।

এলসিডি মনিটর এবং এলইডি মনিটরের মধ্যকার পার্থক্য

LCD মনিটর	LED মনিটর
১. LCD এর পূর্ণরূপ হলো Liquid Crystal Display।	১. LED এর পূর্ণরূপ হলো Light Emitting Diode।
২. LCD মনিটর ব্যাকলাইটিং এ ঠান্ডা ক্যাথোড ফ্লোরসেন্ট ল্যাম্প (Cold Cathode Fluorescent Lamps–CCFL) ব্যবহার করে।	২. LED মনিটর লাইট ইমিটিং ডায়োট ব্যবহার করে।
৩. কম কোয়ালিটির ডিসপ্লে।	৩. ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালো মানের।
৪. বিদ্যুৎ খরচ বেশি।	৪. বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম।
৫. কম স্বাচ্ছন্দ্যময়।	৫. চোখের জন্য বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময়।
৬. কম লাস্টিং করে।	৬. বেশিদিন লাস্টিং করে।
৭. দাম তুলনামূলকভাবে কম।	৭. দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে বেশি ব্যবহৃত হলো দ্রুত কমে আসবে।
৮. তৈরি করার সময় মারকারি ব্যবহার করা হয় বিধায় কম পরিবেশ বান্ধব।	৮. বেশি পরিবেশ বান্ধব।

AMOLED মনিটর

AMOLED এর পূর্ণরূপ হলো– Active–Matrix Organic Light–Emitting Diode. এটি হলো মোবাইল ফোন, টেলিভিশন এবং এ জাতীয় ডিসপ্লে এর জন্য একটি নতুন ডিসপ্লে প্রযুক্তি। বর্তমানে এটি প্রথম

শ্রেণির এন্ড্রোয়েট স্মার্ট ফোন যেমন– LG Flex, Nexus এবং Samsung Galaxy S সিরিজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর পারফরমেন্স LCD এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এর ইমেজ মান খুবই ভালো। এটি অনেক পাতলা ও হালকা। এ প্রযুক্তিতে আগের LCD এর চেয়ে ৩০-৫০% কম পাওয়ার লাগে। এর রেসপন্স টাইম এলসিডি এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি। AMOLED ডিসপ্লেতে মাত্র দুইটি লেয়ার থাকে। একটি হলো OLED (organic light-emitting diode) লেয়ার যার মাধ্যমে লাইট নির্গত হয়। অপর লেয়ারটি হলো TFT (thin-film transistor) সার্কিট দিয়ে তৈরি ব্যাকপ্লেন যা OLED এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করে।

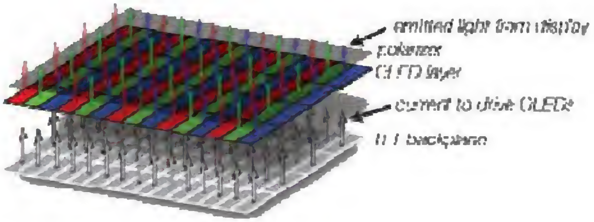

৫.৯ প্রিন্টারের শ্রেণিবিভাগ

প্রিন্টার :

প্রিন্টার হলো কম্পিউটারের অন্যতম বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের সিপিইউ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল কাগজে প্রিন্ট করার জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। প্রিন্টারের সাহায্যে কোনো তথ্যাবলি প্রিন্ট করা হলে কম্পিউটারের ভাষায় তাকে হার্ড কপি বলে।

প্রিন্টারের শ্রেণিবিভাগ :

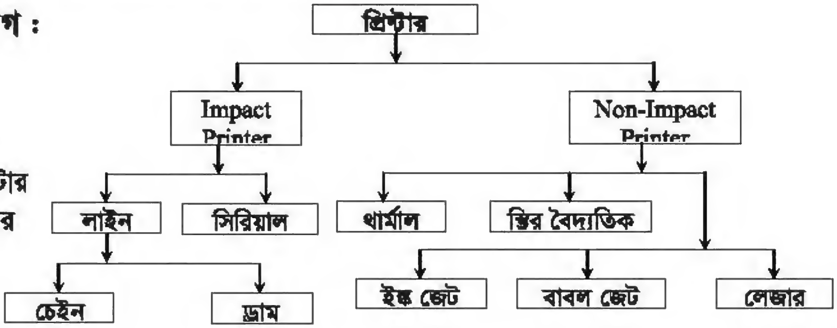

প্রিন্টার

- ইমপ্যাক্ট
  - লাইন প্রিন্টার
    - চেইন প্রিন্টার
    - ড্রাম প্রিন্টার
  - ক্যারেক্টার/সিরিয়াল প্রিন্টার
    - ডেইজি হুইল প্রিন্টার
    - ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার
- নন–ইমপ্যাক্ট
  - লেসার প্রিন্টার
  - ইঙ্কজেট প্রিন্টার
  - থার্মাল প্রিন্টার
  - স্থির বৈদ্যুতিক প্রিন্টার

চিত্র : ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

চিত্র : ইংকজেট প্রিন্টার

প্রিন্টারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১. কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষিত তথ্য ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেসের মাধ্যমে প্রিন্টারে আসে ।
২. প্রিন্টারে আগত তথ্যকে স্থায়ীভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করে ।
৩. প্রিন্টারের সাহায্যে বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, ছবি ইত্যাদির হার্ডকপি তৈরি করা হয় ।
৪. বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রিন্টার তৈরি হয়ে থাকে ।

৫.১০ ডট ম্যাটিক্স, বাবলজেট/ইংকজেট, লেজার প্রিন্টারের বৈশিষ্ট্য

ডট ম্যাটিক্স প্রিন্টারের মূলনীতি

ডট ম্যাটিক্স প্রিন্টার এক ধরনের সিরিয়াল ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার । এক্ষেত্রে কাগজ ও হেডের মাঝখানে কালিযুক্ত ফিতা বা রিবন থাকে । হেডের ভেতরে আকারে সাজানো কয়েকটি নমনীয় strick থাকে । strick গুলো রিবনের উপর আঘাত করে অক্ষরগুলো একের পর এক ছাপিয়ে যায় । বিভিন্ন ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের ম্যাট্রিক্স এর সাইজ বিভিন্ন হয়ে থাকে । যেমন– 7×7 বা 9×7 ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি । এখানে প্রথম সংখ্যা দ্বারা সারি এবং দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা কলাম বুঝায় । যখন যে বর্ণ ছাপাতে হয় তখন সে বর্ণের ডট প্যাটার্ন বিন্দুগুলোর অনুরূপ পিনগুলো প্রিন্ট হেড থেকে বেরিয়ে এসে কালিমাখা ফিতাকে আঘাত করে । ফলে কাগজের ওপর বর্ণটি তৈরি হয় । এ প্রিন্টারের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৩০০টি পর্যন্ত বর্ণ ছাপানো যায় ।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের সাহায্যে বর্ণ ছাড়াও ছবি, গ্রাফ বা চার্ট প্রিন্ট করা যায় । এই প্রিন্টারে ফন্ট নির্দিষ্ট নয় । বরং সুইচ সেটিং এর মাধ্যমে এতে ভিন্ন ভিন্ন ফন্ট নির্ধারণের পাশাপাশি সফটওয়্যারের সাহায্যেও সহজেই ফন্ট পরিবর্তন করা যায় । ব্যবহারকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী বর্ণকে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রিন্ট করা যায় । সাদা কালো প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার এর হেড ম্যাকানিজমটি বেশ সহজ এবং রিবনটি কালো । কিন্তু রঙিন বা কালার প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আছে । কালার প্রিন্টারের রিবনে চারটি প্রাথমিক রং থাকে । রং গুলো হলো লাল, নীল, হলুদ এবং কালো । এর চারটি রংয়ের প্রয়োজনীয় মিশ্রণে বিভিন্ন রংয়ের ডট সৃষ্টি হয় । বিভিন্ন রংয়ের ডট তৈরির জন্য রিবনটিকে ওপরে নিচে প্রয়োজন মত উঠানো নামানোর ব্যবস্থা থাকে । যেহেতু ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে রংএর সংখ্যা সীমিত তাই উচ্চমানের কালার প্রিন্টিং এর জন্য এটি উপযোগী নয় ।

ডট ম্যাটিক্স প্রিন্টারের বৈশিষ্ট্য

১. ক্যাশ রেজিস্টার, এটিএম ইত্যাদির মতো ডিভাইস এবং বিভিন্ন পয়েন্ট-অব-সেল টার্মিনালে এই প্রিন্টার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় ।
২. মাল্টি-পার্ট স্টেশনারি প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালত, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কার্বন কপি তৈরির জন্য এই প্রিন্টার ব্যবহৃত হয় ।

ইংকজেট প্রিন্টারের মূলনীতি

ইংকজেট প্রিন্টার হলো একটি নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার । এতে সূক্ষ্ম কালির কণা একটি কৌশিক নল থেকে জেট আকারে সজোরে প্রক্ষেপিত হয়ে কাগজের উপর ডট তৈরির মাধ্যমে অক্ষরের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলে । এ প্রক্ষেপণ সাধারণত দুইভাবে করা যায় । যথা-থার্মাল ইংক প্রক্ষেপণ (Thermal Ink Jet) এবং পিজোইলেকট্রিক ইংক প্রক্ষেপণ (Piezo electric ink Jet) । প্রথম পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এ পদ্ধতির ইংকজেট প্রিন্টারকে থার্মাল জেট বা বাবল জেট প্রিন্টার বলা হয় । অন্যান্য প্রিন্টারের তুলনায় ইংক

জেট প্রিন্টারে ছাপানোর গুণগত মান বেশ ভালো। আধুনিক ইংকজেট প্রিন্টারের গুণগত মান লেজার প্রিন্টারের কাছাকাছি। এর সাহায্যে ৩০০ dpi রেজুলেশনে খুব দ্রুতগতিতে প্রিন্ট করা যায়। এ প্রিন্টারে প্রিন্টিং এর সময় তেমন শব্দ হয় না। বিভিন্ন সৌখিন কাজে বর্তমানে ইংকজেট প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। যেমন ভিজিটিং কার্ড, দাওয়াত কার্ড, আইডেন্টিটি কার্ড ইত্যাদি।

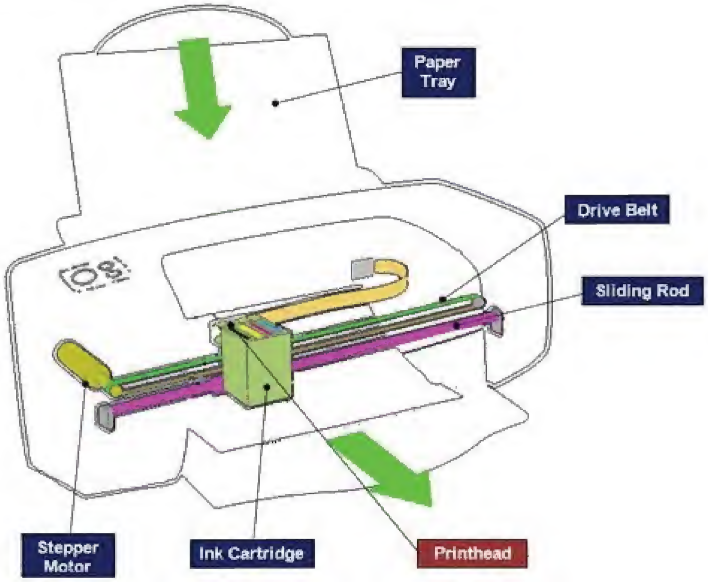

চিত্র : লেজার প্রিন্টার

লেজার প্রিন্টারের মূলনীতি

লেজার প্রিন্টার একটি নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার। লেজার (LASER) এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. এ লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তির মূলে রয়েছে আলোক পরিবাহী (Photo Conductive) পদার্থ যা আলোর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এবং আলোর অনুপস্থিতিতে বিদ্যুৎ কুপরিবাহী হিসেবে কাজ করে। সেলিনিয়াম একটি আলোক পরিবাহী পদার্থ। লেজার প্রিন্টারে একটি সিলিন্ডার বা ড্রামের গাত্র সেলিনিয়ামের স্তর দিয়ে প্রলেপ দেওয়া থাকে। প্রিন্টিং এর বিভিন্ন ধাপ এ সেলিনিয়ামকে চার্জিত করা হয় এবং পরবর্তীতে এর অংশবিশেষ প্রয়োজনমতো লেজার বিম ফেলে চার্জমুক্ত করা হয়।

লেজার প্রিন্টারে সাধারণত ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের মতো এক একটি করে অক্ষর ছাপানোর পরিবর্তে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা একবার ছাপানো হয়। লেজার প্রিন্টারের অক্ষর ছাপানো হয় নন-ইমপ্যাক্ট ডট ম্যাট্রিক্স আকারে। এক্ষেত্রে ডটগুলো খুব ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে। ফলে সাধারণভাবে এদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। চিত্রে একটি লেজার প্রিন্টার দেখানো হলো।

এ প্রিন্টারের রেজুলেশন, স্পিড অন্যান্য প্রিন্টারের চেয়ে বেশি। প্রিন্টারের রেজুলেশন DPI এবং গতি PPM এ পরিমাপ করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত একটি লেজার পিন্টারের রেজুলেশন ১২০০ DPI এবং গতি ২৪ PPM। যে সকল ক্ষেত্রে উচ্চ গতি ও উচ্চ গুণগত প্রিন্টিং দরকার, সে সকল ক্ষেত্রে লেজার প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য প্রিন্টারের তুলনায় লেজার প্রিন্টারের কার্টিজের দাম বেশি।

লেজার প্রিন্টারের বৈশিষ্ট্য :

১. লেজার প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপানো হয়।
২. কাগজের উপর লেজার রশ্মি তাপে অক্ষর স্থায়ীভাবে বসে ছাপানো হয়।
৩. এ প্রিন্টার উচ্চগতি সম্পন্ন।
৪. লেজার প্রিন্টারের ছাপা উন্নত মানের।
৫. লেজার প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ বেশি।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, ইংকজেট প্রিন্টার ও লেজার প্রিন্টারের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য :

ডট প্রিন্টার	ইংকজেট প্রিন্টার	লেজার প্রিন্টার
১. ডট প্রিন্টার প্রিন্ট হেড কালির রিবনের উপর দিয়ে রোলারের আটকানো কাগজের উপর ধাক্কা দিলে সেখানে অক্ষরের ছাপ পড়ে।	১. ইঙ্ক জেট প্রিন্টারে কতকগুলো সূক্ষ্ম সূচিমুখ থেকে বের হয়ে আসা বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কালির সূক্ষ্ম কণাগুলোকে একটি তড়িৎক্ষেত্র ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে কাগজের উপর লেখা ছাপায়।	১. লেজার প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপানো হয়।
২. ডট প্রিন্টারে একটি বর্ণ বা একটি লাইন ছাপানোর পর প্রিন্ট মাথা একটু সরে যায় ফলে আরেকটি অক্ষর বা লাইন ছাপা হয়।	২. কালি নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রিন্ট হয় বিধায় কাগজের উপর পানি পড়লে লেখা নষ্ট হয়ে যায়।	২. কাগজের উপর লেজার রশ্মি তাপে অক্ষর স্থায়ীভাবে বসে ছাপানো হয়।
৩. এ প্রিন্টার ধীর গতিসম্পন্ন।	৩. এ প্রিন্টার ধীর গতিসম্পন্ন।	৩. এ প্রিন্টার উচ্চগতি সম্পন্ন।
৪. ডট প্রিন্টারের ছাপা সাধারণ মানের।	৪. ইংকজেট প্রিন্টারের ছাপা মধ্যম মানের। তবে উন্নতমানের ইংকজেট প্রিন্টারের ছাপা লেজার প্রিন্টারের মতো উন্নত মানের।	৪. লেজার প্রিন্টারের ছাপা উন্নত মানের।
৫. ডট প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ কম।	৫. ইংকজেট প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ বেশি।	৫. লেজার প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ বেশি।

ইমপেক্ট ও নন–ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার এর মধ্যে পার্থক্য :

ইমপেক্ট প্রিন্টার	নন–ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার
১. এই প্রিন্টারে ছাপানোর কাজ প্রিন্টার হেডের মাধ্যমে হয়ে থাকে।	১. এই প্রিন্টারে ছাপানোর কাজ করার জন্য লেজার রশ্মি বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
২. প্রিন্ট হেড কাগজকে স্পর্শ করে।	২. প্রিন্ট হেড কাগজকে স্পর্শ করে না।
৩. প্রিন্টের গুণগত মান উন্নত হয় না।	৩. ছাপার মান বেশ উন্নত হয়।

৪. প্রিন্ট করার সময় প্রচুর শব্দ হয়।	৪. প্রিন্ট করার সময় শব্দ খুব কম হয়।
৫. প্রিন্টের গতি কম।	৫. প্রিন্টের গতি অনেক দ্রুত।

ডট প্রিন্টার ও লেজার প্রিন্টার এর মাঝে পার্থক্য :

ডট প্রিন্টার	লেজার প্রিন্টার
১. ডট প্রিন্টার প্রিন্ট হেড কালির রিবনের উপর দিয়ে রোলারের আটকানো কাগজের উপর ধাক্কা দিলে সেখানে অক্ষরের ছাপ পড়ে।	১. লেজার প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপানো হয়।
২. ডট প্রিন্টারে একটি বর্ণ বা একটি লাইন ছাপানোর পর প্রিন্ট মাথা একটু সরে যায় ফলে আরেকটি অক্ষর বা লাইন ছাপা হয়।	২. কাগজের উপর লেজার রশ্মি তাপে অক্ষর স্থায়ীভাবে বসে ছাপানো হয়।
৩. এ প্রিন্টার ধীর গতিসম্পন্ন।	৩. এ প্রিন্টার উচ্চগতি সম্পন্ন।
৪. ডট প্রিন্টারের ছাপা সাধারণ মানের।	৪. লেজার প্রিন্টারের ছাপা উন্নত মানের।
৫. ডট প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ কম।	৫. লেজার প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ বেশী।

৫.১১ রিবন কার্টিজ, ইংক কার্টিজ এবং টোনার কার্টিজ

রিবন কার্টিজ

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে ব্যবহৃত একটি কালিমাখা ফিতার সরঞ্জাম হলো রিবন কার্টিজ। একে প্রিন্টারের হেড স্লটে চাপ দিয়ে সংযোজন করা হয়। রিবন কার্টিজের আকার আকৃতি সাধারণত নির্ভর করে প্রিন্টার মডেলের উপর। প্রিন্টার হেডে সংযোজনের পূর্বে এর Tightening Knoe কে তীর চিহ্নিত দিকে ঘুরিয়ে ফিতার ভাঁজ দুর করা হয়।

চিত্র : রিবন

ইংক কার্টিজ

ইংক কার্টিজ হলো কালিযুক্ত একটি আধার যাতে শক্ত কালির দণ্ড বা তরল কালি থাকে। বর্তমানে ইংক কার্টিজে কালির শক্ত নিরেট দণ্ডই বেশি ব্যবহৃত হয়। ইংক কার্টিজ সাধারণত বাবল জেট বা ইংকজেট প্রিন্টারে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রিন্টারের মডেল অনুযায়ী ইংক কার্টিজের আকার আকৃতি বড়-ছোট হয়ে থাকে। হেড স্লটে স্থাপনের পূর্বে এতে সংযুক্ত হলে টেপটি খুলে নিতে হয়। ইংক কার্টিজ প্যাকেট থেকে খুলে অনেকক্ষণ রেখে দিলে কালি শুকিয়ে যায়।

চিত্র : ইংক কার্টিজ

টোনার কার্টিজ

লেজার প্রিন্টারে ব্যবহৃত পাউডার জাতীয় কালির আধার হলো টোনার কার্টিজ। সাধারণত প্রিন্টারের মডেলের উপর ভিত্তি করে টোনার কার্টিজ বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। প্রিন্টারে সংযোজনের পূর্বে প্যাকেট থেকে খুলতে হয়। খোলা অবস্থায় রেখে দিলে ছয় মাসের মধ্যেই এটি নষ্ট হয়ে যায়। প্যাকেট অবস্থায় প্রায় আড়াই বছর থাকে।

চিত্র : টোনার

প্রশ্নমালা—৫

■ **অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. কম্পিউটার পেরিফেরালস কী?
২. কয়েকটি কম্পিউটার পেরিফেরালস এর নাম লেখ।
৩. কম্পিউটার পেরিফেরালস কয় প্রকার ও কী কী?
৪. ইনপুট/আউটপুট (আই/ও) ডিভাইস কী?
৫. কয়েকটি ইনপুট/আউটপুট (আই/ও) ডিভাইসের নাম লেখ।
৬. হার্ডডিস্ক কয় প্রকার ও কী কী?
৭. আইডিই (IDE) ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড বিশিষ্ট হার্ডডিস্ককে PATA হার্ডডিস্ক বলা হয় কেনো?
৮. স্কাজি (SCSI) কী?
৯. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ কী?
১০. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ এর কাজ কী?
১১. ফ্লাশ ড্রাইভ কী?
১২. কীবোর্ড কী?
১৩. মাউস কী?
১৪. ডিসপ্লে ডিভাইস বলতে কী বোঝায়?

১৫. প্রিন্টারের কাজ কী?
১৬. ইংকজেট প্রিন্টারের মূলনীতি কী?
১৭. পেজ প্রিন্টার বলতে কী বোঝায়?
১৮. লেটার কোয়ালিটি প্রিন্টার কী?
১৯. DPI, PPM ও LPM কী?
২০. প্রিন্টিং কোয়ালিটি কী?
২১. LASER–এর পূর্ণরূপ লেখ।
২২. SATA–এর পূর্ণরূপ লেখ।
২৩. উন্নতমানের প্রিন্টারের জন্য কোন প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়?
২৪. কীবোর্ডে কয়টি ফাংশন কী (Key) থাকে?
২৫. ক্যাপস লক কী (Key)? এর কাজ লেখ?
২৬. রিবন কার্টিজ কাকে বলে?
২৭. ইংক কার্টিজ কী?
২৮. টোনার কার্টিজ বলতে কী বোঝ?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইনপুট ডিভাইস বলতে কী বোঝ?
২. আউটপুট ডিভাইস বলতে কী বোঝ?
৩. সাটা (SATA) ও পাটা (PATA) হার্ড ডিস্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৪. হার্ডডিস্ক ড্রাইভের বৈশিষ্ট্য লেখ।
৫. অপটিক্যাল ড্রাইভ এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৬. ফ্লাশ ড্রাইভ এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৭. ওএমআর (OMR) এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৮. ওসিআর (OCR) এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৯. কীবোর্ড এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।
১০. মাউসের প্রকারভেদ লেখ।
১১. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
১২. লেজার প্রিন্টারের মূলনীতি কী?
১৩. ইমপ্যাক্ট ও নন–ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার কী?
১৪. লাইন প্রিন্টার ও সিরিয়াল প্রিন্টার কী?
১৫. সিরিয়াল ও লাইন প্রিন্টারের প্রধান পার্থক্য কী?
১৬. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
১৭. ইংকজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
১৮. লেজার প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
১৯. সিরিয়াল পোর্ট মাউস, পিএস/২ ও ইউএসবি (USB) পোর্টের বর্ণনা দাও।
২০. সিআরটি (Cathode ray tube) ডিসপ্লে ডিভাইস বা মনিটরের বর্ণনা দাও।

২১. এলসিডি ডিসপ্লে ডিভাইস (K) বা মনিটর এর বর্ণনা দাও।
২২. সিআরটি মনিটরের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
২৩. এলসিডি মনিটরের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
২৪. সিআরটি মনিটরের একটি স্পেসিফিকেশন লেখ।
২৫. সিআরটি মনিটর ও এলসিডি মনিটর এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া ও সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২. চিত্রসহ হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
৩. কীবোর্ড এর বিভিন্ন কী এর কাজ বর্ণনা কর।
৪. প্রিন্টারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
৫. প্রিন্টারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
৬. একটি ডট ম্যাটিক্স প্রিন্টারের মূলনীতি বর্ণনা কর।
৭. একটি ইংকজেট প্রিন্টারের মূলনীতি বর্ণনা কর।
৮. একটি লেজার প্রিন্টারের মূলনীতি বর্ণনা কর।
৯. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, ইংকজেট প্রিন্টার ও লেজার প্রিন্টারের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।
১০. লেজার প্রিন্টারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

অধ্যায়–৬

পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেম

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

৬.১. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ইউপিএস, আইপিএস কী তা ব্যক্ত করতে পারব।

৬.২. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, UPS, IPS এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞাত হব।

৬.৩. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার UPS, IPS এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো জ্ঞাত হব।

৬.১ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ইউপিএস, আইপিএস সম্পর্কে ধারণা

পাওয়ার ব্যাকআপ

মেইন পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের পাওয়ার চলে গেলে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য ব্যাটারি ব্যাংক যা চার্জ হয়ে পাওয়ার ধরে রাখে তাকে পাওয়ার ব্যাকআপ বলা হয়। পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি বা ইনভার্টার হলো এমন একটি ডিভাইস যা ব্যাটারির সাহায্যে ডিসি সাপ্লাইকে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স লোডের উপযোগী এসি পাওয়ার সাপ্লাই এ রূপান্তর করতে পারে। একে পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি বলা হয়। এটা মেইন এসি এর উপস্থিতিতে কম্পিউটার বা এ জাতীয় যন্ত্রপাতিতে পাওয়ার সরবরাহ করে এবং ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার জমা করে রাখে। আর এসি সরবরাহের অনুপস্থিতিতে ব্যাটারিতে জমাকৃত ডিসি পাওয়ারকে এসিতে রূপান্তর করে তাৎক্ষণিক পাওয়ার সরবরাহ করে থাকে। কার্য ও স্থানভেদে এ পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ ধরনের পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতিকে IPS (Instant Power Supply), UPS (Uninterrupted Power Supply), EPS (Emergenery Power Supply), QPS (Quick Power Supply) ও বলা হয়। নিচে একটি পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমের চিত্র দেখানো হলো।

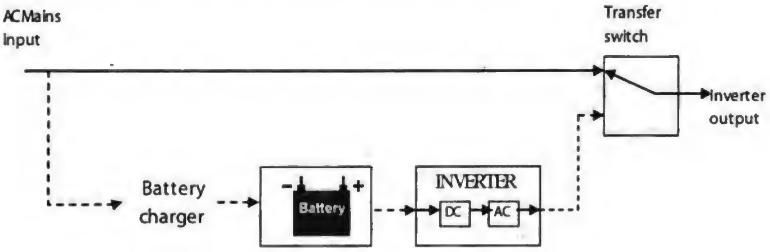

চিত্র : পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি

পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি বা ইনভার্টার হলো এমন একটি ডিভাইস যা ব্যাটারির সাহায্যে ডিসি সাপ্লাইকে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক লোডের উপযোগী এসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ে রূপান্তর করতে পারে।

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (Voltage Stabilizer)

বিদ্যুতের হঠাৎ ওঠা–নামাজনিত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণকারী একটি যন্ত্র হচ্ছে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার। কম্পিউটার অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্যের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের কারণেও এর অনেক ক্ষতি হতে পারে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ভোল্টেজের পরিমাণ সাধারণত ২২০ ভোল্ট। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে সর্বনিম্ন ১২০ ভোল্ট থেকে সর্বোচ্চ ২৯০ ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। বিদ্যুতের এ অস্বাভাবিক আচরণে কম্পিউটারে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই সর্বদা এ প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্যের নিত্যতা বজায় রাখার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (Voltage Stabilizer) ব্যবহার করতে হয়। বিদ্যুৎ

প্রবাহের মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে যা-ই সরবরাহ হোক না কেন ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার উক্ত মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় (২২০ ভোল্ট) সরবরাহ করে থাকে। ফলে মূল বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুতের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও কম্পিউটারে গ্রহণযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। কোন কারণে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের ক্ষমতার বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেলে সাথে সাথে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের অভ্যন্তরে থাকা ফিউজটি পুড়ে গিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

চিত্র : ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার

স্ট্যাবিলাইজারকে প্রথমে বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। তারপর সেখান থেকে কম্পিউটারে শক্তি সরবরাহ করা হয়। এতে কম্পিউটারের জন্য সরবরাহের নির্ধারিত পরিমিতির কোন পরিবর্তন হলে তা সরাসরি এর উপর প্রভাব বিস্তার করে না। বাজারে বিভিন্ন ক্ষমতার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্ষমতা বা ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তাই প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কেনা উচিত। সাধারণত ৫০০ থেকে ৬০০ ভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কোন সাধারণ কম্পিউটার ও প্রিন্টারের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে বিদ্যুতের ভোল্টেজের ওঠানামাজনিত সমস্যা হতে মুক্ত রাখতে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন এবং সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি প্লেয়ার।

ইউপিএস (UPS)

ইউপিএস (UPS)—এর পূর্ণ নাম Uninterruptible Power Supply। এটি বিশেষ এক ধরনের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে গৌণ সঞ্চয়ক কোষ বা ব্যাটারি যা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় করে রাখে। ফলে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ কম্পিউটারে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে। সরবরাহ বন্ধ হওয়ার এক থেকে দুই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। কম্পিউটারের সাথে ইউপিএস ব্যবহার করা হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ইউপিএস-এ জমাকৃত বিদ্যুতের সাহায্যে কম্পিউটার সচল থাকে। বাজারে বিভিন্ন সময়ের ব্যাকআপ সংবলিত ইউপিএস পাওয়া যায়। ফলে ব্যবহারকারীগণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার পর ইউপিএস-এর বদৌলতে পরিচালিত কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ডেটাসমূহ এ সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ করতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সংযোগব্যবস্থা ইউপিএস-এর মধ্যে দিয়েই করা হয়, যেন সরবরাহ বন্ধ হওয়া মাত্রই ইউপিএস তার কাজ শুরু করতে পারে। বাজারে বিভিন্ন ক্ষমতার ইউপিএস পাওয়া যায়। এগুলো ৫/১০ মিনিট থেকে শুরু করে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।

চিত্র : ইউপিএস

আইপিএস (IPS)

IPS–এর পূর্ণরূপ হলো Instant Power Supply এটি হলো এমন একটি বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টোরেজ যা বিদ্যুৎ যাওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার সরবরাহ করে। UPS এর মতো IPS বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। ১/১০ সেকেন্ড পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। মেইন লাইন থেকে IPS এর মধ্যস্থ ব্যাটারি চার্জ হয়ে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় করে রাখে। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। UPS এর চেয়ে IPS এর ব্যাটারির সাইজ এবং ক্ষমতা বেশি তাই এটি এক নাগারে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। তাই বর্তমানে কম্পিউটার ছাড়া অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন– লাইট, ফ্যান ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এটির জনপ্রিয়তা বেশি।

চিত্র : IPS

৬.২ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ইউপিএস (UPS), আইপিএস (IPS) এর প্রয়োজনীয়তা

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এর প্রয়োজনীয়তা

কম্পিউটার অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্যের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের কারণেও এর অনেক ক্ষতি হতে পারে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ভোল্টেজের পরিমাণ সাধারণত ২২০ ভোল্ট। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে সর্বনিম্ন ১২০ ভোল্ট থেকে সর্বোচ্চ ২৯০ ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। বিদ্যুতের এই অস্বাভাবিক আচরণে কম্পিউটারে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই সর্বদা এই প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্যের নিত্যতা বজায় রাখার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (Voltage Stabilizer) ব্যবহার করতে হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে যা-ই সরবরাহ হোক না কেন ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার উক্ত মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় (২২০ ভোল্ট) সরবরাহ করে থাকে। ফলে মূল বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুতের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও কম্পিউটারে গ্রহণযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে।

স্ট্যাবিলাইজারকে প্রথমে বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে সংযোগ করা হয়। তারপর সেখান থেকে কম্পিউটারে শক্তি সরবরাহ করা হয়। এতে কম্পিউটারের জন্য সরবরাহের নির্ধারিত পরিমিতির কোনো পরিবর্তন হলে তা সরাসরি এর উপর প্রভাব বিস্তার করে না।

চিত্র : ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার

চিত্র : ইউপিএস

চিত্র : আইপিএস

ইউপিএস (UPS) এর প্রয়োজনীয়তা

মেইন এসি এর উপস্থিতিতে কম্পিউটার এ পাওয়ার সরবরাহ করে এবং ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার জমা (Store) রাখে। আর এসি মেইন এর অনুপস্থিতিতে বা হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাটারির জমাকৃত ডিসি পাওয়ারকে এসিতে রূপান্তর করে তাৎক্ষণিকভাবে কম্পিউটারে পাওয়ার সরবরাহ করে এ ট্রান্সফার টাইম এত কম নির্ধারণ করা হয় যে উক্ত সময়ের মধ্যে কম্পিউটার বন্ধ বা রিসেট হয় না। ফলে কম্পিউটার এ নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহ হতে থাকে।

আইপিএস (IPS) এর প্রয়োজনীয়তা

মেইন লাইন এসি এর উপস্থিতিতে লোডে পাওয়ার সরবরাহ করে এবং ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার সংরক্ষণ করে। আর এসি মেইন লাইন এর অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাটারীর জমাকৃত ডিসি পাওয়ারকে এসিতে রূপান্তর করে এবং সাথে সাথে লোডে পাওয়ার সরবরাহ করে থাকে। এর ট্রান্সফার টাইম একটু বেশি হওয়ায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর পুনরায় ব্যাটারি থেকে পাওয়ার পেতে কিছুটা সময় লাগে। ফলে লোডে বন্ধ বা রিসেট হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় লোডে নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহ হয় না।

৬.৩ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ইউপিএস (UPS), আইপিএস (IPS) এর বৈশিষ্ট্য

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এর বৈশিষ্ট্য

১. পাওয়ার সাপ্লাই এর আউটপুটে স্থির মানের অল্টারনেটিং পাওয়ার সরবরাহ করার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহৃত হয়।

২. ভোল্টেজ এর হ্রাস-বৃদ্ধি, ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন কিংবা সিগনালের বিকৃতির প্রভাব থেকে এ লোডকে রক্ষার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এর প্রয়োজন হয়।

৩. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এ ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় না, ফলে পাওয়ার ব্যাকআপের ব্যবস্থা নেই।

৪. বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার অকেজো হয়ে পড়ে।

ইউপিএস (UPS) এর বৈশিষ্ট্য

১. ইউপিএস এর পূর্ণ নাম Uninterruptible Power Supply.

২. মেইন লাইন এর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে কোনো প্রকার বিরতি বা interruption ছাড়া নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস আনইন্টারাপ্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই বলে।

৩. এটা একটি পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি। বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলেও নিরবিচ্ছিন্ন পাওার সরবরাহের মাধ্যমে এটা লোডকে কার্যকরি রাখে।

৪. কম্পিউটার এর প্রোগ্রাম ও ডাটা রক্ষার্থে এবং জীবন রক্ষাকারী মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি চালনায় ইউপিএস অপরিহার্য।

৫. এটা মেইন লাইন এসি এর উপস্থিতিতে কম্পিউটার এ পাওয়ার সরবরাহ করে এবং ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার জমা (Store) করে রাখে। আর এসি মেইন লাইনে পাওয়ারের অনুপস্থিতিতে ব্যাটারির জমাকৃত ডিসি পাওয়ারকে এসিতে রূপান্তর করে লোডে সরবরাহ করে থাকে।

৬. ইউপিএস এর ট্রান্সফার টাইম নগণ্য বিধায় ইহাতে সংযুক্ত লোড রিস্টার্ট হয় না।

আইপিএস (IPS) এর বৈশিষ্ট্য

১. আইপিএস এর পূর্ণ নাম Instant বা Interruptable Power Supply.

২. এটা মেইন বৈদ্যুতিক লাইনে এসি এর উপস্থিতিতে লোডে পাওয়ার সরবরাহ করে এবং ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার জন্য (Store) জমা রাখে। আর এসি মেইন লাইনে পাওয়ারের অনুপস্থিতিতে ব্যাটারির জমাকৃত ডিসি পাওয়ারকে এসিতে রূপান্তর করে লোডে পাওয়ার সরবরাহ করে থাকে।

৩. এর ট্রান্সফার টাইম বেশি হওয়ায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর পুনরায় ব্যাটারি থেকে পাওয়ার পেতে কিছুটা সময় লাগে। ফলে লোড কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ বা রিসেট হয়ে যেতে পারে।

৪. ইহা একটি পাওয়ার ব্যাকআপ প্রদান করে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন নয়।

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ইউপিএস ও আইপিএস এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য :

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার	ইউপিএস	আইপিএস
১. পাওয়ার সাপ্লাই এর আউটপুটে স্থির মানের অল্টারনেটিং পাওয়ার সরবরাহ করার জন্য ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহৃত হয়।	১. মেইন লাইন এর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে কোন প্রকার বিরতি বা interruption ছাড়া নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহের জন্য ইউপিএস ব্যবহৃত হয়।	১. মেইন লাইন এর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাওয়ার সরবরাহের জন্য ইউপিএস ব্যবহৃত হয়।
২. ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় না, ফলে পাওয়ার ব্যাকআপের ব্যবস্থা নেই।	২. এটা মেইন লাইন এসি এর উপস্থিতিতে ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার জমা (Store) রাখে।	২. এটা মেইন লাইন এসি এর উপস্থিতিতে ব্যাটারিকে চার্জিত করার মাধ্যমে পাওয়ার জমা (Store) রাখে।
৩. পাওয়ার সরবরাহ করে না বিধায় এতে কোন ট্রান্সফার টাইম নেই।	৩. ট্রান্সফার টাইম নগণ্য বিধায় ইহাতে সংযুক্ত লোড রিস্টার্ট হয় না।	৩. ট্রান্সফার টাইম বেশি বিধায় এতে সংযুক্ত লোড রিস্টার্ট হয়।
৪. এটি কোনো পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি নয়।	৪. নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহকারী পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি।	৪. পাওয়ার সরবরাহকারী পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি।
৫. মূল্য অনেক কম।	৫. মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।	৫. ইউপিএস এর চেয়ে মূল্য কম কিন্তু ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের চেয়ে অনেক বেশি।
৬. ভোল্টেজ এর হ্রাস–বৃদ্ধি, ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েল কিংবা সিগনালের বিকৃতির প্রভাব থেকে লোডকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।	৬. কম্পিউটার এর প্রোগ্রাম ও ডাটা রক্ষার্থে এবং জীবন রক্ষকারী মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি চালনায় ব্যবহৃত হয়।	৬. মেইন লাইনে এসি এর উপস্থিতিতে লোডে পাওয়ার সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নমালা—৬

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
২. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কী?
৩. ইউপিএস (UPS) কী?
৪. আইপিএস (IPS) কী?
৫. আইপিএস সচরাচর কত রেটিং এর হয়ে থাকে?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ও পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা কী?
২. ইউপিএস এর মূলনীতি কী?
৩. আইপিএস এর মূলনীতি কী?
৪. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এর বৈশিষ্ট্য কী কী?
৫. ইউপিএস এর বৈশিষ্ট্য কী কী?
৬. আইপিএস এর বৈশিষ্ট্য কী কী?

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেম বর্ণনা কর।
২. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ইউপিএস ও আইপিএস এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

তৃতীয় অংশ

কম্পিউটার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স

অধ্যায়–৭

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স

■ **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**

৭.১. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স ব্যক্ত করতে পারব।
৭.২. কম্পিউটার এর ক্ষতিসাধনকারী নিয়ামকগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
৭.৩. কম্পিউটার এর ক্ষতিসাধনকারী নিয়ামকগুলো থেকে কম্পিউটারকে রক্ষণাবেক্ষণের উপায় ব্যক্ত করতে পারব।
৭.৪. ডিস্ক সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপায় ব্যক্ত করতে পারব।
৭.৫. পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এর ক্ষতিকারক নিয়ামক চিহ্নিত করতে পারবে ও উহার প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
৭.৬. কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যাসমূহ এবং উহার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে ব্যক্ত করতে পারব।
৭.৭. কম্পিউটার ল্যাবের উপযোগী পরিবেশ সম্পর্কে ব্যক্ত করতে পারব।

৭.১ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স

কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র সামগ্রীকে হার্ডওয়্যার বলে। অর্থাৎ কম্পিউটারের যে সকল অংশ ধরা ছোঁয়া বা স্পর্শ করা যায় তাদেরকে হার্ডওয়্যার বলা হয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সামগ্রীর মধ্যে ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস ও বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অংশ, স্মৃতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ হার্ডওয়্যার সামগ্রী পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ

কম্পিউটার পদ্ধতি থেকে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে এর যত্ন নেওয়া, নির্দিষ্ট সময় পর পর এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কোন যন্ত্র ঠিকমত কাজ না করলে তা মেরামত কিংবা প্রয়োজনে পরিবর্তন করা প্রভৃতিকে সমন্বিতভাবে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১. কম্পিউটার বন্ধ করার পর ঠাণ্ডা হলে কাপড় বা অন্য কিছুর কভার দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। নিয়মিতভাবে এর বহিরাবরণের ধুলাবালি মুছে পরিষ্কার করা উচিত।

২. সপ্তাহে অন্তত একদিন কীবোর্ড, মনিটর, মাউস, সিপিইউ ইত্যাদির গায়ে লেগে থাকা ধুলাবালি পরিষ্কার করা উচিত।

৩. ধুলাবালি রোধে বিশেষ ধরনের ও মাপের ডাস্ট কভার ব্যবহার করা উচিত।

৪. কম্পিউটার কখনই খোলা জানালার পাশে রাখা ঠিক নয়। এতে করে জানালা দিয়ে আসা ধুলাবালি এবং বৃষ্টির পানি খুব সহজেই সিস্টেমের উপর পড়ে পদ্ধতিটিকে নষ্ট করে দিতে পারে।

৫. এ্যালকোহল সমৃদ্ধ ক্লিনার, তুলা বা নরম সুতি কাপড় দিয়ে খুব সহজেই কম্পিউটারের বাহ্যিক যন্ত্রাংশগুলো পরিষ্কার করা যেতে পারে।

৬. যে সমস্ত শুকনো খাবার গুঁড়া উৎপন্ন করে তা কম্পিউটারের সামনে বসে খাওয়া উচিত নয়।

৭. কম্পিউটারের সামনে বসে ধূমপান করা উচিত নয়। এতে সিগারেটের বা ধূমপান সামগ্রীর ছাই জাতীয় ধুলা ময়লা কম্পিউটারের যন্ত্রাংশে পড়তে পারে।

৮. সিপিইউ এবং মনিটরের বহিরাবরণ খুলে ভেতরের ময়লা পরিষ্কার করতে ব্লোয়ার বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করা উত্তম।

৯. কখনও ফ্লপি ডিস্কের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করা উচিত নয়। এতে হাতে লেগে থাকা ধুলাবালি লেগে যেতে পারে। মাঝে মাঝে মাউসের ট্র্যাকবলটি খুলে এর ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা উচিত।

১০. সার্কিট বোর্ড বা মাদারবোর্ড কোনো অবস্থাতেই ভিজা কাপড় ও তুলা দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত নয়। ধুলাবালি কম্পিউটার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করে থাকে। যেমন :

১. ধুলাবালি বিভিন্ন সার্কিটের উপর তাপ কু-পরিবাহী আস্তরণ তৈরি করার কারণে উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করে।

২. ধুলাবালি জমার কারণে কম্পিউটারের ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশগুলো নির্ধারিত গতিতে ঘুরতে পারে না।

৩. সিগারেটের ছাই জাতীয় ধুলাবালি ডিস্কে সংরক্ষিত ডেটা নষ্ট করে দিতে পারে, এমনকি ডিস্ক ড্রাইভ বিকল করে দিতে পারে।

৪. ধুলাবালি জমে ডিস্ক ড্রাইভের হেড ক্ষয় হয়ে যেতে পারে।

৫. দীর্ঘক্ষণ সরাসরি কম্পিউটারের উপর প্রখর সূর্যকিরণ পড়লে এটি গরম হয়ে যেতে পারে, এমনকি উত্তাপে কোনো কোনো যন্ত্রপাতি বা প্লাস্টিক জাতীয় আবরণ গলে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

৭.২ কম্পিউটারের ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো চিহ্নিতকরণ

কম্পিউটারের ক্ষতিকারক নিয়ামক

কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য নানা ধরনের প্রভাব ও কারণ কাজ করে। এ সকল প্রভাবগুলোর কিছু প্রাকৃতিক, কিছু কৃত্রিম এবং কিছু ব্যবহারকারীর অদক্ষতা, অসাবধানতাজনিত। কম্পিউটারের ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলোকে বৃহত্তর চারটি পরিসরে বিভক্ত করা যায়। যথা–

১. ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামকসমূহ
২. বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকসমূহ
৩. সফটওয়্যারজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকসমূহ এবং
৪. ব্যবহারকারীর বেঠিক (Improper) পরিচালনা (Handling)।

ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামক : যে সকল ক্ষতিকারক নিয়ামকসমূহ বাহ্যিক অবস্থা ও পরিবেশত কারণে কম্পিউটারে ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয় তাদেরকে ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামক বলে। ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো হলো–

১. ধুলাবালি (Dust)
২. ধোঁয়া (Smoke)
৩. অত্যধিক তাপমাত্রা (High Temparature)
৪. অত্যধিক ঠাণ্ডা বা শৈত্য প্রবাহ (Very Low Temparature)
৫. চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Fields)
৬. তরল পদার্থ ও আর্দ্রতা (Liquid & Humidities)
৭. যন্ত্রাংশের ক্ষয়িষ্ণু ধর্ম (Corrosionot Parts)
৮. নয়েজ বা ইন্টারফেরেন্স (Noise or Interference)

বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামক : যে সকল ক্ষতিকারক নিয়ামকসমূহ বিদ্যুৎ এর অনাকাঙ্ক্ষিত তাৎক্ষণিক অবস্থার কারণে সৃষ্টি হয় তাদের বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামক বলে। বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো হলো–

১. সরবরাহকৃত ভোল্টেজ অত্যধিক কম বা বেশি হওয়া
২. হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া

৩. ন্যূনতম সময়ের ব্যবধানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ও চালু হওয়া
৪. পাওয়ার ফ্লাকচুয়েশন (Power Fluctuations)
৫. আর্থিং (Earthing)

সফ্‌টওয়্যারজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামক : ব্যবহৃত সফটওয়্যার এর কারণে কম্পিউটারে যে ক্ষতিসমূহ পরিলক্ষিত হয় তাদের সফটওয়্যারজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামক বলে। সফটওয়্যারজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো হলো—

১. অপারেটিং পদ্ধতি নষ্ট হয়ে যাওয়া
২. ভাইরাসের আক্রমণ
৩. সফ্‌টওয়্যার বা তথ্যভাণ্ডারে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারীর অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিং এবং তথ্য চুরি।

বেঠিক পরিচালনাজনিত নিয়ামক : যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে কম্পিউটার সংস্থাপন, চালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনের কারণে যে ক্ষতি হয় তাকে বেঠিক পরিচালনাজনিত নিয়ামক বলে। বেঠিক পরিচালনাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো হলো—

১. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সঠিক না হওয়া
২. যন্ত্রাংশের প্রতিস্থাপন সঠিক না হওয়া
৩. যথাযথ নিয়মে না চালানো এবং
৪. যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব।

৭.৩ কম্পিউটার এর ক্ষতিকারক নিয়ামক হতে কম্পিউটারকে রক্ষণাবেক্ষণের উপায়

কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। বিভিন্নভাবে এর ক্ষতি হতে পারে। কম্পিউটারের ক্ষতিসাধনকারী নিয়ামক হতে কম্পিউটার রক্ষা করার জন্য নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করা যায় :

১. **ধুলাবালি :** ধুলাবালি দ্বারা কম্পিউটারের অভ্যন্তরে মেমোরি, চিপ, সূক্ষ্ম যান্ত্রিক সংযোগ, ডিস্ক ড্রাইভ ইত্যাদি বেশি আক্রান্ত হয়। কম্পিউটারের সার্কিটে ধুলাবালি জমার ফলে অনেক অপরিবাহী আস্তরণ তৈরি হয়। এজন্য ধুলাবালি পূর্ণ জায়গায় কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

২. **আহার বা অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ :** কম্পিউটার কক্ষে কখনো ধূমপান করা বা মিষ্টি ও তরল জাতীয় কোনো প্রকার খাবার গ্রহণ করা ঠিক নয়। সিগারেটের ধোঁয়া ধুলাবালির সাথে মিশে কম্পিউটারের সংযোগ পিন এবং কানেক্টরে অক্সাইড আবরণ তৈরি করে যা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশের জন্য ক্ষতিকর। মিষ্টি জাতীয় বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের কণা পড়লে পিঁপড়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য পোকা-মাকড়ের উপদ্রব দেখা দেয়। এ ধরনের অনেক পোকামাকড় বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ তারের আবরণ কেটে ফেলতে পারে। তাই কম্পিউটার রুমে আহার, ধূমপান করা এবং মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য রাখা উচিৎ নয়।

৩. **ধাতব পদার্থ :** কম্পিউটার যন্ত্রের কাছাকাছি আলপিন, সেফটিপিন, স্ট্যাপলার পিন ইত্যাদি পদার্থ রাখা ঠিক নয়। কারণ এসব ধাতব পদার্থ অসাবধানতাবশত কমপিউটারের সিপিইউ, কীবোর্ড, হার্ডড্রাইভ ইত্যাদির সূক্ষ্ম সংযোগ স্থলে পড়ে গিয়ে শর্ট সার্কিট হতে পারে।

৪. **বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ :** কম্পিউটারের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। বিদ্যুতের তার কখনোই অসাবধানভাবে বা অকারণে পেঁচানো অবস্থায় রাখা উচিৎ নয়।

৫. **চৌম্বক জাতীয় পদার্থ :** চৌম্বকীয় প্রভাবে কম্পিউটারের ডিস্ক ও ডিস্ক ড্রাইভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই চৌম্বক জাতীয় পদার্থ সবসময় কম্পিউটার থেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

৬. **ভোল্টেজ উঠানামা :** কম্পিউটারে ভোল্টেজ উঠানামা থেকে রক্ষার জন্য অবশ্যই স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে।

৭.৪ ডিস্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের উপায়

ডিস্ক সংরক্ষণ বলতে ডিস্ককে সাবধানে রাখাকে বুঝায়। ডিস্ককে নিরাপদে রাখাকে ডিস্ক সংরক্ষণ বলে।
ডিস্ক সংরক্ষণের নিয়ম বর্ণনা করা হলো :

১. ডিস্ক কখনো বাঁকানো বা ভাঁজ করা যাবে না।
২. ডিস্কের খোলা অংশ কোনো অবস্থাতেই স্পর্শ করা উচিত নয়।
৩. ডিস্ক কখনো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে রাখা যাবে না।
৪. ডিস্কে চাপ দেওয়া যাবে না।
৫. ধুলাবালি, রোদ বা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে।
৬. ডিস্ক সর্বদা উলম্বভাবে রাখতে হবে।
৭. ডিস্কের গায়ে সূক্ষ্ম নিবের কলম দ্বারা লেখা উচিত নয়।
৮. শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার জায়গায় ডিস্ক রাখতে হবে।
৯. প্রতি মাসে একবার ডিস্ক ড্রাইভ পরিষ্কার করা উচিত।
১০. ডিস্ক সর্বদা ডিস্ক বক্সে রাখতে হবে।
১১. কোনোরকম চৌম্বক পদার্থের নিকট ডিস্ক নেওয়া উচিত নয়।

৭.৫ পাওয়ার সাপ্লাই এর ক্ষতিকারক নিয়ামক ও এর প্রতিরোধের উপায়

পাওয়ার সাপ্লাই-এর ক্ষতিকারক নিয়ামক হলো :

১. পাওয়ার সাপ্লাই-এর ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন।
২. পাওয়ার সাপ্লাই-এর ভিতরের কম্পোনেন্টগুলোর মান সঠিক না হওয়া।
৩. ধুলোবালি পাওয়ার সাপ্লাই-এর অভ্যন্তরে ঢুকে বিভিন্ন সংযোগে বাধার সৃষ্টি করে।
৪. অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হলে তা প্লাস্টিকের আবরণকে গলিয়ে ফেলে ক্ষতি করতে পারে।

পাওয়ার সাপ্লাই—এর ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো প্রতিকারের উপায়গুলো হলো :

১. কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই খুব নির্ভরযোগ্য হতে হবে।
২. পাওয়ার সাপ্লাই-এর ডিজাইন ত্রুটিমুক্ত এবং কম্পোনেন্টগুলোর মান সঠিক হতে হবে। তাছাড়া এসি পাওয়ার লাইন অবশ্যই মানসম্পন্ন হতে হবে।

৭.৬ কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যাসমূহ এবং উহার কারণ ও প্রতিকার

কম্পিউটার চালনায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেসব সমস্যা প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে সেগুলোকে প্রাথমিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিচে এ ধরনের কিছু প্রাথমিক সমস্যাসমূহ এবং উহার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সমস্যা–০১ কম্পিউটার এবং মনিটরে পাওয়ার আসে না।

কারণ :

১. পাওয়ার কর্ড (Power supply cable) খারাপ থাকতে পারে।
২. পাওয়ার সাপ্লাই খারাপ।
৩. কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে পাওয়ার কানেকশন ল্যুজ থাকতে পারে।
৪. সকেটের প্লাগের কানেকশনে সমস্যা থাকতে পারে।

সমাধান :

১. মাল্টিমিটার (AVO meter) এর মাধ্যমে পাওয়ার কর্ড এর continuty পরীক্ষা করতে হবে। সমস্যা থাকলে পরিবর্তন করতে হবে।

২. পাওয়ার সাপ্লাই এর ফ্যান ঘুরছে কীনা পরীক্ষা করতে হবে। এর আউটপুট ভোল্ট +5V, –5V, +12V এবং –12V পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

৩. কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে পাওয়ার কানেকশনটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ল্যুজ থাকলে সেটি মজবুত করে লাগিয়ে দিতে হবে।

৪. সকেটের প্লাগের কানেকশনে ত্রুটি পেলে তা ঠিক করে নিতে হবে।

সমস্যা–০২ কম্পিউটারে পাওয়ার আসে না (প্রসেসর এর Cooling Fan ঘুরে না) কিন্তু মনিটরে পাওয়ার আসে (মনিটরের পাওয়ার আলাদা নয় কম্পিউটারের পিছন থেকে নেওয়া হয়েছে অথবা মনিটরের পাওয়ার আলাদা ক্যাবল এর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে)।

কারণ :

১. পাওয়ার সাপ্লাই খারাপ হতে পারে।

২. মাদারবোর্ড খারাপ হতে পারে।

৩. পাওয়ার সুইচ খারাপ হতে পারে।

সমাধান :

১. পাওয়ার সাপ্লাই পরীক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে এর কুলিং ফ্যান ঘুরছে কীনা, প্রয়োজনে এর ফিউজ খুলে পরীক্ষা করতে হবে। সমস্যা পাওয়া গেলে সমাধান করতে হবে।

২. পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক থাকলে মাদারবোর্ড পরীক্ষা করতে হবে। কখনো কখনো মাদারবোর্ডে পাওয়ার কানেকশন ঢিলা থাকলে এমনটি হতে পারে।

৩. ATX পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে এর সুইচিং মাদারবোর্ডের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আবার কখনো পাওয়ার সুইচটিও খারাপ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে Reset সুইচ এর Connector টি Power কানেকটরে লাগিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

সমস্যা–০৩ পাওয়ার লাইন ঠিক আছে কিন্তু কম্পিউটারে পাওয়ার আসে না।

কারণ :

১. পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ফিউজ পুড়ে যেতে পারে।

২. অনেক ক্ষেত্রে Dry-Soldering এর কারণে সার্কিট ভালোভাবে কাজ করে না।

সমাধান :

১. পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ফিউজ পুড়ে গেছে কীনা তা চেক করে দেখা দরকার এবং প্রয়োজন বোধে তা রিপ্লেস করতে হবে।

২. পাওয়ার সাপ্লাইটি খুলে সার্কিটটি বাহ্যিকভাবে খুব ভালো করে দেখা প্রয়োজন যে কোনো পার্টস যেমন– রেজিস্টার, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটর অথবা অন্য কোনো ছোট পার্টস পুড়ে গেছে কীনা। যদি কোনো কিছু পুড়ে থাকে তবে তা ঐ মানের পার্টস অথবা সেটার সমতুল্য কোনো পার্টস দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে।

৩. উপরোক্ত উপায়ে যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে এভোমিটার বা মাল্টিমিটারের এর মাধ্যমে বিভিন্ন সন্দেহজনক পার্টস মেপে দেখতে হবে এবং কোনো পার্টসের সমস্যা পাওয়া গেলে সেটিকে অনুরূপ পার্টস দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৪. অনেক ক্ষেত্রে Dry–Soldering এর কারণে সার্কিট ভালোভাবে কাজ করে না। সেক্ষেত্রে সেটি ভালো ভাবে দেখে আবার সোল্ডারিং করা উচিত।

সমস্যা–০৪ কম্পিউটার বারবার হ্যাং হয়ে যায়।

কারণ :

১. পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পুড়ে গেলে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

২. পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কোনো ইউনিট নষ্ট হয়ে থাকতে পারে।

৩. প্রসেসর বা মাদারবোর্ডের সাথে গ্রাফিক্স কার্ড কম্পাটিবল না হতে পারে।

সমাধান :

১. ভালো কোনো পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে পরীক্ষা করা। সমস্যা পেলে আপনার নষ্ট পাওয়ার সাপ্লাইটি বদলে ফেলা।

২. গ্রাফিক্স কার্ডটি কম্পাটিবল না হলে বায়োস সেটআপে ঢুকে এজিপির ইন্টারফেস এক্স বা ২এক্স থাকলে সেটি পরিবর্তন করে দেখা যেতে পারে।

সমস্যা–০৫ কম্পিউটার শাট ডাউন করলে সেটি রিস্টার্ট হয়।

কারণ : পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সমস্যা থাকতে পারে।

সমাধান : ভালো কোনো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ঠিক হয়ে গেলে নিশ্চিত হওয়া যে বিদ্যমান পাওয়ার সাপ্লাইটি ত্রুটিপূর্ণ। তাই এটি বদলে ফেলতে হবে।

সমস্যা–০৬ Boot Disk Failure মেসেজ দেখায়।

কারণ :

১. IDE ক্যাবল ঢিলাঢালা অবস্থায় থাকতে পারে।

২. হার্ডডিস্ক নষ্ট থাকতে পারে।

সমাধান :

১. IDE ক্যাবল ঢিলা থাকলে সেটি যথাযথভাবে লাগতে হবে। এরপর কম্পিউটার চালু করতে হবে। আশা করা যায় এবার কম্পিউটারটি বুট করবে।

২. হার্ডডিস্কটি নষ্ট কীনা সেটি বের করার জন্য অন্য একটি হার্ডডিস্ক কম্পিউটারে লাগিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

সমস্যা–০৭ বায়োস হার্ডডিস্ক পাচ্ছে না কিংবা অপারেটিং সিস্টেম না পাবার বার্তা দেখাচ্ছে।

কারণ :

১. হার্ডডিস্কে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা আছে সেটি নিশ্চিত থাকলে এই সমস্যা হতে পারে ডেটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবলের যথাযথ সংযোগের অভাবে।

২. বায়োসের CMOS Standard Features এ হার্ডডিস্কটি None করা থাকতে পারে।

৩. CIH জাতীয় ভাইরাসের আক্রমণে বায়োসে হার্ডডিস্ক ডিটেক্ট করতে পারছে না।

সমাধান :

১. হার্ডডিস্কের ডেটা ক্যাবল এবং পাওয়ার ক্যাবল খুলে পুনরায় সঠিকভাবে লাগিয়ে নিতে হবে।

২. বায়োসের CMOS Standard Features এ হার্ডডিস্কটি None করা থাকলে তা পরিবর্তন করে IDE বা Auto নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৩. ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে বুটআপ ডিস্ক দিয়ে কম্পিউটার চালু করে ভাইরাস স্ক্যান করতে হবে।

সমস্যা–০৮ **"This Program has perform an illegal operation and will shutdown" মেসেজ দেখায়।**

কারণ :

১. কম্পিউটারের কোনো ফাইল করাপ্ট হয়ে গেলে এমনটি হতে পারে।

২. ভাইরাসের কারণে হতে পারে।

সমাধান :

১. ফাইল নষ্ট হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামটি আনইন্সটল করে পুনরায় ইন্সটল করে দেখতে হবে।

২. কার্যকরি একটি এন্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে। এন্টিভাইরাসটি সব সময় আপডেট রাখতে হবে।

সমস্যা–০৯ **কম্পিউটার ঘন ঘন রিস্টার্ট হয়ে যায়।**

কারণ :

১. অতিরিক্ত গরমের কারণে অথবা প্রসেসরের কুলিং ফ্যান ঘুরছে না।

২. ডিসপ্লে বা অন্যান্য ব্যবহৃত কোনো কার্ডের হিট সিঙ্ক খুলে গিয়েছে।

৩. অপারেটিং সিস্টেম বা কোনো সফটওয়্যারে সমস্যা থাকলে।

সমাধান :

১. মাদারবোর্ডের সাথে লাগানো প্রসেসরের ফ্যানটি পরীক্ষা করা। দেখতে হবে ঠিকমতো ভালো স্পিডে ঘুরছে কীনা।

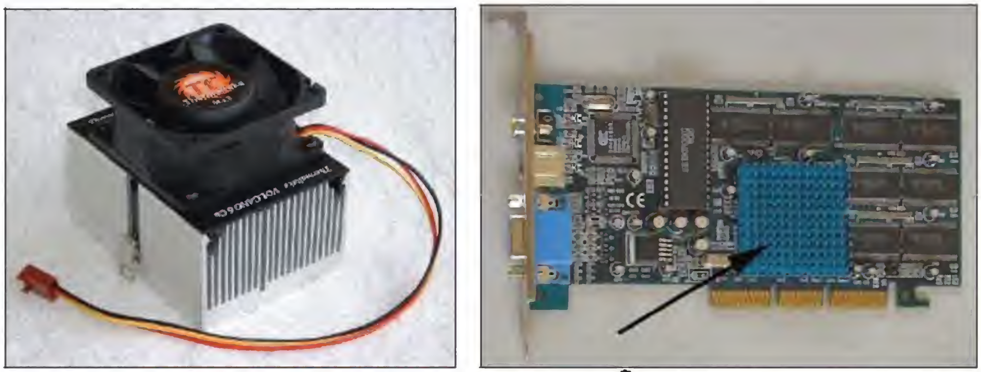

চিত্র : Heat Sink

প্রয়োজনে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট থাকলে ভালো একটি ফ্যান লাগিয়ে নিতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ফ্যানটিও পরীক্ষা করতে হবে।

সমস্যা–১০ **কম্পিউটার চালু করলে বুট না হয়ে Wait মেসেজ দেখায়। এছাড়া বিপ শব্দও করছে না।**

কারণ :

১. মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত ক্যাবলগুলোর সংযোগ ঢিলা থাকতে পারে।

২. মাদারবোর্ডে ত্রুটি থাকতে পারে।

সমাধান :

১. মাদারবোর্ডের সাথে সংযোজিত ক্যাবলগুলোর কানেকশন পরীক্ষা করতে হবে। কোনো ক্যাবল ঢিলা থাকলে সেগুলো যথাযথভাবে লাগিয়ে দিতে হবে।

২. মাদারবোর্ডের ত্রুটি খোঁজার জন্য অন্য একটি মাদারবোর্ড লাগিয়ে দেখা যেতে পারে। সমস্যা পেলে মাদারবোর্ড পরিবর্তন করতে হতে পারে।

সমস্যা–১১ ডিসপ্লে কিংবা বিপ সাউন্ড কোনোটিই আসছে না।

কারণ : কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে নষ্ট হয়ে গেলে এমনটি হতে পারে।
সমাধান : অন্য একটি মাদারবোর্ড লাগিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। বিদ্যমান মাদারবোর্ডটি ত্রুটিপূর্ণ হলে নতুন একটি মাদারবোর্ড কিনে ব্যবহার করতে হতে পারে।

সমস্যা–১২ "CKSUM ERROR (Checksum Error)" মেসেজ দেখায়।

কারণ : বায়োস চিপটি মাদারবোর্ডের সাথে সঠিকভাবে বসানো নেই।
সমাধান : বায়োস বসানোর ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে ঠিকমতো সকেটে বায়োস চিপটি বসিয়ে দিতে হবে।

সমস্যা–১৩ "Illegal Operation"

কারণ : প্রসেসরের স্পিডের সাথে মিল রেখে মাদারবোর্ডের জাম্পার সেটিং ভুল হতে পারে।
সমাধান : সঠিকভাবে জাম্পার সেটিং করতে হবে।

সমস্যা–১৪ ডিসপ্লে আসে না।
কারণ : বায়োস নষ্ট থাকতে পারে।
সমাধান : ভালো একটি বায়োস লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বিদ্যমান বায়োসটিতে সমস্যা পেলে সেটি নতুন একটি বায়োস দ্বারা প্রতিস্থাপন করে নিতে হবে।

সমস্যা–১৫ কোনো একটি প্রোগ্রাম বা ফাইল রান করার সময় Out of Memory মেসেজ প্রদর্শন করে।
কারণ :

১. একসাথে একাধিক ডকুমেন্ট বা প্রোগ্রাম ওপেন করা থাকলে এমনটি হতে পারে।
২. যে ফাইলটি বা প্রোগ্রামটি ওপেন করতে হবে তার ধারণক্ষমতার মতো র‍্যাম কম্পিউটারে নেই।
৩. বিশেষ কোনো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এটি হলে বুঝতে হবে সফটওয়্যারটিতে সমস্যা আছে। হয়তো বা এর কোনো ফাইল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সমাধান :

১. একাধিক ডকুমেন্ট বা প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করা থাকলে এই মুহূর্তে যেগুলোর প্রয়োজন নেই সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।
২. বিশেষ সফটওয়্যারের কারণে সমস্যা হলে সেটি আনইন্সটল করে আবার ইন্সটল করতে হবে।
৩. কম্পিউটারে র‍্যামের পরিমাণ কম হলে তা অবিলম্বে বাড়িয়ে নিতে হবে। তাতে যেকোনো কাজ করতে পারবেন আরও দ্রুতগতিতে।
৪. বিশেষ ক্ষেত্রে কম্পিউটার রিস্টার্ট করে দেখা যেতে পারে।

সমস্যা–১৬ Illegal Operation মেসেজ প্রদর্শন করে।
কারণ : র‍্যামের বাস মিসম্যাচ হলে এ ধরনের মেসেজ দেখায়। যেমন– মাদারবোর্ড হয়তো ১০০ মেগাহার্টজ বাস

স্পিডের র‍্যাম সমর্থন করে অথচ লাগিয়েছেন ১৩৩ মেগাহার্টজ বাস স্পিডের র‍্যাম।
সমাধান : সঠিক বাস স্পিডের র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে।

সমস্যা–১৭ কম্পিউটারের অডিও ড্রাইভার ইন্সটল করা থাকলেও সাউন্ড আসে না।

কারণ :

১. সিস্টেমের পেছনের দিকে সঠিকভবে জ্যাক লাগানো নেই।
২. স্পিকার ও স্পিকারের ক্যাবলে সমস্যা থাকতে পারে।

সমাধান :

১. সিস্টেমের পেছনের দিকের জ্যাকটি সঠিকভাবে লাগানো কীনা পরীক্ষা করতে হবে। না থাকলে সেটি সঠিকভাবে লাগিয়ে দিতে হবে।
২. স্পিকার কিংবা স্পিকারের ক্যাবলে সমস্যা থাকলে সেগুলো পরিবর্তন করে নিতে হবে।

সমস্যা–১৮ হার্ডডিস্ক ড্রাইভ থেকে কোনো ভিডিও ফাইল চালালে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায় কিন্তু অডিও ফাইলের বেলায় ঠিকই চলে।

কারণ :

১. ডিসপ্লে কার্ডে সমস্যা থাকতে পারে।
২. সাউন্ড কার্ড মাদারবোর্ডের সাথে ঠিক ম্যাচ করছে না।

সমাধান :

১. গ্রাফিক্স কার্ডের ড্রাইভার আন-ইন্সটল করে পুনরায় ইন্সটল করে পরীক্ষা করতে হবে। ডিসপ্লে কার্ডটি খুলে এতে ময়লা থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। পুনরায় স্লটে বসিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে ডিসপ্লে কার্ডটি পরিবর্তন করে নিতে হবে।
২. কখনও কখনও সাউন্ড কার্ডের সমস্যার জন্য এমনটি হতে পারে। কোনো নতুন কম্পিউটারে এমন সমস্যা হলে সেটি সাউন্ড কার্ড এবং মেইনবোর্ডের কনফ্লিক্টের কারণেও হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য একটি সাউন্ড কার্ড লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

সমস্যা–১৯ কীবোর্ড কাজ করছে না।

কারণ : কীবোর্ডের ক্যাবলটি যথাযথভাবে সংযুক্ত নেই। অনেক সময় ভুল করে মাউসের পোর্টে কিংবা অন্য কোনো পোর্টে কীবোর্ডের ক্যাবল সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। সেটি হলে কীবোর্ড কাজ করবে না।

সমাধান :

১. কীবোর্ডের ক্যাবলটি সঠিক পোর্টে লাগানো কীনা যাচাই করে দেখতে হবে। ভুল পোর্টে লাগানো থাকলে সেটি খুলে সঠিক পোর্টে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করে দেখতে হবে। আশা করি সেটি কাজ করবে।
২. এরপরও কাজ না করলে ধরে নিতে হবে সেটি নষ্ট। নতুন একটি কীবোর্ড দ্বারা সেটি রিপ্লেস করতে হবে।

সমস্যা–২০ মাউস কাজ করছে না।

কারণ :

১. মাউসের ক্যাবলটি যথাযথভাবে সংযুক্ত নেই। অনেক সময় ভুল করে কীবোর্ডের পোর্টে কিংবা অন্য কোনো পোর্টে মাউসের ক্যাবল সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। সেটি হলে মাউস কাজ করবে না।
২. মাউসটি নষ্ট থাকতে পারে।

সমাধান :

১. মাউসের ক্যাবলটি সঠিক পোর্টে লাগানো কীনা যাচাই করে দেখতে হবে। ভুল পোর্টে লাগানো থাকলে সেটি খুলে সঠিক পোর্টে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করে দেখতে হবে । আশা করি সেটি কাজ করবে।

২. এভাবে সমস্যার সমাধান না হলে মাউসটি যথার্থভাবে ইন্সটল করা হয়েছে কীনা সেটি পরীক্ষা করতে হবে। এটি ঠিকভাবে ইন্সটল করা আছে কীনা তা দেখার জন্য কম্পিউটারের ডেস্কটপে গিয়ে My Computer আইকনের উপর মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। একটি পপআপ মেনু আসবে। সেখান থেকে Manage এ ক্লিক করতে হবে। Computer Management উইন্ডো খুলবে। এই উইন্ডোর বাম দিকের মেনু থেকে Device Manager নির্বাচন করতে হবে। তাহলে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত ডিভাইসগুলোর একটি তালিকা ডানে প্রদর্শিত হবে। সেখানে যদি মাউসের আইকনযুক্ত Mice and other pointing devices নামের একটি লেখা দেখে তবে বুঝে নিতে হবে মাউসটি সঠিকভাবে ইন্সটল হয়েছে।

৩. এরপরও যদি মাউসটি কাজ না করে তবে ধরে নিতে হবে মাউসটি নষ্ট। সুতরাং নতুন একটি মাউস দ্বারা সেটি প্রতিস্থাপন করতে হবে।

সমস্যা–২১ "DISPLAY ADAPTER FAILED; USING ALTERNATE"

কারণ : কোনো কোনো মাদারবোর্ডে (80286, 80386) কালার/মনোক্রোম ডিসপ্লে কার্ডের জন্য জাম্পার সেট করতে হয়। এই ক্ষেত্রে কার্ডের সাথে জাম্পার সেটিং ঠিক নেই।

সমাধান : মাদারবোর্ডের ভিডিও জাম্পার সেটিং চেক করতে হবে। যদি সেটিং ঠিক না থাকে তবে ঠিক করে দিতে হবে।

সমস্যা–২২ "Insert System disk and Press any key to Continue"

কারণ :

১. হার্ডডিস্ক থেকে সিস্টেম (অপারেটিং সিস্টেম) ফাইল মুছে গেছে।

২. হার্ডডিস্কটি নষ্ট থাকতে পারে।

৩. ডেইজি চেইন এবং পাওয়ার কানেকশন ঠিক নাও থাকতে পারে।

সমাধান :

১. Setup Utility থেকে IDE HDD Auto Detection চেপে দেখতে হবে। যদি হার্ডডিস্ক ডিটেক্ট করতে পারে তবে হার্ডডিস্কটি ঠিক আছে বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বুটাবল ডিস্ক থেকে কম্পিউটার বুট করতে হবে এবং ফ্লপি ডিস্ক থেকে হার্ডডিস্ক এ সিস্টেম স্থানান্তর করতে হবে।

২. যদি Setup Utility থেকে IDE HDD Auto Detection চেপে হার্ডডিস্ক ডিটেক্ট করতে না পারে তবে সংযোগগুলো ঠিকমতো আছে কীনা চেক করতে হবে।

৩. তারপরও যদি না চলে তাহলে বুঝতে হবে হার্ডডিস্কটি নষ্ট।

৭.৭ কম্পিউটার ল্যাবের উপযোগী পরিবেশ

কম্পিউটারের সংবেদনশীল যন্ত্রাংশগুলোকে কার্যক্ষম রাখার জন্য এর নিরাপদ ভৌত পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে কম্পিউটারকে যে কক্ষে রাখা হয় সেখানকার ভৌত পরিবেশের উপর নজর দেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে সঠিক ভৌত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১. কম্পিউটারকে এমন কক্ষে স্থাপন করতে হবে যেখানে খুব বেশি গরম বা খুব বেশি ঠাণ্ডা না পড়ে। কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কর্তৃক সৃষ্ট তাপ যাতে সুষমভাবে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্য কম্পিউটার কক্ষের তাপমাত্রা খানিকটা ঠাণ্ডা হওয়া চাই তবে খুব বেশি নয়। সম্ভব হলে এজন্য ল্যাবে এসি লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আর সেটি সম্ভব না হলে তুলনামূলকভাবে যে কক্ষটি একটু ঠাণ্ডা সেখানে কম্পিউটারকে স্থাপন করতে হবে।

২. ধুলাবালি যাতে কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে জমতে না পারে সে রকম একটি স্থানে রাখতে হবে। বিশেষ করে জানালার পাশ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা প্রয়োজন। প্রতিদিন কম্পিউটারের উপরের অংশকে এবং মাঝেমধ্যে সিপিইউ খুলে ভেতরটা ব্লোয়ার দিয়ে পরিষ্কার করলেই ধুলাবালি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিশেষ করে মাদারবোর্ডটিকে ভালো করে ধুলামুক্ত করা প্রয়োজন। নিয়মিত কাজের পর ডাস্ট কভার দিয়ে কম্পিউটারকে ঢেকে দিলে ধুলাবালি থেকে কম্পিউটারকে অনেকাংশে রক্ষা করা যায়।

চিত্র : একটি কম্পিউটার ল্যাব

৩. কম্পিউটারের উপর যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে সেজন্য একে জানালার পাশে রাখা ঠিক নয়। দীর্ঘক্ষণ সূর্যের উত্তাপে কোনো কোনো যন্ত্রাংশ উত্তপ্ত হয়ে গলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. টেলিভিশন, ভিসিপি, ভিসিআর, টেলিফোন ইত্যাদি এবং কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদির মতো চৌম্বকীয় আবেশ সৃষ্টিকারী ব্যবহার্য যন্ত্রাদি কম্পিউটার থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা উচিত। আর মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি থেকে নিরাপদ দূরত্বে ডিস্ক ও ডিস্ক ড্রাইভ রাখা উচিত। টেলিফোন বা যেকোনো তথ্য পরিবহণ ক্যাবল কম্পিউটার থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন।

৫. আরএফআই (RFI) নয়েজের প্রভাব থেকে কম্পিউটারকে মুক্ত রাখার জন্য টেলিভিশন থেকে কম্পিউটারকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখতে হবে এবং ডিরেকশনাল আউটডোর টিভি এন্টেনা ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি টিভি সেটের সাথে লাইন ফিল্টার সংযুক্ত করতে হবে। টুইন-লিড ওয়্যার (Twin-lead wire) এর পরিবর্তে এন্টেনার জন্য ৭৫ ওহমের সমাক্ষিক ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে।

৬. কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই, ফ্যান, সংযোগ ক্যাবল, ফ্লুরেসেন্ট লাইট ইত্যাদি কর্তৃক সৃষ্ট নয়েজকে অর্থাৎ কম্পিউটারের সিস্টেম নয়েজকে কম্পিউটার কক্ষ থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৭. ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশের তুলনায় কম্পিউটার পাওয়ার লাইন সমস্যা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। অতি উচ্চ ভোল্টেজ কিংবা নিম্ন ভোল্টেজের ফলে কম্পিউটারের বর্তনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য কম্পিউটারে নয়েজমুক্ত বিদ্যুতের অবিরাম সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। তাই বিদ্যুতের ওঠা নামা রোধ করতে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে। কম্পিউটারের সাথে ইউপিএস ব্যবহার করলে তা বৈদ্যুতিক ধাক্কা সামলে নিতে পারে এবং বিদ্যুৎ চলে গেলেও কিছু সময়ের জন্য কম্পিউটারকে সচল রাখতে পারে। সরাসরি আইপিএস এর লাইনে কম্পিউটার ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ চলে গেলেও ব্যবহারকারী তা বুঝতে পারেন না। আইপিএস কম্পিউটারে ১ ঘণ্টারও বেশি বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে। তাই সম্ভব হলে দীর্ঘক্ষণ সেবা দেয় এমন ধরনের আইপিএস ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নমালা—৭

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
২. ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামক বলতে কী বোঝায়?
৩. বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামক বলতে কী বোঝায়?
৪. সফটওয়্যারজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামক বলতে কী বোঝায়?
৫. বেঠিক পরিচালনাজনিত নিয়ামক বলতে কী বোঝায়?
৬. কম্পিউটারে ব্যবহৃত ডিস্ক কয় প্রকার ও কী কী?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী?
২. কম্পিউটারের ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলোকে কতভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
৩. ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো কী কী?
৪. বৈদ্যুতিক সমস্যাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো কী কী?
৫. সফটওয়্যারজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো কী কী?
৬. বেঠিক পরিচালনাজনিত ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো কী কী?
৭. ডিস্ক ও ডিস্ক ড্রাইভের ক্ষতিকারক বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. কম্পিউটারের ক্ষতিকারক নিয়ামকগুলো বর্ণনা কর।
২. কম্পিউটারের ভৌত ক্ষতিকারক নিয়ামক হতে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের উপায় বর্ণনা কর।
৩. ডিস্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের উপায় বর্ণনা কর।
৪. পাওয়ার সাপ্লাই এর ক্ষতিকারক নিয়ামক ও এর প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

অধ্যায়–৮

কম্পিউটার সফটওয়্যার ট্রাবলস্যুটিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স

■ **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**

৮.১. কম্পিউটার সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব ।

৮.২. Disk Cleanup, Seandisk ও Defragment কী তা ব্যক্ত করতে পারব ।

৮.৩. প্রোগ্রাম ও ডাটা ব্যাক–আপ তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হব ।

৮.১ কম্পিউটার সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স এর প্রয়োজনীয়তা

সফটওয়্যারের সাহায্যে ত্রুটি নির্ণয় ও সমাধানের প্রক্রিয়াকে সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স বলে । সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স বেশ সহজ । কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ অতিসহজেই অপারেটিং পদ্ধতি বা ইউটিলিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে সফটওয়্যারজনিত মেইনটেন্যান্স করতে পারে ।

সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স এর প্রয়োজনীয়তা

১. সিস্টেমের প্রপার্টিজ প্রদর্শন ও পরিবর্তন ।
২. কম্পিউটারের Performance বৃদ্ধি ।
৩. কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখা ।
৪. ডিস্কের ত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধন এবং জায়গা খালি করা ।
৫. ডাটার ব্যাকআপ তৈরি করা ।
৬. পদ্ধতিকে নিরাপদে রিস্টোর করা ।
৭. বৈদ্যুতিক খরচ নিয়ন্ত্রণ করা ।
৮. সিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন করা ।
৯. কম্পিউটারকে সমপোযোগী করে রাখা ।

সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স টুল্স

সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স টুলস হলো– ব্যাকআপ, ক্যারেকটার ম্যাপ, ডিস্ক ক্লীনআপ, ডিস্ক ড্রিফ্রাগমেন্টেশন, ফাইল এন্ড সেটিং ট্রান্সফার উইজার্ড, সিডিউল টাস্ক, সিকিউরিটি সেন্টার, পদ্ধতি ইনফরমেশন ও পদ্ধতি রিস্টোর । নিচে সচরাচর ব্যবহৃত তিনটি টুলস (ডিস্ক ক্লিনআপ, স্কেনডিস্ক বা চেক ডিস্ক এবং ডিস্ক ড্রিফ্রাগমেন্টেশন) এর বর্ণনা দেওয়া হলো ।

১. **ডিস্ক ক্লিনআপ (Disk Clean up) :** বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটার সিস্টেমে অনেক অপ্রয়োজনীয় ফাইল জমা হয় । যেমন টেম্পরারি ফাইল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা ফাইল, রিসাইকেল বিন-এ জমাকৃত ফাইল । এ সকল অপ্রয়োজনীয় ফাইল পদ্ধতি থেকে মুছে ফেলা হয় ।

২. **স্ক্যান ডিস্ক (Scan Disk) :** সংরক্ষিত ফাইলে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে স্ক্যান ডিস্ক/ চেক ডিস্ক টুল ব্যবহার করে তা সংশোধন করা যায় । অনেক সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের ত্রুটির কারণে কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে । উইন্ডোজ এসপি ও তার পরবর্তী ভার্সনে স্ক্যান ডিস্ক এর পরিবর্তে চেক ডিস্ক টুলটি ব্যবহৃত হয় ।

৩. **ডিস্ক ড্রিফ্রাগমেন্টেশন (Disk Derfragmentation) :** ব্যবহারজনিত কারণে হার্ডডিস্কের ফাইলগুলো বিভিন্ন

জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে একে হার্ডডিস্কের অসজ্জিত অবস্থা বা ডিফ্রাগ বলে। এ অবস্থায় কোনো তথ্য পড়তে অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়ে। এ ক্ষেত্রে ডিস্কের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

৮.২ ডিস্ক ক্লিনআপ (Disk Cleanup), স্ক্যান ডিস্ক (Scandisk), ডিফ্রাগমেন্ট (Defragment)

ডিস্ক ক্লিনআপ (Disk Cleanup)

কাজ করতে গিয়ে কম্পিউটার সিস্টেমে অনেক অপ্রয়োজনীয় ফাইল জমা হয়। যেমন– টেম্পরারি ফাইল, ইন্টারনেট থেকে ডাউন-লোড করা ফাইল, Recycle Bin—এ জমা হওয়া ফাইল। এ সকল ফাইল কম্পিউটার সিস্টেমে জায়গা দখল করে থাকে। Disk Cleanup নামক একটি অপশন ব্যবহার করে এ সকল অপ্রয়োজনীয় ফাইল পদ্ধতি থেকে মুছে ফেলা যায়। Disk Cleanup অপশন ব্যবহার করে নিম্নোক্ত অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে ফেলা যায়।

স্ক্যান ডিস্ক (Scandisk)

ডিস্কে ফাইল, ফোল্ডার বা প্রোগ্রাম সংরক্ষণে কোনো ত্রুটি বা গড়মিল বা বিদ্যুৎ সরবরাহের ত্রুটির কারণে কোনো সমস্যা দেখা দিলে স্ক্যানডিস্ক বা ডিস্ক চেক টুলস দিয়ে তা সংশোধন করা হয়। স্ক্যানডিস্ক হলো উইন্ডোজের একটি ইউটিলিটি টুলস। স্ক্যানডিস্ককে উইন্ডোজ ৭ এ ডিস্ক চেক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ফাইল অ্যালোকেশন টেবিল (File Allocation Table– FAT), ফাইল পদ্ধতি স্ট্রাকচার (File System Structure), ফাইল ট্রি স্ট্রাকচার (File Tree Structure) ও ড্রাইভের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ টুল্‌স ডিস্ক বিশ্লেষণ করে কোনো সমস্যা হলে তা শনাক্ত ও সংশোধন করে। এটা হার্ড ডিস্ক/ফ্লপি ডিস্ক, র‍্যাম, মেমোরি কার্ড ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করতে পারে। এটা বহুল ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় মেইনটেন্যান্স টুলস। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে কোনো সমস্যা হলে স্ক্যান ডিস্কের সাহায্যে ডিস্ক ড্রাইভ স্ক্যান করে ত্রুটি দূর করা হয়। স্ক্যানডিস্ক বা ডিস্ক চেক কম্পিউটারের সুরক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কম্পিউটারের বিভিন্ন ড্রাইভে নানাধরনের সমস্যা দেখা দিলে তা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুবই উপকারী। এর মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারী তার নির্দিষ্ট কোনো হার্ডডিস্ক ভলিউমে সৃষ্ট সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। উইন্ডোজ ৭ এ কম্পিউটারে সংযুক্ত হার্ডডিস্কের যে ড্রাইভের স্ক্যানডিস্ক বা ডিস্ক চেক করা হবে সে ড্রাইভে রাইন বাটনে ক্লিক করে প্রদর্শিত মেনু থেকে Properties এ ক্লিক করে প্রদর্শিত ডায়ালগ বক্সের Tools ট্যাবে এ ক্লিক করে Check now বাটনে ক্লিক করে ড্রাইভ চেক করা হয়। চেকিং শেষে কম্পিউটারটি ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট কোনো হার্ডডিস্ক ভলিউমের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদান করে।

ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন (Disk Defragmentation)

সংরক্ষিত তথ্যসমূহকে ডিস্কে নির্দিষ্ট স্থানে সারিবদ্ধভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াকে Defrag করা বলে। সংরক্ষিত তথ্যগুলো ডিস্কে অগোছালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা হলে একপর্যায়ে কম্পিউটারের চলাচল প্রক্রিয়া ধীর গতির হয়ে পড়ে। ফলে কম্পিউটারে যত ধরনের অতিরিক্ত RAM সংযোজন করা হোক না কেনো এরূপ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে স্থানাভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে সংরক্ষিত তথ্যটির তুলনায় অধিক স্থান প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সাধারণত ডিস্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে খালি স্থান বিভক্ত হয়ে থাকে বিধায় এধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। Defrag কমান্ডের সহায়তায় তথ্যগুলো ডিস্কের এক পার্শ্বে সংরক্ষণ করা হলে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

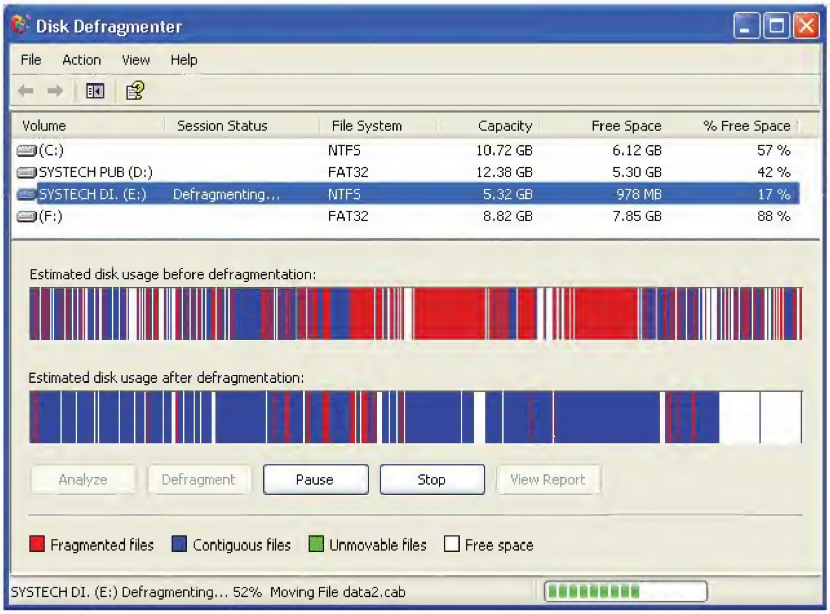

৮.৩ প্রোগ্রাম ও ডাটা ব্যাকআপ তৈরি করার পদ্ধতি

ব্যাকআপ বলতে হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত তথ্যের অনুলিপি তৈরি করাকে বুঝায়। অনেক সময় দুর্ঘটনাবশত হার্ডডিস্কের তথ্যসমূহ মুছে যায় অথবা সংরক্ষিত তথ্য অনাকাঙ্ক্ষিত তথ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় বা অপ্রবেশযোগ্য হয়ে পড়ে। মূলত এসব কারণে প্রোগ্রাম ও ডাটার ব্যাকআপ রাখা প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যাকআপ রাখা হলে হারিয়ে যাওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ডাটার ব্যাকআপ কপি ব্যবহার করে ডাটাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। সাধারণত দুই ধরনের ডাটার ব্যাকআপ প্রয়োজন। যথা—পদ্ধতি প্রোগ্রাম এবং ব্যবহারকারীর ডাটা। প্রোগ্রাম ও ডাটার ব্যাকআপ একই হার্ডডিস্কে কিংবা ভিন্ন কোনো হার্ডডিস্কে করা যায়। ভিন্ন স্টোরেজ মিডিয়া যেমন, সিডি আর ইত্যাদিতে ডাটার ব্যাকআপ করা যায়।

ডাটা ব্যাকআপ এর জন্য স্টোরেজ মিডিয়া ছাড়াও জিপ ড্রাইভ, জ্যাজ ড্রাইভ, এমনও ড্রাইভ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক সকল অপারেটিং সিস্টেমে বিল্ট ইন ব্যাকআপ ইউটিলিটি থাকে। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ ফিচার সমৃদ্ধ কিছু ব্যাকআপ সফটওয়্যার আছ যা ব্যবহার করে অন্য মাধ্যমে ডাটা টান্সফারের পাশাপাশি ফাইলসমূহের সংগঠন, ব্যাকআপ আপডেট ও রিস্টোরের কাজ করা যায়। উন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ৫ ধরনের ব্যাকআপ ব্যবহার করা যায়, যেমন :

১. নরমাল বা ফুল ব্যাকআপ (Normal or Full Backup)

২. ইনক্রিমেন্টাল ব্যাকআপ (Incremental Backup)

৩. ডিফারেন্সিয়াল ব্যাকআপ (Differential Backup)

৪. কপি ব্যাকআপ (Copy Backup)

৫. টাইমফ্রেম ব্যাকআপ (Timeframe Backup)

ব্যাকআপের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত যে কোনো এক বা একাধিক ব্যাকআপ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ব্যাকআপ ও ডাটা রিকভারির জন্য তিন ধরনের টুল ব্যবহৃত হয়। যেমন—

১. Last known good configuration.

২. Emergency repair disk.

৩. Windows Backup.

এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় টুলদ্বয় শুধু পদ্ধতি স্টেট এবং তৃতীয় টুলটি পদ্ধতি স্টেট ও ইউজার ডাটা ব্যাকআপ এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নমালা—৮

■ **অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. কম্পিউটারে সমস্যাগুলোকে কয়টি পরিসরে ভাগ করা যায় ও কী কী?
২. কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি কয় প্রকার ও কী কী?
৩. সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স বলতে কী বুঝায়?
৪. সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স টুলস কী কী?
৫. Disk Clean-up কী?
৬. স্ক্যান ডিস্ক বলতে কী বোঝায়?
৭. ডিফ্রাগমেন্ট কী?
৮. ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন কী?
৯. প্রোগ্রাম ও ডাটা ব্যাকআপ কী?
১০. উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে কয় ধরনের ব্যাকআপ ব্যবহার করা হয় এবং কী কী?
১১. উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ব্যাকআপ ও ডাটা রিকভারি টুলস কী কী?

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্সের কাজগুলো উল্লেখ কর।
২. সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা কী কী?

■ **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স টুলসগুলোর বর্ণনা দাও।
২. প্রোগ্রাম ও ডাটা ব্যাকআপ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায়–৯
কম্পিউটার ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–
- ৯.১. ভাইরাস, মেলওয়্যার ও এন্টিভাইরাস সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
- ৯.২. ভাইরাস ও মেলওয়্যার আক্রামণ হওয়ার কারণ জানতে পারব।
- ৯.৩. ভাইরাস ও মেলওয়্যার আক্রামণ কম্পিউটারের লক্ষণ জানতে পারব।
- ৯.৪. ভাইরাস ও এন্টিভাইরাসের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।
- ৯.৫. ভাইরাস ও মেলওয়্যারের বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারব।

৯.১ ভাইরাস, মেলওয়্যার, এন্টিভাইরাস

ভাইরাস বা কম্পিউটার ভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাস একটি ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম। কম্পিউটার ভাইরাস বাহিরের উৎস থেকে কম্পিউটারের মেমোরিতে প্রবেশ করে মেমোরিতে গোপনে বিস্তার লাভ করে মূল্যবান প্রোগ্রাম, তথ্য নষ্ট করা ছাড়াও অনেক সময় কম্পিউটারকে অচল করে দেয়। সিআইএইচ ভাইরাসের রচয়িতা "চেন ইং হাও"।

ভাইরাসের নামকরণ

কম্পিউটারের পরিভাষায় ভাইরাস (VIRUS) শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ (Vital Information Resources Under Seize)'–অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রখ্যাত গবেষক 'ফ্রেড কোহেন' ভাইরাস নামকরণ করেন।

ভাইরাসের ইতিহাস

১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের দুই প্রোগ্রামার আমজাদ ও বাসিত উপলব্ধি করল ফ্লপি ডিস্কের বুটসেক্টর executable কোড ধারণ করে এবং এ কোড কম্পিউটার চালু করলেই রান করে যদি ড্রাইভে ডিস্ক থাকে। তারা আরও উপলব্ধি করল যে এ কোড তাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম (কোড) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় যা মেমোরি রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম হতে পারে এবং যা নিজের কপি তৈরি করতে সক্ষম। প্রোগ্রাম নিজের অনুলিপি তৈরি অর্থাৎ ভাইরাসের মতো বিস্তার ঘটাতে পারে বলে তারা এর নাম দেয় 'ভাইরাস'। কিন্তু এটি শুধু ৩৬০ কিলোবাইট ফ্লপি ডিস্ককে সংক্রমিত করে। ১৯৮৭ সালে University of Delaware–এ কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। কম্পিউটার শুরু করে ফ্লপি ডিস্কের লেবেল '(c) Brain' লেখা দেখার মাধ্যমে কম্পিউটার ভাইরাসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এটিই প্রথম ভাইরাসের আক্রমণ এবং এটি ড. সলেমন পর্যবেক্ষণ করেন। এ ভাইরাসের উপস্থিতি প্রথম উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা কম্পিউটার মহিলা কর্মী দেখে একে ভাইরাস বলে মনে করেন এবং ডিস্ক থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার কাজে নিমগ্ন ড. সলেমনের শরণাপন্ন হন। ড. সলেমন একে বিশ্লেষণ করেন এবং এভাবে তিনি এন্টিভাইরাস ব্যবসায়ে আসেন। ১৯৮৭ সালে Charlie, Vienna নামক ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা মেশিনকে Hang ও রিবুট করে দেয়। ইতোমধ্যে ইসরালের তেলআবিবে অন্য একজন প্রোগ্রামার Suriv–01 নামে ভাইরাস তৈরি করে। এটি ছিল মেমোরি রেসিডেন্ট ভাইরাস কিন্তু এটি com ফাইলকে আক্রমণ করতো। এভাবে প্রতি বছর নতুন নতুন অনেক ভাইরাস তৈরি হয় এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে। ৯৯ এর ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার সিআইএইচ বা চেরনোবিল নামক ভাইরাসের আক্রমণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। টাইম বোমার ন্যায় নির্দিষ্ট সময়ে এ ভাইরাসটি কম্পিউটারকে আক্রান্ত করে। একই সময়ে সারাবিশ্বে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার এটিই সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের অসংখ্য পিসি ছাড়াও এ ভাইরাস

সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, সেলুলার ফোন কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট হাউসের বহু সংখ্যক কম্পিউটার অচল করে দেয়। ২০০১ ও ২০০২ এ মেলিসা নামক ইন্টারনেট ভাইরাসের আক্রমণে অনেক ওয়েব সার্ভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ই–মেইলের এটাচমেন্ট ফাইলের সাথে আসা এ ফাইলটিও ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

মেলওয়্যার (Malware)

মেলওয়্যার (Malware) একটি ইংরেজি শব্দ যার পূর্ণ শব্দরূপ হলো Malicious Software। সাধারণভাবে মেলওয়্যার বলতে সেই সমস্ত সফটওয়্যারকে বোঝানো হয়, যে সফটওয়্যারগুলো ডিজাইন করা হয় ব্যবহারকারীর অজান্তে কোনো কম্পিউটারে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে উক্ত কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে। যদিও কম্পিউটার ভাইরাসও একই উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়ে থাকে তথাপি মেলওয়্যার এবং কম্পিউটার ভাইরাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মেলওয়্যার সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য কম্পিউটার ভাইরাসের সাথে মেলওয়্যারের পার্থক্য বোঝাটা অত্যন্ত জরুরী।

কম্পিউটার ভাইরাস হলো এমন এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা ধারণা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজে নিজেই কপি হতে পারে এবং এটি কম্পিউটার সিস্টেমে থাকা বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রামকে আক্রান্ত করে থাকে। অপরপক্ষে মেলওয়্যার আরও অনেক বিস্তৃত একটি টার্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার অন্যতম সাধারণ একটি টাইপ হচ্ছে কম্পিউটার ভাইরাস। কম্পিউটার ভাইরাস ছাড়াও মেলওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে রয়েছে স্পাইওয়্যার, অ্যাডওয়্যার, ট্রোজান হর্স, ওয়ার্ম প্রভৃতি। এগুলোর প্রতিটির টাইপ বা প্রকৃতি ভিন্ন হলেও এদের উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেমে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং এর ক্ষতিসাধন করা। এজন্য এগুলোর প্রত্যেকটি মেলওয়্যারের এক একটি টাইপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এমনকি আর্থিক প্রতারণা বা অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়ে ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলোকেও অ্যাডভান্স লেভেলের মেলওয়্যার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেমন : Ransomware।

মেলওয়্যার (Malware) এর উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কৌতুককর কোন কিছু উপস্থাপনের জন্য।
২. পাবলিক সিস্টেমের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৩. অনলাইন বিপণন বাণিজ্য।
৪. বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মেলওয়্যারগুলো তৈরি করা হয় ফোর্স অ্যাডভার্টাইজিং বা জোর পূর্বক বিপণনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন, কোনো কম্পিউটার থেকে ব্যবহারকারীর অজান্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি, ই-মেইল স্প্যাম ছড়ানো, কম্পিউটার সিস্টেমকে জিম্মি করে জোরপূর্বক অর্থ আদায় ইত্যাদি উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে।

এন্টিভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাসের প্রতিষেধক প্রোগ্রামকে এন্টি ভাইরাস বলা হয়। কয়েকটি বহুল প্রচলিত এন্টিভাইরাস হলো ম্যাকএফির ভাইরাস স্ক্যান, নর্টন এন্টি ভাইরাস, আইবিএম এন্টি ভাইরাস, পিসি সিলিন ইত্যাদি।

ভাইরাসের প্রকারভেদ

১. **তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীল ভাইরাস :** এ জাতীয় ভাইরাসের আক্রমণের ফলে কম্পিউটারে তাৎক্ষণিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রমণের পরে পুনরায় কম্পিউটার চালু করা হলে ভাইরাসের লক্ষণ বুঝা যায়। বুট সেক্টর ভাইরাস এরূপ তাৎক্ষণিক অসুবিধার সৃষ্টি করে।

২. **ক্রম ক্রিয়াশীল ভাইরাস :** এ জাতীয় ভাইরাস কম্পিউটারে আক্রমণের পর ধীরে ধীরে কম্পিউটার সিস্টেমে আধিপত্য বিস্তার করে এবং একসময় কম্পিউটারের স্বাভাবিক কাজকে অচল করে দেয়।

৩. **টাইম বম্ব ভাইরাস :** এ জাতীয় ভাইরাস দীর্ঘ সময়ব্যাপী কম্পিউটারে লুকিয়ে থাকে। তারপর কোন নির্দিষ্ট দিনে সজীব হয়ে কম্পিউটারের ক্ষতি সাধন করে। যেমন– জেরুজালেম-বি ভাইরাস। এ ভাইরাস বছরের ১৩ তম শুক্রবারে আক্রমণ চালিয়ে সকল ফাইল নষ্ট করে দেয়। বর্তমান সময়ের আলোচিত ভাইরাস উইন-৩২ সিআইএইচ ভাইরাস প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল কম্পিউটারকে আক্রমণ করে।

জৈবিক ভাইরাস ও কম্পিউটার ভাইরাস এর তুলনামূলক :

জৈবিক ভাইরাস	কম্পিউটার ভাইরাস
১. জৈবিক দেহ ছাড়া ভাইরাস এর প্রকাশ ঘটে না।	১. কম্পিউটার ছাড়া কম্পিউটার ভাইরাসের প্রকাশ পায় না।
২. জৈবিক ভাইরাস প্রথমে পোষকের দেহে প্রবেশ করে, এরপর নিজের বংশ বিস্তারের মাধ্যমে পোষকের দেহে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে পোষকের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।	২. কম্পিউটার ভাইরাস প্রথমে কোনো একটি কম্পিউটারে প্রবেশ করে, অতঃপর কপির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় বিস্তার ঘটিয়ে কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ফলে কম্পিউটারের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।
৩. জৈবিক ভাইরাসে আক্রান্ত কোন জীবের সংস্পর্শে অপর কোন সুস্থ জীব এলে, ঐ ভাইরাস সুস্থ জীবে প্রবেশ করে।	৩. কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো সিস্টেম ভাইরাসবিহীন কোনো সুস্থ কম্পিউটারের সংস্পর্শে এলে এটিও ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়।
৪. জৈবিক ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিষেধক হিসাবে এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হয়। এই এন্টিবায়োটিক পোষকের দেহে অবস্থিত ভাইরাসকে ধ্বংস করে।	৪. কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কম্পিউটারকে ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে হলে এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়।

ভাইরাস কম্পিউটারকে যে ধরনের ক্ষতি করে

১. কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোনো ফাইল মুছে দিতে পারে।
২. ডাটা বিকৃত (Corrupt) করে দিতে পারে।
৩. কম্পিউটারে কাজ করার সময় আচমকা অবাঞ্ছিত বার্তা প্রদর্শন করে।
৪. কম্পিউটার মনিটরের স্ক্রিনে ডিসপ্লেকে বিকৃত (Corrupt) করে দিতে পারে।
৫. একটি সিস্টেমের কাজকে ধীরগতি সম্পন্ন করে দিতে পারে।

কম্পিউটারে ভাইরাস অনুপ্রবেশ বন্ধ করার উপায়সমূহ

১. অন্য কম্পিউটারে ব্যবহৃত সিডি, ডিস্ক ইত্যাদি নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের পূর্বে ঐগুলিকে ভাইরাস মুক্ত করে নেওয়া।

২. অন্য কম্পিউটার থেকে কপিকৃত সফটওয়্যার নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের আগে সফটওয়্যার ভাইরাস মুক্ত করে নেওয়া।

৩. অন্য কম্পিউটারের কোনো ফাইল নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের পূর্বে ফাইলটিকে যে ডিস্ক বা সিডির মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে উক্ত সিডি বা ডিস্ককে ভাইরাস মুক্ত করা।

৪. ইন্টারনেট থেকে কোনো সফটওয়্যার ভাইরাস থাকলে উহা অন্যান্য কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমিত করে।

৫. অন্যান্য কম্পিউটারে ব্যবহৃত সফটওয়্যার কপি করে ব্যবহার না করা।

৬. কম্পিউটারে সর্বদা এন্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার রাখা। যাতে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও যদি কম্পিউটারে ভাইরাস প্রবেশ করে থাকে তাহলে সতর্কতামূলক সাউন্ড শোনাবে কিংবা বার্তা প্রদর্শন করবে। ফলে নিয়ম অনুযায়ী ভাইরাস ক্লিন করা যাবে।

৭. বাজারে প্রচলিত এন্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার লেটেস্ট ভার্সনা সর্বদা ব্যবহার করা। কারণ, পুরাতন ভার্সনের এন্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার অনেক সময়ে আপটুডেট ভাইরাস শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

৮. প্রতিদিনের এন্ট্রিকৃত ডাটাসমূহ বা ফাইলসমূহ আলাদা কোনো ডিস্ক বা সিডিতে ব্যাকআপ রাখা, তবে আলাদা ডিস্ক বা সিডিটা অবশ্যই ভাইরাসমুক্ত কীনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

৯. ই–মেইল আদান–প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা। যেমন : সন্দেহজনক এমন সোর্স থেকে ই–মেইল রিসিভ না করা। অথবা করলেও সাথে সাথে উহাকে ভাইরাস মুক্ত করা।

১০. কম্পিউটারের সেটআপ–এ অটোভাইরাস গার্ড রাখা। যেন কম্পিউটার বুট করলেই কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি ভাইরাস চেক করতে পারে।

১১. গেম ফাইল ব্যবহারে বেশি সতর্ক থাকা। কারণ, গেম ফাইলসমূহ বেশি বেশি কপি হয়ে ব্যবহৃত হয়। গেম ফাইল ব্যবহারের আগে অবশ্যই ভাইরাস চেক করতে হবে।

১২. COM, EXE ইত্যাদি ফাইলসমূহ Read Only করা উত্তম।

১৩. যে সমস্ত ভাইরাস নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কম্পিউটারের ক্ষতি সাধন করে সেই সমস্ত ভাইরাসের ব্যাপারে অতি মাত্রায় সতর্ক থাকা। যেমন : গত ২৬ শে এপ্রিল, ১৯৯৯ এ সংঘটিত ভাইরাস বিস্ফোরণটা ছিল সিআইএইচ ভাইরাসের নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক বিস্ফোরণ। এ ব্যাপারে সতর্কতা সহজে অবগত হওয়ার জন্য দৈনিক পত্রিকাসহ প্রচলিত কম্পিউটার ম্যাগাজিনসমূহ নিয়মিত পড়া দরকার।

৯.২ ভাইরাস ও মেলওয়্যার (Malware) এ আক্রান্ত হবার কারণ

ভাইরাসে আক্রান্ত হবার কারণ

১. অন্য কম্পিউটারে ব্যবহৃত সিডি, ডিস্ক ইত্যাদি নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের মাধ্যমে।

২. অন্য কম্পিউটার থেকে কপিকৃত সফটওয়্যার নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের মাধ্যমে।

৩. অন্য কম্পিউটারের কোনো ফাইল নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের করলে।

৪. পুরাতন ভার্সনের এন্টি-ভাইরাস সফটওয়্যারে মাধ্যমে।

৫. ই–মেইল আদান–প্রদানের মাধ্যমে।

৬. গেম ফাইল ব্যবহারের মাধ্যমে।

মেলওয়্যার (Malware) এ আক্রান্ত হবার কারণ

১. ই-মেইল অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে ইউজারের পিসিতে আসতে পারে যা ডাউনলোড করা মাত্র ইউজারের পিসিতে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটে। এগুলোকে ই-মেইল মেলওয়্যার বা স্প্যাম বলে। সাধারণত ইউজারের পিসিতে কোনো ফেইক কোম্পানির বিভিন্ন লোভনীয় অফার হিসেবে এই মেইল অ্যাটাচমেন্টগুলো পাঠানো হয়।

২. ই-মেইল মেলওয়্যারের মতো ইনস্ট্যান্ট ম্যাসেজিং সিস্টেমের মাধ্যমেও মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটতে পারে।

৩. ফাইল শেয়ারিং প্রোগ্রামের ব্যবহার করে অনলাইনে ফাইল শেয়ার করলে তার দ্বারা মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটতে পারে।

৪. ইন্টারনেটে পাওয়া থার্ড পার্টি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনগুলোর দ্বারা পিসিতে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটতে পারে। বিশেষ করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহারের যে কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৫. পাইরেটেড সফটওয়্যার ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহারের সময় মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটতে পারে। বিশেষ করে পাইরেটেড সফটওয়্যারগুলো হ্যাকার দ্বারা পাইরেটেড ঘটে বিধায় এর সাথে অধিকাংশ সময় মেলওয়্যার সংযুক্ত থাকে যা সহজেই ইন্টারনেট থেকে ইউজারের পিসিতে ঢুকে পড়ে।

৬. রিমুভেবল কোনো মিডিয়া কম্পিউটারে ব্যবহারের সময় তার মাধ্যমে সিস্টেমে মেলওয়্যারের প্রবেশ ও বিস্তার ঘটতে পারে।

৭. ব্রাউজিং এর সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পিসিতে মেলওয়্যারের আক্রমণ ঘটতে পারে।

৯.৩ ভাইরাস ও মেলওয়্যার এ আক্রান্ত হবার লক্ষণ

ভাইরাস আক্রান্ত কম্পিউটারের লক্ষণ

অন্যান্য রোগ বালাইয়ের মত ভাইরাস সংক্রমণেরও নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গ রয়েছে। নিম্নে একটি কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. কম্পিউটার চালু হতে আগের চেয়ে বেশি সময় নেওয়া।

২. EXE এবং COM ফাইলের আকার বেড়ে যায়।

৩. হঠাৎ করে ফাইল উধাও হয়ে যায় অথবা নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৪. ফাইলের কিছু অংশে অবাঞ্ছিত চিহ্ন বা বার্তা দেখা যায়।

৫. পর্দায় অদ্ভুত বা হাস্যকর বার্তা বা চিত্র পরিলক্ষিত হওয়া।

৬. সিস্টেমের সময় ও তারিখ পরিবর্তিত হওয়া।

৭. ডিস্কে বেড সেক্টর বেড়ে যায়।

৮. হার্ডডিস্কের পার্টিশন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সব ডেটা হারিয়ে যায়।

৯. মেমোরির সাইজ কমিয়ে কোন প্রোগ্রাম চালনায় ব্যাহত করা। যেমন– Out of Memory অথবা Insufficient Memory বার্তা প্রদর্শিত হওয়া।

১০. অযৌক্তিভাবে ডিস্কের ফাঁকা স্থান কমে যাওয়া।

১১. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো ত্রুটির সম্মুখীন হওয়া।

১২. কম্পিউটার কার্যক্রম ক্রমশ ধীর হয়ে পড়া।

১৩. কাজের মাঝখানে হঠাৎ কম্পিউটার হ্যাংগ হয়ে যায়, কখনো শাট ডাউন হয়ে যায়।

১৪. অনেক সময় বায়োসের প্রোগ্রাম মুছে ফেলে কম্পিউটারকে অচল করে দেয়।

মেলওয়্যার (Malware) এ আক্রান্ত হবার লক্ষণ

কোনো কম্পিউটারে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটলে সেই কম্পিউটারে মেলওয়্যার আক্রমণের বেশ কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যে কোনো ধরনের মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটুক না কেন কম্পিউটারে তিনটি সাধারণ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় এতে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটেছে কীনা। যেমন :

পিসি এর পারফরমেন্সে বিঘ্ন ঘটা : যে কোনো ধরনের মেলওয়্যার কম্পিউটারে ঢুকলেই তা কম্পিউটারের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলবে। কোন কম্পিউটার লক্ষণীয় ভাবে ধীরগতিতে কাজ করলে বা কম্পিউটার চালু অথবা বন্ধ হতে অস্বাভাবিক সময় নিলে বুঝতে হবে ঐ কম্পিউটারে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটেছে। অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে সিস্টেম ক্র্যাশ করলেও বুঝতে হবে কম্পিউটারে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটেছে।

পিসি এর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ : কম্পিউটারে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটলে কম্পিউটার নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিচিত্র আচরণ করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় না চাইতেই কম্পিউটারে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত টুলবার বা সফটওয়্যার ইনস্টল হয়ে গেছে যা চাইলেও কম্পিউটার থেকে অপসারণ করা যাচ্ছে না। কম্পিউটার অনেক বিচিত্র মেসেজ বা অফার গ্রহণের জন্য পপআপ উইন্ডো প্রদর্শন করছে। পিসি এই ধরনের আচরণ করলে বুঝতে হবে এতে মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটেছে। আবার হোমপেজ, ডেস্কটপ বা কম্পিউটার সেটিং এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হলে সেটিও মেইলওয়্যার আক্রমণের লক্ষণ।

ব্রাউজিং এর সময় পপ-আপ প্রদর্শন : ব্রাউজিং এর সময় বিভিন্ন পপ উইন্ডো বা অফার প্রায়শঃই ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয়। এগুলো সাধারণত অ্যাডওয়্যার। এগুলোকে আপাতঃদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু আছে যারা পিসিতে বিভিন্ন ক্ষতিকর মেইলওয়্যার ইনস্টল করে ফেলে ব্রাউজকারীর অজান্তেই। সুতরাং ব্রাউজিং এর সময় এই সব পপ—আপ অ্যাডগুলো থেকেও মেলওয়্যার আক্রমণ ঘটতে পারে। অনেক সময় এমন কিছু স্পাইওয়্যার থাকে যেগুলো সার্চ ইঞ্জিনের সাথে কাজ করে। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট বা লিংক প্রদর্শিত হলে বুঝতে হবে এগুলো মেলওয়্যর বিস্তারে প্রদর্শিত হচ্ছে।

৯.৪ কম্পিউটার ভাইরাসের ও এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যারের তালিকা

কম্পিউটার ভাইরাসের তালিকা

1. Boot Sector Virus
2. 12. F1 Key Virus
3. Multipurpose Virus
4. Macro Virus
5. Companion Virus
6. Overwriting Virus
7. Partition Virus
8. Trojan Horse Virus
9. Command Purpose Virus
10. Stealth Virus
11. Memory Resident Virus
12. A.I.D.S Virus
13. De–My Valentine
14. BUDDY LST.ZIP
15. FLFBOWL.EXE
16. Perrin.Exe
17. FULFNBX.Exe
18. Irina Virus ইত্যাদি।

এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যারের তালিকা

1. McAfee Antivirus
2. Norton Antivirus (NAV)
3. Dr. Solomon Antivirus
4. IBM Antivirus
5. Norman Antivirus
6. Thunder Byte Antivirus
7. Virusafe Antivirus
8. AVG Antivirus
9. Central Point Antivirus
10. PC Cillin Antivirus
11. Red Alert Antivirus
12. VX2000 Antivirus
13. Vigillant Antivirus
14. F–Macro Antivirus

15. Iris Antivirus
16. Cleancih Antivirus
17. Reg Clean Antivirus
18. Avast Antivirus
19. Avira Antivirus
20. NetQin Antivirus
21. Panda Antivirus
22. Bitdefender Antivirus
23. Kasper sky Antivirus
24. NOD32 Antivirus

৯.৫ ভাইরাস ও মেলওয়্যার বিস্তার ও প্রতিরোধের উপায়

ভাইরাসের বিস্তার ও প্রতিরোধের উপায়

ভাইরাসে আক্রান্ত হলে হয়ত ভাইরাস নিধন করে পিসিটিকে পুনরায় কার্যপযোগী করে তোলা যায় কিন্তু তাতে করে মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট ছাড়াও প্রয়োজনীয় অতি মূল্যবান প্রোগ্রাম বা তথ্য ও হারিয়ে যেতে পারে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "Prevention is always better than cure" অর্থাৎ প্রতিরোধ সব সময় প্রতিকারের চেয়ে উত্তম। তাই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতিকারের চেয়ে আক্রান্ত না হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কম্পিউটার ভাইরাস থেকে পিসিকে সুরক্ষিত রাখা খুব কঠিন কাজ নয়। সাধারণ কিছু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পূর্ব সতর্কতা নিলে ভাইরাস নামক ভয়ানক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিম্নে ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার কয়েকটি উপায় নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. একান্ত প্রয়োজন না হলে বাহিরের কোনো ডিস্ক ব্যবহার না করা। ডিস্কের মাধ্যমেই ভাইরাস সবচেয়ে বেশি ছড়ায়।

২. বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরের ডিস্কেট ব্যবহার করার আগে অবশ্যই আপডেটেড ভাইরাস স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করে নেওয়া।

৩. সব সময় এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারের আপডেটেড ভার্সন ব্যবহার করা।

৪. প্রতিদিন কাজের শেষে প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ রাখা।

৫. অধিকাংশ ভাইরাস সাধারণত .com এবং .exe ফাইলকে আক্রান্ত করে থাকে। তাই সব প্রোগ্রামের com এবং exe ফাইলসমূহকে Read Only করে রাখা।

৬. মাঝে মাঝে এন্টিভাইরাস দিয়ে স্ক্যান করা।

৭. ইন্টারনেট, বিবিএস ব্যবহারে সতর্ক হওয়া। ভাইরাস স্ক্যানিং করে ইন্টারনেট থেকে ফাইল ডাউন-লোড করা।

৮. ই-মেইলের অপরিচিত এটাচমেন্ট ফাইল খোলার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া।

৯. অযথা অপ্রয়োজনীয় ফ্রি সফটওয়্যার কিংবা ডেমো সফটওয়্যার ব্যবহার না করা।

১০. কম্পিউটার স্টার্টআপে ভাইরাস প্রতিরক্ষক গার্ড সক্রিয় রাখা।

১১. পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার না করা।

১২. সম্ভব হলে বছরে অন্তত একবার ব্যবহৃত হার্ডডিস্কটি লো-লেবেল ফরম্যাট করে নতুন করে সব প্রোগ্রাম ইন্সটল করা।

মেলওয়্যার (Malware) এ আক্রামণ হতে প্রতিকার

১. পিসিকে মেলওয়্যার আক্রমণ থেকে রক্ষার প্রধান উপায় হলো কম্পিউটারে সর্বদা আপগ্রেড এন্টিভাইরাস ইনস্টল করা।

২. প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মেলওয়্যার তৈরি হচ্ছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটছে তাই প্রতিটি এন্টিভাইরাস অল্প সময়ের ব্যবধানে এদের নতুন নতুন আপডেট অনলাইনে রিলিজ করে। সবদা এই আপডেটগুলো অনলাইনে চেক করে নিজের এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামকে আপডেট রাখতে হবে।

৩. যে কোনো পাইরেটেড সফটওয়্যার বা ত্রুটিপূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। অজানা বা অচেনা কোনো অথারের সফটওয়্যার ইনস্টলের পূর্বে এর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবে, তা ইন্সটল করা উচিত।

৪. ইন্টারনেটে ব্রাউজিং এর সময় সর্বদা এন্টি-ভাইরাস অন রাখা উচিৎ। ব্রাউজারে পপ-আপ-ব্লকার ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাডওয়্যারের বিস্তার থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫. ইন্টারনেট থেকে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোডের পূর্বে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তা ইনস্টল করতে হবে।

৬. সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো ব্যবহারের সময় বিভিন্ন অফার, ই-মেইল, থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন নিশ্চিত না হয়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপরিউক্ত সতর্কতাগুলো অনুসরণ করলে কম্পিউটারকে মেলওয়্যার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

প্রশ্নমালা—৯

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার ভাইরাস কী?
২. সিআইএইচ ভাইরাসের রচয়িতা কে?
৩. দুইটি ভাইরাসের নাম লেখ।
৪. এন্টিভাইরাস কী?
৫. দুইটি এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামের নাম লেখ।
৬. প্রোগ্রাম ভাইরাস কী?
৭. মেলওয়্যার কী?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জৈবিক ভাইরাস ও কম্পিউটার ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য কী?
২. এন্টিভাইরাসের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাইরাস আক্রান্ত কম্পিউটারের লক্ষণগুলো বর্ণনা কর।
২. ভাইরাসের বিস্তার ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

চতুর্থ অংশ

কম্পিউটার পরিচালনায় রিস্ক অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি

অধ্যায়–১০

কম্পিউটার পরিচালনায় রিস্ক অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১০.১. কম্পিউটার পরিচালনায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
১০.২. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কম্পিউটার ব্যবহারের নিয়মাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
১০.৩. কম্পিউটার পরিচালনায় স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
১০.৪. কম্পিউটার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
১০.৫. সফটওয়্যার পাইরেসি ও উহার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
১০.৬. তথ্য প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে জ্ঞাত হব।

১০.১ কম্পিউটার পরিচালনায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি

প্রত্যহ দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করলে আমাদের শরীরের কিছু অঙ্গের উপর অত্যধিক চাপ এবং কম্পিউটার থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রশ্মি আমাদের বিভিন্ন ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে চোখ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে যে ধরনের যন্ত্রণা অসুবিধার সৃষ্টি হয়, দীর্ঘদিনের গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা তা প্রতিরোধ ও নিরাময়ের পথ খুঁজে বের করেছেন। বিজ্ঞানের যে শাখায় এসব শারীরিক অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় এরগোনমিকস (Ergonomics)। বিভিন্ন পেশার পেশাজীবীদের কর্মজীবনকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্যই বিজ্ঞানের এ শাখার উদ্ভব, বির্বতন ও বিকাশ, দীর্ঘদিন ধরে কম্পিউটার ব্যবহারজনিত শারীরিক অসুবিধাগুলোও আলোচিত হয় Ergonomics এ। একে CIR (Computer Induce Repetitive) বলা হয়। অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ একে CVS (Computer Vision Syndrome) শিরোনামেও আলোচনা করেছেন। কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে চোখের কিছু কিছু সমস্যা বা যন্ত্রণা বোধ হয়। হাত, ঘাড়, মাথা, কাধ এমনকি পায়েও কিছু কিছু ব্যথাবোধ এবং যন্ত্রণাবোধ এবং যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়-এর মধ্যে কোনটি দীর্ঘস্থায়ীও হয়। একটু সতর্ক হলেই এসবের প্রতিকার আমাদের সাধ্যের মধ্যে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চোখের সমস্যা

মনিটরের অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা ও আলোর অপর্যাপ্ত বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হওয়া, স্ক্রিন এবং চোখের মধ্যে দূরত্বের গরমিল এবং অস্বচছ স্ক্রিনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীর চোখে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১. মনিটরের আলো চোখের সাথে সহনশীল করে সেট করতে হবে। সর্বোচ্চ যত দূরে বসে মনিটরের লেখাগুলোকে স্পষ্ট পড়া যায় তত দূরত্বে বসা উত্তম।

২. দীর্ঘক্ষণ একাধারে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতি এক বা দুই ঘণ্টায় ৫–১০ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

৩. সরাসরি উজ্জ্বল আলোর নিচে কম্পিউটার স্থাপন না করে রুমে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে মনিটরের গ্লাসে লাইট রিফ্লেক্ট না হয়।

৪. কিছুক্ষণ পরপর চোখ পিট পিট করলে চোখ ভেজা থাকবে এবং চোখের মাংসপেশী বেশি কর্মক্ষম থাকবে।

৫. সাধারণ লেখালেখির কাজ থেকে মুভিং ছবি (যেমন : গেম, ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদি) বেশি এফেক্ট করে। এক্ষেত্রে টেলিভিশনের মত দূরত্ব বজায় রেখে দর্শন করা উচিত।

৬. ডেস্কটপের ব্যাকগ্রাউন্ড গাঢ় রঙের পছন্দ না করে সহনশীল সাধারণ রঙ নির্বাচন করা উচিত।

৭. মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখে ঝাপটা দিলে চোখের সজীবতা বাড়ে।

৮. মনিটরের অবস্থান চোখের উচ্চতা থেকে ১০ – ১৫ ডিগ্রি নিচে হতে পারে তবে সমান উচ্চতা থাকলে সবচেয়ে ভালো।

হাত, ঘাড় এবং কাঁধের উপর চাপ

কম্পিউটার ব্যবহারকারী বিশেষ করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, কম্পোজিটর এবং প্রোগ্রামারদের প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে কী–বোর্ড ব্যবহার করতে হয়। এতে করে হাত, ঘাড় এবং কাঁধের উপর চাপ পড়ে। একটু সঠিকভাবে ব্যবহার করলে শরীরের উপর চাপ কম পড়বে। মেঝে থেকে কী–বোর্ডকে ২৮ – ৩১ ইঞ্চি উঁচুতে রেখে কী–বোর্ডকে সমতল জায়গায় স্থাপন করতে হবে। হাতকে কোনো কিছুতে না লাগিয়ে কী–বোর্ড ব্যবহার করতে হবে। মেঝেতে পা না রেখে টেবিলের পা–দানীতে অথবা অনুরূপ উঁচুতে পা রাখা উচিত।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম

দীর্ঘদিন কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে আমাদের ঘাড়, কাঁধ, পিঠ, হাত আর কব্জির মাংসপেশিতে ব্যথা হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা এবং কষ্ট প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। এতে করে শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে পেশির উত্তেজনা কমবে এবং ক্লান্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। মাংশপেশিগুলো শক্তিশালী হবে এবং সকল কাজে দক্ষতা বাড়বে। ব্যায়ামগুলো খুবই সহজ। কাজে বসার আগে অথবা মাঝখানে বিরতিতে প্রতিদিনের কাজের রুটিনমাফিক ব্যায়ামগুলো চর্চা করা উচিত।

ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন

যারা দীর্ঘ সময় কম্পিউটারে কাজ করে তাদের ডিপ্রেশন, এলার্জি, চর্মরোগসহ আরও অনেক ধরনের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এগুলোর জন্য মূলত ইলেকট্রো মেগনেটিক রেডিয়েশনকে দায়ী করেছেন। বড় বড় কোম্পানিগুলো রেডিয়েশন মুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। কম্পিউটার কেনার সময় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। কম রেডিয়েশন হয় এমন সব যন্ত্রপাতি কেনা উচিত।

১০.২ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কম্পিউটার ব্যবহারের নিয়মাবলি

চিত্র : কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য আদর্শ শারীরিক অবস্থান

কম্পিউটারে অনেক সময় ধরে কাজ করতে হয় বিধায় এর জন্য ভালো কাজের পরিবেশ দরকার।

- ওয়ার্কএরিয়াটি সুন্দর পরিপাটি হওয়া উচিত। এসি না থাকলে ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- কাজ করার সময় যাতে দেহ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে থাকে সেজন্য ডেস্ক এবং চেয়ার সেভাবে পছন্দ করতে হবে এবং উচ্চতা সেটিং করা উচিত।
- চেয়ারের ব্যাক যদি এডজাস্ট করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে পিঠের জন্য আরামদায়ক অবস্থায় এডজাস্ট করে নিতে হবে।
- পায়ের পাতাকে ফ্লোরের সমতলে করে রাখতে হবে যাতে হাঁটু এবং এলবো সঠিক অবস্থানে (নব্বুই ডিগ্রির মতো অবস্থায়) থাকে।
- হাতকে ডেস্কের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে কব্জিদ্বয় সাপোর্ট পায়।
- স্ক্রিন (এলসিডি প্যানেলকে) এমন অবস্থানে (এ্যাংগেলে) রাখতে হবে যাতে দেখা স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।

১০.৩ কম্পিউটার পরিচালনায় স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা আইন

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইন হলো এমন একটি আইনের কাঠামো যেটি সাধারণ জনগণ এবং কতিপয় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যেমন– পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের লক্ষ্যে যাবতীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। বিশ্বের অধিকাংশ বিচার ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইনের একটি কাঠামো রয়েছে যেটি সাধারণত পরিদর্শকগণ, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও ফৌজদারি আইনের দ্বারা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়।

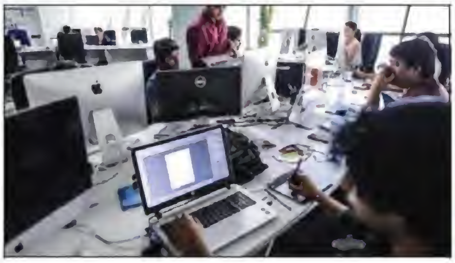

কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশাজীবীদের যথাযথ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং তাদের যাতে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিশ্বের বহু দেশেই এসব স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ছাড়াও আরও বহু দেশে কম্পিউটার পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইনকে যথাযথভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। কম্পিউটার পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো পেশাজীবী যথাযথ কর্মপরিবেশ না পেলে, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এমনকি এসব কারণে শেষ পর্যন্ত কারো মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানি কিংবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটার পরিচালনা করতে গিয়ে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যেমন– স্বাস্থ্যগত সমস্যা, ক্রমাগত অস্বস্তি, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, অসাড়তা, ঘাড়ে সমস্যা, শরীরে জ্বলন অনুভূত হওয়া, মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া, শরীর কাঁপা, দৃষ্টির সমস্যা তৈরি হওয়া ইত্যাদির উদ্ভব ঘটলে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এর সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হয়। এর কারণে কর্মীদের কোনো স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে জেল ও আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে Health & Safety (Display Screen Equipment) Regulations 1992, Management of Health & Safety at Work Regulations 1992, Provision and use of Work Equipment Regulations 1992 এবং Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 এর মতো বেশি কিছু আইন রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে পেশাজীবীদের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মস্থল যথাযথভাবে নকশা করা এবং কম্পিউটারের ব্যবহার দ্বারা কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি যে তৈরি হবে না সেটি নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। চাকরিদাতাকে এই আইন মেনে চলতে হয়। তাকে অবশ্যই চলমান ভিত্তিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে হয়। কর্মীরা যেন তাদের ঝুঁকিগুলোকে শনাক্ত করতে পারে সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিরাপদে কাজ করার অনুশীলন করানো সবই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কর্মীদের ডিসপ্লে স্ক্রিন ইক্যুপমেন্ট যেমন– মনিটর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। নিয়মিত কর্মীদের চোখ পরীক্ষা করানো এবং প্রয়োজন পড়লে তাদের জন্য চশমার ব্যবস্থা করা উচিত। যে সমস্ত কর্মীরা ঘরে বসে ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট দ্বারা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেন তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলোকে আমলে নিয়ে এর প্রতিকারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াও চাকরিদাতার দায়িত্ব। ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে কাজ করার ৫০-৬০ মিনিট পর পর ৫ থেকে ১০ মিনিটের বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

তবে এই আইনগুলোতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়াতে মালিকপক্ষের পাশাপাশি এর ব্যবহারকারীদেরকেও উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে এবং যথাযথ আইন মেনে কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিসপ্লে সংক্রান্ত ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান মালিকের দায়িত্ব হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কম্পিউটার অপারেটরগণ এই আইন মেনে কাজ করছে কীনা তা নিশ্চিত করা। মালিকপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করে তার প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটরদের কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কম্পিউটার অপারেটর কম্পিউটারের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ব্রিফ করা যেন তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।
- যদিও বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইনে কর্তৃপক্ষ ঘোষিত ঝুঁকিগুলো রয়েছে, তথাপি এর বাইরে অনেক অর্ধ ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আইনে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও মালিকপক্ষের বিষয়গুলো নজরে রাখা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইনের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত অডিট পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনের দ্বারস্থ হওয়া।
- প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকল ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।
- কর্মীদের কম্পিউটারের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করতে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং পরিচালনা করা।
- ব্যবহারকারী কোনো বিষয় ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে মনে করে রিপোর্ট দিলে সে সম্পর্কে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে সারা বিশ্বের মানুষ থাকলেও এখনো কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যেই সুনির্দিষ্ট একটি ব্যবহারিক আইনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেখানে কম্পিউটার এবং আধুনিক বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ডিভাইসগুলোর স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো এ বিষয়ে নানা রকম সতর্কতা প্রদান করলেও যুক্তরাজ্য ব্যতীত এখনো পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই কম্পিউটার ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি ডিভাইস ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিকে চিহ্নিত ও প্রতিকারে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তবে বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই অফিস ছাড়াও সাধারণ মানুষের ব্যাপক হারে কম্পিউটার ব্যবহারের কারণে অচিরেই বিভিন্ন দেশ এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করবে আশা করা যায়।

আলো : কাজের স্থান এমনভাবে আলোকিত করতে হবে যাতে কম্পিউটার স্ক্রিন হতে প্রতিফলিত আলো চোখের পীড়ন সৃষ্টি করতে না পারে।

আসবাবপত্র : উচ্চতা সমন্বয় করা যায় এরূপ চেয়ার সরবরাহ করতে হবে এবং ডেস্ক কীবোর্ড হতে সঠিক উচ্চতা এবং দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

হার্ডওয়্যার : স্বাস্থ্যসম্মত হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। যেমন : লো রেডিয়েশন মনিটর ব্যবহার।

সফটওয়্যার : ব্যবহারকারীরা যাতে সহজে ব্যবহার করতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে রকম সফটওয়্যার দিতে হবে।

মাথা : কম্পিউটারে কাজ করার সময় মাথাকে সোজাসুজিভাবে রাখতে হবে। এসময় স্ক্রিন থেকে হাতের দূরত্ব অনুযায়ী মাথা সামনে বা পিছনে নেওয়া যাবেনা।

গলা, ঘাড়, পেছন, কুনুই, কব্জি, হাঁটু রিলাক্সড অবস্থায় রাখতে হবে।

কাজের স্থান নির্ধারণ : কাজের স্থানে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কিত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা আইনে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীর আসন ব্যবস্থা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ যথাযথ নিয়মে রাখা উচিত। ফলে ব্যবহারকারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন এবং অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট রোগ ঝুঁকি কমে যাবে। কম্পিউটার ব্যবহারে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নিম্নলিখিত নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে :

১. কম্পিউটারে স্বাস্থ্যসম্মত আসনবিন্যাসের ফলে চোখের ব্যথা, ঘাড়, পিঠ, কোমর ও কাঁধ ব্যথা, হাত, কুনুই ও কব্জি ব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
২. দীর্ঘদিন ধরে একই আসনে কাজ করার ফলে পেশিতে অবসাদ বা ক্লান্তি আসতে পারে। এজন্য আসন বিন্যাস সঠিক থাকলেও মাঝে মধ্যে মনিটর, কীবোর্ড, চেয়ার ইত্যাদি বিন্যাসের কিছুটা পরিবর্তন আনা উচিত।
৩. কাজের সময় মাঝেমধ্যে দাঁড়ানো কিংবা পিঠ ও বাহু টান টান করে নেওয়া উচিত। এতে কোমর, পিঠ ও শরীরের নিম্নাংশে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হবে এবং দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে সৃষ্ট পেশির টান পড়া বা ব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
৪. কাজ করার সময় অধিকাংশ সময় দৃষ্টি যেদিকে থাকে সেদিকে মাথা দিয়ে সোজা হয়ে বসা উচিত।
৫. ল্যাপটপ ব্যবহারকারীরা যেখানে সেখানে বসে কাজ না করে প্রয়োজন অনুযায়ী ও পরিবেশ উপযোগী করে আসন বিন্যাস ঠিক করে কাজ করা উচিত।
৬. ব্যবহারকারীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে কাজ করতে পারে এমন চেয়ার ব্যবহার করা উচিত।

১০.৪ কম্পিউটার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ

সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime)

সাইবার জগতে অত্যাধুনিক এবং সম্ভবত সবচেয়ে জটিল একটি সমস্যা হলো সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ। বিভিন্ন আইন ও অপরাধ সংক্রান্ত বইপত্রে সাইবার ক্রাইমকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ ধরনের কয়েকটি সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ।

"যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে সাধারণভাবে সেগুলোই সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম হিসেবে পরিগণিত হবে।"

"কোন অপরাধমূলক কাজ যেখানে কম্পিউটারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় কিংবা অপরাধের জন্য কম্পিউটারকে টার্গেট করা হয় অথবা কম্পিউটারের দ্বারা অপরাধ করার পরবর্তীতে তার সাপেক্ষে অন্য কোনো অপরাধ করা হয়, এ সকল অপরাধই সাইবার ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

কম্পিউটার সাধারণত যে সমস্ত অপরাধমূলক কার্যে টুল বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, সেগুলো হলো,

- ফাইনান্সিয়াল ক্রাইম বা অর্থনৈতিক অপরাধ
- বেআইনী আর্টিকেলসমূহ বিক্রয়
- পর্নগ্রাফি
- অনলাইন জুয়া
- ইন্ট্যালেকচুয়াল প্রপার্টি বা মেধাবৃত্তিক সম্পদ সংক্রান্ত অপরাধ
- ই-মেইলের মাধ্যমে জুয়াচুরি
- সাইবারের মাধ্যমে কারো মানহানি বা কাউকে অপবাদ দেওয়া
- সাইবার স্টকিং তথা সাইবারে অপরাধের জন্য গোপন কোন কার্যক্রম চালানো প্রভৃতি।

সাইবার অপরাধের কারণ (Causes of cyber crime)

হার্ট তার "The Concept of Law" গ্রন্থে বলেছেন 'মানব জাতি সর্বদাই অরক্ষিত, সুতরাং তাদের প্রতিরক্ষার জন্যই আইনের শাসন প্রয়োজন।' এ একই কথা সাইবার স্পেসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা যায় কম্পিউটার হলো অরক্ষিত সুতরাং একে সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই আইনী সুরক্ষা প্রয়োজন। যে সমস্ত কারণে কম্পিউটার অরক্ষিত হতে পারে সেগুলো হলো–

১. তুলনামূলক স্বল্প স্পেসে ডেটা সংরক্ষণ

কম্পিউটারের একটি ইউনিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি খুব স্বল্প স্থানে ডেটা সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এর ফলে যে কেউ খুব সহজেই কোনো ফিজিক্যাল বা ভার্চুয়াল মিডিয়াম দ্বারা কোনো তথ্যকে সরায়ে নিতে সক্ষম হয়।

২. সহজে এক্সেস করার সুবিধা

বিভিন্ন গোপন ও জটিল টেকনিক্যাল এপ্লিকেশন ব্যবহার করে কম্পিউটারে অবাঞ্ছিত এক্সেস করা যায়। যেমন– লজিক বম্ব বা Key Logger ধরনের গোপন প্রয়োগক্ষম প্রোগ্রামসমূহ কম্পিউটার সিস্টেমের এক্সেস কোড সহজেই চুরি করতে পারে। এছাড়া এ্যাডভান্স ভয়েস রেকর্ডার কিংবা রেটিনা ইমেজ প্রভৃতি বায়োমেট্রিক সিস্টেমকে বোকা বানানো এবং ফায়ারওয়াল সিস্টেম করা কাজটি সহজেই করতে সক্ষম যা ব্যবহার করে যে কোনো সিকিউরিটি সিস্টেমকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

৩. অপারেটিং সিস্টেমের দুর্বলতা

কম্পিউটারসমূহ অপারেটিং সিস্টেমের ভিত্তিতে কাজ করে এবং এ অপারেটিং সিস্টেমটির কেনো না কোনো পর্যায়ে ছোট খাটো ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়। সাইবার ক্রিমিন্যালগণ এ বিচ্যুতির স্থানগুলো দিয়েই কম্পিউটার সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে আক্রমণ রচনা করে।

৪. অমনোযোগ বা অসতর্কতা

মানুষের কার্যক্রমের সাথে খুবই স্বাভাবিকভাবে অমনোযোগিতার একটি সম্পর্ক রয়েছে যা যে কোনো সময়ই মানুষের আচরণে দেখা যেতে পারে। সুতরাং কম্পিউটার সিস্টেমকে রক্ষা করার কার্যক্রম চালানোর সময় স্বাভাবিকভাবেই যদি অমনোযোগিতার কারণ ঘটে তবে সে অমনোযোগিতার ফলে সাইবার ক্রিমিনালগণ কম্পিউটার সিস্টেমে এক্সেস করার বা এর কন্ট্রোল নিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে যায়।

৫. স্বাক্ষ্য–প্রমাণের অভাব

সাইবার ক্রাইমের পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া খুব স্বাভাবিক এবং আবশ্যিক একটি ব্যাপার কেননা কম্পিউটার সিস্টেমে সমস্ত ডেটাও রুটিন করে ধ্বংস হয়ে থাকে। ভিন্ন কোনো স্থান থেকে ঐ সমস্ত ডেটা সংগ্রহ করতে গিয়ে পুরো অপরাধ তদন্ত প্রক্রিয়াটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সাইবার ক্রিমিনালগণ (Cyber criminals)

সাইবার ক্রিমিনাল বিভিন্ন গ্রুপ বা ক্যাটাগরির হয়ে থাকে। এ গ্রুপ বা ক্যাটাগরি নির্ধারিত হয় সাইবার ক্রিমিনালগণের অপরাধপ্রবণতার উপর ভিত্তি করে। নিচে সাইবার ক্রিমিনালদের এ ক্যাটাগরিগুলো বর্ণিত হলো :

- ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যকার শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক
- সুসংঘটিত হ্যাকারগণ
- প্রফেশনাল হ্যাকার/ক্র্যাকার
- অসন্তুষ্ট কর্মী বা চাকরিজীবী

বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ (Different cyber crimes)

বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ হয়ে থাকে। নিচে অতি সংক্ষিপ্তভাবে অপরাধসমূহের তালিকা দেওয়া হলো :

১. কম্পিউটার সিস্টেম অথবা নেটওয়ার্কে অযাচিত প্রবেশ করা
২. ইলেকট্রনিক ফর্মে থাকা তথ্য চুরি করা
৩. ই-মেইল বম্বিং
৪. বিশাল ই-মেইল পাঠানোর মাধ্যমে সিস্টেম ক্র্যাশ করা
৫. Data didling (কম্পিউটার প্রসেসিং এর পূর্বে কোন ডেটাকে কম্পিউটার থেকে সরিয়ে ফেলা এবং প্রসেসিং সম্পন্ন হবার পর পুনরায় সে ডেটাকে কম্পিউটারে স্থাপন করা।)
৬. Salami Attack (অবৈধ আর্থিক বিনিময় কিংবা আর্থিক ক্ষতি সাধন।)
৭. Denial of Service Attack (বেশি পরিমাণে রিকোয়েস্ট পাঠায়ে সিস্টেম ক্র্যাশ করা)
৮. ভাইরাস/ওয়ার্ম আক্রমণ
৯. লজিক বম্ব (ইভেন্ট নির্ভর প্রোগ্রামের মাধ্যমে সিস্টেমে এ্যাটাক করা)
১০. ট্রোজান এ্যাটাক (পরোক্ষভাবে কারো সিস্টেমে প্রবেশ করে সিস্টেমের কন্ট্রোল গ্রহণ করা)
১১. ইন্টারনেটের ব্যবহার্য সময় বা ইউনিট চুরি।
১২. ওয়েব সাইট হ্যাক করে তথ্য পরিবর্তন করা।

সাইবার অপরাধের শ্রেণিবিভাগ

সাইবার অপরাধ বিষয়টি বৃহত্তর অর্থে নিম্নোক্ত তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হতে পারে। যথা :

- ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে
  - বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ
  - ব্যক্তির সম্পত্তি
- প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে
  - সরকার
  - ফার্ম, কোম্পানি বা ব্যক্তিবর্গের গ্রুপ
- বৃহত্তর অর্থে সমাজের বিরুদ্ধে

উপরে বর্ণিত গ্রুপসমূহের বিরুদ্ধে যে পৃথক পৃথক অপরাধগুলো হতে পারে সেগুলো নিচে উল্লিখিত হলো,

ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে

- ই-মেইলের মাধ্যমে হয়রানি
- সাইবার স্টকিং বা সাইবারের দ্বারা গোপনে কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

- অশ্লীল কিছুর প্রচার ও প্রকাশ
- অপবাদ দেওয়া বা মানহানি করা
- কম্পিউটার সিস্টেমে অবাঞ্ছিত প্রবেশ ও অবৈধ নিয়ন্ত্রণ
- ই-মেইলের মাধ্যমে জুয়াচুরি
- চিটিং এবং প্রতারণা করা

ব্যক্তিগত সম্পদের বিরুদ্ধে

- কম্পিউটারের ক্ষতি সাধন
- ভাইরাস ছড়ানো
- Netrespass
- কম্পিউটার সিস্টেমে অবাঞ্ছিত প্রবেশ/নিয়ন্ত্রণ
- মেধাবৃত্তিক সম্পদ সংক্রান্ত অপরাধ
- ইন্টারনেটের সময় বা ইউনিট চুরি

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে

- কম্পিউটার সিস্টেমে অবাঞ্ছিত প্রবেশ/নিয়ন্ত্রণ
- নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত তথ্য অধিকার বা চুরি
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাইবার সন্ত্রাস সংঘটন
- পাইরেটকৃত সফটওয়্যার বিক্রয় বা বিতরণ

বৃহৎ সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ

- পর্ণোগ্রাফি (বিশেষত শিশু পর্ণোগ্রাফি)
- অশ্লীল ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বিষয় প্রদর্শনের দ্বারা যুব সমাজকে দূষিতকরণ
- গোপনীয় বা অবৈধ তথ্য পাচার
- অর্থনৈতিক অপরাধ
- অবৈধ আর্টিকেল বিক্রয়
- অনলাইন জুয়া

সাইবার অপরাধ নিবারণে করণীয় (Actions to prevent cyber crime)

অপরাধ ঘটে যাবার পর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার চেয়ে অপরাধ যাতে না ঘটে সে ধরনের নিবারণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সর্বদাই উত্তম। অনলাইন ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োজ্য। সাইবার ক্রাইমের শিকার যেন না হতে হয় সে জন্য কিছুটা সচেতণতা এবং কিছু নিবারণমূলক ব্যবস্থা সর্বদা অনুসরণ করলে সহজেই সাইবার ক্রাইমের হাত থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। এ ধরনের কিছু নিবারণমূলক ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. নিজের একান্ত গোপন তথ্য অপরের নিকট উপস্থাপনা থেকে বিরত থাকা উচিত।
২. অনলাইনে সর্বদা নিজের বা পরিচিতজনের কোনো ফটোগ্রাফি অচেনা কিংবা কোনো চ্যাটের বন্ধুর নিকট পাঠানো উচিত নয়। কেননা ঐ ধরনের ফটোগ্রাফি কোনো খারাপ কাজে ব্যবহার হতে পারে।
৩. ভাইরাস এ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সর্বদা নতুন এবং আপগ্রেড অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার করতে হবে।
৪. গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সর্বদা ব্যাকআপ রাখা উচিত যেন ভাইরাস এ্যাটাকের ফলে ঐ ডেটা চিরকালের মতো হারিয়ে না যায়।
৫. আর্থিকভাবে ঝুঁকিমুক্ত থাকতে কখনোই কোনো অনিরাপদ ওয়েবসাইটে ক্রেডিট কার্ডের নম্বর প্রদান করা উচিত নয়।
৬. শিশুরা যেন ইন্টারনেটে ব্রাউজিং এর সময় কোনো অযাচিত সাইটে এক্সেস না করে সেজন্য তার ব্রাউজিং এর দিকে সর্বদা নজর রাখা উচিত।

৭. ব্রাউজিং এর সময় অবশ্যই কোনো সিকিউরিটি প্রোগ্রাম করা উচিত যেগুলো ঝুঁকিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ক্ষতিকর ঝুঁকিগুলো ফেরত পাঠাবে।

৮. ওয়েব সাইটের অধিকারীগণের সর্বদা এর ট্র্যাফিক এবং এতে কোনো অনিয়মিত কিছু ঘটছে কীনা তা পরীক্ষা করা।

৯. ফায়ারওয়াল ব্যবহার করা।

১০.৫ সফটওয়্যার পাইরেসি ও উহার প্রতিরোধের উপায়

সফটওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy)

সফটওয়্যার পাইরেসি বলতে প্রস্তুতকারীর বিনা অনুমতিতে কোনো সফটওয়্যার কপি করা, বিতরণ করা, আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে বুঝায়। অন্যের জিনিস চুরি করার মতো সফটওয়্যার পাইরেসি করাও একটি অপরাধ। সফটওয়্যার পাইরেসির কারণে সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাইরেসি প্রতিরোধে কতিপয় করণীয় ঃ

১. পাইরেসি প্রতিরোধে সর্বপ্রথম কাজ হলো দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলা।

২. যখন কোনো সফটওয়্যার ইন্সটল করা দরকার, ধৈর্যের সাথে "টার্মস এন্ড কন্ডিশন" ভালোভাবে পড়তে হবে। শুধু পড়লেই হবে না, কর্মে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এটি কপিরাইট লঙ্ঘন করলে সেটি ব্যবহার করা হতে বিরত থাকতে হবে।

৩. পাইরেটেড সফটওয়্যার কিনে পয়সা বাঁচাতে হবে- এমন মন-মানসিকতার কারণে পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। এই মানসিকতার অবসান ঘটাতে হবে।

৪. সফটওয়্যার কেনার টাকা না থাকলে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সফটওয়্যার নির্মাতার অনুমতি নিয়ে সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এর ব্যবহার অবৈধ হবে না।

৫. যেহেতু এখনও অনলাইনে লাইসেন্স কেনার পর্যাপ্ত সুযোগ দেশে নাই, তাই পাইরেসি থেকে রক্ষা পাওয়ার কার্যকরী হাতিয়ার ফ্রিওয়্যার, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার এবং সকল প্রকার ফ্রি সফটওয়্যার ব্যবহার করা। পাইরেসি থেকে বাঁচতে আমাদের পেইড সফটওয়্যার এর পরিবর্তে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার ও এতে অভ্যস্ত হতে হবে।

৬. অফিসগুলোতে বাণিজ্যিক সফটওয়্যারসমূহ কিনে ব্যবহার করার প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে। অফিসগুলো নিজেরাই এই কাজটি করতে পারেন।

৭. পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারের কারণে ব্যবহারকারীর কম্পিউটার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কাজেই অফিসের কর্মীদের মধ্যে এর অরিজিনাল সফটওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্বকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৮. পাইরেসি প্রতিরোধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এর কুফল, আইনের ধারা ও শাস্তির বিধান সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

৯. বর্তমানে ইন্টারনেট প্রযুক্তি পাইরেসির প্রধানতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। কাজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে কপিরাইট লঙ্ঘনের যে সমস্ত উপায় রয়েছে সেগুলোর উপর নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন। প্রয়োজনে লঙ্ঘনকারী সাইটগুলোকে ব্লক বা বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

১০. শক্তভাবে আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে পাইরেসি প্রতিরোধ করা সম্ভব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেজন্য পুলিশ-র‍্যাবসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন যাতে করে তারা পাইরেটেড পণ্য বিক্রেতাদের আইনের আওতায় আনতে পারে।

যারা পাইরেটেড পণ্য ক্রয় করে এবং যারা বিক্রয় করে- তাদের এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকারকে আরও বেশি এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে। পাইরেটেড সফটওয়্যার বিকিকিনির ফলে যারা কষ্ট করে সফটওয়্যার তৈরি করে, তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। দেশের তরুণ সমাজ প্রয়োজনীয় অনেক সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। পাইরেসির কারণে কোনোভাবেই এ অগ্রযাত্রায় বাধা পড়তে দেওয়া যাবে না।

১০.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে ধারণা

দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিমনা একটি সমাজ গড়ে উঠেছে। এই সমাজের সকলেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে তাদের দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে ব্যবহার করছেন। ফলে যথাযথ ও সঠিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহারের জন্য জাতীয়ভাবে একটি আইনী কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা থেকে সরকার ২০০৬ সালে সর্বপ্রথম "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬" পাস করে। এর পর দুই দফায় ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে এই আইনগুলোকে সংশোধন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং এগুলোর ব্যতয় ঘটলে বা আইন লঙ্ঘন করলে কী ধরনের শাস্তি হবে তা এসব আইনের বিধানে পরিষ্কার করা হয়েছে। এই আইনে অপরাধ, তদন্ত, বিচার ও দণ্ড ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এখানে অপরাধ ও তার জন্য কী ধরনের দণ্ডের বিধান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে খানিকটা ধারণা প্রদান করা হলো।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের সর্বশেষ সংশোধনীতে (২০১৩ সালে) সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ সম্পর্কে ধারা-৫৪ তে বলা হয়েছে ঃ

(১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মালিক বা জিম্মাদারের অনুমতি ব্যতিরেকে-

(ক) উহার ফাইলে রক্ষিত তথ্য বিনষ্ট করবার বা ফাইল হতে তথ্য উদ্ধার বা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে উক্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন;

(খ) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হতে কোন উপাত্ত, উপাত্ত-ভাণ্ডার বা তথ্য বা উহার উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহ করেন বা স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (removable storage medium) বা উপাত্তসহ উক্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোন উপাত্তের অনুলিপি বা অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেন;

(গ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে উদ্দেশ্য মূলকভাবে কোনো ধরনের কম্পিউটার সংক্রামক বা দূষক বা কম্পিউটার ভাইরাস প্রবেশ করান বা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন;

(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, উপাত্ত, কম্পিউটারের উপাত্ত-ভাণ্ডারের ক্ষতিসাধন করেন বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন বা উক্ত কম্পিউটার, সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে রক্ষিত অন্য কোনো প্রোগ্রামের ক্ষতি সাধন করেন বা করবার চেষ্টা করেন;

(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন বা করবার চেষ্টা করেন;

(চ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কোনো বৈধ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো উপায়ে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করেন বা করবার চেষ্টা করেন;

(ছ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কোন ব্যক্তিকে অবৈধ প্রবেশে সহায়তা প্রদান করেন;

(জ) ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত, কোন পণ্য বা সেবা বিপণনের উদ্দেশ্যে, স্পাম উৎপাদন বা বাজারজাত করেন বা করবার চেষ্টা করেন বা অযাচিত ইলেক্ট্রনিক মেইল প্রেরণ করেন;

(ঝ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোনো ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বাবদ ধার্য চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করেন বা করবার চেষ্টা করেন; তাহা হলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করলে তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যূন সাত বছর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা-৫৫ তে বলা হয়েছে ঃ

(১) কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটার সোর্স কোড, গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন, বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করবার চেষ্টা করেন এবং উক্ত সোর্স কোডটি যদি আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা সংরক্ষণযোগ্য বা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হয়, তাহা হলে তাহার এই কাজ হবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করলে তিনি অনধিক তিন বছর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।

ধারা-৫৬ তে বলা হয়েছে ঃ

(১) কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে মর্মে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও এমন কোনো কার্য করেন যার ফলে কোনো কম্পিউটার রিসোর্সের কোনো তথ্য বিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনোভাবে উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে;

(খ) এমন কোনো কম্পিউটার, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে ইহার ক্ষতিসাধন করেন, যাতে তিনি মালিক বা দখলকার নহেন; তাহা হলে তার এই কার্য হবে একটি হ্যাকিং অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন হ্যাকিং অপরাধ করলে তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এছাড়াও অন্যান্য ধারায় বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫ সম্পর্কে ধারণা

বর্তমানে সময়ে ইন্টারনেট বিহীন বিশ্বের কথা ভাবাই যায় না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে এটি বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। সামাজিক নেটওয়ার্কসমূহের প্রচলন ও ব্যাপক প্রসার, অনলাইন ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেন, রাষ্ট্রীয় ও জোটগত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য, সামরিক গোপনীয় তথ্য, বাণিজ্য ও বিপণন এর ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। সেই সাথে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার হারও বেড়ে গেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেসব অপরাধ সংগঠিত হয় তাকেই সাইবার ক্রাইম বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধ বলা হয়। উন্নত বিশ্বে সাইবার অপরাধকে অপরাধের তালিকায় শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে সাইবার অপরাধীদের জন্য নতুন নতুন আইন। বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে বিধায় এর প্রতিকারে ২০১৫ সালে **'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫'** নামে একটি আইন পাস করা হয়। এই আইনে কোন কাজগুলোকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং সেগুলোর জন্য কী ধরনের শাস্তি দেওয়া যাবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে অপরাধ

ধারা-৯। কোনো ব্যক্তি তথ্য পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করলে তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।

কম্পিউটার সংক্রান্ত জালিয়াতি ও প্রতারণা

ধারা-১০ ও ১১। (১) কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে, কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপর কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো তথ্য পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা নতুন কোনো তথ্যের সংযুক্তি বা বিকৃতির ঘটানোর মাধ্যমে তাহার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির আর্থিক সুবিধা পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হলে তার এই কাজ হবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণার অভিপ্রায়ে প্রেরকের বরাবরে এমন কোনো ইলেকট্রনিক মেসেজ প্রেরণ করেন যাহা বস্তুগতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করায় অপর কোনো ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি সংগঠিত করে, তাহা হলে তার এই কাজ হবে একটি অপরাধ।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোনো অপরাধ করলে তিনি অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পরিচয় প্রতারণা এবং ছদ্মবেশ ধারণ

ধারা-১২। (১) কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে-

ক) প্রতারণা করা বা ঠকানোর উদ্দেশ্যে অপর কোনো ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করে বা অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোনো তথ্য নিজের বলে দেখায়; বা

খ) উদ্দেশ্যমূলক জালিয়াতির মাধ্যমে কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা নিজের বলে এই উদ্দেশ্যে ধারণ করে যে- ১) তাহার নিজের বা অপর কোনো ব্যক্তির সুবিধা লাভ করা বা করানো; ২) কোনো সম্পত্তি বা কোনো সম্পত্তির স্বার্থ প্রাপ্তি; ৩) অপর কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্বার রূপ ধারণ করে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষতি সাধন করা; তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ করলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পর্নোগ্রাফি, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ

ধারা-১৫। (১) কোনো ব্যক্তি- (ক) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল উপাদান প্রকাশ করলে; বা (খ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল উপাদান উৎপাদন করলে; বা (গ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটারের স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (removable storage medium) পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করলে; বা (ঘ) এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরণ বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা (ঙ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করলে;

(২) কোনো ব্যক্তি- (ক) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফি বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান প্রকাশ করলে; বা (খ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে শিশু পর্নোগ্রাফি বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান উৎপাদন করলে; বা (গ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটারের স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (removable storage medium) শিশু পর্নোগ্রাফি বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করলে; বা (ঘ) এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে বা প্রকাশ করবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক শিশু পর্নোগ্রাফি বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরণ বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা (ঙ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফি বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করলে; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি বা শিশু পর্নোগ্রাফি সংঘটনের অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এছাড়াও অন্যান্য ধারায় বিভিন্ন সাইবার অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫ তে বিস্তারিতভাবে আরও বহু বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকলেও এখানে শুধু অপরাধ ও তার জন্য দণ্ডের বিধানগুলো নিয়েই আলোচনা করা হলো।

অনুশীলনী—৮

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. এরগোনমিকস কী?
২. সাইবার ক্রাইম কী?
৩. সাইবার অপরাধের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার ব্যবহারে চোখের কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?
২. কম্পিউটার ব্যবহারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ হতে প্রতিকারের উপায়সমূহ লেখ।
৩. কম্পিউটারের মাধ্যমে কী কী অপরাধ হতে পারে?
৪. বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ বর্ণনা কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাইবার অপরাধের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
২. সাইবার অপরাধ নিবারণে করণীয় বিষয়াবলি বর্ণনা কর।

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি—২ প্রথম পত্র

ব্যবহারিক

ব্যবহারিক-১ : কী-বোর্ডের প্রত্যেকটি কী-এর কাজ চিহ্নিতকরণে দক্ষতা অর্জন

ব্যবহারিক-১.১ : কী-বোর্ডের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানতে পারা।

কাজের ধরন অনুযায়ী কী–বোর্ডের কীগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

ক. ফাংশন কী
খ. টাইপিং কী
গ. টেক্সট কী
ঘ. কার্সর মোভমেন্ট কী
ঙ. নিউম্যারিক কী প্যাড ও
চ. বিশেষ কী

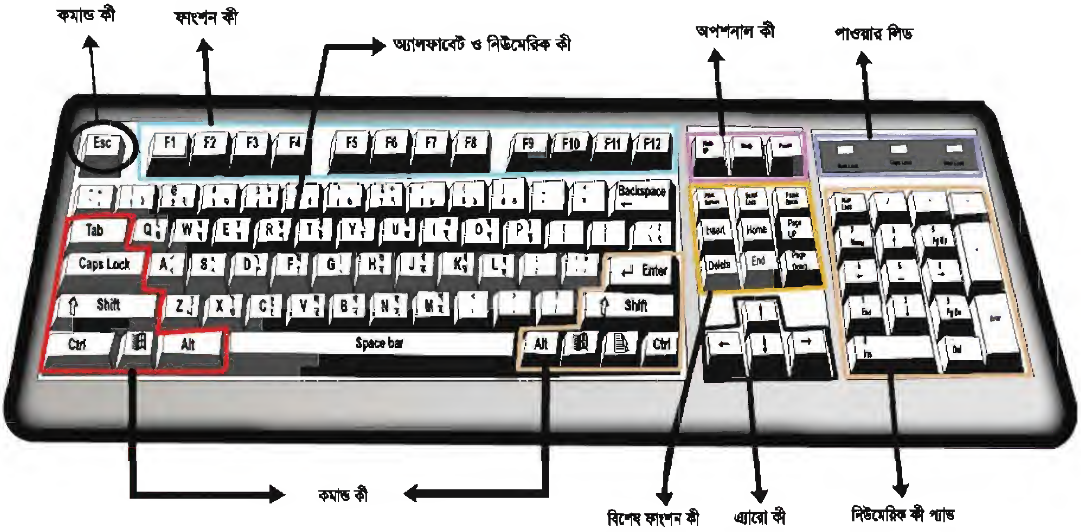

ব্যবহারিক-১.২ : কী-বোর্ডের প্রত্যেকটি কীর কাজ জানতে পারা।

ফাংশন কী (Function Key) :

F1 থেকে F12 ফাংশন কী গুলো তথ্য সংযোজন বা ইনসার্ট করা, অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা এবং বিশেষ ধরনের নির্ধারিত নির্দেশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত F_1 কী প্রোগ্রামের Help কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ফাংশন কী–এর কাজ বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–বেসিক প্রোগ্রামিং–এ F_5 কী চাপ দিয়ে প্রোগ্রাম নির্বাহ (Run) করা যায়, সি–প্রোগ্রামিং–এ Alt + F_5 চাপ দিয়ে প্রোগ্রামের আউটপুট স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়।

টাইপিং কী (Typing Key)

Enter Key : কোনো কমান্ড কার্যকর করার জন্য ঐ কমান্ড লিস্টের আইটেম সিলেক্ট করে Enter Key চাপতে হয়। আবার কোনো Document-এ এক লাইন হতে পরের লাইনে যেতে হলে Enter Key ব্যবহার করতে হয়।

Tab Key : সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে (৫ ক্যারেক্টার) কার্সরকে স্থানান্তর করার জন্য Tab Key ব্যবহৃত হয়।

Space bar : সাধারণত Space bar একবার চাপলে এক ক্যারেক্টার Space দেওয়া যায়। আবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন প্রয়োজনে Space bar কে কাজে লাগানো যায়। যেমন– Games এ Space bar চাপলেই খেলা শুরু হয়।

Shift key : শিফট কী তে চাপ দিয়ে ধরে রেখে A থেকে Z পর্যন্ত কী-গুলোর যে কোনো একটি Key তে চাপ দিলে বড় হাতের অক্ষর (Capital Letter) এবং দুইটি ক্যারেক্টারযুক্ত কী-গুলোর যে কোনো একটি Key (কী) তে চাপ দিলে উপরের চিহ্নটি টাইপ হবে।

Caps Lock : ক্যাপস লক কী চাপ দিয়ে অন করে টাইপ করলে সবগুলো বড় হাতের (Capital Letter) হবে।

কার্সর মোভমেন্ট কী

Arrow Key কী চেপে কার্সরকে বিভিন্ন দিকে নেওয়া যায়। যেমন– বামে, ডানে, উপরে এবং নিচে কার্সরকে সরানো যায়।

Page up : এ কীর সাহায্যে কার্সরকে একস্ক্রিন স্ক্রল আপ করা যায়। Ctrl + Page up কী-র সাহায্যে কার্সরকে স্ক্রিনের শুরুতে আনা যায়।

Page Down : কার্সরকে একস্ক্রিন স্ক্রল ডাউন করা যায়। Ctrl + Page Down কী-র সাহায্যে কার্সরকে স্ক্রিনের শেষে আনা যায়।

Home/End : কার্সরকে বর্তমান লাইনের শুরুতে অথবা শেষে নেওয়ার জন্য এ কী ব্যবহার করা হয়।

Delete Key : Delete Key এর সাহায্যে কার্সরের ডানদিকের বর্ণ বা চিহ্ন মোছা হয়। কোনো সিঙ্গেল কারেক্টার মুছতে হলে কার্সরকে ঐ অবস্থানে আনতে হয়। আবার কোনো অংশ বা অনুচ্ছেদ মুছতে হলে তা আগে সিলেক্ট করে Delete Key চাপতে হয়।

Back space key : Back space key-এর সাহায্যে কার্সর যে অবস্থানে আছে তার বাম দিকের কারেক্টার মুছা হয়।

Insert Key : ভুলবশত কোনো অক্ষর, চিহ্ন বা অঙ্কের পরিবর্তে অন্য কোনো অক্ষর, চিহ্ন বা অঙ্ক টাইপ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ভুল অক্ষর, চিহ্ন বা অঙ্কের উপর কার্সর স্থাপন করে Insert Key তে চাপ দিয়ে সঠিক অক্ষর, অঙ্ক বা চিহ্ন টাইপ করে ভুল সংশোধন করা যায়। Insert Key একটি Toggle Key হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সক্রিয় অবস্থায় Insert Key তে চাপ দিলে এটি নিষ্ক্রিয় হয় এবং নিষ্ক্রিয় থাকা অবস্থায় চাপ দিলে এটি সক্রিয় হয়।

Home Key : End লেখা কী–তে চাপ দিলে কার্সর টাইপ করা লাইনের অথবা পেইজ এর শেষে চলে যাবে।

নিউম্যারিক কী–প্যাড

কী–বোর্ডের ডান অংশে ক্যালকুলেটরের মত ০–৯ এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি চিহ্নিত কী-গুলোকে নিউম্যারিক কী–প্যাড বলা হয়। Num Lock কী যদি অন করা থাকে তবে নিউম্যারিক্যাল কী-প্যাডের মাধ্যমে এ কী–সমূহ ব্যবহার করা যাবে।

বিশেষ কী

Windows key : এই কী চাপলে start Menu প্রদর্শিত হবে।

Escape (Esc) কী : সাধারণত কোনো একটি কাজকে বা নির্দেশকে বাতিল করার জন্য Esc কী ব্যবহৃত হয়।

Control (CTRL) কী : CTRL কী কে অন্য কী-এর সাথে একত্রে চাপ দিয়ে কোনো প্রোগ্রাম অথবা নির্দেশনার কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। CTRL কী ব্যবহার করে প্রোগ্রাম Execution বা Command Execution কে বাতিল করা যায়।

Alter (ALT) কী : এ কী বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন রূপে কাজ করে। CTRL, ALT এবং DEL কী একসাথে চাপ দিলে কম্পিউটার রিস্টার্ট হবে।

Pause/Break : কম্পিউটারে কোনো নির্দেশ বা প্রোগ্রাম চলাকালীন এ কী চাপ দিলে ঐ নির্দেশ চালু অবস্থায় থামানো যায়।

Scroll Lock : কম্পিউটারের স্ক্রিন বা মনিটরে কোনো ডেটা বা ইনফরমেশন দেখার জন্য নির্দেশ দিলে ঐ ডেটা বা তথ্য মনিটরে দেখাবে। কিন্তু ডেটা লেখাগুলো একস্ক্রিনে সংকুলান না হলে অতি দ্রুত স্ক্রল হয়ে চলে যাবে যে মনিটরে দেখা গেলেও বুঝা যাবে না। এক্ষেত্রে স্ক্রল লক বা স্ক্রল কী (Scroll or Scroll কী) চাপ দিয়ে স্ক্রিনে স্ক্রল থামানো যায়।

Print Screen : এ কী ব্যবহার করে স্ক্রিনে প্রদর্শিত লেখা বা ছবিকে প্রিন্ট করা যায়।

ব্যবহারিক-১.৩ : কী-বোর্ড ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করা

কম্পিউটার ব্যবহার করে দ্রুত কাজ করার জন্য কী বোর্ড ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কম্পিউটারের কী-বোর্ডে জোরে চাপ না দিয়ে আলতোভাবে চাপ দিয়ে টাইপ করতে হবে। কম্পিউটারের সামনে নির্দিষ্ট দূরত্বে সঠিকভাবে বসে কী বোর্ডের উপর হালকাভাবে হাতের আঙুল স্থাপন করতে হবে।

কী-বোর্ডের মধ্য সারি কী-গুলোর উপর দুইহাত আলতোভাবে রাখ। ডান হাতের কোণ আঙুল ; লেখা কীতে তার পরের আঙুলগুলো ধারাবাহিকভাবে L K J কীগুলোর উপরে রাখ। একইভাবে বামহাতের কোণ আঙুল A এর উপর এবং পরের আঙুলগুলো S D F এর উপর রাখ। (দুইহাতেরই বৃদ্ধা আঙুল পরের সারির কী-তে একটু উপরে থাকবে।)

এখন বাম হাতের কোণ আঙুলে চাপ দাও এবং খেয়াল রাখ হবে কোন কীতে চাপ দেওয়া হয়েছে। এভাবে টাইপ করতে হবে a s d f g .... f চাপার পর এ আঙুলই আর একটু ডানদিকে বাড়িয়ে g টাইপ কর। বাম বা ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল দিয়ে স্পেসবার চাপ এবং পূর্বের ন্যায় ডান হাতে ডান দিক হতে বাম দিকে ; l k j h টাইপ কর। কিছুক্ষণ এভাবে টাইপ কর। এখন উল্টোদিক হতে টাইপ কর g f d s a এবং h j k l ; এভাবে কিছুক্ষণ টাইপ কর। এখন Caps লিখা কী-তে চাপ দিয়ে টাইপ কর A S D F G ; L K J H এবং G F D S A I H J K L ;

বাম হাত	ডান হাত
a s d f g	; l k j h

g f d s a	h j k l ;
A S D F G	; L K J H
G F D S A	H J K L ;

এভাবে উপরের কী-গুলো মোটামুটি মুখস্থ হলে কী-র দিকে না তাকিয়ে নিচের লেখাগুলো টাইপ কর :
as, add, slad, salad, shall, hall, ask, kajal, jalal, flags, dash, has, flasks, dhaka, khalada,
Caps লক অন থাকলে সব বড় হাতের হবে এবং অফ থাকলে সব লেখা ইংরেজি ছোট হাতের হবে। সাধারণত ক্যাপসলক অফ করে টাইপ করা হয়। যদি প্রথম অক্ষর বড় হাতের এবং পরের সব ছোট হাতের লেখার জন্য ক্যাপস লক অফ করে Shift লেখা কী চেপে ধরে যে অক্ষরটি বড় হাতের চাও তা টাইপ কর। (হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল একটু বাড়িয়ে Shift কী চেপে ধরা শিখুন এবং নিচের লেখাগুলো টাইপ কর :

As, Add, Slad, Asad, Salad, Shall, Hall, Ask, Kajal, Flags, Dash, Has, Flasks, Flag, Dhaka, Alsh, Das, Jalal, Khalada, Halal ইত্যাদি।

সব সময় হাতের আঙ্গুলগুলো কী-বোর্ডের মধ্যম সারিতেই (asdf .....) রেখে আঙ্গুলগুলো উপর নিচ করে কী-বোর্ডের অন্যান্য কী-গুলো টাইপ করে সেগুলোর বিন্যাস মুখস্থ করতে হবে। যেমন, বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল A লিখা কী স্পর্শ করে আছে। আঙ্গুলটি উপরে বাড়িয়ে Q লেখা কী চেপে q টাইপ করতে হবে। এভাবে অন্যান্য আঙ্গুলগুলো বাড়িয়ে অন্যান্য কী চেপে কী-র অবস্থান মুখস্থ কর।

বাম হাত	ডান হাত
q w e r t	p o i u y
t r e w q	y u i o p
Q W E R T	P O I U Y
T R E W Q	Y U I O P

কী-গুলোর অবস্থান মুখস্থ হলে কী না দেখে নিচের লেখাগুলো টাইপ কর :
we, wert, owert, your, youp, tree, treep, poit, report, popy, onil, one, row, owert, rew, yourt, tropy.

হাতের আঙ্গুল কিন্তু কী-বোর্ডের মধ্যম সারিতেই রেখে আঙ্গুল নিচের দিকে বাড়িয়ে Z লেখা কী চেপে z টাইপ কর। একইভাবে দুই হাতের অন্যান্য আঙ্গুলগুলো নিচের দিকে বাড়িয়ে অন্যান্য কী চেপে টাইপ কর অর্থাৎ

বাম হাত	ডান হাত
z x c v	b n m , .
Z X C V	B N M , .
V C X Z	. , M N B

এই কী-গুলো মুখস্থ করার জন্য কী না দেখে নিচের লেখাগুলো টাইপ কর ঃ
zxcm, mvn, vcxz, bcxz, bcx, zvmn, vcxz, ncm, xcv, mbxc, mxcz ক্যাপস লক কী অন করে পুনরায় এগুলো টাইপ কর। SHIFT কী চেপে শুধু প্রথম অক্ষর বড় হাতের (Zxcm) করে টাইপ কর। এভাবে কী বোর্ডের বিভিন্ন কীগুলোর অবস্থান জানা হলে নিচের লেখাটি বারবার টাইপ করলে সবগুলো কী এর অবস্থান মুখস্থ হয়ে যাবে।

Quick brown fox jumps over the lazy dog.

ব্যবহারিক-২ : হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণে দক্ষতা অর্জন

২.১. বিভিন্ন প্রকার (IDE, SATA, PATA, ATA, SCSI) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ চিহ্নিত করতে পারা

চিত্র ঃ IDE (ATA) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

চিত্র ঃ SATA হার্ডডিস্ক ড্রাইভ-এর কানেক্টর

চিত্র : SATA হার্ডডিস্ক ড্রাইভ চিত্র : PATA হার্ডডিস্ক ড্রাইভ চিত্র : SCSI হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

আইডিই বা পাটা (IDE/PATA) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

IDE/PATA ড্রাইভগুলোর সাধারণত ৪০টি পিন থাকে। PATA হার্ডডিস্কগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য PATA ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। একটি একক PATA ক্যাবলে দুইটি ড্রাইভকে যুক্ত করা যায়। এদের একটি মাস্টার হিসেবে এবং অপরটি স্লেভ হিসেবে। হার্ডডিস্ক ড্রাইভে জাম্পারসমূহের বিভিন্ন সমন্বয়ের মাধ্যমে মাস্টার ও স্লেভ কনফিগারেশন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে IDE/PATA ড্রাইভের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

সাটা (SATA) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

SATA ড্রাইভগুলো সাধারণত ৭ পিনের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ৪ পিন দুইটি জোড়ায় থাকে এবং বাকি ৩ পিন গ্রাউন্ডেড অবস্থায় থাকে। SATA হার্ডডিস্কগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য SATA ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। একটি সাটা ক্যাবলে শুধু একটি ড্রাইভই সংযুক্ত করা যায়।

স্ক্যাজি (SCSI) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

SCSI ড্রাইভগুলোর সাধারণত ৫০টি থেকে ৬৮টি পিন থাকে। SCSI হার্ডডিস্ক সংযোগের জন্য সাধারণত SCSI ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। একটি SCSI ক্যাবলে সর্বোচ্চ ১৬টি ড্রাইভ সংযুক্ত করা যায়।

২.২. হার্ডডিস্ক ড্রাইভের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারা

হার্ডডিস্ক ড্রাইভ উল্লেখযোগ্য অংশগুলোর মধ্যে আছে :

- প্লটার
- স্পিন্ডল
- হেড
- অ্যাকচুয়েটর
- অ্যাকচুয়েটর আর্ম
- অ্যাকচুয়েটর এক্সিস
- আইডিই কানেক্টর
- জাম্পার ব্লক
- পাওয়ার কানেকটর

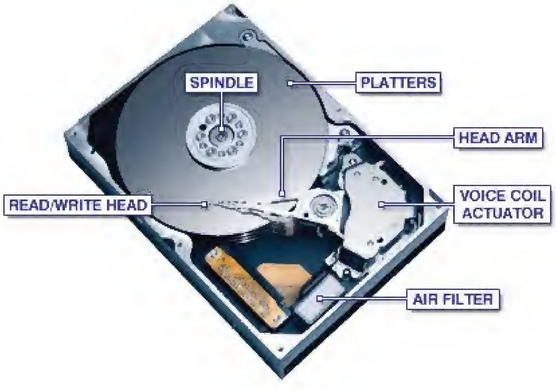

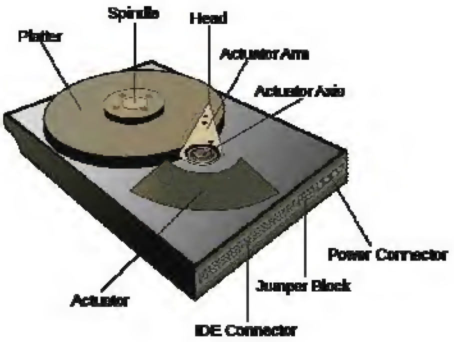

চিত্র : হার্ডডিস্ক ড্রাইভের ডায়াগ্রাম

প্লটার (Platter)

একটি দৃঢ় ডিস্ক, যেটি একটি হার্ডডিস্কের ব্যক্তিগত কম্পোনেন্ট হিসেবে সরবরাহ করা হয়। হার্ডডিস্ক মূলত বেশ কিছু স্ট্যাকড প্লটার নিয়ে গঠিত। প্লটারগুলো চৌম্বক মিডিয়া দ্বারা কোটেড থাকে, যা তাদেরকে ম্যাগনেটিক পোলারিটিতে স্থানীয়ভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করার সুযোগ দেয়।

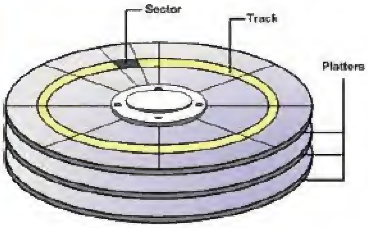

ক্লাস্টার (Cluster)

এটি ম্যাগনেটিক ডিস্ক স্টোরেজের বেসিক অ্যালোকেশন ইউনিট। ক্লাস্টারগুলো (অ্যালোকেশন ইউনিট নামেও পরিচিত) এক বা একাধিক ডিস্ক সেক্টরসমূহ নিয়ে গঠিত। ক্লাস্টারসমূহের উপর ভিত্তি করে স্টোরেজ স্পেস বরাদ্দ হওয়ার কারণে যদি কোনো ফাইল (বা ফাইলের অংশ) দৈহিকভাবে কেবল ক্লাস্টারের একটি অংশ দখল করে তবুও ওই পুরো ক্লাস্টারটি ফাইলটিকে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং ব্যবহৃত ডিস্ক স্পেস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সেক্টর (Sector)

একটি ডিস্কের ডেটা স্টোরেজ এরিয়ার আর্ক—আকৃতির অংশ, যা ডিস্কের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ফিজিক্যাল স্টোরেজ ইউনিট। এটি যেসব অংশ নিয়ে গঠিত সেগুলো হলো :

- **ডিস্ক সারফেসের দুই পাশ (উপর ও নিচ) :** একটি হার্ডডিস্কের একাধিক প্লটার থাকলে সেটিতে দুইটির বেশি পাশ থাকতে পারে।
- **ট্র্যাকসমূহ :** এগুলো ম্যাগনেটিক ডিস্কের উপরিতলে আংটির মতো বিন্যস্ত থাকে।
- **সেক্টরসমূহ :** এগুলো ট্র্যাকসমূহের আর্ক—আকৃতির অংশগুলোকে দখল করে।

অ্যাকচুয়েটর (Actuator)

এটি এমন একটি ডিভাইস, যেটি দৈহিকভাবে অ্যাকচুয়েটর আর্ম—কে ঘুরায়। বিগত বছরগুলোতে অ্যাকচুয়েটর আর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টেপার মোটর ব্যবহার করা হতো। তবে এর সীমাবদ্ধতা থাকায় বর্তমানে অনেক

হার্ডডিস্ক ড্রাইভে স্টেপার মোটরের পরিবর্তে ভয়েস কয়েল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা চৌম্বকীয় উপায়ে চালিত হয় বলে ভয়েস কয়েলে কোনো ওয়্যার বা টিয়ার নেই।

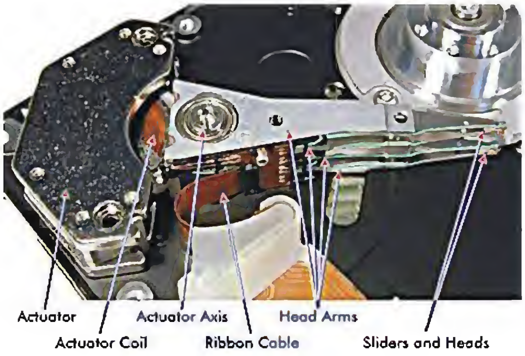

অ্যাকচুয়েটর আর্ম (Actuator Arm)

প্রয়োজনীয় ডেটাকে রিড/রাইট করার জন্য অ্যাকচুয়েটর আর্মটি প্লটার জুড়ে চলাচল করতে থাকে যাতে করে রিড/রাইট হেডটি সঠিক স্থানে অবস্থান করে।

হেড বা রিড/রাইট হেড (Head or Read/Write Head)

প্রতিটি অ্যাকচুয়েটর আর্মের শেষ প্রান্তে রিড/রাইট হেড যুক্ত থাকে। প্লটার থেকে ডেটাকে পড়া ও লেখার কাজের পুরো দায়দায়িত্ব হেড বা রিড/রাইট হেড এর। এটি একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক হেড। প্রতিটি প্লটারের দুইটি করে হেড থাকে। হার্ডডিস্কে যতগুলো প্লটার থাকে তার দ্বিগুণ রিড/রাইট হেড থাকে। তাই রিড/রাইট হেডের সংখ্যা নির্ভর করে প্লাটারের উপর।

স্পিন্ডল (Spindle)

স্পিন্ডলটি প্লটারটিকে ঘুরায়। আপনি যখন একটি হার্ড ড্রাইভের RPM (Revolutions Per Minute) স্পেসিফিকেশন দেখেন তখন সেটি আসলে স্পিন্ডলের স্পিডকে বুঝায়।

২.৩. হার্ডডিস্ক ড্রাইভকে মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করা।

বর্তমান সময়ে মাদারবোর্ডের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এবং দ্রুতগতিতে তথ্য স্থানান্তরের ক্ষমতা থাকার

জন্য কম্পিউটারে সাটা (SATA) হার্ডডিস্ক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে

কম্পিউটার কেসে থাকা ৩.৫ ইঞ্চি মাপের বে (bay) তে হার্ডডিস্ক ড্রাইভ স্থাপন করা হয়ে থাকে। প্রথমে এই বে-তে ড্রাইভটি ঢুকানো হয়, এরপর স্ক্রু-এর লোকেশন ঠিক করে অ্যালাইন করে ড্রাইভটিকে স্ক্রু লাগিয়ে আটকে দেওয়া হয়। হার্ডডিস্ক লাগানোর সময় মাস্টার ও স্লেভ ড্রাইভ নির্ধারণ করে দিতে হয়। কিন্তু সাটা প্রযুক্তিতে যতক্ষণ হার্ডডিস্কটি একপাশ থেকে অপর পাশে লাগানো থাকে ততক্ষণ কোনো ধরনের জাম্পার ম্যানিপুলেশনের প্রয়োজন পড়ে না। আর এই হার্ডডিস্ক কম্পিউটার কেসে ইন্সটল করাও সহজ।

একটি সাটা হার্ডডিস্ক কম্পিউটার কেসের মধ্যে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় ক্যাবলের সাথে তা মাদারবোর্ডে যুক্ত করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. যে সাটা হার্ডডিস্কটি কম্পিউটার কেসে ইন্সটল করা হবে তা নিতে হবে। আজকাল সাটা হার্ডডিস্ক লাগানোর জন্য কম্পিউটার কেসটিকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। এসব কেসে স্ক্রু ছাড়াই মাউন্টিং র‍্যাকের সাহায্যে হার্ডডিস্ককে খুব সহজেই মাউন্টেড করা যায়। এ ধরনের একটি কেসিং সংগ্রহ করলেই ভালো হয়। স্ক্রু ব্যবহারের ঝামেলা তাতে কমবে।

দুই পাশে মাউন্টিং র‍্যাকসহ একটি সাটা হার্ডডিস্ক

হার্ডডিস্কে মাউন্টিং র‍্যাক ফিট করা হয়েছে

২. মাউন্টিং র‍্যাকগুলো কেসিং থেকে খুলে নেওয়া যায়। এগুলোকে খুলে এনে শুধু হার্ডডিস্কে ফিট করতে হবে।
৩. এবার হার্ডডিস্কের সাথে লাগানো মাউন্টিং র‍্যাকসহ পুরো অংশটিকে হার্ডডিস্ক বে-তে সংযুক্ত করতে হবে। হার্ডডিস্কটি সঠিকভাবে ও সঠিক স্থানে ঢুকানো হলে র‍্যাকগুলো জায়গামতো বসে যাবে।

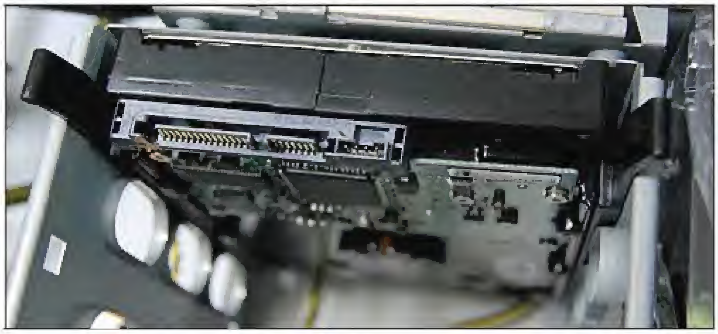
মাউন্টিং র‍্যাকসহ হার্ডডিস্কটিকে বে-তে সংযুক্ত করা হয়েছে

এবার হার্ডডিস্কের জন্য যে সাটা কানেক্টরগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে হবে। এদের মধ্যে একটি ডেটার জন্য এবং অপরটি পাওয়ারের জন্য। হার্ডডিস্কের যথাযথ স্থানে এ দুইটি কানেক্টর লাগিয়ে দিতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন এগুলো পুরোপুরি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোথাও কোনো ফাঁকা থাকা চলবে না।

দুইটি সাটা কানেক্টর

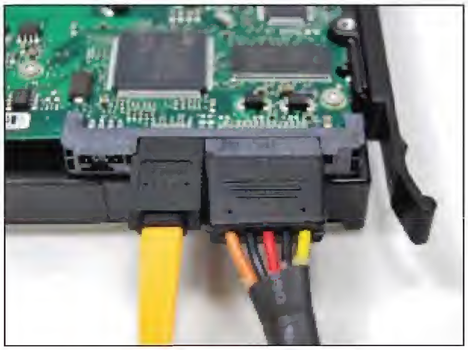

সাটা কানেক্টরগুলো হার্ডডিস্কে সংযুক্ত করা হয়েছে

৪. এরপর সাটা হার্ডডিস্কের সাথে যে ডেটা কানেক্টরটি বা ক্যাবলটি সংযুক্ত হয়েছে তার অপর প্রান্তটি মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট সাটা পোর্টে লাগাতে হবে। মাদারবোর্ডে সাধারণত ৬টি সাটা পোর্ট থাকে।

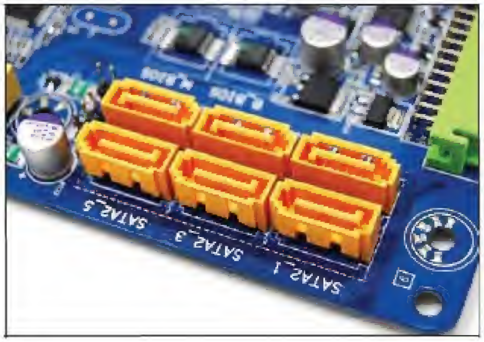

মাদারবোর্ডে থাকা ৬টি সাটা পোর্ট

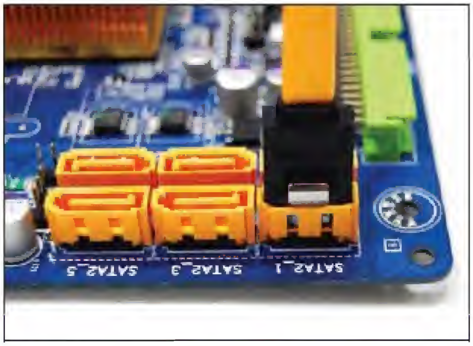

সাটা পোর্টে সাটা ক্যাবল যুক্ত করা হয়েছে

৫. সাটা ডেটা ক্যাবলটি শক্ত করে পোর্টে লাগিয়ে দিতে হবে। এ সময় একটি ক্লিক শব্দ শোনা যাবে। এভাবে কেসিংয়ে সাটা হার্ড ডিস্কটি লাগিয়ে মাদারবোর্ডে সংযুক্ত করা যায়।

২.৪. হার্ডডিস্ক ড্রাইভকে মাস্টার/স্লেভ হিসেবে কনফিগার করা

বর্তমানে ব্যবহৃত সাটা হার্ডডিস্কের আগে আইডিই হার্ডডিস্ক ব্যবহৃত হতো। এক্ষেত্রে একই কম্পিউটারে ডেটা ব্যাকআপ-এর জন্য বাড়তি হার্ডডিস্ক ব্যবহার করার সময় একটিকে মাস্টার এবং অন্যটিকে স্লেভ হিসেবে সেটিং করতে হতো। আইডিই হার্ডডিস্কের জাম্পার পিন রয়েছে। হার্ডডিস্কের গায়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে পিনগুলোতে জাম্পার সেট করে হার্ডডিস্কটি মাস্টার অথবা স্লেভ হিসেবে নির্ধারণ করা যায়।

বর্তমানে আইডিই হার্ডডিস্ক-এর পরিবর্তে সাটা হার্ডডিস্ক ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের সাটা পোর্টে হার্ডডিস্ক সংযুক্ত করা যায়। এতে কোনো জাম্পার সেটিং করার ব্যবস্থা নেই। তাই হার্ডডিস্ককে মাস্টার বা স্লেভ হিসেবে নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। একাধিক সাটা হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রে কোনটি থেকে বুট হবে সেটি বায়োসে নির্দিষ্ট করে দিতে হয়।

ব্যবহারিক—৩ : ফ্লাশ ড্রাইভ, সিডিরম ড্রাইভ চিহ্নিতকরণে দক্ষতা অর্জন করতে পারা

৩.১. ফ্লাশ ড্রাইভ, সিডিরম, ডিভিডি ড্রাইভ চিহ্নিত করতে পারবে

ফ্লাশ ড্রাইভ

ফ্লাশ মেমোরি চিপস দিয়ে তৈরি অত্যন্ত হালকা ও সহজে বহনযোগ্য স্টোরেজ মাধ্যম। সাধারণভাবে এটি দেখতে কলমের ক্যাপের মতো। এছাড়াও এটি বিভিন্ন ডিজাইন এবং সাইজের হয়ে থাকে। ফ্ল্যাশ ড্রাইভের একদিকের মাথাটি কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে সংযুক্ত করা যায়। ফ্ল্যাশ ড্রাইভ কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে যুক্ত করে কাজ করা হয়। এর জন্য আলাদা কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

সিডি রম

সিডি রম ৪.৭২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার চাকতির মতো একটি অপটিক্যাল মাধ্যম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিডি রম অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের তৈরি হয়ে থাকে। সিডি রম চাকতিটির পুরুত্ব ১.২ মিলিমিটার। এর কেন্দ্রে ১৫ মিলিমিটার ছিদ্র থাকে। সিডির মধ্যবর্তী ছিদ্রের চারপাশে ৬ মিলিমিটার বেষ্টনীকে ক্লাম্পিং এরিয়া বলা হয়। এতে কোনো তথ্য থাকে না। সিডি থেকে তথ্য পড়ার জন্য কম্পিউটারের সাথে সিডি ড্রাইভ থাকতে হবে।

ডিভিডি

ডিভিডি দেখতে সিডি রম এর মতো। এটিও ৪.৭২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার চাকতির মতো একটি অপটিক্যাল মাধ্যম। তবে ডিভিডি এর ধারণ ক্ষমতা সিডি থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে। ১.২ মিলিমিটার পুরু হলেও সিডি-তে তথ্য ধারণের জন্য রয়েছে একটিমাত্র ভিত্তিস্তর অথচ ডিভিডিতে রয়েছে ০.৬ মিলিমিটার পুরু দুইটি ভিত্তিস্তর। ডিভিডি থেকে তথ্য পড়ার জন্য কম্পিউটারের সাথে ডিভিডি ড্রাইভ থাকতে হবে।

৩.২. ফ্লাশ ড্রাইভে ডেটা সংরক্ষণ করা

ফ্লাশ ড্রাইভে সহজেই ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। ফ্লাশ ড্রাইভে ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য :

১. ফ্লাশ ড্রাইভটি কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

২. My Computer আইকনে ডাবল ক্লিক করে যে ডেটা ফাইলটি সংরক্ষণ করা দরকার সেটি যে ড্রাইভের যে ফোল্ডারে আছে সেটির উপরে মাউস পয়েন্টার নিয়ে রাইট ক্লিক করতে হবে।

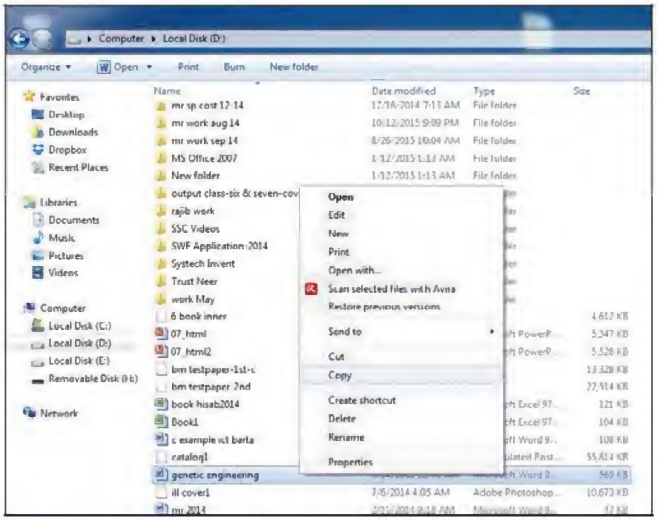

৩. প্রদর্শিত মেনু থেকে Copy অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।

৪. ফ্লাশ ড্রাইভের নামের উপর (এটি কোন নামে থাকতে পারে অথবা Removable নামে থাকতে পারে।) ডাবল ক্লিক করে ফ্লাশ ড্রাইভটি ওপেন করতে হবে।

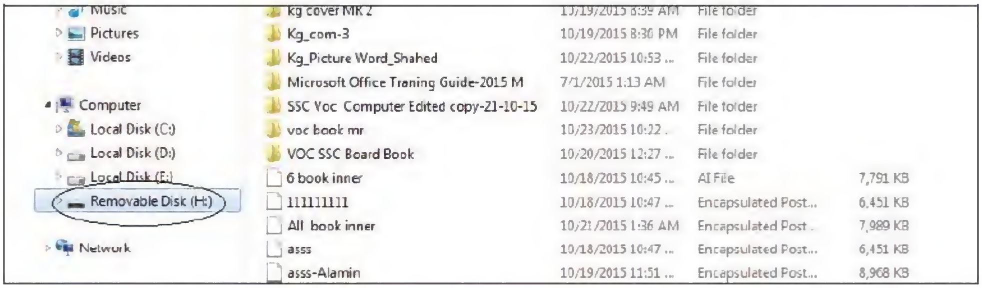

৫. ফ্লাশ ড্রাইভে সংরক্ষিত বিভিন্ন ফাইলের নামের তালিকা প্রদর্শিত হবে। তালিকার যে কোনো ফাঁকা স্থানে রাইট ক্লিক করে প্রদর্শিত মেনু থেকে Paste অপশনটি নির্বাচন করলে ফাইলটি ফ্লাশ ডিস্কে সংরক্ষিত হবে।

৩.৩. কম্পিউটারে সিডি-রম/ডিভিডি-রম ড্রাইভ বা রাইটার সংযুক্ত করা

আজকাল সাটা প্রযুক্তির ডিভাইস বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। অপটিক্যাল ড্রাইভসমূহ যেমন–সিডি-রম ড্রাইভ, ডিভিডি-রম ড্রাইভ কিংবা সিডি/ডিভিডি রাইটার, কম্বো ড্রাইভ ইত্যাদি ড্রাইভও এখন সাটা ক্যাবলের মাধ্যমে মাদারবোর্ডে যুক্ত করা যায় আর কেসিংয়েও খুব সহজেই ইন্সটল করা যায়। সাটা প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা সম্বলিত মাদারবোর্ড নিয়ে কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে অপটিক্যাল ড্রাইভটিও যেন সাটা প্রযুক্তির হয়। এরপর কেসিংয়ে ডিভাইসটি সংযুক্ত করতে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. যে সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভটি ইন্সটল করা হবে তা নিতে হবে। আজকাল সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভসমূহ লাগানোর জন্য কম্পিউটার কেসকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। এসব কেসিংয়ে স্ক্রু ছাড়াই মাউন্টিং র‍্যাকের সাহায্যে অপটিক্যাল ড্রাইভসমূহকে খুব সহজেই মাউন্টেড করা যায়। এ ধরনের একটি কেস সংগ্রহ করলেই ভালো হয়। স্ক্রু ব্যবহারের ঝামেলা তাতে কমবে।

২. মাউন্টিং র‍্যাকগুলো কেসিং থেকে খুলে নেয়া যায়। এগুলোকে খুলে এনে শুধু সিডি-রম/ডিভিডি-রম ড্রাইভে ফিট করতে হবে।

৩. এবার সিডি-রম/ডিভিডি-রম ড্রাইভের সাথে লাগানো মাউন্টিং র‍্যাকসহ পুরো অংশটিকে কম্পিউটার কেসের নির্ধারিত বে-তে সংযুক্ত করতে হবে। সিডি-রম/ডিভিডি-রম ড্রাইভটি সঠিকভাবে ও সঠিক স্থানে ঢুকানো হলে র‍্যাকগুলো জায়গা মতো বসে যাবে।

৪. এবার অপটিক্যাল ড্রাইভের জন্য যে সাটা কানেক্টরগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে হবে। এদের মধ্যে একটি ডেটার জন্য এবং অপরটি পাওয়ারের জন্য। সিডি-রম/ডিভিডি-রম ড্রাইভের যথাযথ স্থানে এ দুইটি কানেক্টর লাগিয়ে দিতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন এগুলো পুরোপুরি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোথাও কোনো ফাঁকা থাকা চলবে না।

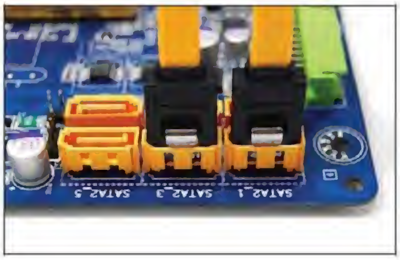

৫. এরপর সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভের সাথে যে ডেটা কানেক্টরটি বা ক্যাবলটি সংযুক্ত হয়েছে তার অপর প্রান্তটি মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট সাটা পোর্টে (মাদারবোর্ডে সাধারণত ৬টি সাটা পোর্ট থাকে) শক্ত করে লাগিয়ে দিতে হবে। এ সময় একটি ক্লিক শব্দ শোনা যাবে।

৬. এর মাধ্যমে কেসিংয়ে আমাদের সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভ ইন্সটল করা এবং মাদারবোর্ডে সেটিকে সংযুক্ত করার কাজ সুসম্পন্ন হবে।

৩.৪. সিডি রম, ডিভিডি ড্রাইভের জাম্পার (মাস্টার/স্লেভ) সেটিং করতে পারবে

বর্তমানে ব্যবহৃত সাটা ইন্টারফেসের আগে আইডিই ইন্টারফেস ব্যবহৃত হতো। এক্ষেত্রে একই ডেটা ক্যাবলে একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করার সময় একটিকে মাস্টার এবং অন্যটিকে স্লেভ হিসেবে সেটিং করতে হতো। আইডিই সিডি/ডিভিডি জাম্পার পিন রয়েছে। সিডি/ডিভিডি ড্রাইভের গায়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে পিনগুলোতে জাম্পার সেট করে ড্রাইভটি মাস্টার অথবা স্লেভ হিসেবে নির্ধারণ করা যায়। তিন জোড়া জাম্পার পিনের কোনো জোড়াতে জাম্পার সেট করে মাস্টার বা স্লেভ হিসেবে নির্ধারণ করা যায়।

বর্তমানে আইডিই এর পরিবর্তে সাটা ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের সাটা পোর্টে সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি সংযুক্ত করা যায়। এতে কোনো জাম্পার সেটিং করার ব্যবস্থা নেই। তাই সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি মাস্টার বা স্লেভ হিসেবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় না।

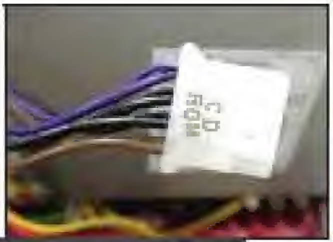

৩.৫ সিডিরম/ডিভিডি এ ডেটা রিড/রাইট করতে পারবে

উইন্ডোজ এক্সপি/৭ এর সিডি রাইট অপশনটি ব্যবহার করে সহজে সিডি রাইট করা যায়। নিচে উইন্ডোজ এক্সপিতে সিডি রাইট করা দেখানো হলো :

- সিডি ড্রাইভে একটি নতুন সিডি ঢুকাতে হবে। কিছুক্ষণ পর সিডি ড্রাইভ লেটার দেখাবে। অটোমেটিক না দেখালে ডেস্কটপের My Computer এ ডাবল ক্লিক করতে হবে। My Disc ড্রাইভে ডাবল ক্লিক করতে হবে।

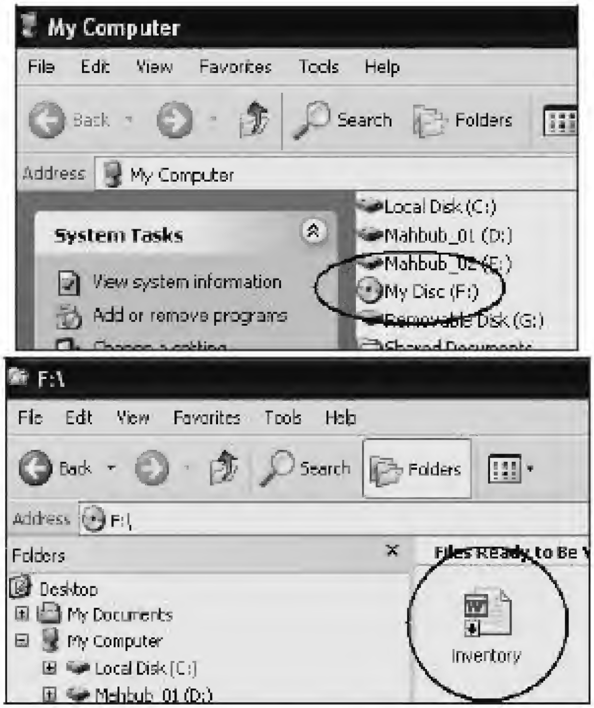

- যেসব ফাইল বা ফোল্ডার সিডিতে কপি করতে হবে সেগুলো সিলেক্ট করে কপি নির্দেশ দিয়ে এ উইন্ডোর ডান অংশের ভেতরে ক্লিক করে পেস্ট নির্দেশ দিলে ফাইলসমূহ পেস্ট হবে।

- File মেনুতে ক্লিক করে Write these files to CD অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।

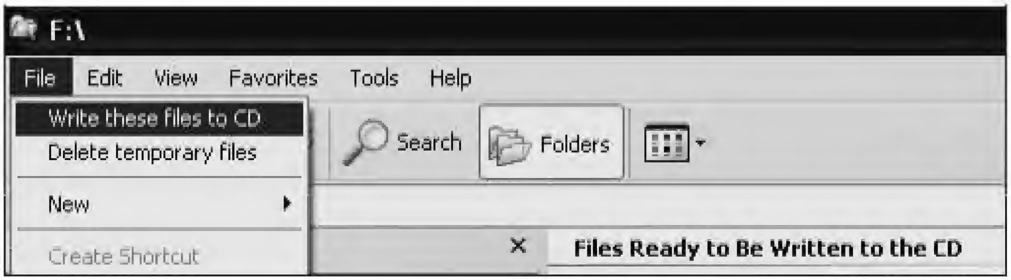

- পর্দায় নিচের উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। CD Name : এর নিচের বক্সে সিডিটির যে নাম দেওয়া দরকার সে নাম টাইপ করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

- পর্দায় সিডি রাইটিং প্রক্রিয়া দেখাবে।
- সিডি রাইট সমাপ্ত হলে পরবর্তী উইন্ডো থেকে Finish বাটনে ক্লিক করে বের হয়ে আসতে হবে।

ব্যবহারিক-৪ : বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টার চিহ্নিতকরণে দক্ষতা অর্জন

৪.১ বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টার চিনতে পারা

প্রিন্টার

যে যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রাপ্ত ফলাফল কাগজে ছাপানো যায় তাকে প্রিন্টার বলা হয়। এটি বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইস। প্রিন্টের মান কী রকম হবে তা নির্ভর করে প্রিন্টারের রেজ্যুলেশনের উপর। বেশি রেজ্যুলেশনের প্রিন্টার নিখুঁতভাবে প্রিন্ট করে থাকে।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে লেখার জন্য ছোট পিনে গ্রিড ব্যবহার করা হয়। অনেকগুলো পিনের মাথা রিবনের উপর আঘাত করে কাগজের উপর কতকগুলো বিন্দু বসিয়ে অক্ষর তৈরি করা হয়। সাধারণত এ প্রিন্টারে ৭, ৯ অথবা ২৪টি পিন থাকে, যেগুলো লাইন বরাবর চলাচল করে বিন্দুর মাধ্যমে অক্ষর তৈরি করে। এ প্রিন্টারে ছাপা অক্ষর, প্রতীক বা ছবি সূক্ষ্ম হয় না। এ ধরনের প্রিন্টার বেশ ধীরগতিসম্পন্ন হয়।

ইঙ্কজেট প্রিন্টার

ইঙ্ক জেট প্রিন্টারে কতকগুলো সূক্ষ্ম সূচিমুখ (Nozzle) থেকে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কালি বেরিয়ে এসে কাগজের দিকে ছুটে যায়। একটি তড়িৎক্ষেত্র এ চার্জযুক্ত কালির সূক্ষ্ম কণাগুলোকে ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে কাগজের উপর কোনো বর্ণকে ফুটিয়ে তোলে। স্বল্পদামি প্রিন্টার হিসেবে ইঙ্কজেট প্রিন্টার জনপ্রিয়। সাধারণত বাসাবাড়িতে ইঙ্কজেট প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। ক্যানন বাবলজেট, এইচপি ডেস্কজেট, এপসন স্টাইলাস ইত্যাদি প্রিন্টারসমূহ ইঙ্কজেট প্রিন্টার।

লেজার প্রিন্টার

উন্নত মানের প্রিন্টিংয়ের জন্য লেজার প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। বেশি পরিমাণ, ছাপার উন্নত মান, স্পষ্ট আউটপুট এসবের জন্য লেজার প্রিন্টার সর্বাধিক পরিচিত। ফটোকপি মেশিনে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় লেজার প্রিন্টারেও সেই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো রিবন বা তরল কালি ব্যবহৃত হয়না। তার পরিবর্তে টোনার নামে একটি বিশেষ ব্যবস্থায় পাউডার কালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।।

ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার

ইঙ্কজেট প্রিন্টার

লেজার প্রিন্টার

৪.২.বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ চিনতে পারা

ইঙ্ক জেট প্রিন্টার

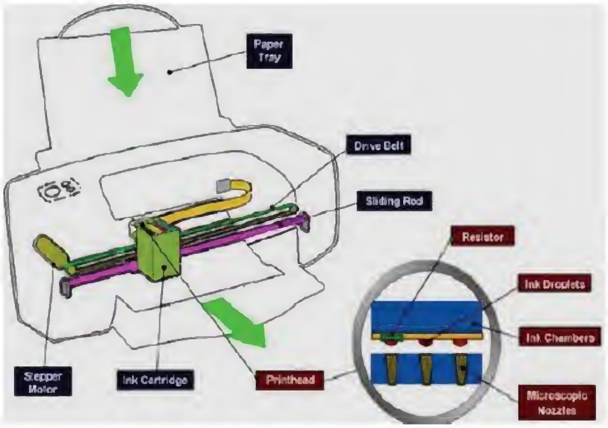

চিত্র : ইঙ্কজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

পেপার ট্রে : এখানে কাগজ স্থাপন করা হয়।

স্টেপার মটর : এটি এক ধরনের বিশেষ ইলেকট্রিক মটর যা ঘুরে ড্রাইভ বেল্টকে মুভ করায়।

ড্রাইভ বেল্ট : মটরের সাথে লাগানো এ বেল্টের সাহায্যে ইনক কার্টিজ মুভ করে।

ইনক কার্টিজ : ইনক কার্টিজ অথবা ইনকজেট কার্টিজে কালি থাকে যা প্রিন্টিং করার সময় কাগজে ফেলে ছাপিয়ে থাকে।

প্রিন্ট হেড : প্রিন্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কম্পিউটার থেকে ইলেকট্রিক সিগনাল গ্রহণ করে কার্টিজ থেকে প্রয়োজনীয় কালি নিক্ষেপ করে ছাপানোর কাজ করে থাকে।

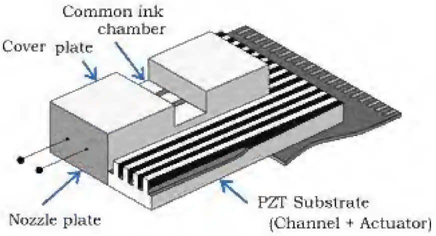

Schematic diagram of printhead

চিত্র : প্রিন্ট হেড

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

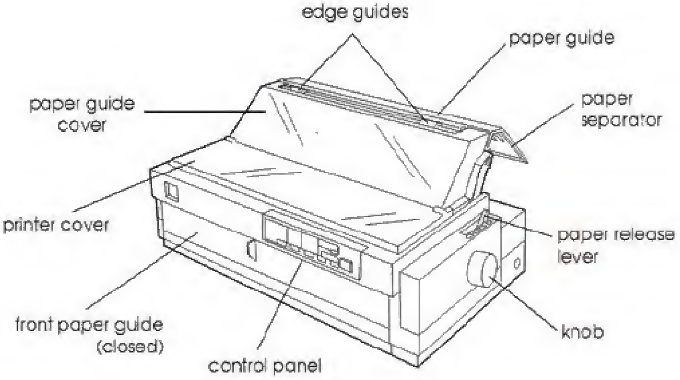

চিত্র : ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

কন্ট্রোল প্যানেল : এই Panel এ কতগুলি সুইচ এবং ইন্ডিকেটর থাকে। সুইচগুলোর মাধ্যমে প্রিন্টারকে কন্ট্রোল করা যায় এবং ইন্ডিকেটরগুলো প্রিন্টারের এর Status দেখায়।

নব (Knob) : নব এর সাহায্যে ম্যানুয়ালি পেপার ফিড করা যায় অথবা পেপার প্রিন্টার থেকে বের করে নেওয়া যায়।

পেপার রিলিজ লিভার (Paper Release Leaver) : এই লিভারের মাধ্যমে কাগজকে রিলিজ করা যায়। Paper এর ধরণ (Single Sheet, Continuous Sheet) অনুসারে লিভারকে সেট করতে হয়।

স্টিপার মটর (Stepper Moto): ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারে দুইটি স্টিপার মটর থাকে। এদের একটি প্রিন্টার হেডকে হরিজন্টালি মুভ করিয়ে থাকে এবং অন্যটি একটি লাইন প্রিন্ট হওয়ার পর কাগজটিকে পরবর্তী লাইন প্রিন্ট করার জন্য এগিয়ে দেয়।

প্রিন্টার হেড (Printer Head) : প্রতিটি প্রিন্টার এ একটি প্রিন্টার Head থাকবে। যা 9 Pin অথবা 24 Pin এর হয়ে থাকে। এই হেড পিনের সংখ্যার উপর প্রিন্টারের প্রিন্ট কোয়ালিটি নির্ভর করে। প্রিন্টারের হেডটি একটি ডেইজি চেইনের মাধ্যমে লজিক বোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে।

সেন্সর (Sensor) : প্রতিটি প্রিন্টার এ একাধিক Sensor বা Switch থাকে। যার একটি প্রিন্টার এ Paper আছে কি নেই তা একটি Indicator এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানায়।

Tractor : প্রিন্টার এ Continuous Paper কে Feed করানোর জন্য একটি ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হয় ফলে প্রিন্টারে একই সাথে 2000 Sheet পর্যন্ত Connect করা যায়।

লেজার প্রিন্টার

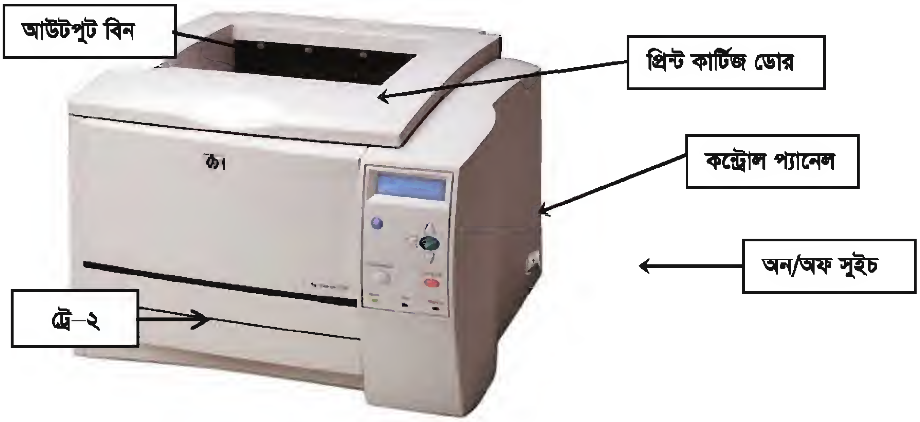

চিত্র : লেজার প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

আউটপুট বিন : এ অংশে প্রিন্টারে কাগজ ইনপুট বের হয়। এ অংশের পিছন দিকে প্রিন্ট করা কাগজ বের হয়।

প্রিন্ট কার্টিজ ডোর : এ অংশে ঢাকনার নিচে টোনার লাগানো থাকে। এখানে হালকা করে চাপ দিয়ে ডোরটি খুলে টোনার খোলা বা লাগানো হয়।

কন্ট্রোল প্যানেল : এ অংশে বিভিন্ন বাটন থাকে। বিভিন্ন বাটনে চাপ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা হয়।

অন/অফ সুইচ : পাওয়ার লাইন যুক্ত করে এ সুইচে চাপ দিয়ে প্রিন্টার অন বা অফ করা হয়।

ট্রে-২ : এ ট্রেটি খুলে এ ভেতরে কাগজ সংরক্ষিত করে প্রিন্টিং এ সময় নির্দেশ দিলে এখান থেকে কাগজ নিয়ে প্রিন্ট করে।

৪.৩ ডট মেট্রিক্স, লেজার ও ইঙ্কজেট প্রিন্টার কম্পিউটারে সংযোগ দিয়ে ড্রাইভার সফটওয়্যার ইন্সটল করা

ড্রাইভার হলো এমন কিছু প্রোগ্রাম, যা সাধারণত কম্পিউটারের সাথে ব্যবহৃত বিভিন্ন হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এগুলো হার্ডওয়্যার উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যের সাথেই সরবরাহ করে থাকে। যেমন– মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার, প্লটার ইত্যাদির বিভিন্ন মডেলের জন্য বিভিন্ন ড্রাইভার রয়েছে। হার্ডওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট থেকেও তাদের বিভিন্ন মডেলের ড্রাইভারগুলোর অধিকাংশই বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। পাশাপাশি যেসব সাইট বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ডাউনলোড করার সুবিধা দিয়ে থাকে সেগুলো থেকেও প্রয়োজনীয় ড্রাইভারটি ডাউনলোড করা যায়। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কোম্পানির প্রিন্টারের ড্রাইভার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম। নিচে এইচপি-এর একটি মডেলের লেজার প্রিন্টারের ড্রাইভার ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। এ থেকে ধারণা নিয়ে অন্যান্য প্রিন্টারেরও ড্রাইভার ইন্সটলেশন করা যাবে।

প্রিন্টার–এর ড্রাইভার ইন্সটল করা

এইচপি (হিউলেট প্যাকার্ড)–এর লেসার জেট সিরিজের 2100/2100M/2100TN মডেলের প্রিন্টারের ড্রাইভার ইনস্টল করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে :

১. সিডি/ডিভিডি-রম ড্রাইভে ড্রাইভারটির ইন্সটলার সিডি/ডিভিডি-টি প্রবেশ করাতে হবে। অটোরান সমৃদ্ধ হওয়ায় একটি ওয়েলকাম ডায়ালগ বক্স আসবে। এখান থেকে Install your HP LaserJet 2001 printer software বাটনে ক্লিক করতে হবে।

২. একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩. লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট ডায়ালগ বক্স আসবে। Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪. প্রিন্টার সিলেক্টের জন্য নতুন একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এখান থেকে সবার উপরের রেডিও বাটনটি ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে। (অন্য কোনো প্রিন্টারের ড্রাইভার ইনস্টল করার সময় কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো দেখে ইনস্টলের নির্দেশ দিতে হবে) এবং Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

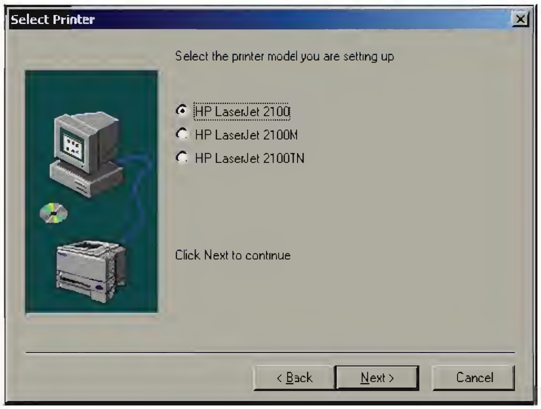

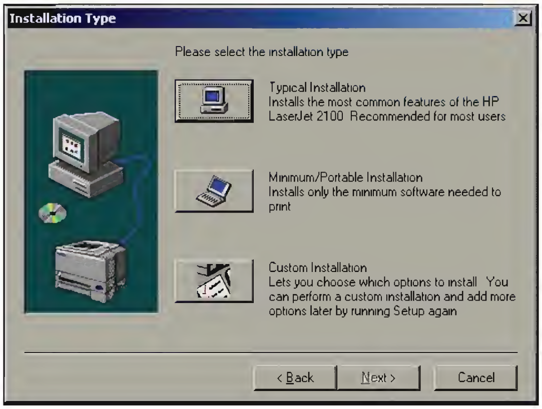

৫. পুনরায় Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এখানে Typical Installation বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৬. এবার Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। ধাপে ধাপে সেটআপ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৭. ইন্সটল প্রক্রিয়া শেষ হলে সেটআপ কমপ্লিট হবার ডায়ালগ বক্স আসবে। Finish বাটনে ক্লিক করে প্রিন্টারের ড্রাইভারটি ইন্সটলের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হবে।

৮. কম্পিউটারে ড্রাইভার ইনস্টল হয়ে যাবে।

ব্যবহারিক-৫ : প্রিন্টারের কালি পুনঃস্থাপন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন

৫.১ প্রিন্টারে রিবন, কার্টিজ এবং টোনার সংযোজন-বিয়োজন

ডট ম্যাট্রিক্স রিবন সংযোজন-বিয়োজন

নিম্নে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে রিবন প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো। রিবনের কালি ফুরিয়ে গেলে প্রিন্টারের পুরাতন রিবনকে সরিয়ে নতুন কার্টিজ প্রতিস্থাপন করতে হয়। রিবন প্রতিস্থাপনের জন্য প্রিন্টারের পাওয়ার সুইচ অফ করে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। প্রিন্টার দিয়ে গুণগত মানের আউটপুট পেতে হলে প্রিন্টার প্রস্তুতকারক কর্তৃক তৈরিকৃত রিবন কার্টিজ ব্যবহার করতে হবে। প্রিন্টারে রিবন সংযোজন—বিয়োজন করতে হলে নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. প্রথম ধাপে প্রিন্টারের পাওয়ার সুইচ বন্ধ করতে হবে।

২. প্রিন্টার কভারটিকে লম্ব অবস্থান অনুযায়ী খুলতে হবে। এরপর এটিকে অপসারণের জন্য তুলে আনতে হবে।

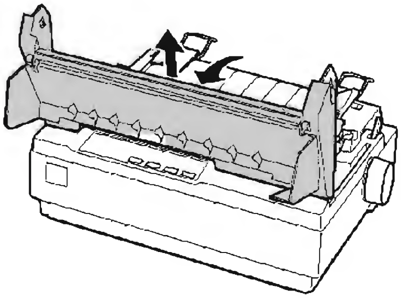

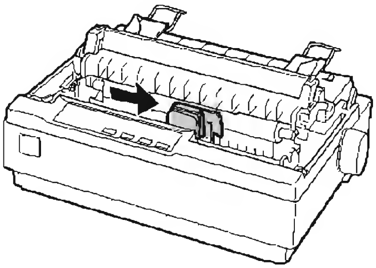

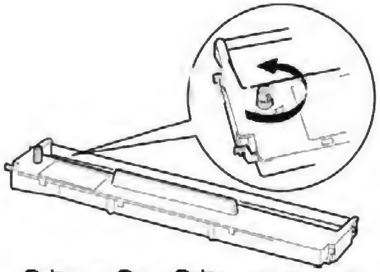

৩. প্রিন্ট হেডটিকে প্রিন্টারের মাঝ বরাবর সরিয়ে আনতে হবে।

৪. এটি যাতে সহজে ইন্সটল করা যায় সেজন্য রিবনটি থেকে যেকোনো ধরনের ঢিলা অবস্থা রোধ করতে রিবন-টাইটেনিং নবটিকে তীর চিহ্ন বরাবর টেনে আনতে হবে।

৫. নিচে দেখানো চিত্রানুযায়ী রিবন কার্টিজটিকে প্রিন্টারে ঢুকাতে (সন্নিবেশ করতে) হবে; এরপর প্লাস্টিক হুকগুলোকে প্রিন্টার স্লটগুলোর ভেতরে ঠিকমতো বসানোর জন্য কার্ট্রিজটিকে উভয়দিক থেকে সজোরে চাপ দিতে হবে।

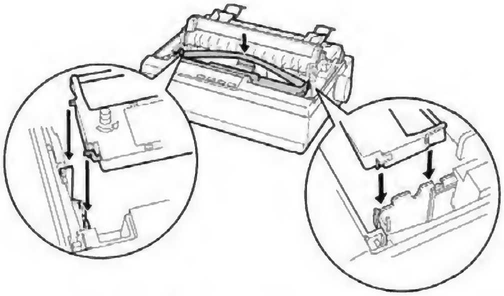

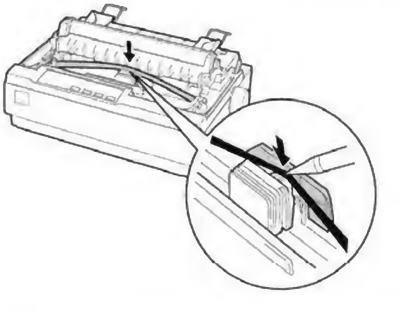

৬. যেকোনো ধরনের পয়েন্টেড অবজেক্ট যেমন– একটি বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করে রিবনটিকে প্রিন্ট হেড এবং রিবন গাইডের মাঝে নিয়ে আসতে হবে। রিবনটিকে জায়গামতো বসাতে রিবন-টাইটেনিং নবকে আবর্তন করাতে হবে; এটি বাঁকানো কিংবা ভাঁজ করা উচিত নয়।

৭. এটি যাতে মসৃণভাবে চলাচল করে সেটি নিশ্চিত করতে প্রিন্ট হেডটিকে একপাশ থেকে অন্যপাশে স্লাইড করতে হবে।

৮. প্রিন্টার কভারটিকে পুনরায় ইন্সটল ও বন্ধ করে দিতে হবে।
প্রিন্টারের কভার লাগিয়ে পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে এবং একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে এর ফাংশন পরীক্ষা করতে হবে।

ইঙ্ক কার্টিজ সংযোজন—বিয়োজন

যখন ইঙ্ক জেট প্রিন্টারের ইঙ্ক কার্টিজের কালি ফুরিয়ে যায় বা কমে যায় তখন প্রিন্টার অন অবস্থায় কালি শেষ নির্দেশক লাইট ফ্লাশ করতে থাকে। আবার কালি যখন একেবারে শেষ হয়ে যায় তখন প্রিন্টার ছাপানোর কাজ বন্ধ করে দেয় এবং কালি শেষ নির্দেশক লাইট অনবরত সংকেত দিতে থাকে। ইঙ্ক জেট প্রিন্টারে পুরাতন কার্টিজ পাল্টিয়ে নতুন কার্টিজ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো।

১. প্রিন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন থাকা অবস্থায় 'কালি শেষ' নির্দেশক লাইট ফ্লাশিং করছে কী না দেখতে হবে।
২. প্রদর্শিত চিত্রের মতো প্রিন্টার কভার খুলতে হবে।

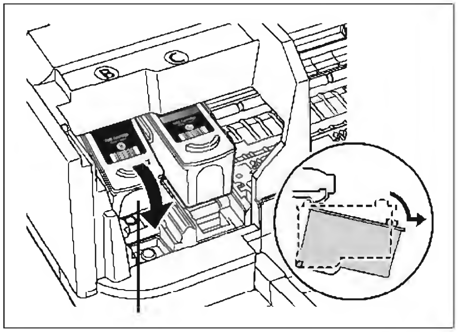
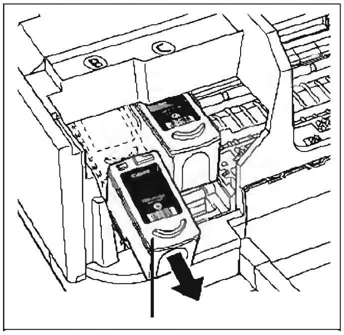

কভার খোলা ও কার্ট্রিজ বের করা

৩. ইঙ্ক কার্টিজ প্রতিস্থাপন করার জন্য পুরাতন ইঙ্ক কার্টিজের ক্ল্যাম্পকে হালকাভাবে উপরের দিকে টানতে হবে। তাহলে ইঙ্ক কার্টিজটি হোল্ডার হতে কিছুটা উঠে আসবে। পুরাতন ইঙ্ক কার্টিজ খুলে সঠিকভাবে রাখতে হবে।
৪. নতুন ইঙ্ক কার্টিজকে প্যাকেট থেকে বের করতে হবে। কার্টিজের কমলা/হলুদ প্রোটেকটিভ টেপটিকে চিত্রে নির্দেশিত দিকে হালকাভাবে টেনে খুলতে হবে।
৫. নিচের চিত্রে প্রদর্শিত তীর চিহ্নিত দিক অনুযায়ী ইঙ্ক কার্টিজের সম্মুখ অংশ উপরের দিকে এবং পেছনের অংশ নিচের দিকে রেখে আলতোভাবে ইঙ্ক কার্টিজকে হোল্ডারে রাখতে হবে।

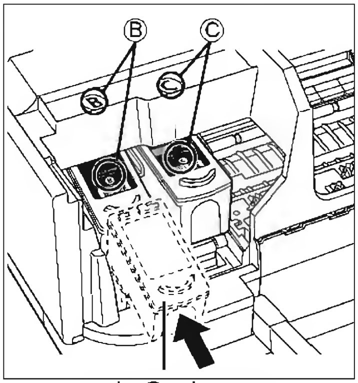

প্রোটেকটিভ টেপ খোলা

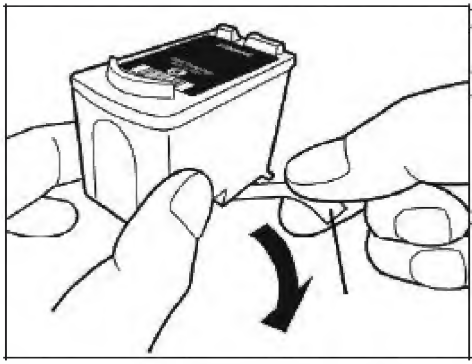
কার্টিজকে হোল্ডারে স্থাপন

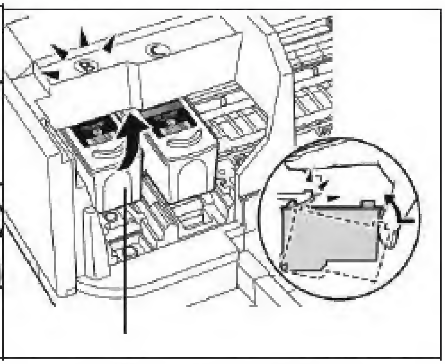
কার্টিজকে হোল্ডারে আটকানো

৬. অতপর ইঙ্ক কার্টিজ ক্ল্যাম্পকে নিচের দিকে চাপ দিয়ে কার্টিজকে সঠিক স্থানে লক করে দিতে হবে।

৭. প্রিন্টার কভার বন্ধ করতে হবে।

টোনার কার্টিজ সংযোজন-বিয়োজন

লেজার প্রিন্টারে ব্যবহৃত টোনার কার্টিজে কালির পরিমাণ কমে গেলে প্রিন্ট আউট হালকা হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, একটি নতুন টোনার কার্টিজ প্রতিস্থাপন করতে হয়। পুরাতন টোনার কার্টিজ সরিয়ে নতুন টোনার কার্টিজ প্রতিস্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. প্রথমে প্রিন্টারের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে এটিকে একটি ফাঁকা জায়গায় রাখতে হবে। তারপর প্রিন্টারের দরজা খুলে পুরাতন টোনার কার্টিজকে বের করতে হবে।

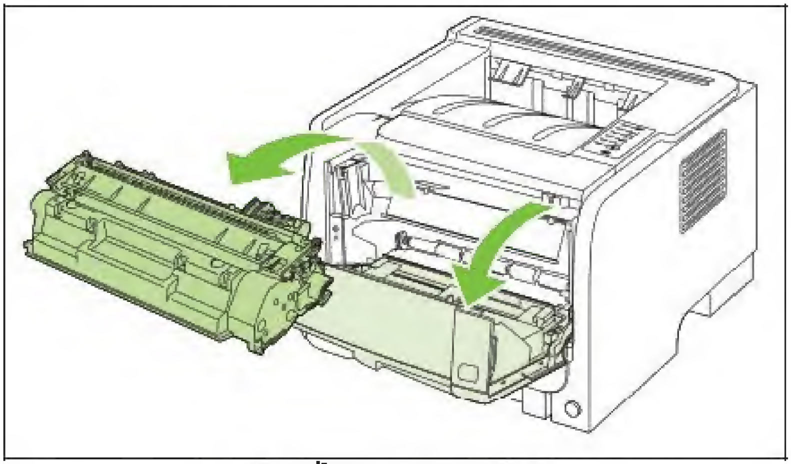
কভার টোনার খোলা ও বের করা

২. প্যাকেট হতে নতুন টোনার কার্টিজটি বের করে নিতে হবে। কার্টিজের বামদিকে অবস্থিত ট্যাবটি বাঁকা করে ভেঙে ঢিলা করতে হবে এবং এটিকে ধরে কার্টিজের অভ্যন্তরস্থ টেপকে টেনে সম্পূর্ণরূপে বের করতে হবে।

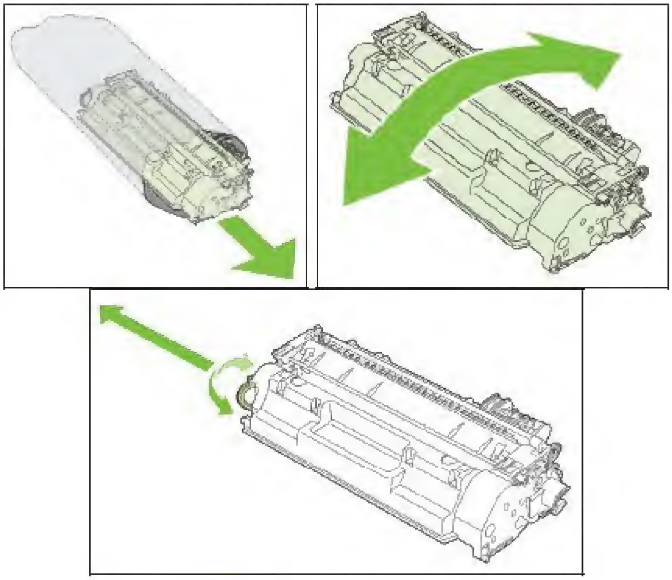

কার্টিজের টেপকে টেনে বের করা

৩. টোনার কার্টিজটিকে প্রতি পাশে কয়েকবার করে ঝাঁকাতে হবে যাতে কালির বন্টন সুষম হয়।
৪. টোনারকে সমান্তরাল অবস্থায় প্রিন্টারে প্রবেশ করিয়ে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে হবে।

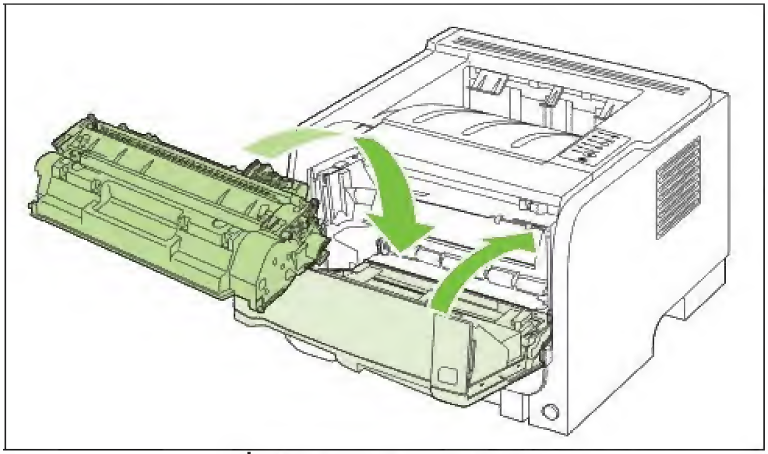

টোনার স্থাপন ও কভার বন্ধ করা

৫. সবশেষে প্রিন্টারের দরজা বন্ধ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে হবে এবং একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে কার্যকরিতা পরীক্ষা করতে হবে।

৫.২ টোনার এবং কার্টিজে কালি রিফিল করা

প্রিন্টারে কালি রিফিলের জন্য Black, Magenta, Yellow & Cyan এ চারটি কালি বাজার থেকে কিনে আনতে হবে। সব কালার শেষ না হলে শুধু প্রয়োজনীয় কালার কিনলেই চলবে।

প্রিন্টারের ভেতর থেকে অতি সাবধানে Black Cartridge ও Color Cartridge দুইটিই বাহির করে আনতে হবে।

এবার কার্টিজ দুইটির উপরের স্টিকারটি তুলে ফেলতে হবে।

চিত্রের মতো স্থানে সুচ দিয়ে ফুটা করতে হবে। স্টিকার তুললেই বুঝা যাবে কোথায় কোথায় ফুটো করতে হবে। কালার কার্টিজে মোট তিনটি কালার কালি রিফিল করতে হবে। তাই নির্দিষ্ট স্থানে তিনটি ফুটো করতে হবে। আর ব্ল্যাক কার্টিজটির একটি স্থানে ফুটো করলেই চলবে।

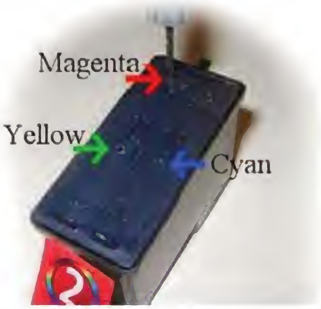

এখন একটি সিরিঞ্জে পরিমাণমতো কালি নিয়ে নির্দিষ্ট কালার নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করাতে হবে। কালার উল্টো পাল্টা হলে কিন্তু প্রিন্টার প্রিন্ট করার সময় উল্টো পাল্টা কালিতে প্রিন্ট করবে।

সবশেষে আবার কার্টিজ দুইটি সঠিকভাবে প্রিন্টারে স্থাপন করতে হবে। কালি রিফিল করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রিন্ট করতে হবে।

প্রিন্টার থেকে টোনারটি যথাযথভাবে খুলে আনতে হবে। টোনারের রিফিল হোলটি খুঁজে দেখতে হবে। এটি সাধারণত স্ক্রুর নিচে ফেস প্লেটের উপর থাকে।

রিফিল হোলের ক্যাপটি খুলে ফেলতে হবে।

রিফিল টোনারের কালির বোতলের মুখটি খুলে পরিমাণ মতো ঢালতে হবে।

অনেক টোনার রিফিল করলেও কাজ করে না। এক্ষেত্রে পেজ—কাউন্ট চিপটি খুলে আবার লাগাতে হয় (রিসেট করতে হয়) অথবা পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণভাবে রিফিল কালির সাথেই এটি সংগ্রহ করতে হয়। প্রিন্টার টোনারের উপরের দিকের ডান অংশে সোনালী রঙ এর পেজ-কাউন্ট চিপটি থাকে। স্ক্রু খোলে এটি বের করে এটিকে রিসেট করতে হবে অথবা প্রয়োজনে নতুনটি লাগাতে হবে। এভাবে টোনার রিফিল করার পর টোনারটিকে দুই হাতে ধরে হালকা করে উপর-নিচে ঝাকিয়ে টোনারটি প্রিন্টারে লাগাতে হবে।

ব্যবহারিক—৬ : Disk Clean up, Scandisk, Disk Defragment এবং System Restore করার দক্ষতা

৬.১. Disk Cleanup করার দক্ষতা অর্জন

Disk Cleanup করে অপ্রয়োজনীয় অনেক ফাইল মুছে হার্ডডিস্কের স্পেস বাড়ানো যায় এবং কাজের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করা যায়।

Disk Cleanup করার ধাপ :

Disk Cleanup করার পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. Start মেনু থেকে যথাক্রমে Programs এবং Accessories নির্বাচন করতে হবে। তাহলে System tools এর সাবমেনু প্রদর্শিত হবে।

২. সাব মেনু থেকে Disk Cleanup এ ক্লিক করতে হবে। Disk Cleanup উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। যে ড্রাইভ থেকে ফাইল মুছতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে।

৩. প্রয়োজনীয় ড্রাইভ নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। উক্ত ড্রাইভ মুছে ফেলার মতো অপ্রয়োজনীয় ফাইল যদি থাকে তবে নিম্নরূপ ডায়ালগ বক্স আসবে।

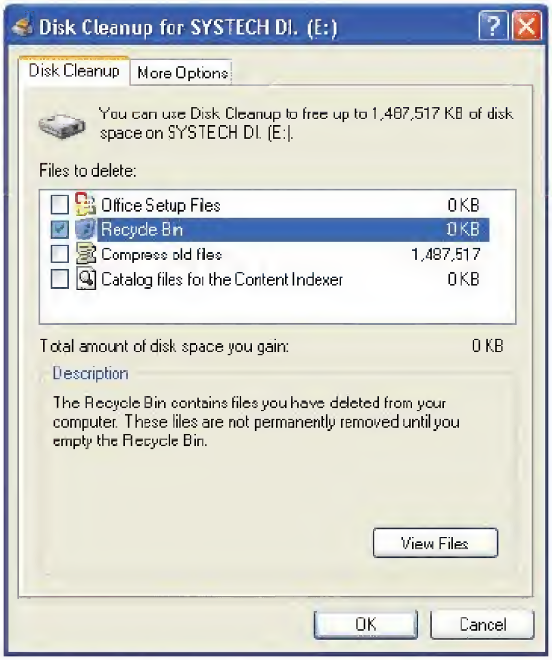

৪. প্রত্যেক ধরণের ফাইলের আগে একটি চেক বক্স আছে। অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছতে হলে চেক বক্স নির্বাচন করতে হবে।

৫. তারপর OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। সত্যিই ফাইলগুলো মুছে ফেলা হবে কী না তার জন্য নিম্নরূপ ম্যাসেজ বক্স আসবে।

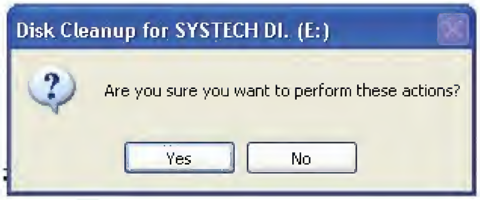

৬. Yes বাটনে ক্লিক করলে Disk Cleanup প্রোগ্রামটি কাজ করবে এবং নির্বাচিত অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে যাবে।
উল্লেখ্য যে Disk Cleanup প্রোগ্রাম দিয়ে মুছে ফেলা ফাইল Recycle Bin ফোল্ডারে জমা হয় না। ফলে তা আর পুনরুদ্ধার করা যায় না।

৬.২ Scandisk (Disk Check) করার দক্ষতা অর্জন

১. উইন্ডোজের **Start** বাটনে ক্লিক করতে হবে।
২. শর্টকাট মেনু থেকে **Open Windows Explorer** এ ক্লিক করতে হবে।
৩. নেভিগেশন প্যানের **Computer** এ ক্লিক করলে রাইট প্যানে ড্রাইভসমূহ প্রদর্শিত হবে।

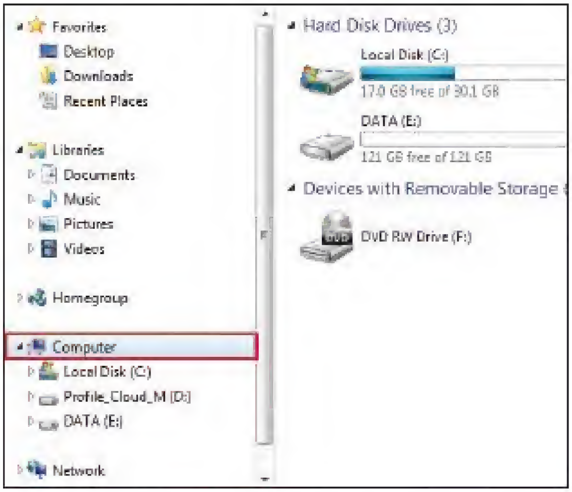

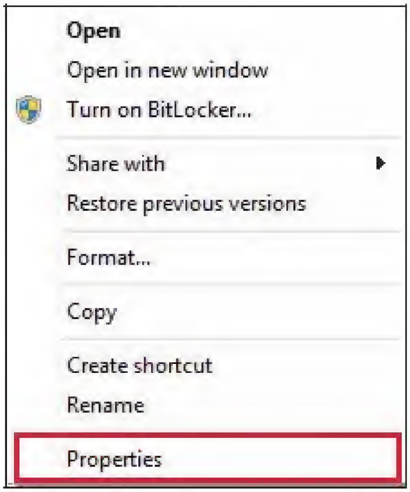

৪. যে ড্রাইভটি চেক করা দরকার সেটির উপর রাইট ক্লিক করতে হবে।
৫. প্রদর্শিত মেনু থেকে **Properties** এ ক্লিক করতে হবে।
৬. **Tools** ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। **Check now** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

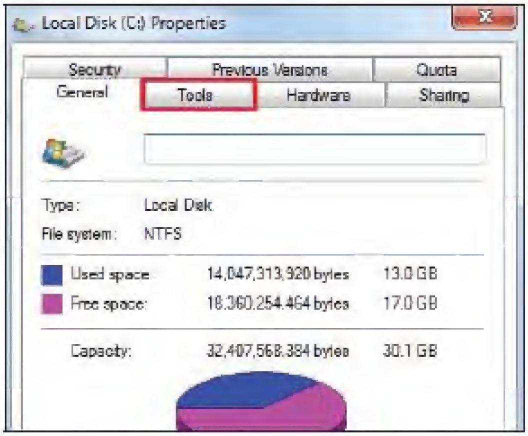

৭. চেক ডিস্ক উইন্ডো থেকে **Automatically fix file system errors** অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।

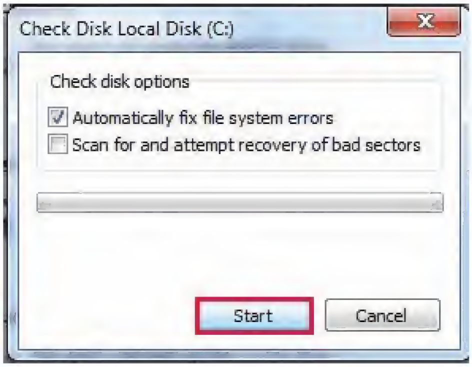

৮. Start বাটনে ক্লিক করতে হবে। যদি নির্বাচিত ড্রাইভটিতে অপারেটিং সিস্টেম থাকে অর্থাৎ এটি যদি সিস্টেম ড্রাইভ হয় তাহলে ওয়ার্নিং বার্তাসহ প্রদর্শিত ডায়ালগ বক্সের Schedule disk check অপশনে ক্লিক করতে হবে।

৯. এক্ষেত্রে সব প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে কম্পিউটার রিস্টার্ট করলে চেকিং অপশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে পরবর্তী উইন্ডো খোলার আগেই ফলাফল দেখাবে। যদি ড্রাইভটি সিস্টেম ড্রাইভ না হয় তাহলে কম্পিউটার রিস্টার্ট করার দরকার নেই। Start বাটনে ক্লিক করলে চেকিং শুরু হবে এবং ফলাফল দেখাবে।

৬.৩. Disk Defragment করার দক্ষতা অর্জন

Disk defragmentation করার ধাপ :

১. Start মেনু থেকে যথাক্রমে Programs এবং Accessories নির্বাচন করতে হবে। System Tools এর সাবমেনু প্রদর্শিত হবে।

২. সাব মেনু থেকে Disk defragmentation এ ক্লিক করতে হবে। Disk Defragmentation উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

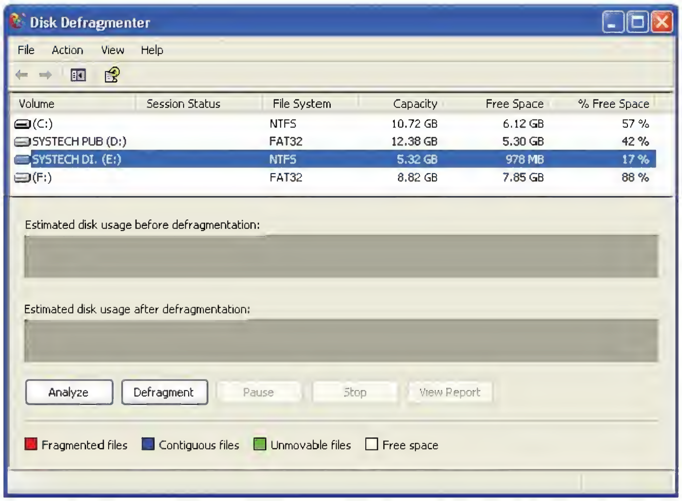

৩. ডাইরেক্টরি নির্বাচনের জন্য ড্রাইভ লিস্ট প্রদর্শিত হবে।

৪. যে ডাইরেক্টরি Defrag করতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে।

৫. Defragment বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

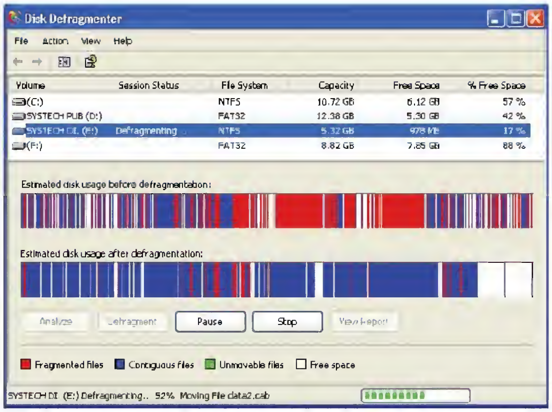

Defragmenting প্রক্রিয়া শুরু হবে। কতটুকু Defragmenting হয়েছে তা উইন্ডোর নিচের দিকে প্রদর্শিত হবে।

৬. Disk Defragmentation উইন্ডোর বাটনগুলোর কার্যকরিতা উল্লেখ করা হলো।

Stop : এ বাটনে ক্লিক করে Disk Defragmentation প্রক্রিয়া বাতিল করা যাবে।

Pause : এ বাটনে ক্লিক করলে Disk Defragmentation প্রক্রিয়া আপাতত থামানো যাবে। Pause বাটনে ক্লিক করলে এটি Resume নাম ধারণ করবে। Resume বাটনে ক্লিক করে পুনরায় Disk defragmentation শুরু হবে।

৭. Disk Defragmentation প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলে নিম্নরূপ বার্তা প্রদর্শিত হবে।

৮. প্রয়োজনমত View Report বা Close বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৯. View Report বাটনে ক্লিক করলে যে ড্রাইভের Defragmentation করা হয়েছে তার ফলাফল দেখাবে।
১০. Close বাটনে ক্লিক করলে উইন্ডোটি বন্ধ হয়ে যাবে।

৬.৪. System Restore করার দক্ষতা অর্জন

১. Sart > Program > Accessories > System Tools > Backup নির্দেশ দিতে হবে। পর্দায় ব্যাকআপ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।
২. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। প্রদর্শিত Backup উইজার্ড থেকে Backup files and settings রেডিও বোতামটি নির্বাচন করতে হবে।
৩. আবার Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে নিম্নরূপ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।

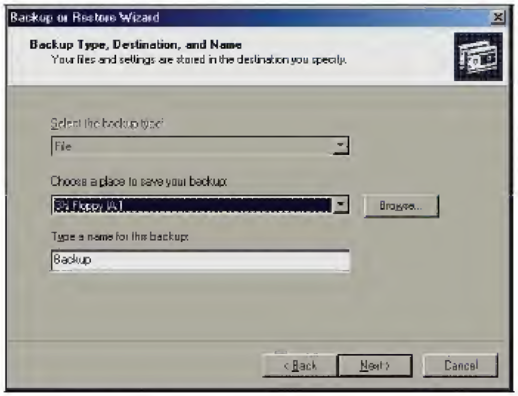

চারটি রেডিও বাটন আছে। রেডিও বাটনগুলোর ক্যাপশন থেকেই উহাদের কার্যকরিতা বুঝা যায়। কী জাতীয় ডেটা ব্যাকআপ গ্রহণ করা হবে তা এ রেডিও বোতাম থেকে নির্ধারণ করা হয়।
৪. ধরা যাক, ফাইলের ব্যাকআপ এবং সেটিংস কপি করতে হবে। এক্ষেত্রে My Documents and settings রেডিও বাটনটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে নিম্নরূপ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।
ব্যাকআপ কপি কোথাও সংরক্ষণ করতে চাইলে তা নির্বাচন করতে হয়। Choose a place to save your backup লিস্ট বক্স থেকে প্রয়োজনীয় ড্রাইভ বা ডাইরেক্টরি যেমন অন্য কোনো হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, সিডি বা অন্য কোনো নেটওয়ার্ক অবস্থান নির্বাচন করতে হবে অথবা Browse বাটনে ক্লিক করে পাথ নির্ধারণ করতে হবে।
৫. Type a name for his backup টেক্সট বক্সের মধ্যে ব্যাকআপ ফাইলের নাম লিখতে হবে।
৬. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে প্রদর্শিত উইজার্ড Backup-এর জন্য নির্ধারিত অপশনগুলো প্রদর্শিত করবে।
৭. Finish বোতাম ক্লিক করতে হবে। ব্যাকআপ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং প্রগ্রেস প্রদর্শন করার জন্য একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। ব্যাকআপ সম্পন্ন হওয়ার পর উইন্ডো আসবে।
৮. ব্যাকআপ গ্রহণ সমাপ্ত হলে ☒ Close বোতাম ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করতে হবে।

৯. কোনো Removble মিডিয়াতে ব্যাকআপ করলে তা সরিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।

ডেটা রিস্টোর করা

ব্যাকআপ করা ডেটা ব্যবহার করার জন্য রিস্টোর করে নিতে হয়। নিচে ব্যাকআপ করা ডেটা রিস্টোর করার জন্য যা করতে হবে:

১. কোনো Removble মিডিয়াতে ব্যাকআপকৃত ডেটা থাকলে তা কম্পিউটারে প্রবেশ/সংযোগ করতে হবে।
২. Start > All Programs > Accessories > System > Backup নির্দেশ দিতে হবে। পর্দায় Backup উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। Next বোতাম ক্লিক করতে হবে। নিম্নরূপ উইজার্ড আসবে।

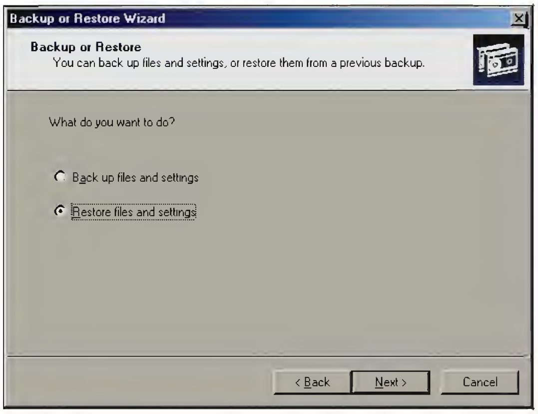

৩. Restore files and settings বোতামটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবার উইজার্ডের পরবর্তী পর্যায় প্রদর্শিত হবে। যে মিডিয়াতে বা ডাইরেক্টরিতে ব্যাকআপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নির্বাচন করে পূর্বের ব্যাকআপকৃত ফাইল নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে Browse বোতাম ক্লিক করে যথাযথ ডাইরেক্টরি থেকে ব্যাকআপ ফাইল নির্বাচন করা যায় । কোথায় রিস্টোর করা হবে তা উইজার্ডের ডান দিকে নির্ধারিত হয়।
৪. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে নির্ধারিত Restore অপশনসমূহসহ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৫. Restore Process ডায়ালগ বক্স আসবে এবং নির্বাচিত ফাইলসমূহ Restore হওয়ার পর উহার তথ্য প্রদর্শন করবে।
৬. It Close বোতাম ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করতে হবে। এখন টার্গেট ডাইরেক্টরি থেকে রিস্টোর করা ফাইলসমূহ ব্যবহার করা যাবে ।

ব্যবহারিক—৭ : প্রোগ্রাম ও ডেটা ব্যাক-আপ তৈরির দক্ষতা অর্জন

৭.১. ফাইল/ফোল্ডার ক্রিয়েট, ডিলেট ও রিনেম করতে পারা

ফোল্ডার হচ্ছে ফাইল সংরক্ষণ করে রাখার জায়গা। একই ধরনের কাজের একাধিক ফাইলকে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য একটি ফোল্ডারের ভেতরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

নতুন ফোল্ডার তৈরি করা

1. Start > All Programs > Windows Explorer নির্দেশ দিয়ে এক্সপ্লোরার উইন্ডোতে আসতে হবে।
২. যে ফোল্ডারের অধীন সাব-ফোল্ডার তৈরি করা দরকার সে ফোল্ডারটি নির্বাচন করে উইন্ডোর বাম অংশ থেকে উক্ত ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করতে হবে। My Computer আইকনে ক্লিক করে ডান অংশে প্রদর্শিত D: ড্রাইভে ডাবল ক্লিক করতে হবে।

3. File > New > Folder নির্দেশ দিতে হবে।
4. New Folder নামে ফোল্ডার তৈরি হবে। অন্য কোনো নাম দিতে চাইলে সে নাম টাইপ করে এন্টার দিতে হবে। SYSTECH লিখে এন্টার দিলে এ নামে ফোল্ডার তৈরি হবে।

ফাইল/ফোল্ডার রিনেম করা

কোনো ফাইল বা ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন বা রিনেম করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এখানে (অর্থাৎ পপআপ মেনু ব্যবহার করে ফাইল বা ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন করার পদ্ধতি) দেখানো হলো।

১. যে ড্রাইভের ফাইল বা ফোল্ডারকে রিনেম করতে হবে সে ড্রাইভটি ওপেন করতে হবে।
২. তারপর উক্ত ড্রাইভে ভেতরের উক্ত ফাইল বা ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। নিম্নরূপ পপআপ মেনু দেখা যাবে।

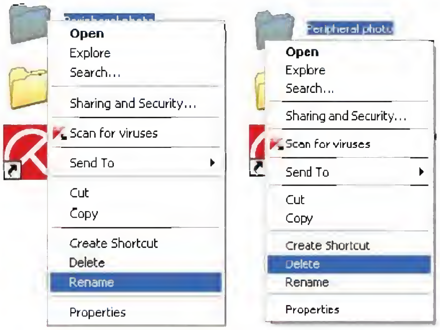

৩. পপআপ মেনু থেকে Rename এ ক্লিক করতে হবে। তাহলে উক্ত ফাইল/ফোল্ডারটি রিনেম করা অপশন দেখাবে। নতুন নাম টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

ফাইল/ফোল্ডার ডিলেট করা

কোনো ফাইল বা ফোল্ডারকে ডিলেট বা মুছে ফেলার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এখানে পপআপ মেনু ব্যবহার করে ফাইল বা ফোল্ডারটি ডিলেট (Delete) করার পদ্ধতি দেখানো হলো।

১. যে ড্রাইভের ফাইল বা ফোল্ডারকে ডিলেট (Delete) করতে হবে সে ড্রাইভটি ওপেন করতে হবে।
২. তারপর সংশ্লিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। নিম্নরূপ মেনু দেখা যাবে।
৩. পপআপ মেনু থেকে Delete এ ক্লিক করতে হবে।
৪. Delete এ ক্লিক করার পর নিম্নরূপ একটি Confirmation message আসবে।

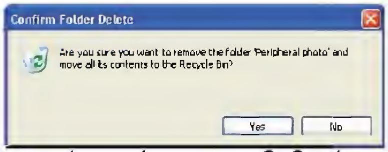

৫. এখান থেকে Yes লেখাতে ক্লিক করলে উক্ত ফাইল/ফোল্ডারটি ডিলেট (Delete) হয়ে যাবে।

ড্রাইভ/ফোল্ডারের প্রপারটিজ প্রদর্শন

কোনো ড্রাইভ/ফোল্ডারের প্রপারটিজ দেখতে হলে উক্ত ড্রাইভ/ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে তার উপর মাউসের ডান বাটন দিয়ে ক্লিক করতে হবে। নিম্নোক্ত পপআপ মেনু দেখা যাবে।

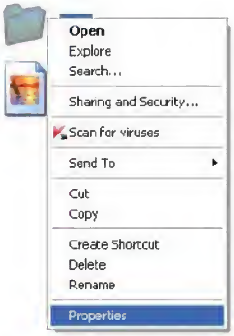

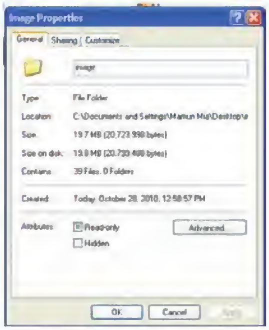

পপআপ মেনু থেকে Properties এ ক্লিক করতে হবে। তাহলে নিম্নরূপ একটি উইন্ডো দেখা যাবে।

এখানে ফোল্ডারের সাইজ, লোকেশন (Location) ইত্যাদি দেওয়া আছে। এ Sharing ট্যাবে ক্লিক করে নেটওয়ার্ক এ ফাইল বা ফোল্ডারের Share দেওয়া যায়। এছাড়া Customize ট্যাবে ক্লিক করে ফোল্ডার এর আইকন পরিবর্তন করা যায়।

ব্যবহারিক—৮ : এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটলেশন-এর দক্ষতা অর্জন

৮.১. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারা

এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম

প্রতিদিন সারাবিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য নতুন নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ভাইরাসের উপর গবেষণা করে এর প্রতিষেধক অর্থাৎ এন্টিভাইরাসও তৈরি হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে জনপ্রিয় কয়েকটি এন্টিভাইরাস হলো :

১. এভিজি (AVG)
২. আভাস্ত (AVAST!)
৩. আভিরা (Avira)
৪. ক্যাসপারেস্কি (Kaspersky)
৫. ম্যাকএফির ভাইরাস স্ক্যান (McAffy's Virus Scan)
৬. নর্টন এন্টিভাইরাস (Norton Anti Virus – NAV)
৭. আইবিএম এন্টিভাইরাস (IBM AntiVirus)
৮. পিসি সিলিন (PC Cillin)
৯. বিটডিফেন্ডার (Bitdefender)
১০. পিসি টুলস এন্টিভাইরাস (PC Tools AntiVirus)
১১. পান্ডা এন্টিভাইরাস (Panda AntiVirus) ইত্যাদি।

৮.২ এন্ট্রিভাইরাস সফটওয়্যারসমূহ ইন্সটল ও আন-ইনস্টল করতে পারা

জনপ্রিয় এন্টিভাইরাস হলো ক্যাসপারাস্কি। বাজারে এর বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়। এখানে ক্যাসপারাস্কি ২০১৬ সংস্করণটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক্যাসপারাস্কি ২০১৬ এন্টিভাইরাস ইন্সটল করা

১. এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল করার জন্য ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ থাকতে হবে। কাজেই প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ঠিক রয়েছে কীনা।
২. বাজার থেকে সংগ্রহ করা ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসের ইন্সটলার সিডিটি সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভে প্রবেশ করাতে হবে।
৩. ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে অটোরান এনাবল্ড করা থাকলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপেন হবে। আর তা না হলে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে সিডিটি ব্রাউজ করে এন্টিভাইরাসটির সেটআপ ফাইলটিতে মাউস

পয়েন্টার দিয়ে ডাবল ক্লিক করতে হবে। ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল নোটিফিকেশন আসলে Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪. সেটআপ হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং নিচের মতো উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

৫. প্রদর্শিত উইন্ডোতে I want to participate in Kaspersky Security Network (KSN) to provide optimal protection for my computer অপশনটি সিলেক্ট করা থাকবে। এটি এই অবস্থাতেই রেখে দেওয়া ভালো। এবার Install বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৬. নিচের উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। অপারেটিং সিস্টেমের কম্পাটিবিলিটি চেক করা শুরু করবে। এতে খানিকটা সময় লাগতে পারে।

৭. কম্পাটিবিলিটি ঠিকঠাক থাকলে এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল হতে শুরু করবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি ইন্সটল হয়ে যাবে এবং উইন্ডোতে বার্তা প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

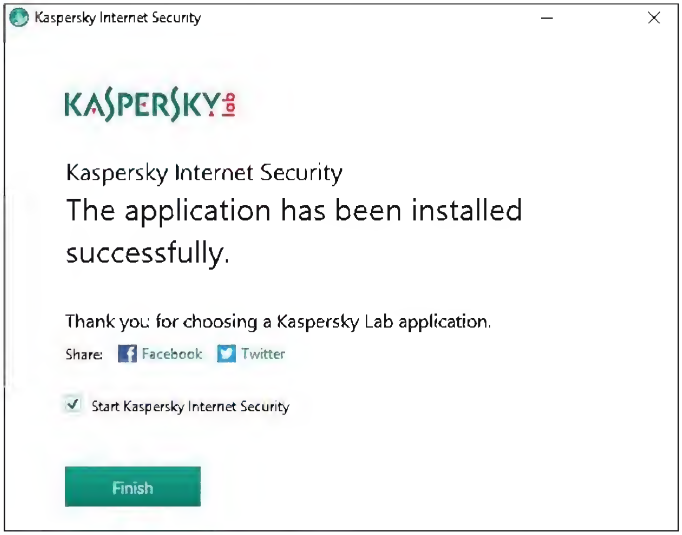

৮. এবার অ্যাপ্লিকেশন লোডিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। এর কিছুক্ষণ পরেই অপারেটিং সিস্টেমের তথ্য গ্রহণ করা শুরু করবে।

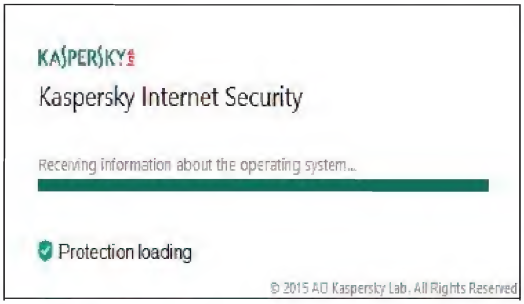

৯. কিছুক্ষণ পর অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাকটিভেট করার উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এন্টিভাইরাসটি কেনার সময় এর সাথে সরবারাহকৃত অ্যাকটিভেশন কোডটি টাইপ করে দিতে হবে। ফলে Activate বাটনটি অ্যাকটিভ হবে। এবার Activate বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১০. ক্যাসপারাস্কি ল্যাবের অ্যাকটিভেশন সার্ভারের সাথে যুক্ত হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। অনলাইনে অ্যাকিটিভেশন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। কিছুক্ষণ পর অ্যাকটিভেশন সুসম্পন্নের বার্তা সম্বলিত উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১১. ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসটি এখন চালু হয়ে যাবে এবং নিচের মতো উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

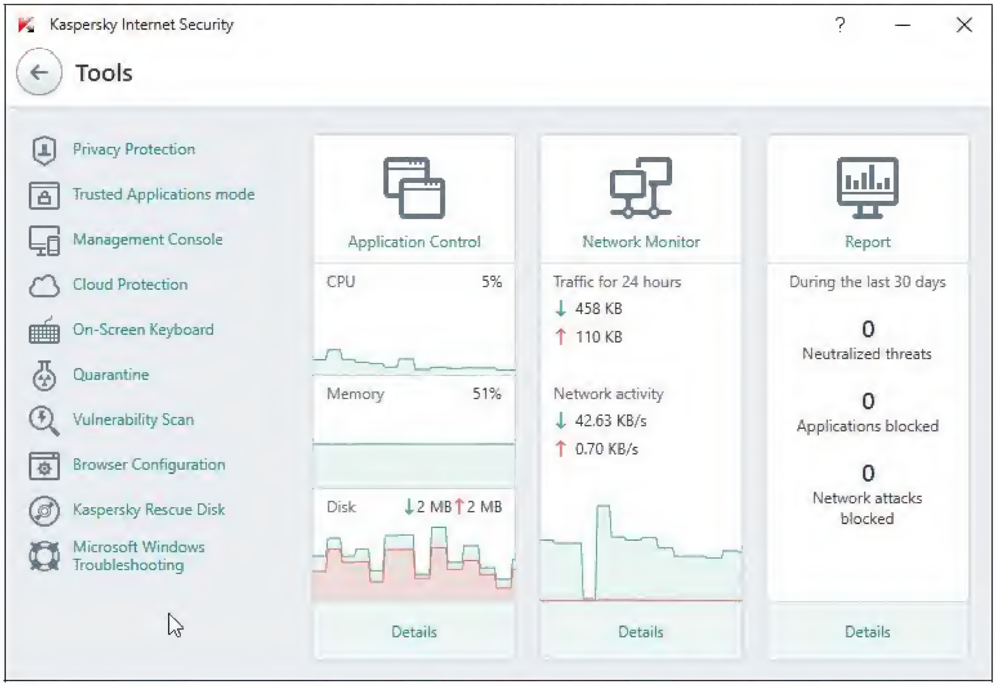

১২. এই উইন্ডোতে এন্টিভাইরাসটি পরিচালনার যাবতীয় টুলগুলো পাওয়া যাবে। এছাড়া উইন্ডোর ডান দিকে এপ্লিকেশন কন্ট্রোল, নেটওয়ার্ক মনিটর এবং রিপোর্ট প্রদর্শিত হবে। উপরের Tools লেখা বাটনটিতে ক্লিক করলে এন্টিভাইরাসের স্বাভাবিক উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে।

ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসকে আপডেট করা

ক্যাসপারাস্কি অ্যান্টিভাইরাসটি ইন্সটল করার পর পরই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবার প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। এজন্য ইন্টারনেট কানেকশন থাকা জরুরি। কোনো কারণে আপডেট প্রক্রিয়া শুরু না হলে Update আইকন সম্বলিত অপশনের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে সেটি আপডেট হয়ে যাবে। এতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগতে পারে।

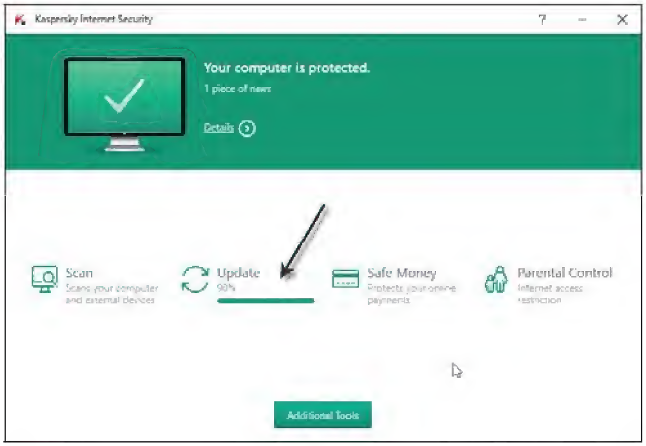

ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসের ব্যবহার

ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল হবার পরপরই নিজে থেকে স্ক্যান করার প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় এটি রুটকিট স্ক্যান করে। এই অবস্থায় Scan এ ক্লিক করলে স্ক্যানিং অপশনগুলো প্রদর্শিত হয়।

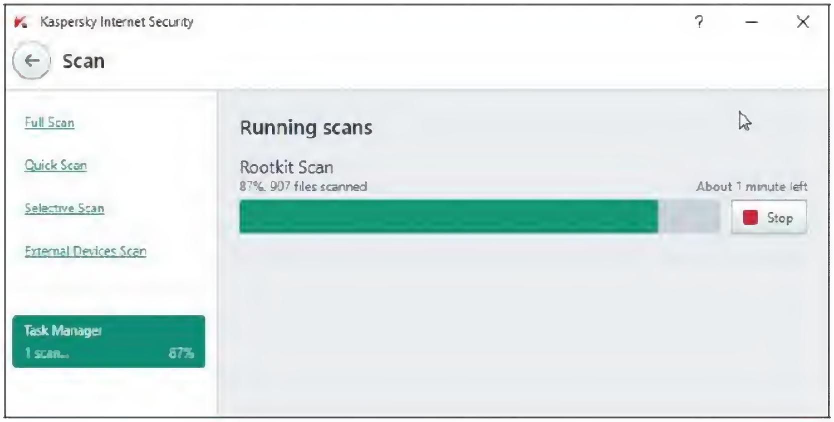

স্বাভাবিক ব্যবহার

স্বাভাবিকভাবে কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথে ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসটি চালু হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি কম্পিউটারটি স্ক্যান করার প্রয়োজন পড়ে তবে স্টার্টআপে থাকা ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসের আইকনের উপর ক্লিক করলে Kaspersky Internet Security এর স্বাভাবিক উইন্ডোটি প্রদর্শিত হয়।

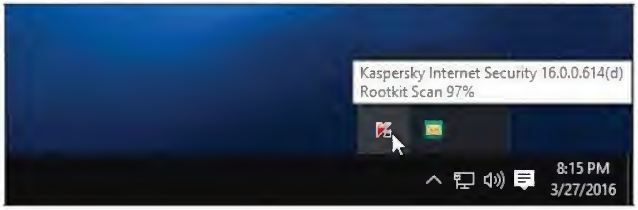

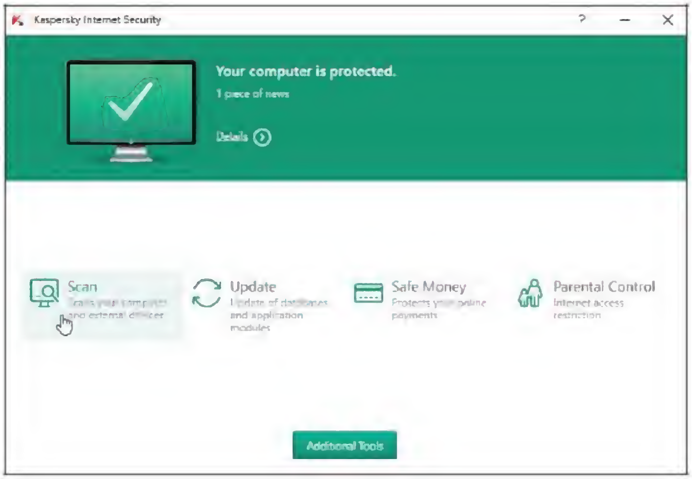

কম্পিউটার স্ক্যান করতে চাইলে Scan এ ক্লিক করতে হবে। ফলে স্ক্যান করার যাবতীয় অপশনগুলো নতুন উইন্ডোতে প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে চাইলে ফুল স্ক্যান, কুইক স্ক্যান, সিলেকটিভ স্ক্যান, এক্সটার্নাল ডিভাইস স্ক্যান করা যাবে। ধরা যাক আমরা নির্দিষ্ট কোনো ড্রাইভকে স্ক্যান করবো। সেক্ষেত্রে Selective Scan অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে।

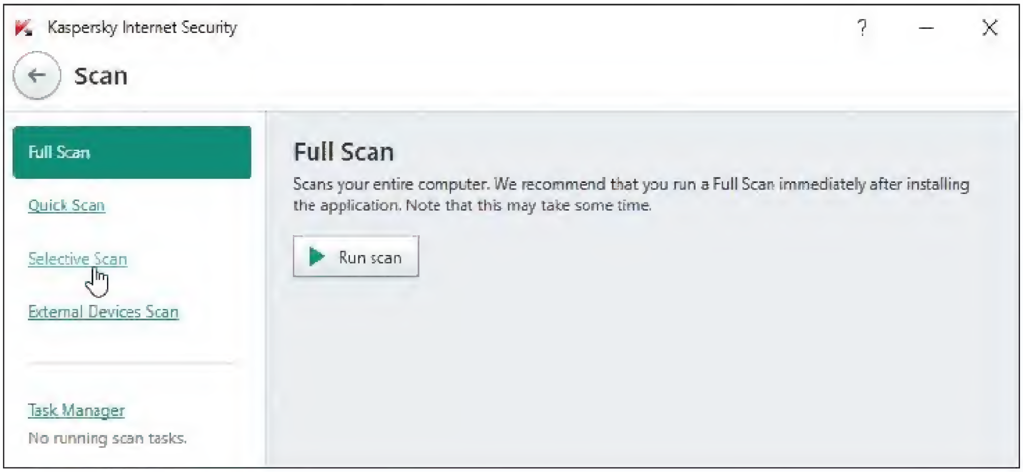

এবার যে আইটেমগুলোকে স্ক্যান করতে হবে সেগুলোকে চাইলে ড্র্যাগ করে এনে এখানে ড্রপ করে দেওয়া যাবে। এটি খুবই ফ্লেক্সিবল একটি অপশন। আর সেটি করতে না চাইলে উপরের Add বাটনে ক্লিক করতে হবে।

নিচের উইন্ডোর মতো স্ক্যান করার জন্য ড্রাইভ/ফোল্ডার সিলেক্ট করার জন্য ড্রাইভগুলো প্রদর্শিত হবে। যে ড্রাইভটি বা ফোল্ডারটি স্ক্যান করতে হবে সেটির লোকেশন নির্ধারণ করতে হবে। তারপর Select বাটনে ক্লিক করতে হবে।

ড্রাইভটি বা ফোল্ডারটি সিলেক্ট হয়ে যাবে। এবার Run scan বাটনে ক্লিক করতে হবে।

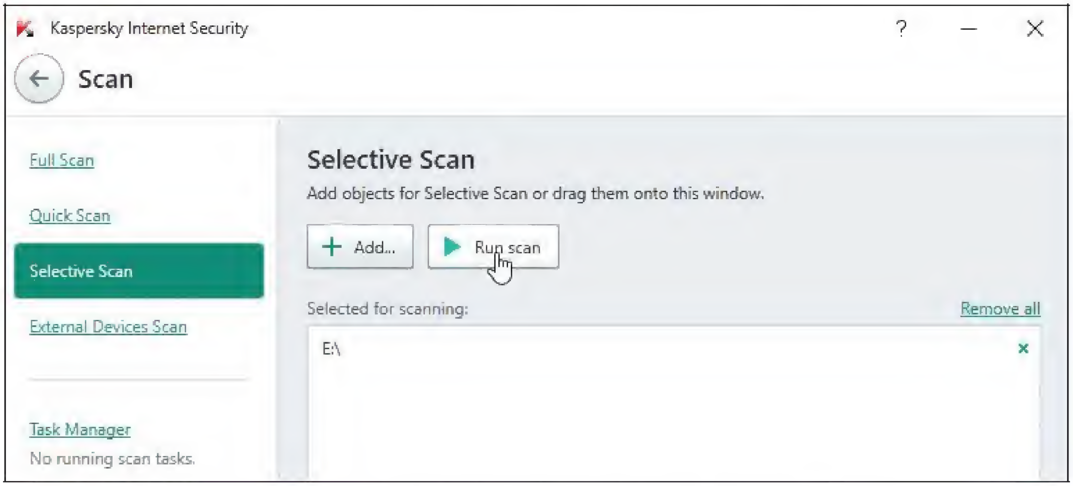

ড্রাইভ স্ক্যান করা শুরু হবে। শতকরা কত ভাগ স্ক্যান করা সম্পন্ন হলো তা পাশে প্রদর্শিত হবে।

এই অবস্থায় নির্দিষ্ট কোনো ড্রাইভে ভাইরাস পেলে একটি লাল মেসেজ বক্সের মাধ্যমে তা প্রদর্শিত হবে। ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাস নিজে থেকেই এটিকে মুছে ফেলতে বা ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব নষ্ট করতে কাজ শুরু করবে। কিছুক্ষণ পর সবুজ একটি ইউন্ডোতে ভাইরাস মুক্ত করার বার্তা প্রদর্শিত হবে। এভাবে যত ভাইরাস, ট্রোজান, ওয়ার্ম ইত্যাদি পাবে সবগুলোর ক্ষেত্রে বার্তা দেখিয়ে সেগুলোকে সংক্রমণমুক্ত করবে।

ধরা যাক, আমরা একটি ফোল্ডারকে এবার স্ক্যান করবো। এটি করার জন্য Selective Scan অপশনটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় উক্ত ফোল্ডারটিকে ড্র্যাগ করে ড্রপ করতে হবে। ফোল্ডারটি সিলেক্ট হয়ে গেলে উপর থেকে Run scan বাটনে ক্লিক করতে হবে।

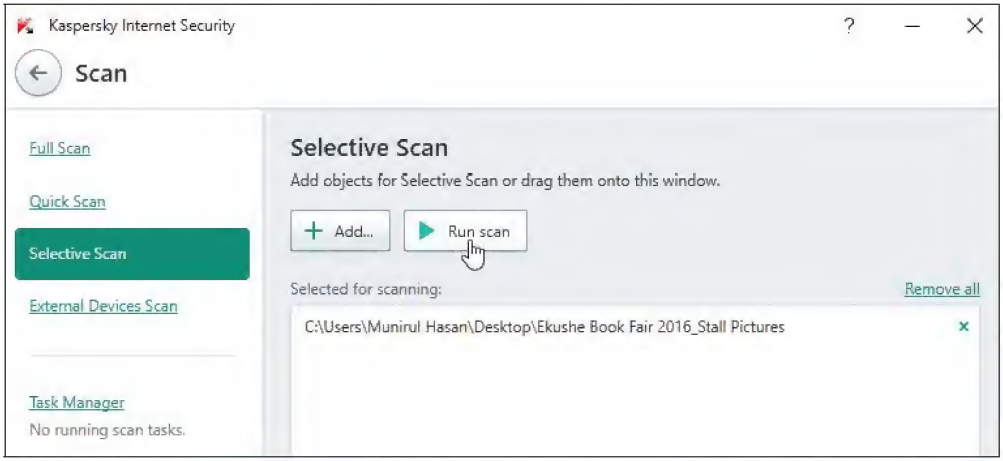

স্ক্যান প্রক্রিয়া শুরু হবে। এটি শেষ হলে রিপোর্ট দেখার জন্য Detailed report লিংকে ক্লিক করতে হবে। ফলে স্ক্যানের ফলাফল রিপোর্ট আকারে প্রদর্শিত হবে।

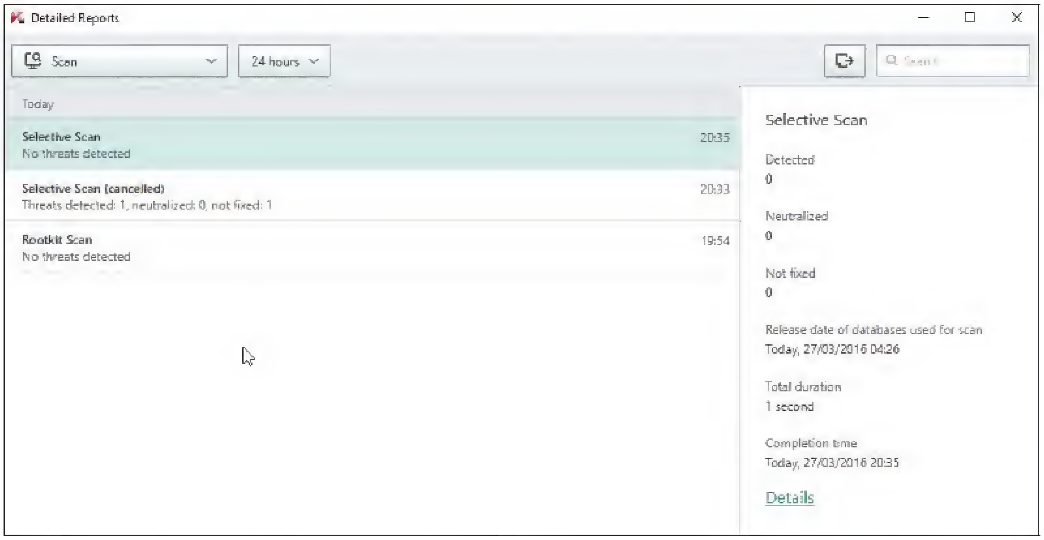

এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারসমূহ আন-ইনস্টল করতে পারা

কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার মাধ্যমে তাকে যেমন কার্যক্ষম করা যায় তেমনি অনেক সময় কোনো সফটওয়্যারের ব্যবহার কমে গেলে তাকে অপসারণেরও প্রয়োজন পড়ে। কম্পিউটার হতে অপ্রয়োজনীয় এসব সফটওয়্যার অপসারণ কিংবা বাদ দেওয়ার পদ্ধতিটিই হলো আনইন্সটল। সাধারণত পুরনো কোনো সফটওয়্যার যা এখন আর ততটা ব্যবহৃত হচ্ছে না, বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভার, গেমস ইত্যাদি আনইন্সটলের মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে মুছে ফেলা হয়। কোনো প্রোগ্রাম আনইন্সটল করলে ঐ প্রোগ্রামটির সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই কম্পিউটার থেকে মুছে যায় এবং প্রোগ্রাম মেনু থেকে ঐ প্রোগ্রামটির নাম এবং যেখানে এর শর্টকাট স্থাপিত হয়েছে তা মুছে যায়। নতুন কোনো এন্টিভাইরাস ইন্সটল করার জন্য কম্পিউটারে আগে ইন্সটল করা এন্টিভাইরাসটি আন-ইন্সটল করে নিতে হয়। উইন্ডোজ-৭ এর Uninstall অপশনটি ব্যবহার করে সহজেই আন-ইন্সটল করা যায়। সেজন্য—

১. Start মেনুতে ক্লিক করে Control Panel অপশনে ক্লিক করতে হবে।
২. Control Panel উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।
৩. Programs এর অধীন Uninstall a program আইকনে ক্লিক করতে হবে।

৪. Programs and Features উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। কম্পিউটারে ইনস্টল করা প্রোগ্রামসমূহ প্রদর্শিত হবে। এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি খুঁজে প্রোগ্রামটি সিলেক্ট করতে হবে। এ অবস্থায় সেটি হাইলাইটেড অবস্থায় থাকবে। এবার Uninstall/Change বাটনে ক্লিক করতে হবে।

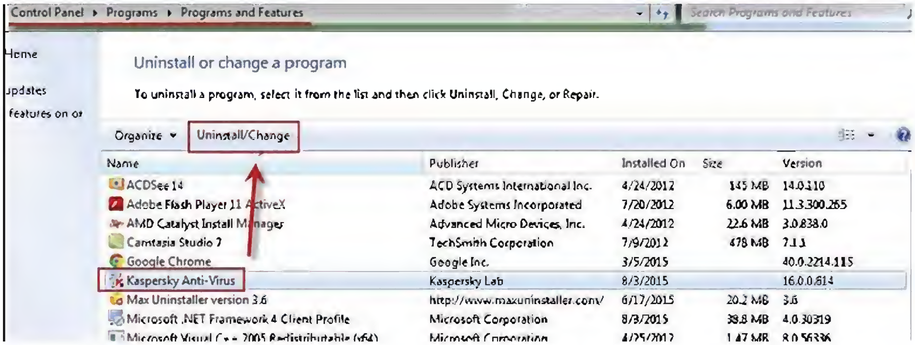

৫. একটি মেসেজ বক্স আসবে। Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

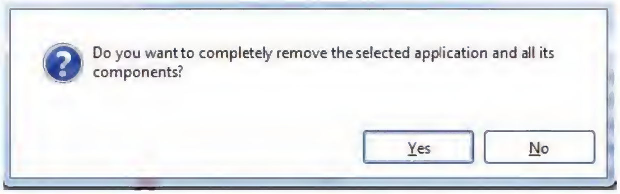

৬. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটির আনইন্সটল হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রোগ্রামটি আনইন্সটল হয়ে যাবে।

৮.৩. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারকে ভাইরাস ও মেলওয়্যার মুক্ত করতে পারা

ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে ভাইরাস ও মেলওয়্যার মুক্ত করার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. প্রধান উইন্ডো থেকে Scan বাটনে ক্লিক করতে হবে।

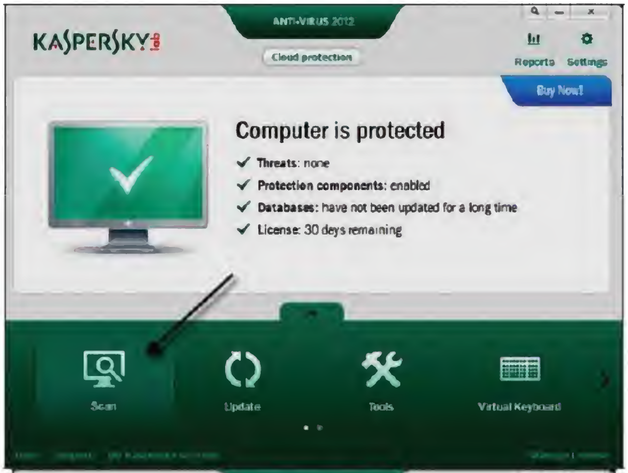

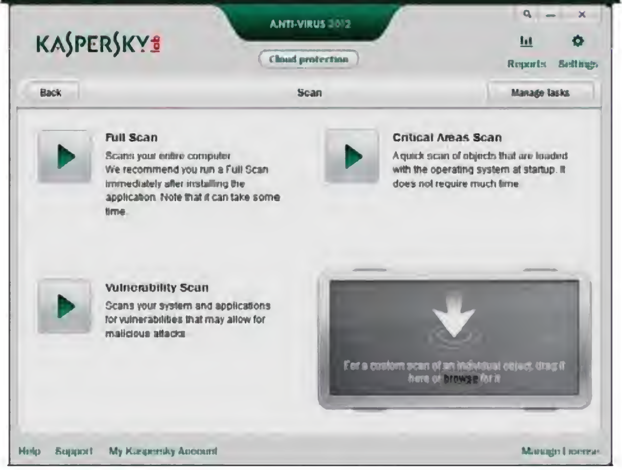

২. এখানে আপনি Full Scan, Vulnerability Scan ও Critical Areas Scan নামে প্রধান ৩টি বাটন পাওয়া যাবে। চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো একটি স্ক্যান প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩. এছাড়া উইন্ডোর নিচের দিকে কাস্টম স্ক্যানের জন্য রয়েছে একটি মনিটরসদৃশ অংশ-যেখানে প্রধানত দুইভাবে কাস্টম স্ক্যান করা যায়। প্রথম পদ্ধতি হলো নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্ট (ফোল্ডার) কে ড্র্যাগ করে এখানে এনে ছেড়ে দেওয়া কিংবা এখানে থাকা browse লিঙ্কে ক্লিক করা।

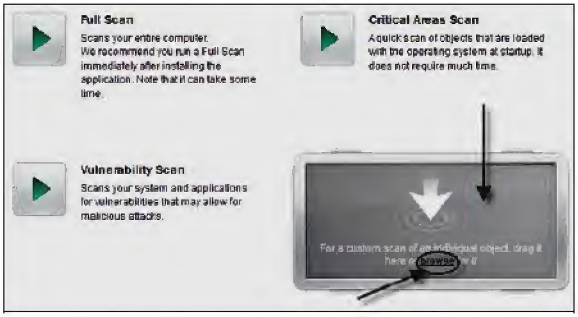

৪. প্রথম পদ্ধতিটি প্রয়োগের জন্য কাঙ্ক্ষিত ড্রাইভ হতে কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডারটিকে ড্র্যাগ করে এনে মনিটর সদৃশ্য অংশটির উপর ছেড়ে দিতে হবে। এ সময় সিস্টেম ট্রে-তে স্ক্যানিং অপশন প্রদর্শিত হবে। সেখান থেকে Scan Now বাটনে ক্লিক করতে হবে। (স্ক্যান করার পূর্বে অবশ্যই এন্টিভাইরাসটিকে আপডেট করে নিতে হবে নতুবা নতুন ভাইরাস এবং ওয়ার্মগুলোকে এটি শনাক্ত করতে পারবে না)।

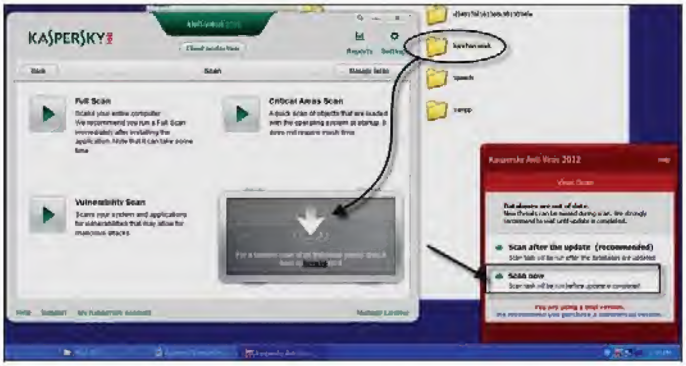

৫. স্ক্যান প্রক্রিয়া শুরু হবে। অবজেক্ট তথা ফোল্ডারটির সাইজের উপর স্ক্যানিংয়ের সময় নির্ভরশীল।

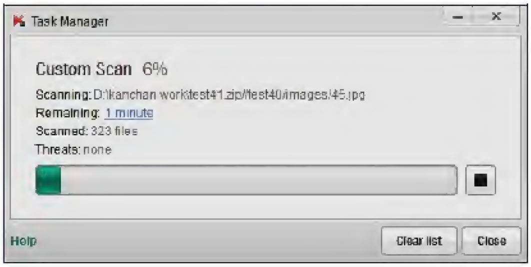

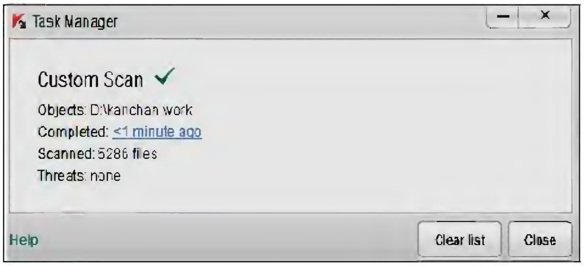

৬. স্ক্যানিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ফলাফল দেখাবে। Close বাটনে ক্লিক করে উইন্ডোটি বন্ধ করতে হবে।

৭. দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাস্টম স্ক্যান করতে চাইলে browse লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। Custom Scan উইন্ডো আসবে। এখান থেকে যে ড্রাইভটিকে স্ক্যান করতে হবে সেটির চেক বক্সে ক্লিক করতে হবে। তারপর OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

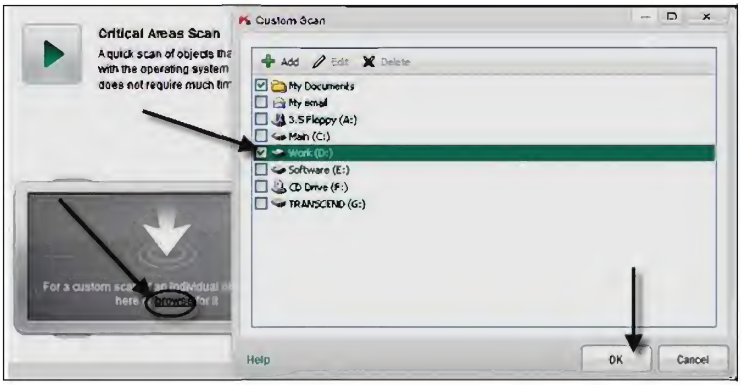

৮. সিস্টেম ট্রে-এর কাছে নিচের উইন্ডোটি প্রদর্শিত হলে Scan Now বাটনে ক্লিক করতে হবে। নির্দিষ্ট ড্রাইভটিতে কাস্টম স্ক্যান শুরু হবে।

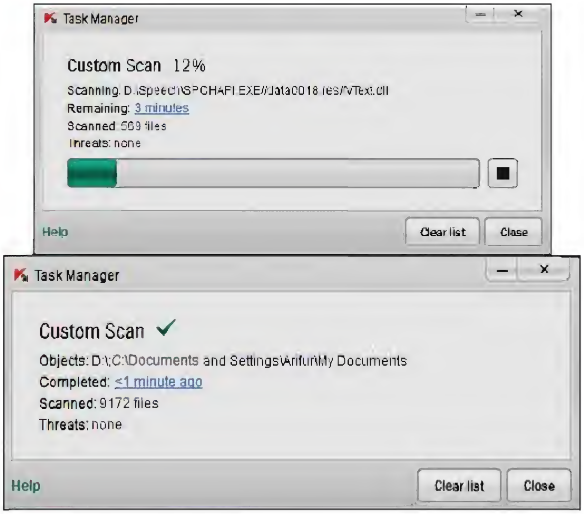

৯. স্ক্যান শেষ হলে তার ফলাফল প্রদর্শিত হবে। কাজ শেষে Close বাটনে ক্লিক করতে হবে।

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি—২

প্রথম পত্র

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট

সাধারণভাবে বলা যায়– দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন উন্নয়নকে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে। অফিসের ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নৈপুণ্যের সাথে অফিস পরিচালনা করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেকে ও কর্মরত প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিই হলো লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট। কর্মদক্ষতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে উন্নয়ন করে তার জীবন পরিচালিত করাকেই লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে।

জীবন উন্নয়নের ধাপ হলো লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট। তাই বলা যায়, যার মাধ্যমে একজন সচিব তার কার্যাবলি, দায়িত্ব, গুণাবলি, কর্মপদ্ধতি, অফিসিয়াল পত্র রচনা, সভা আহ্বান, যোগাযোগ রক্ষা, অভ্যর্থনা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, আচরণ ও অফিসের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান ও নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে।

লাইফ স্কিল ডেভেলমেন্ট এর গুরুত্ব

বর্তমান ব্যবসায় জগতের সকল প্রতিষ্ঠানই স্বল্পসময়ে অধিক কার্য সম্পাদন ও সর্বাধিক ব্যয় সংকোচন করার চেষ্টা করে। আর এই প্রচেষ্টা সফল হয় লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। এ লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট যে সব ক্ষেত্রে অবদান রাখে, তা হলো– কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানবসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, দক্ষ কর্মী সৃষ্টি, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, নথিপত্র সংরক্ষণ, যোগাযোগে উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ, সমন্বয় সাধন, সংগঠন গোপনীয়তা রক্ষা, পত্র রচনা ও যোগাযোগ, সময় বাঁচাতে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, সভা-সমিতি, ভালো ফলাফল, অফিস মেশিন সম্পর্কে জ্ঞান, আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম-উন্নয়ন, পাঠ্যাভ্যাস, সামাজিক দক্ষতা, সমস্যা সমাধান, উপস্থাপনা দক্ষতা, দলবদ্ধ কার্য সম্পাদন, বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি। আর এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর উদ্দেশ্য

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধ্যয়ন করে অফিসের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনপূর্বক দক্ষতার সাথে অফিস পরিচালনা করে আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এ বিষয় পাঠের মাধ্যমে একজন সচিবের কার্যাবলি, দায়িত্ব, গুণাবলি, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, এ বিষয় পাঠের মাধ্যমে জানা যায় সচিব কীভাবে পত্র রচনা, সভা আহ্বান, কার্যবিবরণী লিখন, সভা পরিচালনা, যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রেরণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অভ্যর্থনা, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, আচরণ, অফিসের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে। অর্থাৎ, অফিসের যাবতীয় কার্যাবলি অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদন করাই লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের উদ্দেশ্য।

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট—এর পদ্ধতিসমূহ :

১. জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা পদ্ধতি;
২. সত্যানুসন্ধান পদ্ধতি;
৩. আত্মোপলব্ধি পদ্ধতি;
৪. আত্মোন্নয়ন পদ্ধতি;
৫. নেতৃত্বদান পদ্ধতি;
৬. ব্যক্তিত্ব বিকাশ পদ্ধতি;
৭. বাস্তব উপলব্ধি পদ্ধতি;
৮. সৃজনীশক্তির বিকাশ পদ্ধতি ও
৯. নৈতিকতার উন্মেষ পদ্ধতি।

লাইফ স্কিল ডেভেলমেন্ট—এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে আমাদের দেশেও লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিম্নে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় না। তাই সাধারণ শিক্ষার সাথে লাইফ স্কিল ডেভেলমেন্ট বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি কারিগরি জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান, আত্মোন্নয়ন, সমস্যা সমাধান, ব্যক্তি সম্পর্ক ইত্যাদি দ্বারা মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে। ফলে যে দেশের অতিরিক্ত মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন করে বিদেশে রপ্তানি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হয়।

২. **মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে জ্ঞান থাকলে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলি স্বল্পসময়ে, কম পরিশ্রমে ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা যায়। সুতরাং, মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের গুরুত্ব অপরিহার্য।

৩. **দক্ষ ব্যবস্থাপনা :** ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা—কর্মচারীদের দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৪. **দক্ষ কর্মী সৃষ্টি :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের মাধ্যমে আত্ম উন্নয়ন, সামাজিক দক্ষতা, ব্যক্তি সম্পর্ক, সমস্যা সমাধান, দলবদ্ধ কার্য সম্পাদন, শর্টহ্যান্ড ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করে দক্ষ কর্মী তৈরি করা যায়।

৫. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়টি রপ্ত করে একজন লিপিকার যে কোনো লেখনী স্বল্পসময়ে ও স্বল্পশ্রমে সম্পন্ন করে তার কর্মদক্ষতা দেখাতে পারেন। এটি কার্যালয়ের কার্যভার লাঘব করে এবং সময় ও অর্থ বাঁচিয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. **সমন্বয় সাধন :** লাইফ স্কিল পাঠের মাধ্যমে একজন সচিব সামাজিক দক্ষতা, ব্যক্তি সম্পর্ক, সমস্যা সমাধান, দলবদ্ধ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

৭. **যোগাযোগ উন্নয়ন :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা—কর্মচারীদেরকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলে এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা :** প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সুন্দর, সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপায় বা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান তথা দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে।

৯. **নথিপত্র সংরক্ষণ :** যে কোনো অফিসিয়াল চিঠিপত্র সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনের সময় দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয়। আর এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের মাধ্যমে।

১০. **মুখপাত্র :** এ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন একজন সচিব প্রতিষ্ঠানে তার নির্বাহীর নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করেন। তিনি অনেক সময় নির্বাহীর প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১১. **গোপনীয়তা রক্ষা :** একজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা রক্ষা করে কীভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের মাধ্যমে।

১২. **সময় বাঁচাতে :** লাইফ স্কিল—এর অন্যতম অংশ ইংরেজি শর্টহ্যান্ড। এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অনেক কাজ করা সম্ভব হয়।

১৩. **সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে :** সাঁটলিপির মাধ্যমে দ্রুত ডিকটেশন নিতে পারার দক্ষতা এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আর এই দক্ষতা সাংবাদিকতা পেশার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১৪. **সভা পরিচালনা :** লাইফ স্কিল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সভা সুন্দরভাবে উপস্থাপনা এবং দক্ষতার মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারে।

১৫. **আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোন্নয়ন :** এ বিষয় পাঠে একজন ব্যক্তি নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং আত্মোন্নয়নের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকে।

১৬. **পাঠাভ্যাস :** পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ইচ্ছা, আগ্রহ, পরিবেশ, আসবাবপত্র বিন্যাস, বিষয়বস্তু উপস্থাপন, উপকরণের ব্যবহার, সময় তালিকা, শিক্ষণের মনোভাব ইত্যাদি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের মাধ্যমে এসব উপকরণের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যায়। ফলে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

১৭. **সামাজিক দক্ষতা :** এ বিষয়টি মানুষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নমনীয় আচরণ করে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় শিক্ষা দেয়।

১৮. **সমস্যা সমাধান :** এ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে অফিসের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উপায় জানা যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যায়।

১৯. **বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন :** লাইফ স্কিল পাঠে একটি অফিসের বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়। বাজেটিং ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নেই ভূমিকা রাখে না, বরং পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেও ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট—এর উদ্দেশ্য আলোচনা

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট—এর উদ্দেশ্য : লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়টি একটি কর্মমুখী ও বাস্তবধর্মী বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এটি অধ্যয়ন করে একজন শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিক উন্নয়নসহ অফিসের যাবতীয় কার্যাবলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধ্যয়ন করে অফিসের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জনপূর্বক দক্ষতার সাথে অফিস পরিচালনা করে আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়া যায়। নিচে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করা হলো—

১. **সাচিবিক কার্যাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান দান :** সচিবকে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যাবলি পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হিসেবে অফিসের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা তার দায়িত্ব। লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সচিবের কার্যাবলি ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান এবং সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা। অর্থাৎ সচিব কখন, কোন কাজ, কীভাবে করেন তার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন; নথি সংরক্ষণ, তথ্য যোগাযোগ, রুটিন প্রণয়ন, অফিসের গোপনীয়তা রক্ষা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য।

২. **যোগাযোগ সম্পর্কিত জ্ঞান দান :** দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনো তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানকে যোগাযোগ বলে। পত্র রচনা, সভা আহ্বান ও পরিচালনা করা, উপস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়টি জ্ঞান দান করে। এ বিষয়টি পত্র রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, যা যোগাযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে থাকে। কীভাবে সভা করতে হবে অর্থাৎ সভা পরিচালনা, উপস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. **আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোন্নয়ন :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো

আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

৪. **সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন :** মানুষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নমনীয় আচরণ দ্বারা সামাজিক দক্ষতার উন্নয়ন লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. **ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভব। ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও ব্যক্তি-ব্যক্তি মনোমালিন্যের কারণ দূরীকরণ, আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের উপায় বা পদ্ধতিসমূহ শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা বিষয়টির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬. **তথ্য সংরক্ষণ :** সচিবকে অফিসের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়। আর এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান দান করা লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭. **পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা :** পাঠাভ্যাস দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এর ফলে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, যা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যার্জন সহজতর করে। পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে প্রয়োজন ইচ্ছা, আগ্রহ, পরিবেশ, আসবাবপত্রের বিন্যাস, বিষয়বস্তু উপস্থাপন, উপকরণের ব্যবহার, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান, সময় তালিকা ইত্যাদি উপাদান। লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক জ্ঞান উপকরণের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যায়, যা বিষয়টির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮. **দলবদ্ধ পর্যালোচনা ও কার্য সম্পাদন :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দলবদ্ধভাবে কোনো কার্য সম্পাদন, সদস্যদের হতাশা দূরীকরণ, নেতৃত্বের বিকাশ ইত্যাদি।

৯. **আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৌশলের ব্যবহার :** আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কৌশল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দান করে দক্ষতা উন্নয়ন লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট—এর পদ্ধতিসমূহ আলোচনা

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন পদ্ধতি : সাধারণত দক্ষতার সাথে জীবন উন্নয়নের অবস্থানকে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে। সমাজে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা—চেতনা দ্বারা নিজের জীবনের উন্নয়ন করে থাকে। কেউ ব্যবসায় করে, কেউ চাকুরি করে, কেউ আইনজীবী পেশা গ্রহণ করে, কেউ ডাক্তার বা প্রকৌশলী হয়ে, আবার অনেকে রাজনীতি করেও জীবনের উন্নয়ন করে থাকে। নিম্নে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট—এর বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. **জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা পদ্ধতি :** সমাজের যে কোনো মানুষকে জীবনে উন্নয়ন করতে হলে অবশ্যই জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর শিক্ষা গ্রহণের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে, যেমন— সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, ভাষাশিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা ইত্যাদি।

২. **সত্যানুসন্ধান পদ্ধতি :** জীবনে উন্নয়ন করতে হলে অবশ্যই তাকে সত্যের সন্ধান করে বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে হবে। আর তাই প্রত্যেক মানুষকে একাগ্রচিত্তে সাধনার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান করে লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। এ পদ্ধতিকে অনেকটা আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

৩. **আত্মোপলব্ধি পদ্ধতি :** একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে পারে ও তার নিজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে, তখনই তার আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়েছে বলা যায়। জীবনমান উন্নয়নে এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪. **আত্মোন্নয়ন পদ্ধতি :** আত্মার উন্নয়ন হলো আত্মোন্নয়ন। আত্মোন্নয়ন বলতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ করাকে বুঝায়। আর নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে জীবনে উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে আত্মোন্নয়ন পদ্ধতি হলো লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের অন্যতম পদ্ধতি।

৫. **নেতৃত্বদান পদ্ধতি :** লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের আরেক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো নেতৃত্বদান পদ্ধতি। যারা সমাজজীবনে নেতৃত্বদান করতে পারে, তারা অবশ্যই ব্যক্তিজীবনে উন্নয়ন করতে পারে। নেতৃত্বদান করার

কতকগুলো দিক রয়েছে। যেমন : কর্মীদের সংগঠিত করা, সভা আহ্বান করা, সভা পরিচালনা করা, যোগাযোগ, অভ্যর্থনা ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা ইত্যাদি।

কথোপকথন/আলাপ/গল্পগুজব

কথোপকথন

ইংরেজি 'dialogue' বা 'conversation' এর বাংলা প্রতিশব্দ কথোপকথন। দুই বা তার বেশি ব্যক্তির মধ্যে যে কথাবার্তা তাকেই বলা হয় কথোপকথন। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত একে অপরের সঙ্গে কথা বলে চলি। লক্ষ করলে দেখব, তার অধিকাংশ কথাই বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ এবং যথাযথ শব্দ প্রয়োগে ও বাক্য–বিন্যাসে সুসংহত নয়। লিখিত কথোপকথন বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ বাক্য কাম্য নয়; তাকে শুধু ভাষাগত সম্পূর্ণতা দান করলেই চলবে না, অর্থগত পূর্ণতা দিতে হবে।

কথোপকথন–নির্ভর সাহিত্যশাখার নাম নাটক। কথোপকথনই একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনি এগোয়, চরিত্রগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে পাপড়ি মিলে ফুটে–ওঠা ফুলের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত করে, ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনি ও চরিত্র পরিণতির অভিমুখী হয়। সেজন্য কথোপকথন নাটকের প্রাণ বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে শিক্ষার্থীর অনুশীলিত কথোপকথনের সঙ্গে নাটকের কথোপকথনের পার্থক্য দুস্তর। শিক্ষার্থীর লেখ্য কথোপকথন প্রধানত বিষয়ানুগ, তাতে কেবল প্রদত্ত বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে, নাটকের কাহিনির অগ্রগতি ও চরিত্রের পরিণামমুখী বিকাশের অবকাশ নেই। এ জন্য সাধারণ কথোপকথন চরিত্রানুগ হয় না। বরং বলা যায়, কোনো প্রাবন্ধিক বিষয়কে কথোপকথনের ভিন্ন স্বাদে পরিবেশিত করা হয়। গল্প–উপন্যাসেও সংলাপ থাকে, তবে তা বর্ণনা অংশের অঙ্গীভূত হয়ে কাহিনি ও চরিত্রের অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

কথোপকথন রচনায় লক্ষণীয় বিষয়

ভালো সংলাপ রচনা অনুশীলনসাপেক্ষ। সেজন্য শিক্ষার্থীকে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন :

১. সংলাপের জন্যে প্রদত্ত বিষয়টি নিয়ে প্রথমে ভালোভাবে ভেবে–চিন্তে মনের মধ্যে বিষয়টিকে গুছিয়ে নিতে হয়। বিষয়ের উপস্থাপনা ও পরিণতির মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। যদিও কাহিনি থাকে না, তাহলেও প্রদত্ত বিষয় বক্তাদের ভাবনা–চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মননের রসদে সজীব ও পুষ্ট হয়ে একটা ক্ষীণ প্রবাহমানতায় পরিণামমুখী হয়। সেজন্য প্রদত্ত বিষয়ের ক্রমবিকাশের বোধটি মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠা চাই।

২. যাদের মধ্যে সংলাপ হবে, সে চরিত্রগুলো নির্দিষ্ট থাকলে তাদের মুখে কথা বসিয়ে সংলাপ রচনা করতে হয়। চরিত্র নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে বিষয় অনুযায়ী চরিত্র ভেবে নিতে হয়। কথার ওপর চরিত্রের প্রতিফলন পড়ে। ছেলেমানুষের মুখে বুড়োর কথা যেমন বেমানান, তেমনি বুড়োর মুখে ছেলেমানুষী কথা হাস্যকর।

৩. সংলাপের আয়তনের নির্দিষ্ট কোনো মাপজোখ নেই। বক্তব্য বিষয় পূর্ণতা লাভ করলেই সংলাপের সমাপ্তি। তবে দীর্ঘ সংলাপ না হওয়াই উত্তম।

৫. লক্ষ রাখতে হবে সংলাপ যেন বক্তা–প্রতিবক্তার নিছক প্রশ্ন ও উত্তরে পর্যবসিত না হয়। আলাপ–আলোচনার মধ্য দিয়ে বক্তব্য বিষয় এগোবে, প্রয়োজনে তর্ক–বিতর্কের কিছুটা আমেজ আসতে পারে।

৬. এ ধরনের সংলাপে নাটকীয়তার অবকাশ নেই। তবে উক্তি–প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে আলোচ্য বিষয় এগুতে এগুতে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা নাটকীয় রস ও মাধুর্যের আমেজ এসেই পড়ে। সরস সংলাপ হৃদয়গ্রাহী হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কৌতুক–রস কিংবা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শাণিত ফলা সংলাপকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে।

৯. ব্যক্তিত্ব সুরক্ষা

৯.১ দৈনন্দিন কর্মসময় নিরূপণ

দৈনন্দিন কর্ম সময় নিরূপণ বলতে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের কাজগুলো সময়সূচি ও তালিকা অনুসারে যথাসময়ে সম্পন্ন করাকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের রুটিনমাফিক কাজগুলো সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হলো একটা প্রতিষ্ঠানের অফিসের মৌলিক দায়িত্ব। অফিসের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করাই হলো দৈনন্দিন কর্মসময় বা অফিস রুটিন। অর্থাৎ নির্ধারিত কর্মসূচি বা কার্য তালিকা অনুসারে কাজ সম্পাদন করাই হচ্ছে রুটিন। এ নিয়মে কোনো দায়িত্ব পালন করতে কতটুকু সময় লাগবে তা নিরূপণ করা। এটা যখন নিয়মিতভাবে প্রতিদিন নিষ্পন্ন কাজের সময় নিরূপণ করা হয় তখন তাকে দৈনন্দিন কর্মসময় নিরূপণ বলে। কর্মসময় নিরূপণের উদ্দেশ্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. কর্মসময় নিরূপণের মাধ্যমে কাজ করলে কাজের গতি বাড়ে এবং নিয়ম পালনে সহায়ক হয়।
২. এর মাধ্যমে দৈনন্দিন সম্পাদিত কাজ সহজ ও ধারাবাহিক হয়।
৩. কর্মীদের প্রতিদিনের কাজ পালা অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হয় বলে দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে।
৪. এর মাধ্যমে কাজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।
৫. এটা অনুসরণ করলে কাজের তদারক পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধা হয়।
৬. প্রত্যেকের কাজ সঠিকভাবে বন্টন করা থাকে বলে কেউ কাজে ফাঁকি দিলে তার অনুপস্থিতি ধরা পড়ে এবং ঐ কাজ অন্যকে দিয়ে সমাধা করিয়ে নেওয়া যায়।

কর্মসময় নিরূপণের গুরুত্ব : কর্মসময় নিরূপণের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি অফিস ব্যবস্থায় এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। রুটিনের মাধ্যমে কাজ করলে কাজে দক্ষতা আসে, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়ে। ফলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বেড়ে যায়। নিচে রুটিনের বা কর্মসময় নিরূপণের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. **নির্দিষ্ট সময় কার্য সম্পাদন :** কর্মসময় নিরূপণ করা থাকলে কর্মীকে সঠিক সময়ে অফিসে আসতে হয় এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হয়। ফলে কাজে অবহেলা বা ফাঁকির কোনো সুযোগ থাকে না।

২. **পালাবদলের সুবিধা :** শিল্পকারখানায় পালা বা শিফট অনুসারে কাজ হয়। এখানে একজন শ্রমিকের কাজ তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে অন্য শ্রমিকদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শেষ করতে হয়। এক্ষেত্রে কর্মসময় নিরূপণের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. **শৃঙ্খলা আনয়ন :** কর্মসময় নিরূপণের মাধ্যমে কাজ হলে অফিসের কাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং কর্মীদের দক্ষতা বাড়ে।

৪. **সময়ের অপচয় রোধ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** দৈনন্দিন কর্মসময় নিরূপণের মাধ্যমে কাজ হলে অফিসে বা প্রতিষ্ঠানে অযথা সময়ের অপচয় রোধ হয়, ফলে ব্যয়ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য ধারাবাহিক অফিস কাজে রুটিন বা দৈনন্দিন কর্মসময় নিরূপণ করা না থাকলে প্রতিষ্ঠানে বা অফিসে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরিকল্পনা বলতে আমরা ভবিষ্যত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে বুঝে থাকি। দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝি দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক উপায়ে এবং সঠিক বা উপযুক্ত সময়ে প্রতিদিনের কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনাই হলো দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায়, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত দৈনিক করণীয় কার্যাবলির বিবরণ দেওয়া হয় এবং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাকে দৈনন্দিন

কর্মপরিকল্পনা বলে। দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনার উদাহরণ হলো কোনো কাজের কর্মসূচি।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন : কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/কর্মসূচি হলো কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য বাস্তব বা ব্যবহারিক রূপরেখা। এতে নির্দিষ্ট কাজটির আরম্ভের এবং সমাপ্তির সময় ও অন্যান্য সহায়ক কার্যাবলির মেয়াদসহ ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। কর্মসূচিতে সাধারণত নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে :

১. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য;
২. উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত দায়িত্বের বর্ণনা;
৩. উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যের বর্ণনা;
৪. প্রয়োজনীয় সম্পদের বর্ণনা;
৫. প্রতিটি কাজের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করতে হবে তা ঠিক করা;

নিম্নের ছকের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/কর্মসূচির নমুনা দেওয়া হলো :

নং	পদক্ষেপ	আনুমানিক সময়	প্রতিদিন কর্ম ঘণ্টা	আনুমানিক ব্যয়	দায়িত্ব
১.	অফিস কক্ষ নির্মাণ	১ মাস	প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা	২ লক্ষ টাকা	প্রধান প্রকৌশলী ও মিস্ত্রি
২.	আসবাবপত্র ক্রয়	৭ দিন	প্রতিদিন ২ ঘণ্টা	৫০ হাজার টাকা	মহা ব্যবস্থাপক
৩.	আসবাবপত্র বিন্যাস	৩ দিন	প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা	২ হাজার টাকা	অফিস সহকারী
৪.	অফিস সহকারী নিয়োগ	১০ দিন	১ দিন বিজ্ঞাপন ১ ঘণ্টা ১ দিন সাক্ষাৎকার ৩ ঘণ্টা	২ হাজার	কর্মী ব্যবস্থাপক
৫.	অফিস উদ্বোধন	১ দিন	১ দিন আনুমানিক ২ ঘণ্টা	২ হাজার	পাবলিক রিলেশন অফিসার

৯.২ সফলতা অর্জন

প্রত্যেক মানুষই তার নিজের জীবনে সফলতা অর্জন করতে চায়। কিন্তু এটি সহজ নয়। সফলতা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো প্রথমে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে সফলতার সংজ্ঞা নিরূপণ করা। সফলতার সংজ্ঞা একেকটি মানুষের কাছে একেক রকম। কেউ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা এবং পারিবারিক সুখ শান্তিকে সফলতা হিসেবে নির্ধারণ করে থাকে। আবার কেউ কেউ আর্থিক সচ্ছলতা বা পারিবারিক সুখ শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে সমাজভুক্ত সকল মানুষের সুফলের জন্য কাজ করা এবং সামাজিক সম্মান অর্জন করাকে ব্যক্তিগত সফলতা হিসেবে গণ্য করে। তবে বৈজ্ঞানিকভাবে সফলতার সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে যে, সফলতা হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার সক্ষমতা। এটি নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্রের জন্য যেমন সত্য তেমনি নিজের সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রেও সত্য হবে। কোনো একজন ব্যক্তির অর্জিত সফলতাকে তিনভাবে চিহ্নিত করা যায়। যথা :

- তার অফিসিয়াল দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে কার্যক্ষেত্রে সফল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। একই সাথে এর মাধ্যমে সে নিজের আর্থিক সচ্ছলতাকে নিশ্চিত করার কারণে আর্থিকভাবেও সফল হতে পারে।
- ঐ ব্যক্তি তার পারিবারিক দায়িত্ব কর্তব্য তথা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে তার কাছে পারিবারিক সদস্যদের প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান প্রভৃতি কর্তব্যগুলো সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হলে, সে তার পারিবারিক জীবনে সফল হতে পারে।
- এছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজে বাস করতে হয় বিধায় তার জন্য স্বাভাবিক কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। যেমন প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক, বন্ধুবাৎসল্য, দেশ ও আইনের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি। এই

দায়বদ্ধতা থেকে তার উপর অর্পিত সামাজিক দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের দ্বারা সে সামাজিকভাবে সফল ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় একজন মানুষের সফলতা অর্জনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এগুলো হলোঃ

ক. ব্যক্তিগত সফলতা
খ. সামাজিক সফলতা

পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য একজন মানুষকে উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে সফলতা অর্জন করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ করে ব্যক্তিগত সফলতা অর্জনে সক্ষম হলেও তাকে সফল ব্যক্তি বলা যাবে না কেননা সে অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে নিজের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হলেও তার অবৈধ কাজ দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এভাবে সে তার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করার ফলে ব্যক্তিগতভাবে সফল হলেও সামাজিকভাবে অসফল থাকার দরুণ তাকে সফল ব্যক্তি বলা যাবে না। এজন্যই পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সফলতা অর্জন বিষয়টি সহজ নয় এবং একজন মানুষ অনেক ক্ষেত্রে তার সমগ্র জীবন ব্যয় করেও পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়।

তবে জীবনে সত্যিকার সফলতা অর্জনের জন্য কিছু মৌলিক শর্ত রয়েছে এবং একজন ব্যক্তি সেই মৌলিক শর্তগুলো পূরণে সক্ষম হলে তার জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা সহজ হয়ে ওঠে। একই সাথে এই মৌলিক শর্তগুলো তার সফলতা অর্জনের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলে।

সফলতা অর্জনের জন্য মৌলিক তিনটি শর্ত হলো :

ক. পরিকল্পনা প্রণয়ন
খ. পরিকল্পনার বাস্তবায়ন
গ. অব্যাহত প্রচেষ্টা

সামগ্রিক জীবনে সফলতা অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি শর্ত সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক. পরিকল্পনা প্রণয়ন

সফলতা অর্জনের জন্য জীবনে সঠিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। সফল হবার সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিচের কার্যগুলো সম্পাদন করা আবশ্যক। যথা :

সফল হবার কল্পনা করা : প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো,"কল্পনার শক্তি জ্ঞানের চেয়ে বেশি।" কেউ নিজের সফলতাকে যতটা নিখুঁত এবং স্বচ্ছভাবে কল্পনা করতে পারবে তার পক্ষে সফলতা অর্জন ততই সহজ হয়ে উঠবে। একজন ইঞ্জিনিয়ার যেমন কোনো স্থাপনা নির্মাণের আগে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র স্থাপনাটি কল্পনায় দেখতে পায় ঠিক সেভাবেই নিজের সাফল্যের স্বপ্নকে নিখুঁতভাবে বিনির্মাণ করতে শিখতে হবে। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নিজের সাফল্যের স্বপ্ন দেখতে হবে। একই সাথে নিজের সাফল্যের এই স্বপ্ন দ্বারা নিজের এগিয়ে যাবার প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে। তবে কল্পনা করার সময় অবশ্যই অন্যের সাফল্যকেও সম্মান করতে হবে।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ : নিজের জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে হবে। এটি নির্ধারণের সময় প্রাধান্য দিতে হবে কোন কাজটি করতে নিজের ভালো লাগে। যে কাজ ভালো লাগে সেই কাজে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুললে তাতে সফলতা অর্জন সহজ হয়ে পড়ে।

সফলতার সংজ্ঞা নির্ধারণ : বিভিন্ন জনের কাছে সফলতার সংজ্ঞা বিভিন্ন। আবার সফলতা যদি নিজের ব্যক্তিগত অর্জনের সাপেক্ষে হয় তবে তার ব্যপ্তি নির্ধারণও কঠিন। যেমন কোনো চাকুরীজীবী যদি সফলতা হিসেবে নিজের কার্যক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানকে নির্ধারণ করে তবে সেখানে পৌঁছানোর পর সে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং নিজের জন্য সফলতার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং বার বার তার পরিমাপ করার সাপেক্ষে নিজেকে তার

লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে হবে। যেমন : কার্যক্ষেত্রে সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখতে পারে নিজেকে যতটা উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। এর পাশাপাশি সে ছোটো ছোটো কিছু বিষয়কে নিজের সফলতার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে। যেমন কর্মক্ষেত্রে বছরে তার কর্মদক্ষতা ৩০% করে বাড়াবে এমন লক্ষ্য নিয়ে কেউ কাজ করলে বছর শেষে সে তার সফলতার পরিমাপ করতে পারবে এবং এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে সে তার সফলতার জন্য আত্মতৃপ্তি লাভের আনন্দ পেতে পারবে। এর দ্বারা নিজেকে অনুপ্রাণিতও করা সম্ভব হবে যা আরও বড় সফলতা অর্জনের পূর্বশর্ত হতে পারে।

আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা : সফলতা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করতে হবে। এর ফলে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি আরও বেশি সাবধানী এবং যত্নবান হতে পারে যা তার সফলতা অর্জনের পথকে সুগম করবে। কোনো ছোটোখাট সফলতায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী না হয়ে বরং ঐ কাজটির ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়েছে কীনা তা বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে সে বিষয়ে আরও সাবধানী এবং যত্নবান হতে হবে। নিজেকে নিয়মিত নিজের কাজের ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনার মুখোমুখি অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

লক্ষ্যকে সময়ানুবর্তী করা : নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই সময়ে ঐ লক্ষ্যকে অর্জনের জন্য নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। লক্ষ্যের সময় নির্ধারণ না করলে সফলতা সুদূর পরাহত থেকে যাবে। বরং জীবনের লক্ষ্যকে ছোট ছোট ভাগ করে তার সময় নির্ধারণ করতে হবে।

লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্ধারণ : লক্ষ্য নির্ধারণের পর ঐ লক্ষকে অর্জনে সফল হবার জন্য কী ধরনের চিন্তা, দক্ষতা এবং কার্যাবলী প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে হবে। যেমন কেউ যদি ভালো বক্তা হিসেবে সফল হতে চায় তবে তাকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সৃজনশীল চিন্তা করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি নিজের বাচন ভঙ্গি, উপস্থাপনা রীতি প্রভৃতি বিষয় চর্চার মাধ্যমে দক্ষতা তৈরি করতে হবে।

আগ্রহী হওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা : সফলতার আরেকটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার এবং সেই বিষয়ে নিজেকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করে নিজ উদ্যোগ সেই প্রশ্নের সমাধান বের করার চেষ্টা করা। অধিকাংশ সফল মানুষ তাদের জীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অসংখ্যবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গমন করে নিজেকে যাচাই করার মাধ্যমে নিজেকে সফলতার যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

অভিজ্ঞতার বিনিময় : নিজের অর্জিত জ্ঞানকে সর্বোচ্চ না ভেবে এবং তা নিজের মধ্যে সংকুচিত না রেখে অন্যের সঙ্গে বিনিময়ের মানসিকতা গড়ে তোলা সফলতা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অন্যতম একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। নিজেকে বিনয়ী রেখে ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে শেখার মানসিকতা বজায় রাখা সফলতার জন্য অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে।

খ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

শুধু সাফল্যের পরিকল্পনা করলেই সফল হওয়া সম্ভব নয় বরং পরিকল্পনাকে সঠিক উপায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সফলতা অর্জন সম্ভব। সফলতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যা করা উচিত তা হলো :

- মূল লক্ষ্যকে ছোটো ছোটো লক্ষ্যে ভাগ করে সেই ছোটো ছোটো লক্ষ্যগুলো অর্জনের মধ্য দিয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে যে কোনো বড় লক্ষ্য অর্জনে সফল হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।
- লক্ষ্য নির্ধারণের পর যতটা সম্ভব সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকার চেষ্টা করা। পরিস্থিতি বা পরিবেশের কারণে সাময়িকভাবে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটলেও বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেটি মেনে নিয়ে যতটা সম্ভব পুনরায় সেই লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ ঘটাতে হবে।
- যতটা সম্ভব সফল মানুষদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের সফলতার জন্য তাদের সফলতার বিষয়গুলোকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কার্যক্ষেত্রে সফল মানুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত

থাকলে নিজের সাফল্য অর্জনের তাগিদ বজায় থাকবে এবং তাদের দ্বারা নিজেকে অনুপ্রাণিত করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

- অন্যের কাজের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। সফলতা অর্জনের জন্য সব লক্ষ্য পুরণে একক প্রচেষ্টায় সর্বদা সম্ভব নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করা সাফলতা পাবার অন্যতম একটি পূর্বশর্ত।
- নিজের কাজকে মূল্যায়ন এবং লক্ষ্য অর্জনে সফলতা লাভের জন্য ব্যাক্তি জীবনে সুপরামর্শ দাতার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় সুতরাং সফলতা অর্জনে সর্বদা নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানী, দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন পরামর্শদাতার সাহায্য গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।
- নিজের কাজ সম্পর্কে যতটা সম্ভব নিজেকে তথ্যবহুল করে তুলতে হবে। নিজের কাজের বিষয়ে পড়াশোনা অব্যাহত রাখা, নিজের কাজের অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে বিনিময় করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- সর্বদা নিজের ভাবনাকে সঠিক মনে না করে অন্যের মতমতকে প্রয়োজনে গুরুত্ব দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে ত্রুটি ঘটলে তড়িৎ তা স্বীকার করে নিয়ে অন্যের মতামত গ্রহণের মানসিকতা রাখতে হবে।
- প্রয়োজনে ঝুঁকি নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় বসে না থেকে প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়ে কাজে নামার মানসিকতা নিজের সাফল্যের সহায়ক হয়ে ওঠে। তবে কখনোই অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।
- যে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে তা এড়িয়ে না গিয়ে সেটি সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমস্যা সমাধান করার মধ্য দিয়েই বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব হবে।
- কাজ সহজ করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা নিলেও নিজেকে প্রযুক্তির অধীন করা যাবে না। অর্থাৎ সাফল্য অর্জনে অপ্রয়োজনে প্রযুক্তি ব্যবহার না করে প্রযুক্তি কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে।

গ. অব্যাহত প্রচেষ্টা

এটি সর্বজনগ্রাহ্য একটি মত যে বিফলতা হচ্ছে সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। অর্থাৎ ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে পুনরায় লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকা সফলতা অর্জনের জন্য আবশ্যক। আর এজন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। যথাঃ

ধৈর্য ধারণ করা : যে কোনো ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে ধৈর্য ধরে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যেতে হবে। ব্যর্থতায় নিজের কর্মতৎপরতায় বিরতি না দিয়ে বরং ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে ধৈর্য ধরে পুনরায় সেই লক্ষ্য অর্জনে নব উদ্যোমে কাজ শুরু করতে হবে।

ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া : সফলতা অর্জনের জন্য নিজের ভুলগুলোকে ভুল হিসেবে না বিবেচনা করে নিজের জন্য শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ফলে পরবর্তী লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐ ভুলই অন্যতম একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া : সর্বদা সবক্ষেত্রে সব রকম অর্জন সম্ভব হয় না। এটি জীবনের বাস্তবতা। সুতরাং কোনো ব্যর্থতায় সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়া করে নিজের সময় নষ্ট না করে বরং সেই পরিস্থিতিকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং সেখান থেকে যতটা সম্ভব নিজের সফলতার জন্য সহায়ক কিছু খুঁজে নিতে হবে। মহান বিজ্ঞানী নিউটনের মাথার উপর আপেল পড়ায় তিনি হতবিহ্বল হন নি বরং সেই পরিস্থিতি থেকে তিনি আপেল পতনের কারণ হিসেবে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করে ফিজিক্সের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

সাফল্যকে সন্তুষ্টির সংজ্ঞা মনে না করা : সফলতা অর্থ সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হওয়া। সেই লক্ষ্য সর্বদা সন্তুষ্টি নাও বয়ে আনতে পারে। এজন্য কখনোই কী করার পরিবর্তে কী করলে কী ভালো হতো এ নিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

চিন্তার দ্বিধা–দ্বন্দ্ব দূর করা : সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে হবে। কোনো কিছুতে ব্যর্থ হলেই নিজের সিদ্ধান্তের জন্য দ্বিধা দ্বন্দ্বে না ভুগে বরং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সেই ব্যর্থতা থেকে নিজেকে বের করে আনতে হবে।

৯.৩ সফলতার পরিমাপ

সফলতা হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হওয়া আর জীবনের প্রতিক্ষেত্রে এই সক্ষমতার সুফল লাভের জন্য সফলতাকে পরিমাপের উপায় জানা জরুরি। এর ফলে জীবনের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয় এবং বৃহত্তর লক্ষের জন্য তা অনুপ্রেরণার যোগান দেয়। সফলতার সংজ্ঞার মতো সফলতার পরিমাপের মানদণ্ড নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন এবং তা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সফলতা পরিমাপের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সফলতার সংজ্ঞা কী হবে তাকে নির্দিষ্ট করা।

সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্র বিবেচনায় একে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :

- ব্যবসায়িক সাফল্যের পরিমাপ
- কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পরিমাপ
- ব্যক্তিজীবনে সাফল্যের পরিমাপ

ব্যবসায়িক সাফল্যের পরিমাপ : অধিকাংশ ব্যক্তি ব্যবসায়িক সাফল্যকে পরিমাপ করে ব্যবসায় মুনাফার ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো ব্যবসায় কেবলমাত্র ভালো মুনাফা অর্জনের সাফল্য এর আর্থিক সাফল্য হিসেবে গণ্য হলেও সামগ্রিকভাবে তাকে ব্যবসায়িক সাফল্য হিসেবে পরিমাপ করা হয় না। সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য পরিমাপ ব্যবসায় এর মুনাফা এবং এর সাথে ঐ ব্যবসা তার ভোক্তার জন্য কতটুকু গুরুত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এই দুইয়ের মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে।

কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পরিমাপ : কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করা হয়ে থাকে। একজন মানুষ কেবল কর্মক্ষেত্রে তার শ্রম দিয়ে গেল কিন্তু তার অবস্থানের উত্থান ঘটল না, সেক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে আংশিকভাবে সফল হলেও তা পরিপূর্ণ সফলতা হিসেবে পরিগণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে সামগ্রিক সফলতা পরিমাপে ব্যক্তির কাজের মান, তার ধারাবাহিক উত্থান এবং পাশাপাশি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে তার আচরণিক দিকগুলোও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। একজন ব্যক্তি তার কাজের ভালো মান বজায় রেখে ধারাবাহিক উন্নতি অব্যাহত রাখার পরও কর্মক্ষেত্রে তার সহকর্মীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের কারণে সামগ্রিকভাবে কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারেন।

ব্যক্তি জীবনে সাফল্যের পরিমাপ : ব্যক্তি জীবনে সামগ্রিক সাফল্য পরিমাপে বিবেচ্য হলো তার পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট তার অবস্থান এই দুইয়ের সামষ্টিক সাফল্যের পরিমাণ। সেইসাথে তার সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের সক্ষমতাও এক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ব্যক্তির সাফল্যের পরিমাপকরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যখন জীবনের কোনো ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে তার আগেই ব্যক্তিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে এর জন্য কী ফলাফল সে আশা করে এবং কীভাবে সে নিজেকে ঐ লক্ষ্যের জন্য সফল হিসেবে মেনে নেবে। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে ঐ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে করতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে ঐ সফলতার অনুভূতির জন্য প্রস্তুত করে এবং এভাবেই কোনো কাজে আশানুরূপ সফলতার পর ঐ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তি তার অভ্যন্তরে আত্মসন্তুষ্টির অনুভূতি লাভ করে।

সুতরাং ব্যক্তিকে সকল ধরনের সফলতা পরিমাপের জন্য তার বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগাতে হবে। অপরের বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ব্যক্তি তার সফলতার সঠিক পরিমাপে সক্ষম হবে না।

সাফল্য পরিমাপের গুরুত্ব

ব্যক্তি জীবনে সাফল্য পরিমাপের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। এটি তাকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করে। এটি তার আত্মবিশ্বাসকে বিনির্মাণ করে এবং যে কোনো কাজের জন্য নিজের দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে। জীবনে বড় লক্ষ্যে সফলতা অর্জনের জন্য ছোটো লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাতে সফল হওয়া এবং নিয়মিত সেই সাফল্যকে পরিমাপ করা ব্যক্তির জন্য ব্যাপক ইতিবাচক মনোভাবের জন্ম দেয় এবং তা স্থায়ীভাবে তার অন্যান্য কাজে সফলতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

৯.৪ আত্মসম্মান

একজন মানুষের আত্মসম্মান হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কারণ মানুষের আত্মসম্মানবোধ না থাকলে সে কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যদি পিয়নের ন্যায় আচরণ করে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানে উন্নতি আসার কথা ভাবা যায় না। যদি পরিচালকের মধ্যে পরিচালকসুলভ মনোভাব না থাকে তাহলে যে কোনো সমস্যা বা উদ্ভূত পরিস্থিতি শক্তভাবে মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

আত্মসম্মান এর গুণাবলি

আত্মসম্মান বা ব্যক্তিত্বের কিছু গুণাবলি থাকা জরুরি। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব :** একজন আত্মসম্মানী ব্যক্তির সবচেয়ে বড় উপাদান হলো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কারণ ব্যক্তির যদি আকর্ষণী শক্তি না থাকে তাহলে অন্যরা তার প্রতি আকর্ষিত হবে না।
২. **আত্মবিশ্বাসী :** একজন সফল ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি মানুষের মধ্যে এ গুণটি না থাকে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে না।
৩. **মনোযোগী :** একজন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির যে কোনো কাজে মনোযোগী হতে হবে।
৪. **পরিশ্রমী :** আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময়ই পরিশ্রমী হয়।
৫. **সৌজন্যতা :** আত্মবিশ্বাসী মানুষের সৌজন্যতাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৯.৫ নিম্ন–মানের আত্মসম্মান

নিম্নমানের আত্মসম্মানের অধিকারী ব্যক্তিরা জীবনে কোনো কিছু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ব্যাপক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে তারা সমাজ এবং পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং নিজেদের তৈরি ভুবনে আবদ্ধ থেকে তারা কৃত্রিম একটি বিষণ্নতায় ভুগতে থাকে। তাদের মধ্যে কোনো ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয় না বিধায় তারা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। নিজের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নেবার পরিবর্তে তারা নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে। নিম্ন মানের আত্মসম্মানকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে এর মুক্ত হবার নানা উপায় বের করেছে। দীর্ঘ সময় জুড়ে নিম্নমানের আত্মসম্মান বয়ে বেড়ানোর ফলে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

নিম্নমানের আত্মসম্মানের কারণ

নিম্নমানের আত্মসম্মান গড়ে ওঠার পেছনে বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। নিচে এই কারণগুলো চিহ্নিত করা হলো। যথা :

- ছেলেবেলায় পিতামাতার যথাযথ সঙ্গ বঞ্চিত হয়ে একা একা বেড়ে ওঠা অর্থাৎ ছেলেবেলা অবহেলা ও অনাদরে পার করা।

- ছেলেবেলা থেকে দীর্ঘদিন ধরে কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তিভোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
- প্রতিনিয়ত নিজের সমালোচনা শুনতে থাকা।
- অন্যের সাথে তুলনায় বিশেষ করে ভাইবোনদের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কারো অবস্থানকে নিচু দেখানো।
- শারীরিক কোনো অসুস্থতায় ভোগা।
- দীর্ঘদীন বেকার থাকা।
- মাদকাসক্তি।
- বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রভৃতি।

নিম্নমানের আত্মসম্মানের সর্বনাশা প্রভাব থেকে ব্যক্তিমাত্রেরই উত্তরণ জরুরি। এজন্য ইতিবাচক মনোভাব, নিজের সঠিক মূল্যায়ন, নিয়মিত যোগ ও ধ্যানের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রভৃতি সহায়ক হতে পারে।

৯.৬ আত্মবিশ্বাস নির্মাণ কৌশল

আত্মবিশ্বাস মানুষের বিশ্বাসের প্রধান বাহন। যার নিজের প্রতি বিশ্বাস যত বেশি তার অপরের প্রতি বিশ্বাসের পরিমাণ ততো বেশি। অর্থাৎ নিজের প্রতি যার বিশ্বাস যত বেশি অপরের প্রতি তার বিশ্বাসযোগ্যতা তত বেশি। বিশ্বাস মানুষের এমন একটি অনুভূতি যা মানুষের সফলতায় সহায়তা করে। বিশ্বাস কর্মীর আচরণ ও প্রেষণার উপর দুইভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত, ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে, প্রতিষ্ঠান তার নিকট হতে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে তা সে করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে প্রত্যাশিত আচরণ তার জন্য ইতিবাচক ফল বহন করে আনবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বাস হচ্ছে আয়নার স্বচ্ছ টুকরার মতো—যা মানুষের প্রতিচ্ছবি হয়ে বিরাজ করে। বিশ্বাস মানুষের মনের মধ্যে বিরাজমান।

১০. ইতিবাচক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি

১০.১ মনোভাব এবং মানবিক গুণাবলি

মনোভাব : যে কোনো অফিসে বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোভাবের সাহায্যে মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গির সংগতি রক্ষা করে। ব্যক্তির আচরণের অনেক অনুপ্রেরণাই লুকিয়ে থাকে তার মনোভাবে। মনোভাবের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। মনোভাবের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিলেও মনোভাব যে একটি ধারণা এ বিষয়ে সবাই একমত। মনোভাব এক ধরনের মানসিক প্রবণতা। এটি ব্যক্তির বিশেষ ধরনের মতামত গঠন করে।

মনোভাবের বৈশিষ্ট্য :

১. **মনোভাব জন্মগত নয় :** এটি জন্মগত নয়। ব্যক্তির বায়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া তথা সামাজিক শিক্ষণের ভেতর দিয়ে মনোভাব অর্জিত হয়। অর্থাৎ, মনোভাব জন্মগত বা বংশগত নয়। মনোভাবের জৈবিক ভিত্তি হলেও মনোভাব জৈবিক চাহিদা থেকে উদ্ভূত নয়। সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন– পরিবার, খেলার সাথী, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মনোভাব গঠনে সহায়তা করে।

২. **মনোভাব মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী :** মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ এটি মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী। তবে মনোভাব যেহেতু জন্মগত নয়, অভিজ্ঞতার প্রভাবে অর্জিত সেহেতু অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের ফলে মনোভাব পরিবর্তন হতে পারে।

৩. **মনোভাব সর্বদাই লক্ষ্যাভিমুখী :** এটি সর্বদাই লক্ষ্যাভিমুখী। এদিক থেকে মনোভাব ও প্রেষণা তথা উদ্দেশ্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। উদ্দেশ্য অথবা প্রেষণা হলো একধরনের মানসিক উত্তেজনা বা অস্থিরতা। এর একটি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পর উত্তেজনা লোপ পায়। কিন্তু মনোভাবের সাথে প্রেষণার পার্থক্যও আছে। প্রেষণা মনোভাব অপেক্ষা স্বল্পকাল স্থায়ী একটি মানসিক–দৈহিক প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। তদুপরি, প্রেষণার তৃপ্তি সাধন করা যায়; কিন্তু মনোভাব শুধু প্রকাশ করা চলে। প্রেষণা বা উদ্দেশ্য মূলত ইচ্ছামূলক সক্রিয়তা। অপরপক্ষে মনোভাব মূলত জ্ঞানমূলক বা অবহিতিমূলক। উদ্দেশ্য বা প্রেষণা হলো কার্যের প্ররোচক আর মনোভাব হলো প্রেষণা বা উদ্দেশ্যের দিক-নির্ধারক।

৪. **মনোভাব সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন :** মনোভাব সুপ্ত থাকে বলে সোজাসুজি মনোভাবকে জানা যায় না। ব্যক্তির কথাবার্তা ও আচরণ থেকে তার মনোভাব সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞান হয়।

৫. **মনোভাব একটি মানসিক প্রবণতা :** এটি একধরনের মানসিক প্রবণতা। এটি ব্যক্তির মতামত গঠনের মূলশক্তি হিসেবে কাজ করে।

৬. **মনোভাব ব্যক্তির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নির্দেশ করে :** এটি সর্বদাই ব্যক্তির সাথে তার পরিবেশের একটি বিশেষ পরিস্থিতির সম্পর্ককে বোঝায়। এ বিশেষ পরিস্থিতি কোনো 'বস্তু' হতে পারে। কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো মূল্যবোধও হতে পারে। কাজেই বাহ্যিক বিষয়ের সাথে সম্পর্ক বাদ দিয়ে কোনো মনোভাব হতে পারে না।

৭. **মনোভাব গোষ্ঠীর সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :** বিশেষ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যেমন আমাদের কোনো মনোভাব থাকতে পারে, গোষ্ঠী সম্পর্কেও তেমন মনোভাব থাকতে পারে। অর্থাৎ কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়, তা ঐ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হতে পারে। তবে কেউ কেউ অবশ্য গোষ্ঠীর মনোভাব থেকে স্বতন্ত্র মনোভাব পোষণ করতে পারে।

৮. **মনোভাবের সাথে অনুভূতি ও আবেগ জড়িত :** এটির সাথে অনুভূতি ও আবেগ জড়িত থাকে। কেননা, সব মনোভাবেই বাস্তবধর্মী ও বুদ্ধি বিবেচনা প্রসূত নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোভাব কোনো বিষয়, বস্তু বা ঘটনার প্রতি ভয়, বিদ্বেষ, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগময়ী ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার, আবেগ মনোভাবের একটি গৌণ বৈশিষ্ট্য। মনোভাবের সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকলেও আবেগ ও মনোভাব এক নয়। আবেগ একটি বিক্ষুব্ধ অবস্থা, কিন্তু মনোভাব সর্বদা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।

৯. **মনোভাব ব্যক্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ :** এটি ব্যক্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং ব্যক্তিত্ব মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদার মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি তার সব কাজেই উদার ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

১০. **মনোভাবের পক্ষপাতিত্ব :** মনোভাব কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার পক্ষে বা বিপক্ষে হয়ে থকে। যেসব বিষয় বা বস্তু আমাদের নিজেদের পক্ষে থাকে, সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি আমরা অনুকূল মনোভাব পোষণ করি আবার, বিপক্ষে থাকলে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মনোভাব পক্ষপাতদোষে দুষ্ট অর্থাৎ নিরপেক্ষ নয়।

মানবিক গুণাবলি

মনোভাব মানুষের স্বভাবগত চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যেহেতু স্বভাব পরিবর্তন দুরূহ তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন সে নিয়মিত তার মধ্যে কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করবে। এই প্রচেষ্টা তাকে অনেকের মধ্যে পৃথকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে। কেউ যদি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের মধ্যে এই মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারে তবে সে আবশ্যিকভাবেই জীবন ও কর্মে উন্নতি করতে সক্ষম হবে।

জীবন ও কর্মে উন্নতি ও সফলতার অন্যতম একটি চাবিকাঠি হলো উন্নত মানব চরিত্র গঠন। এর জন্য উন্নত মানবিক গুণাবলির অধিকারী হওয়া আবশ্যক। এটি কেবল বইয়ের ভাষায় থাকা কোনো উপদেশ নয় বরং উন্নত বিশ্বে এখন প্রফেশনালদের নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য মানবিক এই গুণাবলির প্রয়োজনীয়তা সুনির্দিষ্ট জরিপের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

করপোরেট কোম্পানিগুলোতে উচ্চ বেতনের পদগুলোতে কর্মী নিয়োগের সময় বিষয়টি ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। একটি উচ্চ পদের জন্য বিবেচিত দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন যার ঐ পদের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা থাকলেও মানবিক গুণাবলির ঘাটতি রয়েছে এবং অপর জনের যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতি থাকলেও সে শক্তিশালী মানবিক গুণাবলির অধিকারী। এমন পরিস্থিতিতে দুইজনের মধ্যে কোন জন নির্বাচিত হবে। আধুনিক বিশ্বের করপোরেট লেভেলে চালানো এক জরিপে দেখা গেছে শতকরা ৯৬ ভাগ কোম্পানি এক্ষেত্রে শক্তিশালী মানবিক গুণাবলির অধিকারীকে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতি থাকা স্বত্ত্বেও নির্বাচন করে থাকে। এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এভাবে যে যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতি উন্নত মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ তার স্বভাবগত ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে অর্জন করে নিতে পারে। সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানির দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিমাপ তাদের কাজের ধারা অনুসারে পাল্টাতে পারে এবং একজন কর্মীকে যে কোনো সময় সেই নতুন পরিস্থিতিকে আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে কাজ শুরু করলেও উন্নত মানবিক গুণাবলির অভাবে সে নতুন পরিস্থিতিকে সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। কেননা মানবিক গুণাবলির বিষয়টি মানুষের অভ্যাসগত মনোভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং খুব সহজে বা স্বল্প সময়ে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সফলতার দৌড়ে নিজেকে এগিয়ে রাখার জন্য উন্নত মানবিক গুণাবলির চর্চা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে আবশ্যক।

সফলতার জন্য অপরিহার্য মানবিক গুণাবলিসমূহ :

জীবন ও কর্মে সফলতা লাভের জন্য একজন ব্যক্তির যে সকল মানবিক গুণাবলি চর্চা করা অপরিহার্য সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. **সহানুভূতিশীলতা :** অন্যের ভাবনাকে বুঝতে সক্ষম হওয়া সফলতার জন্য সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে অপরিহার্য একটি মানবিক গুণাবলি। জীবন ও কর্মের সকলক্ষেত্রে এই গুণাবলিব জয় থাকলে ব্যক্তি দ্রুত নিজেকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবে।

২. **অন্তর্জ্ঞানলব্ধতা :** যে কোনো বিষয় বুঝতে এবং তার সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে নিজের অন্তর্গত জ্ঞানের উপর আস্থা রাখতে হবে। অর্থাৎ মন থেকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই এই মানবিক গুণাবলি ব্যক্তির সফলতা অর্জনে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

৩. **সৃজনশীলতা :** নিজের কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে নতুন নতুন চিন্তা এবং কর্ম পরিকল্পনার উদ্ভাবন করতে হবে। কল্পনাশক্তি মানুষের এমন একটি শক্তিশালী মানসিক অবস্থা যা তাকে সর্বদা নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য প্ররোচনা ও প্রণোদনা প্রদান করে।

৩. **কর্মানুরাগিতা :** নিজের কাজকে সর্বদা ভালোবাসতে হবে এবং কাজ থেকে আনন্দ লাভ করতে হবে। দায় এড়াতে কাজ করার মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের কাজকে জীবনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৪. **অবিরত শিক্ষণ :** সবসময় সবকিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা বজায় রাখতে হবে। সকল সফল মানুষের জীবন পর্যালোচনায় সর্বদা এই মানবিক গুণটি পরিলক্ষিত হয়। সবকিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা নিজের মনকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।

৫. **ভালো শ্রোতা হওয়া :** নিজে বলার সক্ষমতার কারণে কেবল সবসময় নিজের কথা না বলে বরং অপরের কথা মন দিয়ে এবং ধৈর্য্য ধরে শোনার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এর ফলে অপরের নিকট নিজের কথার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাবে।

৬. **বিশ্বাস বা প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষমতা :** এই গুণটি সফলতা অর্জনে একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি সহজেই অপরকে তার কথার উপর ভিত্তি করে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করতে পারে।

৭. **দয়ালু এবং দায়িত্বশীলতা :** নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তা পূরণে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কখানো নিজেকে অধিক যোগ্য প্রমাণের জন্য মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অপরের আশা ভঙ্গের কারণ হওয়া যাবে না। কর্মক্ষেত্রে নিজের সহকর্মীদের প্রতি বিনয়ী এবং দয়ালু হবার মানসিকতা বজায় রাখতে হবে।

৮. **নেতৃত্ব :** নেতৃত্ব অনেকক্ষেত্রে স্বভাবগত একটি গুণ হলেও অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য পৃথক কোনো মানসিক গঠনের প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণভাবে দায়িত্ব নেবার মানসিকতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অগ্রগামী থাকা ব্যক্তিকে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করতে পারে।

৯. **সততা :** সততা একটি অপরিহার্য মানবিক গুণ যা যে কোনো মানুষকে সর্বক্ষেত্রে সফলতা এনে দিতে পারে। সকল ক্ষেত্রে সততার অভ্যাসের জন্য ব্যক্তি সর্বদা পুরস্কিত হয়ে থাকে।

১০. **সাহসিকতা :** নিজের নীতিতে অটল থেকে কর্মক্ষেত্রে যে কোনো বাঁধা অতিক্রমে সাহসিকতা ব্যক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক গুণাবলি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১১. **আত্মসচেতনতা :** নিজের দুর্বলতা এবং অজ্ঞতার বিষয়গুলো নিয়ে আত্মসচেতন থাকলে মানুষ যে কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

১২. **ঐকান্তিকতা :** পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো অর্জন করাই হলো ঐকান্তিকতা যা মানুষকে তার কার্যক্ষেত্রে সফলতার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত এবং হকদার করে তোলে।

১০.২ সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝানো হয় একজন মানুষের যে কোনো বিষয়কে তার শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার সক্ষমতা অর্জন করা। মানুষ বহুমাত্রিক জীব। তার চেতন এবং অবচেতন স্বত্ত্বা রয়েছে, রয়েছে যৌক্তিক স্বত্ত্বা এবং যুক্তিহীন আবেগ। মানুষ যখন কোনো কিছু সম্পর্কে চিন্তা করে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন এই বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে তাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং একজন মানুষের বিচক্ষণ মনোভাব গড়ে ওঠে সকল বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে চিন্তা, মতামত ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ামকগুলোর প্রয়োজন অনুসারে আনুপাতিক ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। যেমন কেউ কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আবেগের আধিক্য দ্বারা প্রভাবিত হলে সেটি তার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় হবে। সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ এই সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হতে পারে।

সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে প্রয়োজন নিজের মনের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং মন, শরীর ও আত্মাকে কোনো একটি চিন্তা, মতামত বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিকভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন। পরিবার ব্যক্তির সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান বিধায় এখানে তার লব্ধ অভিজ্ঞতা সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নিয়মিত ধ্যানের মাধ্যমে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত শরীর চর্চা বজায় রেখে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা এবং আত্মিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাসগুলো সম্মিলিতভাবে ব্যক্তির সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়ে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমেও ব্যক্তির সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলন ঘটতে পারে।

১০.৩ মনোভাব নির্ধারণের উপাদান

কোনো ব্যক্তি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে অথবা অন্যের নিকট হতে মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ মনোভাব গ্রহণ বা গঠনে শিক্ষণ কাজ করে থাকে। কাজেই মনোভাব গঠনে শিক্ষণের মূলনীতিগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির মনোভাব গঠনে যে বিষয়গুলো কাজ করে তা নিম্নরূপ :

১. **সামাজিক প্রভাব :** সমাজের রীতি–নীতি, প্রথা, অভ্যাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। উক্ত ব্যক্তি বা সামাজিক দলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইহা সমাজে প্রচলিত মনোভাব ও বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. **পরিবার :** জন্মের পর মানুষ পরিবার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার প্রাথমিক পরিবেশ হলো পরিবার। শিশু তার পিতা-মাতা এবং পরিবার থেকে প্রথমে শিখে এবং পরিবারই তার মনোভাব গঠন করে।

৩. **দলনেতা :** আমরা কোনো না কোনো দল বা গোষ্ঠির সদস্য। দল বা গোষ্ঠির নেতা সদস্যদের জন্য কিছু আদর্শ নির্ধারণ করে থাকে। সদস্যকে বা ব্যক্তিকে কী কী মনোভাব শিখতে হবে দল তা নির্ধারণ করে।

৪. **সমকক্ষ দল বা সঙ্গী :** ব্যক্তি পরিবার থেকে বের হয়ে তার সমকক্ষ দলভুক্ত হয়। এসব সঙ্গীদল হলো বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তি, সহকর্মী, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি। ব্যক্তির এসব সঙ্গীদল তার মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৫. **শিক্ষা :** শিক্ষা মানুষের চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমে মানুষ নিত্যনতুন আচার আচরণ শিখে এবং তা মানুষের স্থায়ী মনোভাব গঠনে সাহায্য করে।

৬. **সংবাদ :** সংবাদ থেকেও মানুষ শিক্ষা লাভ করে। তাই সংবাদ ব্যক্তির মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সহায়তা করে।

৭. **চাহিদা :** ব্যক্তির চাহিদা পূরণ বা ব্যর্থতার সাথে তার মনোভাব গঠনের একটা সম্পর্ক আছে। সাধারণত যেসব অবস্থা ব্যক্তির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে ঐসব অবস্থা বা ব্যক্তির প্রতি ঐ ব্যক্তির মনোভাব গঠিত হয়।

১০.৪ ইতিবাচক মনোভাব

মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা বিদ্যমান থাকে। একটি হচ্ছে আত্মবিনাশী, অপরটি হচ্ছে আত্মবিশ্বাসী। ভালো–মন্দ বলে কিছু নেই, মানুষের চিন্তা চেতনাই ভালো বা মন্দের সৃষ্টি করে। মানুষের মন পরিবর্তনশীল। যে কোনো সময় মানুষের মন পরিবর্তন হতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতির উপর মানুষের মন বিরাজমান। মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রোগ্রামের পরিকল্পনা। মস্তিষ্কে যদি আত্মবিশ্বাসী ধারণা সেট করা হয়ে তখন তা হয় ইতিবাচক মনোভাব। ইতিবাচক মনোভাব হচ্ছে মানুষের লক্ষ্যে পৌছানোর প্রধান হাতিয়ার। ইতিবাচক মনোভাব সৃজনশীলতার ও মনশীলতার জন্ম দেয়। যেমন একজন দুর্নীতিবাজ ও তার দুর্নীতির কর্মকে আমরা নেতিবাচক বলে মনে করি। এ কারণে সমাজ তাকে ধিক্কার দিয়ে থাকে। এটাকে বলা হয় নেতিবাচক মনোভাব। অন্যদিকে একজন ভালো বা সৎ

মানুষের কর্মকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং সমাজের সকলে তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। এটি ইতিবাচক মনোভাব। ইতিবাচক কর্মই হবে আমাদের চলার পাথেয়।

সফলতা অর্জনের জন্য ইতিবাচক মনোভাবের কোনো বিকল্প নেই। ইতিবাচক মনোভাব একজন মানুষের নৈতিক ও মানসিক শক্তিকে দৃঢ় করে যার দ্বারা সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে ওঠে। ইতিবাচক মনোভারেব গুরুত্বপূর্ণ সুফলগুলো হলো :

- এটি ব্যক্তিকে তার লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের পথে ধাবিত করে।
- ব্যক্তির জীবনে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখে।
- কাজ করবার শক্তি বৃদ্ধি করে।
- নিজের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা তৈরি করে।
- নিজেকে ও অন্যকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়।
- জীবনের বাধা–বিপত্তি এবং চ্যালেঞ্জসমূহ কমিয়ে আনে।

১০.৫ ইতিবাচক মনোভাব গঠনের ধাপসমূহ

ইতিবাচক মনোভাব গঠনের ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

১. **মনোভাব পরিবর্তন :** মানুষের মনোভাব পরিবর্তনশীল। যে যেভাবে মনকে পরিবর্তন করবে তার মন সেভাবেই পরিবর্তন হবে। মানুষের মনের ময়লা মুছে ফেললে অর্থাৎ অজুহাত, আলস্য, হতাশা, ব্যর্থতা দূর করে দিলে তার মধ্যে সফলতা আসবেই।

২. **প্রশংসা করা :** মানুষের কাজের প্রশংসা করলে তার কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সে জন্য কেউ ছোট কাজ করলেও তার কাজটি ছোট করে না দেখে প্রশংসা করা উচিত। এতে সে অনুপ্রাণিত হয়ে বড় কাজ করার স্পৃহা পাবে।

৩. **মূল্যায়ন :** কাজের মূল্যায়ন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। অনুগতকে গুরুত্ব দিলে নিজের গুরুত্বও বাড়ে। অবজ্ঞায় কখনো পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। এই জন্য গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত।

৪. **অন্যকে সহযোগিতা করা :** মানুষ আমার কাছে যা প্রত্যাশা করে আমার উচিত মানুষকে তার চেয়ে বেশি কিছু দেওয়া। এতে নিজের মূল্যায়ন আরও বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে অন্যের সহযোগিতা ও সমর্থন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান।

১১. মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা

১১.১ মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির এমন একধরনের বিশ্বাস, যা দ্বারা তার আচার–আচরণ ও ভালো–মন্দের বিচার নিয়ন্ত্রিত হয়। মূলত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূল্যবোধ তৈরি হয়, যা ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তির বিশ্বাস বলতে সততা, স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি প্রভৃতি যা মূল্যবোধের উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ব্যক্তির মধ্যে যখন কোনো মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় বা দৃঢ় হয়, তখন সে তা করা বা মেনে চলাকে কর্তব্য বলে মনে করে। তবে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের মধ্যে একধরনের শ্রদ্ধাবোধ ও দায়বদ্ধতা অনুভব করে।

প্রধান প্রধান মূল্যবোধসমূহ :

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের কথা স্বীকার করেছেন। তবে সমাজবিজ্ঞানী Spranger (1928) ছয় ধরনের মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ,
২. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ,
৩. সামাজিক মূল্যবোধ,
৪. রাজনৈতিক মূল্যবোধ,
৫. নান্দনিক/সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ ও
৬. ধর্মীয় মূল্যবোধ।

১১.২ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ মূলত ব্যক্তির অর্থ সম্পর্কিত আচার–আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধের ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি প্রবণতার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই তার ব্যবসা–বাণিজ্য বা পেশা নির্ধারিত হয়। এ মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তির আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা বাস্তববাদী হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, অর্থ–সম্পদের প্রতি অধিক আগ্রহী এমন মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অর্থ সম্পদের প্রতি কম আগ্রহী এমন মনোভাব পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এ ধরনের ব্যক্তিরা ধনকুবের হতে চায় তাই তারা ধনদেবতার উপাসনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তিরা যেন ঐতিহ্যময় ঈশ্বরকে অঢেল ধন বা দানের অভিপ্রেত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়।

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় চিন্তা–ধারণা–বিশ্বাস–অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে এ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মূল্যবোধের জন্য বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ব্যক্তি তার মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত ধার্মিক হয়। ধার্মিক লোকের জীবনে মূল্যবোধের ধারণা একতা বা সুসংহতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বিশ্বজগতকে একসূত্রে খুঁজে দেখাই এদের প্রচেষ্টা এবং এরা আধ্যাত্মিক হয়ে থাকে। ধার্মিক লোক নিজেকে বর্ণনা করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং এরা চিরন্তনী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে থাকে। এদের মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক। একজন ধার্মিক ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত খুঁজে পায়। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জীবনের সবকিছু থেকে সরে গিয়ে নিজেকে সংযুক্ত করতে চায় কোনো উচ্চতর বাস্তবতার সাথে।

১১.৩ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

সাধারণত ব্যক্তির মূল্যবোধের হাতেখড়ি ঘটে পরিবারে এবং সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির ধর্মীয় মূল্যবোধ হতে উৎসরিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে তার নিজের পারিবারিক এবং আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই প্রাথমিক দায়বদ্ধতা থেকে তার মধ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধতার উদ্ভব ঘটে যা তার প্রাথমিক মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। একজন ব্যক্তি শিশুকাল থেকেই পিতা–মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের প্রতি অনুগত থাকা, ছোটোদের প্রতি স্নেহশীল এবং নিজের কর্তব্যের প্রতি অটল থাকার শিক্ষা পেলে তার মধ্যে উন্নত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। উন্নত মূল্যবোধের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে শিশুকাল থেকে অঙ্গীকারাবদ্ধতার চর্চা তার ভবিষ্যত সফলতার পথ সুগম করে। যেমন কোনো শিশুর পিতা-মাতার সঠিকভাবে অনুগত থাকার শিক্ষা পেলে ভবিষ্যতে সে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত নিজেকে তার অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হিসেবে

ভাবতে শিখবে এবং তার কর্তব্য ও দায়িত্বকে সে সুচারুভাবে পালনের চেষ্টা করবে। অঙ্গীকারাবদ্ধতার এই বৈশিষ্ট্য তার মূল্যবোধকে সর্বদা সমুন্নত রাখবে।

ব্যক্তিজীবনে বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিজের জন্য স্বয়ংক্রিয় কিছু নিয়মে নিজেকে আবদ্ধ করতে হয় যা তার ভালো ও মন্দের প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে। এটি উন্নত মূল্যবোধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা একজনের কাছে যেটি মন্দ বলে গণ্য হয় অনেক ক্ষেত্রেই অপরজনের দৃষ্টিতে তা সঠিক বলে মনে হয়। আবার ভালোর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং খারাপ থেকে দূরে থাকার বিষয়ে তার এই নিজস্ব বোধ তাকে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে অন্তর্গতভাবে তাড়িত করবে। যে শিশুকে ছেলেবেলায় গুরুজনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুশাসনের শিক্ষা দেওয়া হয় নাই সেই শিশু স্বাভাবিকভাবেই স্কুলে তার শিক্ষকের প্রতি অনুগত না থাকা বা নিজের কর্তব্য পালন না করাকে মন্দকাজ হিসেবে গণ্য করতে সক্ষম হবে না। ফলে তার মূল্যবোধের এই অবক্ষয় সে অনুধাবন করতে পারবে না বা এ থেকে মুক্ত হবারও চেষ্টা করবে না।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সমুন্নত করার জন্য শিশুকাল থেকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হবার শিক্ষা প্রদান করতে হয়। পিতা–মাতা তার শিশুর সামনে মিথ্যাচার করলে শিশুটি মিথ্যাচার স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নিয়ে সেটিকে ভালো হিসেবে চিহ্নিত করে বসতে পারে। তার কারণ শিশুকালে সে তার পরিবারকেই অনুকরণ করার শিক্ষা পায়। সুতরাং ব্যক্তি জীবনে অঙ্গীকারবদ্ধতার অভ্যাস করা শুধু তার নিজের জন্য প্রয়োজন তাই নয় বরং ব্যক্তির অঙ্গীকারবদ্ধতা একই সাথে তার পরিবার এবং উত্তরাধিকারকেও প্রভাবিত করে থাকে।

১১.৪ মূল্যবোধের উন্নয়ন ও পরিশীলন

ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অধিক হয়ে থাকে। মানুষ তার প্রথম মূল্যবোধের চেতনা যেমন পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে থাকে তেমনি সারা জীবন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সে তার মূল্যবোধকে পরিশীলিত করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। তবে পরিবার এবং বিদ্যালয়েই মূলত তার মূল্যবোধের গঠন সম্পন্ন হয় যা পরবর্তী জীবনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। মূল্যবোধের উন্নয়ন ও পরিশীলনে মূল ভূমিকা তাই পরিবার এবং বিদ্যালয়ে কীভাবে ব্যক্তির মূল্যবোধ গঠিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম হিসেবে পরিবারের ভূমিকা

ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের প্রথম ও সর্বপ্রধান মাধ্যম হলো তার পরিবার। মূলত পরিবারেই ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। একক পরিবারে মা–বাবা, ভাই–বোন এবং যৌথ পরিবারে এদের দাদা–দাদি, চাচা, ফুপু এবং আরও নানা সম্পর্কের সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পারিবারিক পরিবেশ। এমনি একটি পরিবেশেই শুরু হয় শিশুর মূল্যবোধ গঠন।

আমরা জানি, মানবশিশু প্রাণিজগতে সর্বাপেক্ষা অসহায় এবং নির্ভরশীল প্রাণী। এ নির্ভরশীলতাই মূল্যবোধের ভিত্তিমূল রচনা করে। জীবনধারণের জন্য একটি শিশু যে ব্যক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তিনি তার মা। এ মায়ের মূল্যবোধ দ্বারা শিশুর মূল্যবোধ প্রভাবিত হয় অথবা গঠন শুরু হয়। জৈবিক চাহিদা নিবৃত্তির এ উৎসটি ধীরে ধীরে মূল্যবোধের প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে গৌণ বলবৃদ্ধির সূত্র অনুযায়ী ধীরে ধীরে মা শিশুর সন্তুষ্টির প্রধান উৎস হয়ে উঠেন এবং এ কারণেই শিশুর সকল মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মায়ের মুখ্য ভূমিকা থাকে। পিতার সাথে শিশুর প্রাথমিক সংযোগ মাতৃসান্নিধ্যের মতো প্রত্যক্ষভাবে জৈবিক চাহিদার সাথে যুক্ত না হলেও তার সাথে শিশুর আন্তঃক্রিয়া অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি। বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তের উৎস হিসেবে শিশু তার পিতাকে পায়। ফলে পিতাও শিশুর মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পরিবার থেকেই শিশু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সরাসরি শিখে। জন্মসূত্রে একজন শিশু স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ পেয়ে থাকে। পিতা-মাতার ধর্ম এবং ধর্মীয় মনোভাব শিশুর ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে একটি সমাজে বাস করতে হলে, পরিবার শিশুটিকে ঐ সমাজের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি শিখতে সাহায্য করে এবং এর

মাধ্যমেই শিশুটির মধ্যে আস্তে আস্তে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ লাভ করে। একটি পরিবারে বাবা-মা যদি শিক্ষিত হয় তবে শিশুর মধ্যে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ পরিবার থেকে গড়ে উঠে। তবে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুর তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে পরিবার ততটা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মূল্যবোধ গঠনে অনেকাংশে পরিবার দায়ী। মূলত পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকেই একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করে এবং মনোভাব থেকে পরবর্তীতে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে ছয় ধরনের মূল্যবোধের প্রত্যেকটিই প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে একজন ব্যক্তি। পরিবার, পরিবারে মা–বাবা, অন্যান্য ভাই–বোনের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই মূল্যবোধ তৈরি হয়। একজন ব্যক্তির মূল্যবোধ সৃষ্টির পেছনে পরিবার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম হিসেবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

গৃহ পরিবেশে অর্জিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মনোভাব নিয়ে শিশু প্রবেশ করে বৃহত্তম সামাজিক পরিমণ্ডলে। এ বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রথম ধাপ বিদ্যালয়ে একটি শিশু মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম হিসেবে পায় তার শিক্ষক–শিক্ষিকা ও সমবয়সীদের। এছাড়াও বয়সে ছোট ও বড় অন্যান্য শিশুরা তার মূল্যবোধ গঠনে কম/বেশি প্রভাব বিস্তার করে। একজন ব্যক্তির তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সহপাঠীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিশু প্রথম নিজের পরিচিতি খুঁজে পায় নিজেরা বিদ্যালয়ে এবং সেখানে তার জ্ঞানমূলক মনোভাব গড়ে উঠে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকার নির্দেশ ও উপদেশের মাধ্যমে শিশুর সরাসরি শিক্ষণ হয়। বিদ্যালয়ের অভিপ্রেত আচরণ, শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠতা ইত্যাদি সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। শিশুর প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ পুরস্কার ও শাস্তির উৎস। এ পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে শিশু আচরণেরও উপযোগিতা এবং তার যথাযথ ব্যবহার করতে শেখে। তাই তাদের মাধ্যমে শিশুর তাত্ত্বিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের নেতৃত্ব বিষয়ে শিশুর মধ্যে মনোভাব সৃষ্টি হয়। শ্রেণিকক্ষ শিশুর মতামত, মনোভাব, তার রাজনৈতিক, সামাজিক, তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষকদের আয়োজিত খেলাধুলা, স্কাউটিং, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে দলগত আচরণভিত্তি (সামাজিক মূল্যবোধ), নেতৃত্ব (রাজনৈতিক মূল্যবোধ), সহযোগিতা (সামাজিক মূল্যবোধ) প্রভৃতি সামাজিক আচরণের বিকাশ লাভ করে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশে মূল্যবোধ গঠনে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো সমবয়সী দল। সমবয়সীদের সাথে মেলামেশার প্রেক্ষিতে তার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গঠিত হয়। একটি শিশুর মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গঠিত হয় তার বিভিন্ন চাহিদা থেকে। যেমন-শিশু যদি চকলেট খেতে চায়, তবে সে তার বাবা-মাকে চকলেট কিনে দিতে বলবে এবং সেক্ষেত্রে চকলেট কেনার জন্য টাকা প্রয়োজন হয় এবং তখন থেকেই শিশুটি শিখবে যে, কোনোকিছু ক্রয় করতে টাকা প্রয়োজন হয় এবং এ টাকা উপার্জন করতে হয় এবং এর জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। নিজের সম্পর্কে ধারণা গঠনেও সমবয়সীদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। যেসব শিশু সমবয়সী দলে উচ্চমর্যাদা পায় তারা সাধারণত অধিকতর আত্মবিশ্বাসী ও নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর ফরে তার মধ্যে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে।

১২. সামাজিক দক্ষতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

১২.১ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

মানুষ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্ক অনুভব করে থাকে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ হয়। এভাবে কোনো ব্যক্তির প্রতি আর এক ব্যক্তির সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। আর এ সম্পর্কের কারণে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধতে পারেন। ফলে দেখা দেয় আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক। অর্থাৎ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক হলো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মেলামেশা,

ভাববিনিময় বা সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক ধরনের আপেক্ষিক আকাঙ্ক্ষা। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বন্ধুত্ব, দলগঠন ইত্যাদিতে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সাধারণভাবে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বলতে অপর ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক মনোভাবকে বুঝায়, যেখানে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি প্রশংসা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বা আচরণ প্রকাশ করে থাকে। মানুষ কখনো একা বাঁচতে সক্ষম হয় না। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাকে আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী, শিক্ষক, পরামর্শক প্রভৃতি নানান ব্যক্তির সাথে তার মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় এবং সামাজিক কাঠামো ও অনুশাসনের ভিত্তিতে তার সম্পর্ক বিনির্মাণের প্রয়োজন হয়। সমাজ তার কাঠামো অনুসারে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের দায়বদ্ধতা, মাত্রা প্রভৃতি নির্ধারণ করে দেয়। ব্যক্তি এই কাঠামোকে অনুশাসন হিসেবে মেনে অন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণে ব্যক্তির প্রধান বিবেচ্য বিষয় দুইটি হচ্ছে বয়স এবং অভিজ্ঞতা। ব্যক্তির বয়স তার আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের কর্তব্য নির্ধারণ করে অন্যদিকে অভিজ্ঞতা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের ক্ষেত্রে সম্পর্কের মান নির্ধারণ করে। ব্যক্তি জন্ম ঘটে সামাজিক প্রতিষ্ঠান তথা পরিবারে তাই পিতা-মাতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বিনির্মাণের কোনো প্রশ্ন আসে না। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সাথে অঙ্গীভূত হয়। মূলত আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় পরিবারের বাইরের জনের সাথে সম্পর্ক নির্মাণে। মানুষ সামাজিক কাঠামো অনুসরণ করে যে ধরনের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরি করুক না কেন সকল সম্পর্ক নির্মাণের জন্য তার কিছু স্বাভাবিক দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে। এই দক্ষতা তৈরির জন্য ব্যক্তির যে সব আচরণিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে সেগুলো হলো :

সম্মান প্রদর্শন : যে কোনো মানুষের কাছে তার সম্মান সর্বদা অধিক। সম্পর্ক বিনির্মাণের জন্য ব্যক্তিকে তাই অপরকে সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব তৈরি করতে হবে।

অপরকে বোঝার সক্ষমতা : যে কোনো সম্পর্ক তৈরির জন্য অপরজনের অনুভূতিকে বোঝার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণে পরস্পরের বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব : আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য সম্পর্কের প্রতি সহমর্মী থাকতে হবে উভয় পক্ষকে। একই সাথে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

নিজেকে প্রকাশ করার সক্ষমতা : ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়লে তার পক্ষে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণ কঠিন হয়ে পড়ে। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য পরস্পরকে পরস্পরের কাছে প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে প্রকাশ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

স্বার্থপরতা পরিহার করা : আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলা। অতিমাত্রায় স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণ এবং তা সুরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিগত অহংকার নিয়ন্ত্রণে রাখা : অতিরিক্ত ব্যক্তিগত অহমিকা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরি ও সুরক্ষায় আত্মঅহংকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

১২.২ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বোধের ভূমিকা

আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণ ও সুরক্ষায় সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। একজন ব্যক্তির অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক আচরণ তাকে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী রাখবে। একজন ব্যক্তি যে কর্মক্ষেত্রে বা পারিবারিক জীবনে সহযোগিতার মনোভাবের চর্চা করে না তার জন্য আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মাণ এবং সুরক্ষা উভয়ই কঠিন হয়ে পড়ে। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহমর্মী এবং সহযোগিতা গড়ে তোলার প্রধান উপায় হলো নিজের স্বার্থকে সর্বদা প্রাধান্য না দিয়ে তা গোষ্ঠীস্বার্থের সাথে সমন্বয় করে চলা। একটি সম্পর্ক সহজে গড়ে উঠলেও কেবলমাত্র সহমর্মিতাবোধের অভাবে তা নষ্ট হতে পারে। এর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন সঙ্গীর প্রতি প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন, তার অনুভূতির প্রতি অনুভূতিশীল হওয়া এবং তার মতামতকে সম্মান করতে শিখা। সঙ্গীর প্রয়োজনে যতটা সম্ভব নিজেকে তার জন্য সহযোগী করে তুলতে হবে।

তার দুঃসময় এবং সুসময়ে পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহমর্মিতার চর্চা অব্যাহত রাখা যাবে।

১২.৩ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের সুরক্ষা

আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক সুরক্ষায় পরস্পরকে সমান ভূমিকা রাখতে হবে। এক হাতে যেতন তালি বাজে না তেমনি এক তরফা কোনো সম্পর্ক টিকতে পারে না। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক সুরক্ষায় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি। পরস্পরিক স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে উভয়কেই এই সম্পর্ককে সম্মান জানাতে হবে। উভয়ের নিকট সম্পর্কের সমান গুরুত্ব থাকতে হবে। একজন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে কেবল সহযোগিতা করে চলে এমন ঐ ব্যক্তি সর্বদা তার সঙ্গীর সহযোগিতা গ্রহণের পর অস্বীকার করে চলে তার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক সুরক্ষায় সকল ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সমান অবদান থাকতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক সুরক্ষায় তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনাকে এড়িয়ে চলা। এটি সম্পর্ককে এক নিমিষে অরক্ষিত করে তুলতে পারে যা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনো কাম্য হতে পারে না।

১২.৪ বিরোধের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান

বিরোধের কারণসমূহ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা দলের মধ্যেকার মতানৈক্যকেই বিরোধ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কর্মীরা কর্মরত থাকে। বিভিন্ন সময় তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়। ফলে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। বিরোধ সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **দুর্বল যোগাযোগ :** একটি প্রতিষ্ঠানে নির্বাহীর সাথে যখন অধঃস্তন কর্মীর যোগাযোগ থাকে না তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আর এরূপ সন্দেহ থেকেই বিরোধ দেখা দেয়।

২. **সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা :** সীমিত সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠান যখন একাধিক কর্মী সীমিত সম্পদের অধিকাংশ বা সবটুকু অধিকারের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তখনই দ্বন্দ্বের শুরু হয়। যেমন– প্রমোশনের জন্য নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দকৃত পদের জন্য কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে।

৩. **দলীয় আন্তঃনির্ভরশীলতা :** মানুষের সীমিত সম্পদের তুলনায় অভাব অসীম। একটি প্রতিষ্ঠানকেও সীমিত সম্পদ দিয়ে তার চাহিদা মেটাতে হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে একটি দল যখন সম্পদের ক্ষেত্রে অন্য দলের উপর নির্ভরশীল হয় তখনই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়।

৪. **লক্ষ্যের পার্থক্য :** প্রতিষ্ঠান অধিক উৎপাদন আশা করে, আর কর্মী চায় উচ্চ মজুরি। এক্ষেত্রে যখন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তখনই দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

৫. **আন্তঃব্যক্তিক গতিশীলতা :** প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো একটি বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন কর্মী ও পুরাতন কর্মীর চিন্তাধারায় মিল থাকে না। এক্ষেত্রে পুরাতন কর্মীকে ডিঙ্গিয়ে নতুন কর্মী পদোন্নতি প্রাপ্ত হলে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

৬. **কর্মকর্তার স্বেচ্ছাচারিতা :** কর্মকর্তা যদি কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে একা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়।

৭. **পক্ষপাতিত্ব :** ব্যবস্থাপক যদি অনেক কর্মীর মধ্যে কোনো বিশেষ কর্মীকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন, তাহলে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

৮. **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** যোগ্যতা দ্বন্দ্বের আর একটি কারণ। সকলের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান নয়। আবার অনেকে উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও ধারণাগত দিকে অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে। সুতরাং শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্য থাকার জন্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে।

৯. **সাংগঠনিক বিভ্রান্তি :** শিল্প কারখানায় কর্মীদের দায়িত্ব যদি সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা না হয় তাহলে কর্মীদের

দায়িত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা থাকে না। এর ফলে কারো কাজের চাপ বেশি পড়ে আবার কারো চাপ কম পড়তে পারে। ফলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পরে।

১০. **রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য :** রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে কর্মীদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে বিষয়টি আরও বেশি লক্ষণীয়।

১১. **পরিবর্তন :** যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রতিষ্ঠানে নতুন প্রযুক্তি স্থাপন করতে হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে কর্মীগণ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বিরোধী মনে করেন এবং বিরোধিতায় লিপ্ত হন। ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণ সর্বদা বড় হতে হবে এমন কথা নেই। অত্যন্ত গৌণ কারণেও তা সৃষ্টি হতে পারে। তবে কর্মীদের মধ্যে উপরে উল্লিখিত কারণে অধিক পরিমাণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

বিরোধ নিরসনের উপায়

বিরোধের উৎপত্তি হওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক বিরোধ কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করছে তা খতিয়ে দেখবেন। তারপর বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমাধানের পথ বের করবেন। বিভিন্ন ব্যবস্থাপক বিরোধ সমাধানে বিভিন্ন ধরনের পন্থা উদ্ভাবন করেন। বিরোধ নিরসনের বিভিন্ন পন্থা নিচে আলোচিত হলো।

১. **অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** ব্যবস্থাপক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের প্রণীত সিদ্ধান্ত কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেন। এক্ষেত্রে কর্মীদের মতামতকে সম্মান দেওয়া হয় না। তাই ব্যবস্থাপক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এতে কর্মীদের কর্ম—ক্ষমতা বাড়ে।

২. **প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎসাহ দান :** সংগঠনের ভিতরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা উৎসাহ নিয়ে কাজ করে।

৩. **পারস্পরিক স্বার্থের নীতির বাস্তবায়ন :** ব্যবস্থাপক যদি কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে তাহলে কর্মীরা অধিক উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ করে। ফলে উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষিত হবে এবং ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্ব নিরসন হবে।

৪. **সুস্পষ্ট নীতিমালা :** প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে কোনো কর্মীর মনে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে না।

৫. **বাইরে থেকে লোক আনয়ন :** অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা হয়।

৬. **প্রক্রিয়ার পরিবর্তন :** সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তনের মাধ্যমেও দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব হয়। এতে প্রতিটি কাজের পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৭. **সম্পদের প্রসার :** প্রতিষ্ঠান তার সম্পদের প্রসার ঘটাতে পারলে সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। ফলে দ্বন্দ্ব হ্রাস পায়।

৮. **সমতা আনায়ন :** এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। আর যে সকল বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা সম্ভব নয়, সে সমস্ত বিষয়ের উপর তেমন জোর দেওয়া হয় না। এ পদ্ধতিকে বলা হয় সমতা আনায়ন পদ্ধতি।

৯. **আপোষ :** সতর্কতা বজায় রেখে আপোষের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়।

১০. **বলিষ্ট ভূমিকা :** এ পর্যায়ে মধ্যস্থতাকারী একজন ব্যক্তি বলিষ্ঠভাবে হস্তক্ষেপ করে দুই পক্ষের অনড় মনোভাবের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেন।

১১. **সমঝোতা :** সমঝোতা দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কিছু গ্রহণ এবং কিছু ত্যাগ করতে হয়। শিল্প বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে সমঝোতা অধিক ব্যবহৃত পন্থা।

১২. মুখোমুখি আলোচনা : বিবাদমান পক্ষসমূহ একত্রে বসে সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করেন, আলোচনা করেন এবং সর্বশেষে সমাধানে উপনীত হন।

১৩. ঘটনার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন : এক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্বন্দ্বের মূল কারণ এবং উৎস খুঁজে বের করে দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়।

১৪. যোগাযোগ : সংগঠনে যোগাযোগ পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়। সংগঠন যতদিন থাকবে, দ্বন্দ্বও ততদিন থাকবে। এই সকল অবস্থার মধ্যে থেকেই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। প্রকৃত অর্থে দ্বন্দ্ব নিরসনের পন্থা কী হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, সামগ্রিক কার্য পরিবেশের উপর।

১২.৫ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়ন

ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। এসব কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা যায়। নিম্নে এসব সম্পর্কের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো—

১. **বন্ধুসুলভ আচরণ :** বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায়। ভালো আচরণের মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব খারাপ আচরণের মাধ্যমে তা কখনো সম্ভব নয়।

২. **যথাযথ সম্মান :** যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিতভাবে প্রদানের মাধ্যমেও তা করা সম্ভব।

৩. **সহানুভূতি :** সহানুভূতি প্রদানের মাধ্যমেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সহানুভূতি।

৪. **প্রাপ্তির নিশ্চয়তা :** যে ব্যক্তির যতটুকু পাওয়া উচিত ঠিক ততটুকু প্রদানের মাধ্যমেও তা করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষ তার ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

৫. **স্বাধীনতা প্রদান :** প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। কোনো কারণে স্বাধীনতা খর্ব হলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা প্রদানের দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটে।

৬. **মানসিক চাহিদা :** মানুষের নানাবিধ চাহিদার মধ্যে মানসিক চাহিদাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানসিকভাবে মানুষ সুস্থ থাকলে যেমন কাজে উৎসাহ পায় ঠিক তেমনি দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. **বিশ্বস্ততা :** ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বস্ততা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের বড় সম্পদ। বিশ্বস্ততার মাধ্যমে শুধু সম্পর্ক উন্নয়ন হয় না। সম্পর্ক দীর্ঘজীবীও হয়।

৮. **স্বীকৃতি :** স্বীকৃতি প্রদান দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। স্বীকৃতি ছাড়া সম্পর্ক উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না।

৯. **ভুল বুঝাবুঝির অবসান :** মানুষের সাথে মানুষের বিভিন্ন কারণে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এগুলো অবসানের মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন হতে পারে।

১০. **কৃতিত্ব :** মানুষকে ভালো কাজের মূল্যায়ন করলে এবং তার কৃতিত্বের পুরস্কার প্রদান করলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন হতে পারে।

১১. **কুশল বিনিময় করা :** ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়নের একটি সহজ মাধ্যম হচ্ছে কুশল বিনিময় করা। কারোর সাথে কারোর দেখা হলে কুশল বিনিময় করলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন হয়।

১২. **গিফট বা উপঢৌকন :** গিফট বা উপঢৌকন ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে গিফট বা উপঢৌকন পাঠালে ঐ ব্যক্তি গিফট পেয়ে খুবই খুশি হয়। এতে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উন্নয়ন হয়।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের একে অন্যের সাথে মনের ভাব আদান–প্রদানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে

সহজ হয়। তাই ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কাজ করলেই ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১৩. উপস্থাপনা কৌশল ও দক্ষতা

কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের বর্ণনাকে প্রতিবেদন বলে। তথ্যের ধারাবাহিক বর্ণনা, বিশ্লেষণ, ধারণা ও মন্তব্যসহ তথ্যের সার্বিক দলিল হলো প্রতিবেদন। এ প্রতিবেদন যখন মৌখিকভাবে কোনো সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, সভা, সম্মেলন ও যৌথ আলোচনায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে উপস্থাপন বলে। আর মৌখিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যে সকল নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাকে উপস্থাপনা কৌশল বলে। যেমন– শারীরিক অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি, চোখের নাচন, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রকাশের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার কলাকৌশলই হলো উপস্থাপনা কৌশল।

উপস্থাপনা দক্ষতা

উপস্থাপন, উপস্থাপনা ও উপস্থাপক তিনটি আলাদা জিনিস। উপস্থাপন হচ্ছে কোনো কিছু প্রকাশ করা বা কোনো বক্তব্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা। আর উপস্থাপনা হচ্ছে কোনো পণ্যের প্রচারের জন্য আকর্ষণীয়ভাবে তার প্রকাশ ঘটানো। সেটা বর্ণনামূলকও হতে পারে আবার অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেও প্রকাশিত হতে পারে। আর উপস্থাপক হচ্ছে সে ব্যক্তি যে পণ্য উপস্থাপনা করে। উপস্থাপনা হচ্ছে verb আর উপস্থাপক হচ্ছে Noun।

ব্যবসায়ের প্রসারতা বা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সুন্দর সাবলীল ভাষায় কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যখন প্রকাশ করা হয় তখন তাকে উপস্থাপনা দক্ষতা বলা হয়। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সভা সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে সুন্দর, সাবলীলভাবে ও দক্ষতার সাথে বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সভা পরিচালনা করে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতার প্রকাশ ঘটায় তাকে উপস্থাপনা দক্ষতা বলে।

উপস্থাপকের সুন্দর পোশাক

পোশাকে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় ফুটে উঠে। তাই উপস্থাপকের উপস্থাপনা করার সময় আকর্ষণীয় পোশাক পরাটা অত্যাবশকীয়। উপস্থাপক যেহেতু সভাকে প্রাণচঞ্চল করে তোলে তাই উপস্থাপকের পোশাক মার্জিত রুচিশীল হতে হবে। উপস্থাপকের পোশাক বলতে সভার বিষয় অনুযায়ী উপস্থাপক যে পোশাক পরিধান করে তাকে বুঝায়। যেমন নির্বাচনী সভায় উপস্থাপক যদি সাংস্কৃতিক সভার পোশাক পরিধান করে তাহলে নির্বাচনে প্রার্থীর ভোটের পরিমাণ কমে যেতে পারে। তাই উপস্থাপকের পোশাক হতে হবে মার্জিত, ভদ্র, রুচিসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

উপস্থাপকের গুণাবলি

যে ব্যক্তি কোনো সভা সমাবেশ পরিচালনা করে তাকে উপস্থাপক বলে। আর সে যে মুখের ভাষায় সভা পরিচালনা করে তাকে উপস্থাপনা বলে। উপস্থাপকের উপস্থাপনের বিষয়গুলো আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নিতে হয় এবং সভায় কোনো কোনো ব্যক্তি বক্তব্য করবেন তাদের নামের তালিকাও আগে থেকে করে নিতে হয়। উপস্থাপনা একটি কলা।

উপস্থাপনা ভালো করতে হলে একজন উপস্থাপকের নিম্নোক্ত যোগ্যতা বা গুণাবলি থাকা আবশ্যক বা উচিত :

১. **ভাষা জ্ঞান :** ভালো উপস্থাপনা অর্জন করতে হলে উপস্থাপককে বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকলে একজন উপস্থাপক সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি ও আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সভা বা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবে।

২. **মিশুক স্বভাব :** একজন উপস্থাপককে মিশুক স্বভাবের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তির সাথে হাসিখুশিভাবে মেলামেশার ক্ষমতা থাকতে হবে। এতে যে কোনো ব্যক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শক শ্রোতায় পরিণত করা যায়।

৩. **সাধারণ শিক্ষা :** সাধারণ শিক্ষা বলতে বুঝায়, যে শিক্ষা সকলের জন্য প্রয়োজন। একজন উপস্থাপককে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যেমন– বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া।

৪. **সাধারণ জ্ঞান :** সাধারণ জ্ঞান একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এটির ব্যবহার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। দক্ষতাসম্পন্ন উপস্থাপক হতে হলে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অবশ্যই প্রতিনিয়ত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই ভালো উপস্থাপনা করা সম্ভব।

৫. **একাগ্রতা :** একজন সফল উপস্থাপকের একাগ্রতা থাকা প্রয়োজন। শ্রোতা-দর্শকদের আবেদন বা চাওয়া পাওয়ার দিকে একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ না করলে দর্শন শ্রোতা অনুষ্ঠান দেখতে উৎসাহিত হবে না।

৬. **দূরদৃষ্টিসম্পন্ন :** একজন উপস্থাপককে সবসময় পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। অর্থাৎ সভা অনেক সময় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য পাণে চলতে হয়। তাই উপস্থাপক দূরদর্শী বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন না হলে প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য একজন উপস্থাপককে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে।

৭. **উপস্থিত বুদ্ধি :** একজন উপস্থাপকের অবশ্যই উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে। অর্থাৎ অনুষ্ঠান চলাকালে যে কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে উপস্থিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮. **শারীরিকভাবে যোগ্য :** একজন উপস্থাপককে অবশ্যই শারীরিকভাবে যোগ্য হতে হবে। যেমন– সুস্বাস্থ্য, সুদর্শন, আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর ও পরিশ্রমী হতে হবে। তাহলেই অনুষ্ঠান ভালোভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

৯. **অভিজ্ঞতা :** উপস্থাপকের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ উপস্থাপক অধিক দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে। ফলে তার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

১৩.১ উপস্থাপনা দক্ষতায় দৈহিক ভাষা

যে ব্যক্তি সভা সমাবেশে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করে তাকে উপস্থাপক বলা হয়। আর তা যখন ভাষার মাধুর্য ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করে তখন তা হচ্ছে উপস্থাপনা দক্ষতা। উপস্থাপনা দক্ষতার জন্য ভাষার মাধুর্য বা দৈহিক ভাষার প্রয়োজন হয়। অনুষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপকের দক্ষতা ও নিপুণতার ওপর নির্ভরশীল। শ্রোতা–দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মন জয় করার মধ্যেই তার সার্থকতা। একজন উপস্থাপকের দৈহিক ভাষা তথা বডি ল্যাংগুয়েজ কেমন হবে তা নির্ভর করে কতিপয় গুণাবলি বা বিষয়ের উপর। দৈহিক ভাষার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের পূর্বশর্তগুলো সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. **সুদর্শন :** একজন উপস্থাপকের অবশ্যই সুদর্শন চেহারার অধিকারী হতে হবে। কেননা মানুষ সুন্দরের পূজারি। সুদর্শন ও সুন্দর চেহারার উপস্থাপকরা সহজেই শ্রোতা–দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

২. **সুস্বাস্থ্যের অধিকারী :** একজন উপস্থাপককে অনুষ্ঠান বা সভা নিখুঁত ও মাধুর্যের সাথে পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই তাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কেননা তাকে অনেক পরিশ্রমের কাজও করতে হয়। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে অধিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়।

৩. **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব :** উপস্থাপককে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব না থাকলে শ্রোতা–দর্শকরা অন্য মনস্ক হয়ে যায়। ফলে অনুষ্ঠান করার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

৪. **আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর :** উপস্থাপকের কণ্ঠস্বর আকর্ষণীয় বা শ্রুতিমধুর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. **আত্মবিশ্বাস :** আত্মবিশ্বাস উপস্থাপকের সফলতা দান করে। শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হলে তার মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

৬. **পরিশ্রমী :** উপস্থাপককে অনুষ্ঠানের দিবসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের পরিশ্রম করতে হয়। তাই তার যথেষ্ট পরিশ্রম করার মন মানসিকতা থাকা প্রয়োজন।

৭. **সময়ানুবর্তিতা :** সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। সময়মত অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে না

পারলে শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে।

৮. **সততা ও বিশ্বস্ততা :** সততা উপস্থাপকের অন্যতম গুণ। উপস্থাপককে তার সকল প্রকার কাজকর্মে ও কথাবার্তায় অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বস্ত হতে হবে। উপস্থাপকের সততা সম্পর্কে শ্রোতা-দর্শকদের আস্থা না থাকলে কোনো সভা বা অনুষ্ঠান সফলতার সাথে পরিচালনা সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, একজন উপস্থাপকের মধ্যে যদি উপরের যোগ্যতাগুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে উপস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। আর উপরিউক্ত কারণগুলোই হলো উপস্থাপনা দক্ষতায় দৈহিক ভাষা।

১৩.২ উপস্থাপন দক্ষতায় ইঙ্গিত ও মুখভঙ্গীর গুরুত্ব

একজন উপস্থাপক শুধু তার বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর দ্বারা সহজেই নিজের উপস্থাপন দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি জটিল বৈশিষ্ট্য হলো কোনো সময় উপস্থাপককে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যে যখন তাকে উপস্থাপনার জন্য উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে দুইটির বাইরে আরও কিছু অতিরিক্ত দক্ষতা দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে। ধরা যাক কোনো উপস্থাপনা সভায় যদি শ্রোতাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি থেকে থাকে যারা প্রতিবন্ধী (মূক ও বধির) অথচ বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ উপস্থাপনা সভায় অংশ নেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে, সেক্ষেত্রে উপস্থাপকের এই জটিল দক্ষতা ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়াও সাধারণভাবে উপস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করার জন্য নিজের ইশারা-ইঙ্গিত মুখভঙ্গি, দৃষ্টির ব্যবহার এবং শারীরিক অবস্থানকেও অত্যন্ত কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

একজন দক্ষ ও পেশাদার উপস্থাপক তার উপস্থাপনাকে এমনভাবে সাজাবে যেন সে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে উপস্থাপনার বক্তব্যের সাথে একীভূত করতে সক্ষম হয়। অবশ্যই এর জন্য সুনির্দিষ্ট অভ্যাস ও চর্চা প্রয়োজন যা উপস্থাপনার সময় সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তার উপস্থাপনার পক্ষে স্বতস্ফূর্ত সহায়ক হিসেবে ব্যবহার দক্ষতা গড়ে তোলে। যখন উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি উপস্থাপক হিসেবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বতস্ফূর্ত সহায়তা পাবে, তখনই উপস্থাপনাটি প্রাণবন্ত হবে এবং তা সাধারণ শ্রোতা বা প্রতিবন্ধী সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। উপস্থাপন দক্ষতায় শারীরিক ইঙ্গিত ও মুখভঙ্গির স্বতস্ফূর্ত প্রণোদনার জন্য উপস্থাপনার সময় নিম্নোক্ত কৌশলগুলো আয়ত্ব করা উচিত।

শ্রোতার সঙ্গে দৃষ্টি সংযোগ ঘটানো : অনেক উপস্থাপকের একটি সাধারণ দুর্বলতা হলো উপস্থাপনার সময় আত্মবিশ্বাসের অভাবকে আড়াল করতে সরাসরি শ্রোতার চোখে চোখ রাখা থেকে বিরত থাকা। এক্ষেত্রে উপস্থাপক তার পুরো উপস্থাপনার সময় ব্যয় করে শ্রোতার পা, ঘাড়, পেছন কিংবা পার্শ্বদেশে দৃষ্টি রেখে যেন সে নিজের সাথে কথা বলে চলেছে। সর্বদা উপস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করার জন্য উপস্থাপকের চোখে উপর সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন প্রতিটি শ্রোতা ঐ উপস্থাপনকে তাকে উদ্দেশ্য করে করা হচ্ছে বলে মনে করতে সক্ষম হয়। উপস্থাপক যদি তার দর্শক শ্রোতাদের বাসের পাশের সিটে বসা অজানা ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান করে উপস্থাপনা করে চলে তবে শ্রোতার পক্ষেও ঐ উপস্থাপনায় মনসংযোগ কঠিন হয়ে ওঠে।

স্বতঃস্ফূর্ততা এবং উৎফুল্লতা বজায় রাখা : উপস্থাপনার পুরো সময় জুড়ে একজন উপস্থাপককে তার তরতাজা মনোভাব বজায় রাখাতে হবে। উপস্থাপনায় নিজের স্বতঃস্ফূর্ততা বা এনার্জি লেভেলকে কখনো এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না যা শ্রোতার কাছে জন্য অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে যে বক্তা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এজন্য পুরো উপস্থাপনে নিজের ইশারা—ইঙ্গিত, দৃষ্টি, মুখভঙ্গি স্বতঃস্ফূর্ত এমন হতে হবে যে বক্তা তার উপস্থাপনাকে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করছে এবং সে তার উপভোগ্য অনুভূতিটি শ্রোতার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

উপস্থাপনের সময় হাঁটা চলা করা : একজন বক্তা যদি একস্থানে স্থির বা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে উপস্থাপনা করে চলে তবে সেটি অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে স্থানের সীমাবদ্ধতা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। তবে উপস্থাপকের যদি সুযোগ থাকে স্টেজ কিংবা শ্রোতাদের মাঝে চলাফেরা করার, তবে সে এই টেকনিককে তার উপস্থাপনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সহজেই ব্যবহার করতে পারে। একজন শ্রোতা তার বক্তব্যের সাথে তাল রেখে যখন স্টেজ কিংবা শ্রোতামণ্ডলীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয় তখন শ্রোতারা তার উপস্থাপনার ডাইনামিক দিকটিকে উপভোগ করে এবং উপস্থাপনা যথার্থই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বক্তব্যের সাথে হাতের ব্যবহার : পেশাদার উপস্থাপক তার বক্তব্যের সাথে নিজের দুইহাতকে নাটকীয়ভাবে ব্যবহার করে উপস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়। বক্তব্যের সাথে তাল রেখে দুই হাতের ব্যবহার আসলে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনা যা দীর্ঘদিন পেশাগত উপস্থাপনার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

মুখমণ্ডলীকে স্বাভাবিক রাখা : মানুষের সকল আবেগ তার মুখাবয়বে প্রতিচ্ছবি ফেলে। সুতরাং উপস্থাপনার সময় অপ্রয়োজনে মুখমণ্ডলে কোনো বিরক্তি, রাগ, বিষাদ কিংবা অতি খুশির ছাপ ধরে রাখা যাবে না। মুখমণ্ডলকে স্বাভাবিক রেখে উপস্থাপনার প্রয়োজনে মুখমণ্ডলে প্রয়োজনীয় আবেগের ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হাবে যা শ্রোতার আবেগকে প্রয়োজনীয়ভাবে সংক্রমিত করতে পারে। অনেকের উপস্থাপনার সময় নানা বদভ্যাস দেখা যায় যেমন জিহ্বা দিয়ে বারবার ঠোঁট চাটা, বারবার গিলা বা ভ্রু বা চোখকে অপ্রয়োজনে সংকুচিত করা প্রভৃতি। ভালো উপস্থাপককে এই সব বদভ্যাস যত্নের সাথে পরিত্যাগ করতে হবে।

১৩.৩ উপস্থাপন দক্ষতায় স্বর ও ভাষার ভূমিকা

স্বর বলতে আমরা মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত যে শব্দ তাকে বুঝি। একজন উপস্থাপকের স্বর হতে হবে স্পষ্ট। অর্থাৎ ভালো ও সুন্দর হতে হবে, যাতে শ্রোতা দর্শক সহজে বুঝতে পারে। করুণ কণ্ঠস্বর অনেক উপস্থাপকের ভাবমূর্তি নষ্ট করে ফেলে।

আর ভাষা বলতে আমরা মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ সমষ্টিকে বুঝি। একজন উপস্থাপকের যথেষ্ট ভাষা জ্ঞান থাকতে হবে। সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। অনেক সময় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ উপস্থাপনা ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এবং উচ্চারণও স্পষ্ট হতে হবে। ভাষাজ্ঞান ভালো হলে উপস্থাপনা দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

উপস্থাপক সাধারণ মানুষের মতো কথা বললে তা আর উপস্থাপনা হবে না। উপস্থাপকের কণ্ঠ হতে হবে স্পষ্ট, সুন্দর, সাবলীল এবং উচ্চারণ হতে হবে শুদ্ধ। যে ভাষায়ই উপস্থাপনা করুক না কেন সেই ভাষা সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকতে হবে। ভাষাজ্ঞানে দক্ষ হলে উপস্থাপকের উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উপস্থাপনা দক্ষতায় স্বর ও ভাষার জ্ঞান নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উপস্থাপনা দক্ষতায় স্বর ও ভাষার ভূমিকা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. **সুন্দর বাচনভঙ্গি :** উপস্থাপনার সময় উপস্থাপককে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে হয়। এ সঞ্চালনই হলো বাচনভঙ্গি। কণ্ঠস্বরের সাথে সাথে বাচনভঙ্গিও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে হবে।

২. **আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর :** উপস্থাপনকারীর কণ্ঠস্বর আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্কশ কণ্ঠস্বর কারোরই পছন্দ নয়। আকর্ষণীয় ও সুললিত কণ্ঠস্বর উপস্থাপককে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

৩. **গলার স্বর সুস্পষ্ট :** দর্শক শ্রোতারা যাতে অতি সহজে উপস্থাপকের কথা বুঝতে পারে তাই তার গলার স্বর স্পষ্ট হতে হবে, যাতে কথা বলার সময় কোনো ধরনের জড়তা না থাকে।

৪. **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ :** উপস্থাপকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তার বক্তব্য উপস্থাপনায় ফুটে উঠবে। মার্জিত ভাষা, সৌজন্যবোধ, সরলতা, বিচার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, সংক্ষিপ্ততা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপস্থাপকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

৫. **সাবলীল :** গলার শব্দ সুন্দর ও সাবলীল হতে হবে। তাহলে দর্শক শোতাদের মন জয় করা যাবে। ফলে সভা বা অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে।

৬. **সংক্ষিপ্ততা :** সংক্ষিপ্ততা বিচক্ষণতার লক্ষণ বলে একটা প্রচলিত কথা আছে। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা অল্পকথায় তার মূল বক্তব্য তুলে ধরে। তাই উপস্থাপক তার বক্তব্য সংক্ষেপে পেশ করলে উপস্থাপন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. **ভুল—ত্রুটি মুক্ততা :** উপস্থাপনে বক্তব্য ত্রুটিপূর্ণ হলে তা একদিকে যেমন উপস্থাপককে বিরূপভাবে সমালোচিত করে, অন্যদিকে তেমনি বলার উদ্দেশ্য অর্জনও ব্যাহত হয়। তাই উপস্থাপনের সময় বক্তব্যের ভুল-ত্রুটি মুক্ততার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

৮. **সম্পূর্ণতা :** উপস্থাপকের বক্তব্য আংশিক বা অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হলে শ্রোতার পক্ষে এর মর্ম উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তাই উপস্থাপককে তার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৯. **অতিকথন বর্জন :** উপস্থাপনের বেশি কথা বা অতিকথন বর্জন করতে হবে। প্রয়োজনীয় বক্তব্য সহজ সরল ভাষায় পেশ করা উচিত।

১০. **দর্শক শ্রোতাদের কথা মনে রাখা :** মঞ্চে বক্তব্যের সময় দর্শক শ্রোতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিষয়বস্তু বুঝার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক বক্তব্য পেশ করতে হবে। অন্যথায় দর্শক শ্রোতাগণ মূল বক্তব্য অনুধাবনে সক্ষম হবে না।

১৩.৪ উপস্থাপন দক্ষতায় বক্তব্যের গতি এবং কণ্ঠস্বরের ভূমিকা

একজন দক্ষ উপস্থাপককে উপস্থাপনার সময় তার বক্তব্যে গতি এবং কণ্ঠস্বরের উত্থান পতনকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। উপস্থাপনার সময় বক্তব্য এমন গতিতে দেওয়া যাবে না যে শ্রোতারা বক্তব্যের গতির সঙ্গে তাল মেলতে পারে না। অনেক প্রফেশনাল বক্তা একই উপস্থাপনা বার বার করার কারণে অনেক সময় দ্রুতগতিতে বলে যেতে থাকে যা অত্যন্ত অবিবেচক প্রসূত। উপস্থাপককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একই উপস্থাপনা হলেও তার শ্রোতা নতুন এবং এই উপস্থাপনা তাদের কাছে প্রথমবার। একারণে বক্তাকে প্রতিটি বক্তব্যের প্রতিটি অংশকে যথাযথ গতি বজায় রেখে পৃথকভাবে শ্রোতাকে অনুধাবন করার সময় দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। তবে তা আবার এমন ধীরগতিসম্পন্ন হওয়া যাবে না যে শ্রোতার কাছে সেটি বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এক্ষেত্রে উপস্থাপকের গলার স্বরের ভূমিকা রয়েছে। উপস্থাপককে তার বক্তব্য অনুসারে গলার স্বরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অপ্রয়োজনে উচ্চ কিংবা নিম্নস্বরের ব্যবহার পরিহার করতে হবে। বক্তব্যে গতি ও কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তব্যের মাঝে প্রয়োজনীয় বিরতি প্রদান : বক্তব্যের মাঝে বিরতিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে উপস্থাপনাকে নাটকীয়ভাবে উচ্চমানের করে তোলা যায়। বক্তব্যের প্রয়োজনে বিরতি ছাড়াও কখনো শ্রোতাকে কোনো কিছু অনুধাবনের জন্য বিরতি প্রদান বা কোনো নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরির জন্য বক্তব্যে ইচ্ছাকৃত বিরতি সৃষ্টি প্রভৃতি কৌশলগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপস্থাপনের সময় বক্তব্য বিরতি দ্বারা শ্রোতার নিকট গল্প বলার ভঙ্গিমা প্রকাশ করে শ্রোতার মনযোগকে দীর্ঘসময় আকৃষ্ট রাখা যাবে।

কণ্ঠস্বরে আবেগ প্রকাশ : উপস্থাপকের কণ্ঠস্বরে আবেগের প্রকাশ জরুরি যা শ্রোতার আবেগকে স্পর্শ করার মাধ্যমে উপস্থাপনার সাফল্য এনে দিতে পারে। একই রকম কণ্ঠস্বরে একঘেঁয়ে উপস্থাপনা শ্রোতার মনযোগ এবং উদ্যম উভয়ই বিনষ্ট করবে। তাই বক্তব্যের প্রয়োজনে কণ্ঠস্বরে অবেগের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ রাখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন : যেকোনো উপস্থাপনায় কণ্ঠস্বরের উত্থান পতনকে নিয়ন্ত্রণ করে উপস্থাপনাকে যথাযথভাবে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তোলা যায়। সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব বোঝাতে নির্দিষ্ট বক্তব্যে কণ্ঠস্বর উত্থিত করা কিংবা শ্রোতাকে কৌতুককর কিছুর দ্বারা মাতিয়ে রাখতে কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ঘটানো প্রভৃতি কৌশল সময়মতো প্রয়োগ করতে পারলে তা উপস্থাপনার যথাযথ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে।

সর্বোপরি পুরো উপস্থাপনার গতি এমন হতে হবে যেন তা শ্রোতাকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিভ্রমণের অনুভূতি প্রদান করে যেটি কীনা একই সাথে শ্রোতার নিকট উপভোগ্য হতে হবে। একটি নির্দিষ্ট পরিভ্রমণে যেমন সুষম গতি, প্রয়োজন অনুসারে উত্থান পতন প্রভৃতি পরিভ্রমণকারী উপভোগ করে তেমনি উপস্থাপনাতেও এমন একটি গতিময় এবং আবেগপ্রবণ উত্থান পতনের অনুভূতি বক্তব্যের গতি ও কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তৈরি করে উপস্থাপনাকে উপভোগ্য করে তুলতে হয়।

উপরের আলোচনায় বলা যায়, সভা বা অনুষ্ঠান পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে একজন উপস্থাপকের উপরিউক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। যে উপস্থাপকের মধ্যে উপরিউক্ত যোগ্যতার সমাহার বেশি ঘটে কার্যক্ষেত্রে তার পক্ষেই তত বেশি সফলতা অর্জন সম্ভব হয়।

১৩.৫ উপস্থাপনায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার

গ্রীক সভ্যতার যুগে এরিস্টটল বা প্লেটোর মতো দার্শনিকগণ নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনে কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে জনতাকে উদ্বেলিত করতে সক্ষম ছিলেন। শিল্প বিপ্লবের ফসল হিসেবে উপস্থাপনায় মাইকের মাধ্যমে কণ্ঠস্বরকে কেবলমাত্র বৃদ্ধির সুবিধা যুক্ত হয়। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অধিকাংশ উপস্থাপনার একমাত্র ব্যবহৃত যান্ত্রিক উপায় ছিলো মাইকের ব্যবহার। কিন্তু বর্তমানে উপস্থাপনার কথাকে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ে আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। উপস্থাপনায় এখন আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- হোয়াইট বোর্ড
- ওভারহেড প্রজেক্টর (OHD)
- মাল্টিমিডিয়া এলসিডি প্রজেক্টর
- কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রভৃতি।

হোয়াউট বোর্ড

এক ধরনের সাদা বোর্ড, যার উপর কালি দিয়ে লেখা যায়। সাধারণত কোনো বোর্ড মিটিং, শিক্ষামূলক সেশন প্রভৃতি উপস্থাপনায় হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের উপস্থাপনাতেও হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার লক্ষণীয়। হোয়াইট বোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপক মার্কারি কলমের সাহায্যে তার বক্তব্য অনুধাবনে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ছক, গ্রাফ তাৎক্ষণিক উপস্থাপন করতে পারে। বক্তব্যের পাশাপাশি শ্রোতাকে হাতে কলমে কোনো কিছু বোঝানোর জন্য হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

ওভারহেড প্রজেক্টর

এক ধরনের যন্ত্র, যার দ্বারা নির্দিষ্ট স্ক্রিনে স্থির চিত্রকে স্লাইড আকারে উপস্থাপন করা যায়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল বা পরিস্থিতিকে সেনাদের নিকট উপস্থাপনের জন্য এটি প্রথম ব্যবহৃত হতে শুরু করে। পরবর্তীতে অন্যান্য সভা,কাউন্সিল, বিজনেস মিটিং প্রভৃতিতেও এর ব্যবহার শুরু হয়।

মাল্টিমিডিয়া এলসিডি প্রজেক্টর

উপস্থাপনায় ব্যবহৃত সর্বাধুনিক যন্ত্র, যার বিশাল স্ক্রিনে যে কোনো বিষয়কে ভিডিও অডিও বা স্লাইড আকারে উপস্থাপন করা যায়। এটি শ্রোতার ভিজ্যুয়াল এটেনশনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং যে কোনো উপস্থাপনায় উপস্থাপকের দায়িত্ব সহজ করে। এই ধরনের প্রজেক্টর ছাড়া আধুনিক কোনো পণ্য, ব্যবসার প্রমোশনাল উপস্থাপনা কিংবা বৈজ্ঞানিক সেমিনার প্রভৃতি কল্পনাই করা যায় না। এলসিডি প্রজেক্টরে স্লাইড এবং ভিডিও, গ্রাফিক্স, এনিমেশন প্রভৃতি প্রদর্শনের সুযোগ থাকায় উপস্থাপক এক্ষেত্রে অনেকটাই যন্ত্রনির্ভর হয়ে নিজেকে কেবল পরিচালকের ভূমিকায় আসীন রেখে যে কোনো উপস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এমনকি ইদানিং শ্রেণিকক্ষগুলোতে পাঠ উপস্থাপনায়ও এই আধুনিক যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

কম্পিউটার সফটওয়্যার

উপস্থাপনার ক্ষেত্রে উপস্থাপকের দক্ষতার অনেকটাই এখন কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী উপস্থাপনা সফটওয়্যারের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার যেটির দ্বারা যে কোনো উপস্থাপনাকে আকর্ষণীয়, অধিক বোধগম্য ও স্বয়ংক্রিয় করে তোলা যায়। এজন্য উপস্থাপকের অধিকাংশ দক্ষতা এখন কম্পিউটার সফটওয়্যারটির যথাযথ ব্যবহারের পেছনে ব্যয় হয় যা উপস্থাপনার সময় তার সৃজনশীলতার দ্বারা শ্রোতাকে অনেক বেশি মনযোগী করে তুলতে সক্ষম।

14. Skill in Communicative English (Conversational Situation)

14.1 Living in an apartment

Shakil : Hello Razib, good morning.
Razib : Hi Shakil, good morning.
Shakil : Razib, where are you going?
Razib : I am going nowhere. I live here in an apartment of this multi–storeyed building. Please come to my apartment.
Shakil : Sorry, not now. I have to go to an office for an urgent piece of business. I shall come another time.
Razib : Oh, then you must inform me before you come.
Shakil : Ok, sure. What floor is your apartment on?
Razib : It's on the third floor.
Shakil : Is the building a walk–up?
Razib : No. It has a small elevator.
Shakil : How large is your apartment?
Razib : It has one drawing room, two bedrooms, one dining room, one kitchen, two baths and two balconies.
Shakil : What other facilities do you have here?
Razib : It is a south facing building. The building has spacious lawn in front of it where children can play. I have got instalment payment facility from the owner company. The building has roof top garden and round the clock security system.
Shakil : Then, I think you are living in a comfortable place with your family. I believe your family members are happy. Bye for the moment.
Razib : Bye, see you next time.

14.2 Speak English–Using the telephone.

- **Using Telephone**

Zahid : Hello, good afternoon. It is Anwar Zahid speaking from Gulshan, Dhaka. Is it Unilever Company head office?
Receptionist : Good afternoon, sir. Yes, it is Unilever Company. How can I help you, sir?
Zahid : Is it in the city or in the suburbs?
Receptionist : It is at Tejgaon in the city.
Zahid : Well. I want to talk to your Marketing Manager. What's his telephone number?
Receptionist : Just a moment please, sir.
Zahid : Well, I am waiting.
Receptionist : I am giving you his office telephone number. It is 8151467 and you need to talk to his personal assistant first.
Zahid : Hello, is it the telephone number of Marketing Manager of Unilever Company?
PA : Yes, it is.
Zahid : I'd like to speak to him.
PA : Who's calling, please?
Zahid : Tell him it's his friend Zahid working in Pran RFL.
PA : Please hold on. I have to see if he's busy or free.
Zahid : Yes, I am waiting.
PA : Sir, Marketing Manger has asked me to inform you that after 15 minutes he will contact you over telephone.
Zahid : Thank you.

PA : You are welcome, sir.

14.3 About different types of cutters and collect chuck

Students : Good Morning, teacher.

(Standing up and in chorus)

Teacher : Good morning to you all. Please sit down. How are you all?

Students : We are fine, sir. Thank you.

(Sitting down and in chorus)

Teacher : This is your practical class of CNC Machining. Now can anyone remember what is the today's topic?

(Some Students raised their hands).

Teacher : Mina, Please tell us what is today's topic.

Mina : Thank you sir. Today we are going to know about the essential tools included to CNC Machining.

Teacher : Very good. You all have read about lathe/mill/grind machines in your textbook. These all are mainly used for turning metal. Are'nt that?

Students (in chorous) : Yes, sir.

Teacher : Well. Today we just discuss about two essential parts of a mill machine which are mainly used to cut metal. Do you know what those are called?

Tareq : Yes, sir. Those are called cutter and collet chuck.

Teacher : Very good, Tareq. Keep it up.

Tareq : Thank you, sir.

Mina : Sir, what is a cutter?

Teacher : Actually it is called milling cutter. Milling is one kind of lathe process that can cut off or remove unnecessary part of a metal work piece to make it usable for a productive purpose.

Mina : Oh really! Now I understand.

Tareq : But sir, how does cutter do the job? Metal is very hard and thick also. It would be very tough to cut off its unnecessary part even though maintaining absolute ratio except the help of high temperature.

Zahid : Very good question, Tareq. Actually milling cutter has multitooth and using the machine power those rotate continuously around the axis.

Teacher : Could you show me the picture of cutters from your textbook?

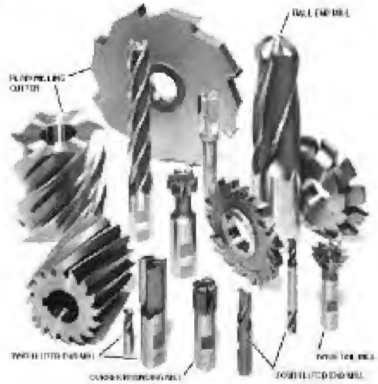

Students (in chorous): Of course, sir, this is it.

Teacher : You all are great. Now listen carefully, different types of cutters are available for serving different purposes.
Mina : But sir, we can divide them into four main types.
Teacher : That's right. Could you tell the name of these four main types of cutter?
Mina : Of course, sir. They are end mill, slab mill, face mill and thread mill.
Teacher : Very good.
Tareq : But sir, I am little confused. How cutter is mountained up into main milling machine when so many different types of cutters are available and looking quite different from each other?
Teacher : Don't worry, Tareq. Still I have another essential part of the machine to introduce to you and you could be enlightened through the point.
Mina : Let me guess it, sir. I think it should be an adapter through which milling cutters are mounted into the spindle of a CNC machine. Am I right, sir?
Teacher : Oh, you are absolutly right. The adapter is called chuk in machine language.
Tareq : Hah, chuck, what a strange name it is! What is a chuck, sir?
Teacher : A chuck is a specialized type of clamp used to hold an object commonly known to us as adapter or holder of a cutter.
Mina : But sir, our textbook includes it as the collet chuck. Is it a special kind of chuck?
Teacher : Collet chuck is one of a main types of chuck used for drill, lathe or milling mechanism. Collet Chuck uses collets to hold the cutter.
Tareq : I have remembered collet chuck is useful for turing application.
Teacher : Yes, my dear boy, you have got the point correctly. Now show me the picture of the collet chuck from your textbook.

Tareq : Oh, sure. This is it, sir.
Teacher : Thank you Tareq. Good job. Remember the names of some types of collet chuck including ER collet chuck, Auto Lock collet chuck etc. Dingdong......................ding dong
Teacher : Ah! The period is over. Ok, my little friends remember and practise the lesson carefully. Wish to have a very charming day to all. Good Bye.
Students : Thank you very much for an interesting lesson and good bye to you also, teacher.
(standing up and chorus)

14.4 Speak English–Get help in stores and talking about shopping

- **Dialogue between a customer and a salesman in a stationery shop.**

Customer : Good morning.
Salesman : Good morning, sir. How can I help you?
Customer : I need some art papers. Have you got it?

Salesman : Yes, we have. How many would you like to have?
Customer : Twenty pieces, please.
Salesman : Here they are, sir.
Customer : How much are they?
Salesman : Forty taka.
Customer : Here it is.
Salesman : Thank you. Do you require anything else?
Customer : One thing more. Do you have clip files?
Salesman : Sorry. We don't have now. You can get it from the next shop.
Customer : All right. I'll get them later on. Thank you for your help.
Salesman : You're welcome. Please do come again.

- **Talking about shopping.**

Ruma : Mother, are you going out now?
Mother : Yes, dear. First I'll go to your Rani aunt's house and then I'll go for shopping.
Ruma : Ok. When you'll go for shopping, please buy some articles for me.
Mother : What are they, Ruma?
Ruma : I require some art papers, colour pencils and two clip files.
Mother : All right. I'll buy those things.
Ruma : Thank you. You are so nice, mother.
Mother : Ruma, I think you require shoes. Your school shoes have worn out.
Ruma : It you think so, you can bring that for me. Then you can buy hair clip, ribbon for me and if possible one table clock and flower vase for my reading table.
Mother : Ok. My dear, I have not enough money now and I shall try my best to buy as much as possible.
Ruma : As you wish mother.
Mother : Bye, Ruma.
Ruma : Bye, mum. May Allah protect you.

14.5 Send and Receiving Letters

- **Sending Letters**

Shahed : Hi Kamal, what a pleasant surprise to see after a long time! How are you?
Kamal : Oh, it's Shahed. Very pleased to see you. Yes, it's a long time after our last meeting. I'm fine. How are you?
Shahed : I'm fine. At this early hour where are you going through this road?
Kamal : I'm going to GPO to send this letter to my pen friend now living in Canada.
Shahed : Oh, I see. You have a pen friend. How long is your pen friendship?
Kamal : It's for two years.
Shahed : Why are you going to GPO? Why are you not going to nearby post office of your residence?
Kamal : I sent letters through that post office but sometimes my pen friend did not get my posted letters and that's why I send through GPO.
Shahed : It's now 7.30 A.M in the morning. Why are you going so early?
Kamal : If I go late, I have to face a long queue. Then it will take a long time to post my letter.
Shahed : By the way, why don't you use E-mail, Facebook or Skype?
Kamal : Yes, you're right. But I find one kind of mental peace and happiness through writing letter. My pen friend also bears the same attitude.
Shahed : Do you often write to him?

Kamal : No, I write to him once a month.
Shahed : Well, best of luck. Bye.
Kamal : Bye, see you next.

- **Receiving Letters**

Akash : Hi Abir, How are you? Where are you going?
Abir : Hi Akash, I'm fine. Hope you are also fine.
Akash : Yes, I'm fine.
Abir : I'm going to our nearby post office in search of a parcel bag sent by my uncle living in England.
Akash : Why are you going yourself? It's the duty of the postal department to send your parcel bag to your address.
Abir : No, it has not happened so.
Akash : By the way, I have seen a postman going through that road with a big bag.
Abir : Oh, that road leads to our house. Let me see if the postman carries my parcel bag. I need to hurry. Then bye.
Akash : Bye Abir. Best of luck.

14.6 Talk about the Weather & trips and sight seeing

- **Talking About Weather**

Najnin : Hello Rashida, good morning.
Rashida : Hi Najnin, good morning to you too.
Najnin : How are you going on with your days?
Rashida : I am not pulling well as hot spell is prevailing now throughout the country.
Najnin : Yes, I agree with you. The country temperature has risen to 45° Celsius.
Rashida : I can't tolerate too much hot as I have recently recovered from typhoid fever. I think nature is also experiencing the bad effect of this hot spell.
Najnin : I pray to almighty Allah for your full well–being.
Rashida : Thank you so much.
Najnin : The weather department has forecasted that hot spell will go away in a day or two.
Rashida : I hope so. May Allah shower mercy on us. I am afraid that after this kind of hot spell hurricane occurs.
Najnin : I agree with you. I also pray to Almighty Allah.
Rashida : Well, bye.
Najnin : Bye too.

- **Booking for a trip**

Passenger : Good morning.
Station Master : Good morning, sir. How can I help you?
Passenger : Would you tell me when the Inter City train wil leave for Chittagong?
Station Master : At 10 P.M. When do you want to travel? How many tickets do you need?
Passenger : I want to travel today. I need two tickets.
Station Master : All the tickets for today have atready been sold. But you're lucky. A few minutes ago one passenger cancelled his journey and gave back his four tickets. Now you can have two tickets from them.
Passenger : Thank god. Could you tell me which seats are vacant?
Station Master : Two seats in the fourth left row and another two seats in the second third row are vacant. Which row do you want?
Passenger : I want to have tickets for the two seats in the fourth left row because these

seats are beside the window. My wife loves to seat beside the window.

Station Master : Here are the two tickets. You are to pay Tk. 700 for the tickets.
Passenger : Here it is. When shall I come here to report?
Station Master : At 9.30 P.M. The train will leave at 10 P.M. sharp.
Passenger : Many thanks for your co–oporation.
Station Master : You're welcome.

- **A dialogue between two friends about a visit to a place of historical sight seeing.**

Mahboob : Hello Jamil, nice to meet you. How are you?
Jamil : Nice to meet you too. I'm fine. How are you?
Mahboob : I'm fine. Did you attend the English class yesterday? In that class our English teacher discussed our lesson entitled heritage site.
Jamil : Yes, I was present. I heard his discussion.
Mahboob : I have already visited Mohasthan gar at Bogra. I enjoyed it very much. Have you ever visited any heritage site of our country?
Jamil : Yes. During the last autumn vacation I got an opportunity to visit Bagerhat with my father.
Mahboob : Whay have you chosen Bagerhat?
Jamil : You know Bagerhat is a place of historical interest. The Shat–Gambuj Moshque is a World Heritage Site. Many people from home and abroad come to visit Bagerhat.
Mahboob : What important things did you see there?
Jamil : The Shat–Gambuj–Mosque, the Mazar of Khan Jahan Ali, the tank, the Ghora Dight etc.
Mahboob : Would you please tell me about the mosque?
Jamil : It is an enormous Moghul archittecture. Khan Jahan Ali built it in 15^{th} century. The mosque is unique because it has sixty pillars supported by seventy seven curved domes. Khan Jahan Ali used it both as a mosque and as a court.
Mahboob : How did you enjoy your visit?
Jamil : It's a wonderful experience. The memory of my visit still haunts me.
Mahboob : Thank you very much.
Jamil : You are welcome.

- **Dialogue between two friends about visiting some important places.**

Abid : Hello Sohel, good morning. Nice to see you again.
Sohel : Hi Abid, same to you. How are you?
Abid : I'm fine. When have you come back from Dhaka?
Sohel : Yesterday in the evening.
Abid : How long did you stay there?
Sohel : I stayed there for a week. It was my first visit to Dhaka.
Abid : How did you enjoy there?
Sohel : Oh! It was very exciting.
Abid : What important sites have you visited?
Sohel : Almost everyday I used to go out with my cousin brothers and sisters to visit important places. I've visited the National Museum, the National Zoo, the Central Shaheed Minar, the Curzon Hall, Ahsan Manjil, the Shangsad Bhaban, the Botanical Garden and many other places.
Abid : It sounds great. I think you have spent wonderful time in Dhaka.
Sohel : Yes, my first visit to Dhaka was of great interest. Those happy days will remain ever remembered in my heart. It has also widened my knowledge and experience.

Abid : Thank you for giving description of your visit to Dhaka. Bye.
Sohel : You're welcome, see you again.

- **Dialogue between two friends about sight seeing.**

Nasir : Hello Pavel, good morning. Very nice to see you.
Pavel : Hi Nasir, good morning. I'm also glad to see you.
Nasir : During the Eid-ul-Azha vacation I went to my village home. Where had you been then?
Pavel : I went to my uncle's house in Chittagong.
Nasir : In my village home I enjoyed natural scenery, trees, birds, boats in the Dhaleswari river, farmers working in the field, simplicity of the village people and many more charming and attractive things and activities.
Pavel : Oh, I see. Nasir, I think you've passed a great and joyful time in your village home.
Nasir : I have told you about my feeling. Now, what about you in Chittagong?
Pavel : While staying in Chittagong, I went to Bandarban known as "Country of cloud and hill" along with my three cousin brothers. If you do not see in your own eyes, you can not believe how beautifully and artistically the gifts of nature are decorated there. Here hills are the rhythm of joy and exuberance. Here hills are the names of love. Here one can feel the touch of cloud closing one's eyes, drink the fresh water of cold spring to one's heart's content, sleep on the cloud. Here one can go upto the cloud with car, roam around with blanket all over the body in midday and go across the moonlit sea with boat. Here the sun rises first. Here the sky is the largest, the most generous, the most extensive and the dearest one. Here one will get the most beautiful characteristics of a spring. You can not imagine what a beautiful and artistic sight Bandarban presents. It is beyond description. I request you to visit Bandarban whenever you get opportunity.
Nasir : Oh, that sounds great! I feel tempted to visit Bandarban and I must visit Bandarban. I think you've enjoyed too much.
Pavel : That sounds nice. I am to go to market. So, Bye.
Nasir : Bye, see you next.

- **Dialogue between two friends in a railway station.**

Khurshid : Hi Salma, good morning. How nice to see you after long time!
Salma : Hello Khurshid, good morning. What a pleasant surprise! I am so happy to see you here.
Khurshid : I have heard that you went abroad for higher studies. Have you completed your course?
Salma : Yes, I am in Australia for doing higher studies. No, I have not yet completed my course. Now I'm in Dhaka for my grandfather is very ill. I'm going to Sylhet to see him.
Khurshid : What a surprise! I'm also going to Sylhet. I'm going there to see my aunt who has recently joined in a govt. college there.
Salma : Then, we are going to the same place. I think we shall pass our time in a nice way. My father is going with me. He is standing over there beside the waiting room. Who is going with you?
Khurshid : My mother and my younger brother are going with me. They have gone to the nearby fast food shop to buy some snacks.
Salma : I can still remember the sweet memories of our school days. Now by your presence those sweet memories have made me too much emotional.

Khurshid : The same is with me. Let's smile and hug each other.
Salma : Yes. you're right.

- **Dialogue between two friends about daily activities.**

Salma : Hi Nurtaj, good afternoon. Where are you going at this time?
Nurtaj : Hi salma, good afternoon. I'm going to the playground to practice badminton. The inter–school badminton competition will start soon and I want to participate in the competition as a member of my school team. Badminton playing is my favourite game.
Salma : I'm very happy to hear that. I am not participating. I am not good at tennis. Besides, I like gardening very much.
Nurtaj : Oh, that sounds good! I think you enjoy your time in your garden.
Salma : I have heard from Rashida that you strictly maintain you daily activities. How do you do that?
Nurtaj : Oh! I'm happy that you are eager to know about my daily activities.
Salma : Yes. please tell it in short.
Nurtaj : I get up early in the morning usually at 5 A.M. Then I say my Fazar prayer and recite from the Holy Quran for 15 minutes. After that I go out for a walk in the open field in front of our house. After returning home I sit to study in my reading room at 6 A.M. At 8 A.M. I take my breakfast and take preparation to go to school. At 9 A.M. I start for my school. My school sits at 9.30 A.M. At tiffin time I say my Zohar prayer and take little snacks which I take from my home. At school I listened to my teacher's lecture attentively. Then I come back from school at 3 P.M. After coming home I take off my school dress, wash hands, feet and face and eat my lunch. After lunch I take rest for sometime. Then at 4.30 P.M. I go to the playground to practice badminton. Sometimes I play other games too. Before evening I come back home, say my evening prayer and take some snacks. Then I sit for study and continue to study till 9 P.M. I watch TV for an hour and then take my dinner and go to bed at 10.30 P.M. This is all about my daily activities in short.
Salma : I'm very glad to hear your daily activities. I have to make some changes in my daily activities to make the same like that of yours. Thank you very much.
Nurtaj : You're welcome. Bye.

- **Two friends discussing before going to buy a computer.**

Shafiq : Hello, Munir. How nice it is to meet you after our examination! Is it not a long time?
Munir : Hello, Shafiq. I had been at my village home after our examination.
Shafiq : What are you going to do now?
Munir : I've an idea. Can you help me?
Shafiq : Yes, of course. What's it?
Munir : I want buy a computer. But I'm not sure which one shall I buy? What do you think I should do?
Shafiq : What is your budget?
Munir : Tk. 60,000/– and I want to buy a computer within a reasonable price.
Shafiq : I think you should buy Lenovo computer and it is within your budget. It's a good computer. I'm using it.
Munir : But I've no good idea about computer. Would you go with me?

Shafiq : It's my pleasure to accompany you.
Munir : Then we can go on next Monday.
Shafiq : All right. See you on Monday next. Bye.
Munir : Thanks a lot. Bye.

- **Two friends discussing how to use a computer.**

Shawqi : Hi Abdullah, how are you? It's a pleasure to see you.
Abdullah : Hi Shawqi, I'm fine. How do you do?
Shawqi : I'm fine. After your examination what are you doing now?
Abdullah : I'm trying to learn how to use a computer? But I find it difficult for me. Will you help me?
Shawqi : It's my pleasure to help you.
Abdullah : Then please come to my house now. I am free now. Are you now free?
Shawqi : Yes, I am not busy now. Let's go to your house.
Abdullah : Thanks a lot.
Shawqi : Before starting to use a computer, you should learn about the main parts of a computer.
Abdullah : Let's start with the different parts of computer.
Shawqi : Different main parts of a computer are : system unit, monitor, keyboard, speaker and mouse.
Abdullah : Ok. I've learnt. Now show me how to start and shut down a computer.
Shawqi : Now observe my activities. First I am switching on the electricity supply. Next if UPS is connected, I shall switch on it. Then I shall press the power button of the system unit. Now I shall press the power button of the monitor. After sometimes a screen will appear on the monitor. It is called desktop. Now computer is ready for functioning. Have you observed my activities. Now I shall show you how to shut down a computer. To shut down a computer you have to–

1. Put the mouse pointer on the start button.
2. Chick on the left mouse button.
3. Click on the turn off (Shut down) option.
4. Press on the power switch of the monitor.

Abdullah : Now let me practice this.
Shawqi : All right. Now practice yourself.
Abdullah : Thank you Shawqi for your co–operation. I hope to learn more from you in near future.
Shawqi : You're welcome. I'm always ready to help you. Now I need to go to my house. Bye.
Abdullah : Bye Shawqi.

14.7 Talking About Eating & Dinner Conversation

- **Talking About Eating Habits**

Rajib : Hello Adnan, how are you? I have not seen you after the result of our HSC examination.
Adnan : Hello Rajib, I am fine. Yes. It is.
Rajib : I have got admission in BSC (Honurs) course in Botany in Dhaka University. Where

have you got yourself admitted?

Adnan : I have got admission in health education subject in an institute. In future I want to work with the people of my village.

Rajib : What do you study there?

Adnan : Health well–being related topics are taught. An interesting matter happened in our health education class yesterday.

Rajib : What's that? Will you tell me, please?

Adnan : Yesterday our teacher of this subject discussed about the eating habits of the people of our country.

Rajib : Please, tell me that.

Adnan : There are quite differences in the eating habits and food items of our rural and urban people. Our rural people eat heavy meal in the breakfast. They usually eat rice and pulse or rice with some other food items for breakfast. Sometimes they also eat chira, khai and muri at breakfast. On the contrary the urban people take bread, parata, loaves, egg, vegetable, sweets and banana etc. along with tea. For lunch our rural people usually eat rice and one or two curries. Our urban people are used to taking rice, curry, fish, vegetable, meat, dal etc. for lunch. The dinner of the rural people is just like the lunch. The dinner items of the urban people are like the lunch items.

Rajib : But I know our urban people also take light refreshment between these three meals.

Adnan : Yes, you are right. Urban people take little snacks before lunch around at 11 or 11:30 AM. They also take light refreshment in the afternoon or evening.

Rajib : What do they eat at these two times?

Adnan : They usually take biscuits, sandwitch, burger, vegetable rolls, singara, samucha, piazoo etc. along with tea or coffee.

Rajib : Do our rural people eat light refreshments like that of the urban people?

Adnan : No, they don't.

Rajib : Thank you for information which I did not know.

Adnan : Thank you too.

- **Dialogue at dinner time.**

Mother : It is time for dinner. All the family members come to the dining table. Dinner is ready.

Shahed : Mum, I will not take vegetable.

Mother : No, you must take vegetable.

Shahed : Rashida is not taking vegetable. She is eating rice with fish and no vegetable is in her plate.

Mother : Shahed, you are wrong. Rashida has come early and she has already eaten vegetable.

Shahed : All right, give me a little vegetable.

Mother : Shahed, you must eat adequate vegetable everyday. You know that health requires all kinds of adequate vitamins. Besides taking fish, meat, milk and egg, you should take vegetable also and this will provide you with all kinds of vitamins.

Shahed : You are right. But mother, I do not like to eat vegetable everyday.

Mother : Two days ago I went through your Health Education book and there I read about the daily needs of vitamins for keeping good health. I have also learnt from there about the diseases caused by the deficiencies of vitamins. Have you not read those?

Shahed : Yes, I have read.
Mother : Then, why don't you follow the instructions?
Shahed : I want to follow. But sometimes I don't feel good to follow.
Mother : That's a bad idea. You know that well known proverbs "Sound mind in a sound body."
Shahed : Ok, mother. From now I shall try my best to take all kinds of foods.
Mother : Ok. That sounds very good.

- **Dialogue between you and a Passerby who is looking for a house.**

I : Excuse me. I wonder if you can help me.
Passerby : What's that?
I : I am looking for 60/c govt. officers' quarter, Paikpara. But I can't find it. Please help me.
Passerby : Oh, I see! It's opposite to Bangla College. Go straight along this road. Then turn on the right. You'll find a lane and after walking a little further you'll see an alley and at the end is house 60/c.
I : Thank you very much for your kind co–operation.
Passerby : You're welcome.
I : Another question I like to ask. Is it a walking distance?
Passerby : Yes, you can go on foot.
I : Ok. Thank you for your information.
Passerby : You are welcome.

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি-২ প্রথম পত্র

ব্যবহারিক কাজ (জব)

জব তালিকা

জব নং–১

১. কী–বোর্ডের প্রত্যেকটি কী এর কাজ চিহ্নিত করণ।

কাজের উদ্দেশ্য :

কী–বোর্ডের প্রত্যেকটি কী এর কাজ চিহ্নিত করতে পারা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

একটি কী বোর্ড

কাজের ধরন অনুযায়ী কী–বোর্ডের কীগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

ক. ফাংশন কী
খ. টাইপিং কী
গ. টেক্সর কী
ঘ. কার্সর মোভমেন্ট কী
ঙ. নিউম্যারিক কী প্যাড ও
চ. বিশেষ কী

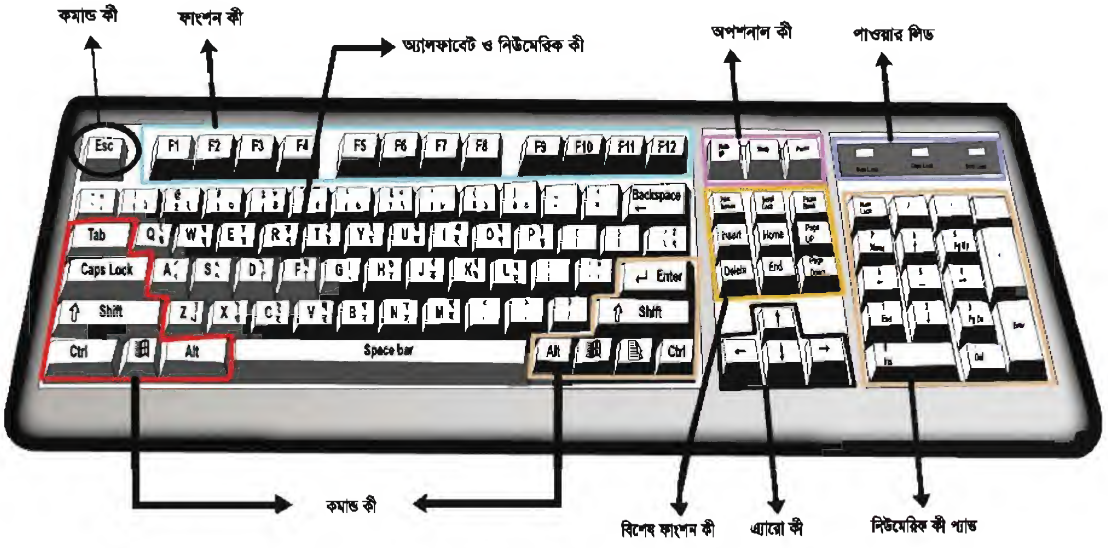

ফাংশন কী (Function Key) :
এ কীগুলো তথ্য সংযোজন বা ইনসার্ট করা, অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা এবং বিশেষ ধরনের নির্ধারিত নির্দেশ প্রদান করে।

টাইপিং কী (Typing Key)

Enter Key : কমান্ড লিস্টের আইটেম সিলেক্ট করে এ কী চাপলে তা কার্যকর হয়। কোনো Document-এ নতুন প্যারাগ্রাফ তৈরি করে।

Tab Key : একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে (৫ ক্যারেক্টার) কার্সরকে স্থানান্তর করে।

Space bar : একবার চাপলে এক ক্যারেক্টার Space হয়।

Shift key : এ কী চাপ দিয়ে ধরে রেখে কোনো অক্ষর কীতে চাপ দিলে বড় হাতের অক্ষর (Capital Letter) হয়। এ কী চেপে ধরে দুইটি ক্যারেক্টারযুক্ত কী-গুলোর যে কোনো একটি Key (কী) তে চাপ দিলে উপরের চিহ্নটি টাইপ হয়।

Caps Lock : চাপ দিয়ে অন করে টাইপ করলে লেখা বড় হাতের (Capital Letter) হবে।

কার্সর মোভমেন্ট কী

Arrow কী: কার্সরকে বিভিন্ন দিকে যেমন– বামে, ডানে, উপরে এবং নিচে নেওয়া যায়। ।

Page up কী : কার্সরকে একস্ক্রিন স্ক্রল আপ করা যায়। Ctrl + Page up কী চেপে কার্সরকে স্ক্রিনের শুরুতে আনা যায়।

Page Down কী : কার্সরকে একস্ক্রিন স্ক্রল ডাউন করা যায়। Ctrl + Page up কী চেপে কার্সরকে স্ক্রিনের শেষে আনা যায়।

Home/End কী : কার্সরকে বর্তমান লাইনের শুরুতে অথবা শেষে নেওয়া যায়।

Delete কী : কার্সরের ডান দিকের বর্ণ বা চিহ্ন মোছা হয়।

Back space কী : কার্সর যে অবস্থানে আছে তার বাম দিকের কারেক্টার মুছা হয়।

Insert কী : সঠিক অক্ষর, অঙ্ক বা চিহ্ন টাইপ করে ভুল সংশোধন করা যায়।

নিউম্যারিক কী—প্যাড

কী—বোর্ডের ডান অংশে ক্যালকুলেটরের মত ০—৯ এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি চিহ্নিত কী-গুলোকে নিউম্যারিক কী—প্যাড বলা হয়। Num Lock কী যদি অন করা থাকে তবে নিউম্যারিক্যাল কী-প্যাডের মাধ্যমে এ কী—সমূহ ব্যবহার করা যাবে।

বিশেষ কী

Windows কী : এই কী চাপলে স্টার্ট মেনু প্রদর্শিত হবে।

Escape (Esc) কী : কোনো একটি কাজকে বা নির্দেশকে বাতিল করে দেয়।

Control (CTRL) কী : অন্য কী-এর সাথে একত্রে চাপ দিয়ে কোনো প্রোগ্রাম অথবা নির্দেশনা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Alter (ALT) কী : এ কী বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন রূপে কাজ করে। CTRL, ALT এবং DEL কী একসাথে চাপ দিলে কম্পিউটার রিস্টার্ট হবে ।

Pause/Break কী : কম্পিউটারে কোনো নির্দেশ বা প্রোগ্রাম চলাকালীন এ কী চাপ দিলে ঐ নির্দেশ চালু অবস্থায় থামানো যায়।

Scroll Lock কী: কম্পিউটারের স্ক্রিন বা মনিটরে কোনো ডেটা বা ইনফরমেশন দেখার জন্য নির্দেশ দিলে ঐ ডেটা বা তথ্য মনিটরে দেখাবে। কিন্তু ডেটা লেখাগুলো একস্ক্রিনে সংকুলান না হলে অতি দ্রুত স্ক্রল হয়ে চলে যাবে যে মনিটরে দেখা গেলেও বুঝা যাবে না। এক্ষেত্রে স্ক্রল লক বা স্ক্রল কী (Scroll or Scroll কী) চাপ দিয়ে স্ক্রিনে স্ক্রল

থামানো যায়।

Print Screen কী : এ কী ব্যবহার করে স্ক্রিনে প্রদর্শিত লেখা বা ছবিকে প্রিন্ট করা যায়।

সতর্কতা :

১. কী-বোর্ডকে সতর্কতার সাথে সিস্টেম ইউনিটে সংযোগ এবং সিস্টেম ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যেন কোনো অংশ নষ্ট না হয়।

২. ভালো কী-বোর্ডের অভ্যন্তরীণ অংশ না খোলাই ভালো। এতে কী-বোর্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩. কী-বোর্ড সিস্টেমে সংযোগ করার সময় কানেক্টরের ডিরেকশন ঠিক আছে কী না দেখে নিতে হবে।

জব নং—২

জবের নাম : হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ।

কাজের উদ্দেশ্য :

১. কম্পিউটারে ব্যবহৃত হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে পরিচিত।

২. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ চিহ্নিতকরণ।

৩. মাদারবোর্ডের সাথে হার্ডডিস্কের সংযোগ স্থাপন ও বিচ্ছিন্নকরণ দক্ষতা অর্জন।

৪. হার্ডডিস্ক ড্রাইভের বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ অংশসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৫. প্রত্যেকটি অংশের কাজ জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. একটি হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

২. একটি কম্পিউটার পদ্ধতি

৩. স্টার ও ফ্ল্যাট স্ক্রু ডাইভার

প্রসঙ্গ বা ভূমিকা :

যে ডিভাইসের সাহায্যে হার্ড ডিস্ক চালনা করা হয় তাকে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (Hard disk drive) বা সংক্ষেপে HDD বলা হয়। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের সাথে আটকানো ডিস্ক প্যাক একটি ঘূর্ণায়মান দণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং উহা আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। একটি স্পিন্ডল মটর ডিস্ক বা ডিস্ক প্যাককে মিনিটে ৭২০০ বা ১০০০০ বার বার ঘুরায়। হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে স্পিন্ডল মটর, ভয়েজ কয়েল মেকানিজম, একচুয়েটর, রিড/রাইট হেড, ডিস্ক প্যাক, হেড পজিশনিং ম্যাকানিজম, আইডিই কানেকটর, মাস্টার-স্লেভ জাম্পার ব্লক, পাওয়ার কানেকটর এবং বায়ু সঞ্চালক ও বিশোধক ইত্যাদি অংশ থাকে।

কাজের ধারা :

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের হার্ডডিস্ক সংগ্রহ করতে হবে।

২. হার্ডডিস্ক ড্রাইভকে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

   ক. হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত পাওয়ার কানেক্টর ও আইডিই/সাটা কানেক্টর খুলতে হবে।

   খ. স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে পদ্ধতি ইউনিট খুলে হার্ডডিস্ক ড্রাইভের স্ক্রুগুলো খুলতে হবে।

৩. ড্রাইভটিকে সিস্টেম ইউনিটের বাইরে আনতে হবে।

৪. একটি নষ্ট হার্ডডিস্ক ড্রাইভের টপ কভার স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে খুলতে হবে।

৫. ড্রাইভারের প্রধান প্রধান আভ্যন্তরীণঅংশসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

চিত্র : হার্ডডিস্কের বিভিন্ন অংশ

৬. ড্রাইভের টপ কভার পুনরায় সংযোগ করতে হবে।
৭. ভালো হার্ডডিস্ক ড্রাইভকে পুনরায় সিস্টেম ইউনিটের সাথে সংযোগ করতে হবে।
৮. পাওয়ার ক্যাবল ও ডেটা ক্যাবল হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

সতর্কতা :

১. হার্ডডিস্ক ড্রাইভটি সতর্কতার সাথে পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যেন কোনো অংশে নষ্ট না হয়।
২. ভালো হার্ডডিস্ক ড্রাইভের অভ্যন্তরীণ অংশে না খোলাই ভালো। এতে ড্রাইভটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৩. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ সিস্টেমের সাথে সংযোগ করার সময় কানেক্টরের ডিরেকশন ঠিক আছে কী না দেখে নিতে হবে।

জব নং–৩

জবের নাম : ফ্লাশ ড্রাইভ ও মিডিয়াম ড্রাইভ বিভিন্ন অংশে চিহ্নিতকরণ।

১. ফ্লাশ ড্রাইভ

উদ্দেশ্য :

১. ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ সম্পর্কে জানা
২. ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভের বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ অংশসমূহ চিহ্নিত করা।
৩. ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভের ব্যবহার জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ
২. ইউএসবি পোর্ট ও অপারেটিং পদ্ধতি সম্বলিত একটি পিসি।

ভূমিকা :

ফ্লাশ ড্রাইভ এক ধরনের সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি চিপ। বৈদ্যুতিক পাওয়ার না থাকা অবস্থায় তথ্য ধারণ করতে পারে। হার্ডডিস্কের তুলনায় এর শুঠন সময় কম এবং বিভিন্ন প্রকার আঘাত সহন ক্ষমতা বেশি। ইহা একটি পোর্টেবল সেকেন্ডারি মেমোরি। প্যাকেজিং অত্যন্ত মজবুত থাকায় চাপ, তাপ ও পানির প্রভাব থেকে ইহা অধিকতর সুরক্ষিত থাকে।

কাজের ধারা :

১. একটি ফ্লাশ ড্রাইভ সংগ্রহ করে উহার বহিঃস্থ অংশগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

চিত্র : ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ

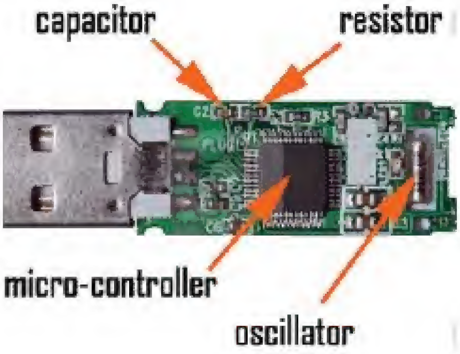

চিত্র : ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ এর বিভিন্ন অংশ

২. সম্ভব হলে ফ্লাশ ড্রাইভের বহিঃস্থ খোলসটি খুলে ভেতরের পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

ক. ইউএসবি কানেক্টর
খ. ইউএসবি কন্ট্রোলার চিপ
গ. টেস্ট পয়েন্ট
ঘ. ফ্লাশ মেমোরি চিপ
ঙ. ক্রিস্টাল অসিলেটর
চ. রেজিস্টেন্টর
ছ. রাইট প্রটেক্ট সুইচ (অপশনাল)
জ. এলইডি।

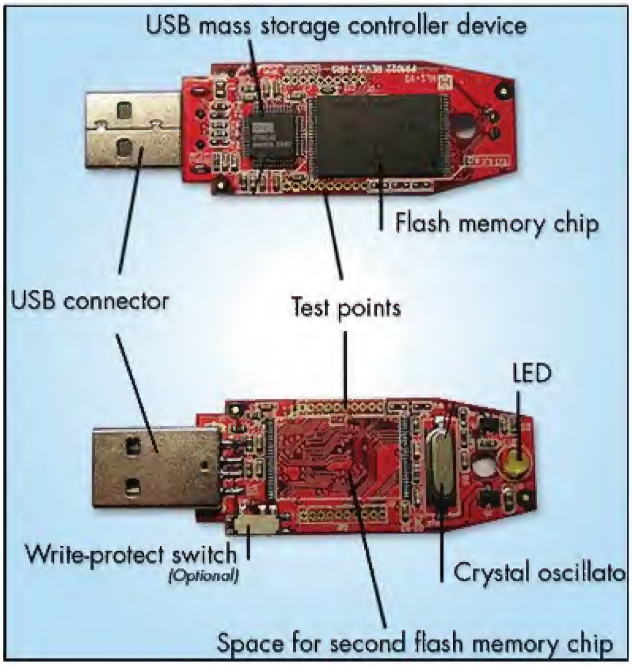

৩. ফ্লাশ ড্রাইভটি কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
৪. ফ্লাশ ড্রাইভটি প্লাগ এন্ড প্লে প্রকৃতির হলে অপারেটিং সিস্টেম একে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে নেবে।
৫. টাস্ক বারে ফ্লাশ ড্রাইভের আইকন দেখা যাবে।
৬. My Computer–এ ডাবল ক্লিক করে অথবা এক্সপ্লোরার খুলে ড্রাইভটি অপারেটিং সিস্টেম ডিটেক্ট করেছে কী না তা দেখে নিতে হবে।
৭. ফ্লাশ ড্রাইভের ফাইল বা ফোল্ডার কপি করতে হবে।
৮. অপারেটিং সিস্টেম থেকে ফ্লাশ ড্রাইভকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
৯. সিস্টেম ইউনিট থেকে ফ্লাশ ড্রাইভকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
১০. কাজের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

সতর্কতা :

১. ফ্লাশ ড্রাইভটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিস্টেমে সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
২. ড্রাইভটি বহিঃস্থ খোলস Shield করা থাকলে উহা খুলতে চেষ্টা করা উচিত নয়।
৩. অপারেটিং সিস্টেম থেকে ফ্লাশ ড্রাইভটি Remove না করে সিস্টেম থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঠিক হবে না।

২. সিডি-রম ড্রাইভ

উদ্দেশ্য :

১. সিডি-রম ড্রাইভ সম্পর্কে জানা
২. সিডি-রম ড্রাইভের বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করা।
৩. সিডি-রম ড্রাইভের ব্যবহার জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. সিডি-রম ড্রাইভ
২. সিডি-রম ড্রাইভ সম্বলিত একটি পিসি ।

ভূমিকা :

সিডি রম একটি অপটিক্যাল মাধ্যম । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিডি রম অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের তৈরি হয়ে থাকে । তথ্য সংরক্ষণ এবং পঠন কাজ করার জন্য এতে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয় । সেকেন্ডারি এ স্টোরেজ মিডিয়াটির মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম হওয়ায় ডেটা সংরক্ষণে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে ।

কাজের ধারা :

১. একটি সিডি-রম ড্রাইভ সমৃদ্ধ পিসি সংগ্রহ করে সিডি-রম ড্রাইভ এর বহিঃস্থ অংশগুলো চিহ্নিত করতে হবে ।

Eject button-এ বাটনে চাপ দিলে ডিস্ক ট্রেটি ওপেন হবে । ডিস্ক ট্রে এর ভিতরে সিডি/ডিভিডি সঠিকভাবে স্থাপন করে পুনরায় ইজেক্ট বাটনে চাপ দিলে সিডি/ডিভিডি-টি ভিতরে প্রবেশ করে কাজ করবে ।

Emergency eject hole : Eject button-এ বাটনে চাপ দিলে কোনো সমস্যার কারণে ডিস্ক ট্রেটি না খুললে এর ভিতর সুরু শক্ত দণ্ডাকৃতির কিছু যেমন জেমস ক্লিপের মাথা ঢুকিয়ে চাপ দিলে ট্রেটি ওপেন হবে।

Disc access light : ডিস্ক ট্রে এর ভিতর সিডি/ডিভিডি প্রবেশ করালে লাইট জ্বলবে। সিডি/ডিভিডি-টি কাজ করলে লাইটটি মিট মিট করে জ্বলবে।

২. সম্ভব হলে পাওয়ার অফ করে লাইন থেকে পাওয়ার ক্যাবল খুলে ফেলতে হবে। সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি ক্যাসিং থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্যাসিং এর ঢাকনাটি খুলে মাদারবোর্ডে ড্রাইভের ডেটা ক্যাবেল এবং পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হবে।

৩. আইডিই এবং সাটা সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ সংগ্রহ করে এদের মধ্যকার পার্থক্য দেখতে হবে।

৪. সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে পুনরায় সংযুক্ত করতে হবে।

৫. পাওয়ার সংযোগ করে কম্পিউটারটি অন করতে হবে।

৬. সিডি/ডিভিডি ড্রাইভের ইজেক্ট বাটনে চাপ দিয়ে একটি ডেটাসমৃদ্ধ সিডি/ডিভিডি-টি ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে।

৭. My Computer–এ ডাবল ক্লিক করে অথবা এক্সপ্লোরার খুলে ড্রাইভটি অপারেটিং সিস্টেম ডিটেক্ট করেছে কী না তা দেখে নিতে হবে।

৮. পুনরায় ইজেক্ট বাটনে চাপ দিয়ে ডেটাসমৃদ্ধ সিডি/ডিভিডি-টি ট্রে থেকে বের করতে হবে।

৯. কাজের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

সতর্কতা :

১. সিডি/ডিভিডি ড্রাইভটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিস্টেমে সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. ড্রাইভটি খুলে এর ভিতরের অংশ দেখতে চেষ্টা করা উচিত নয়।

জব নং—৪

জবের নাম : বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টার চিহ্নিতকরণ।

ক. ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার চিহ্নিতকরণ ও কন্ট্রোল প্যানেল পরিচিতি।

কাজের উদ্দেশ্য :

১. ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার এর পরিচিতি।
২. ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের বহিঃস্থ অংশসমূহ চিহ্নিত করা।
৩. ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন বাটন চিহ্নিতকরণ।
৪. বাটনসমূহ ব্যবহার করে প্রিন্টার চালনায় দক্ষতা অর্জন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. একটি ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার
২. পাওয়ার কর্ড ও প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল
৩. একটি কম্পিউটার পদ্ধতি
৪. স্টার ও ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার

ভূমিকা :

ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার একটি সিরিয়াল ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার। একটি প্রিন্ট হেডকে কাগজ ও হেডের মাঝখানে রাখা কালিযুক্ত ফিতার ওপর আঘাত করে অক্ষরগুলো একটার পর একটা ছাপিয়ে যায়। এ প্রিন্টারের হেডে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজানো অনেকগুলো পিন থাকে। ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে ম্যাট্রিক্সের সাইজ 7 × 7 বা 9 × 7 ইত্যাদি। এখানে প্রথম সংখ্যা দ্বারা সারি এবং দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা কলাম বুঝায়। যখন যে বর্ণ ছাপাতে হয় তখন সে বর্ণের ডট প্যাটার্নগুলোর অনুরূপ পিনগুলো প্রিন্ট হেড থেকে বেরিয়ে এসে কালিমাখা ফিতাকে কাগজের ওপর আঘাত করে এবং বর্ণটিকে ছাপায়। এক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স এর সবগুলো বিন্দু প্রয়োজন হয় না। যে বর্ণের জন্য যে বিন্দুগুলো দরকার ঠিক সে বিন্দুগুলোর অনুরূপ পিনগুলোই ব্যবহৃত হয়। এ প্রিন্টারের সাহায্যে প্রতি ইঞ্চিতে ১২টি হিসেবে প্রতি সেকেন্ডে ৩০০টি পর্যন্ত বর্ণ ছাপানো যায়।

কাজের ধারা :

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার সংগ্রহ করতে হবে।
২. প্রিন্টারের বহিঃস্থ অংশগুলো চিহ্নিত করতে হবে।
৩. প্রিন্টারের কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন বাটন/নব চিহ্নিত করতে হবে।

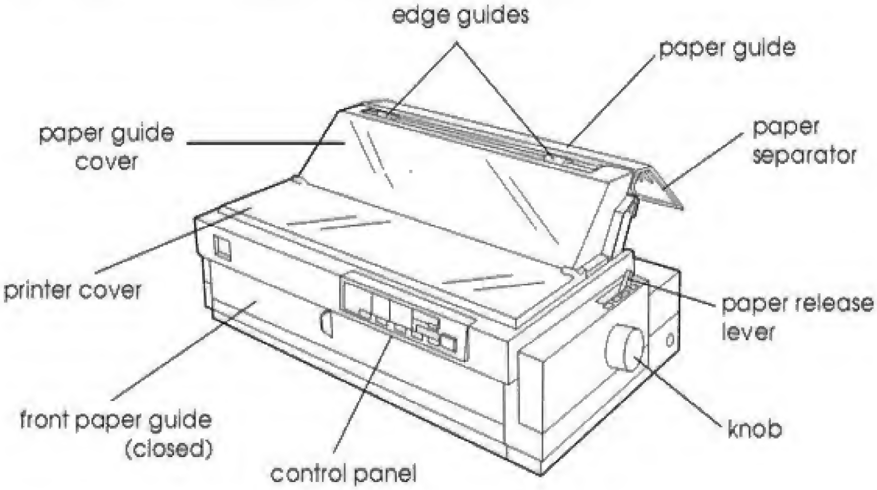

চিত্র : ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ও কন্ট্রোল প্যানেল পরিচিতি

৪. প্রত্যেক প্রকার নবের ব্যবহার করে শিখতে হবে।
৫. প্রিন্টারকে কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযোগ করতে হবে।
৬. প্রিন্ট কোয়ালিটি যাচাই করার জন্য Self Test প্রিন্ট করতে হবে।
৭. প্রিন্টারের ড্রাইভের সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে।
৮. প্রিন্টারের বাফারে জমা ডেটা ক্লিয়ার করা শিখতে হবে।

সতর্কতা :

১. প্রিন্টার সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে যেন কোনো অংশ নষ্ট না হয়।
২. কন্ট্রোল প্যানেলের নবগুলোতে হালকাভাবে চাপ দিতে হবে।
৩. প্রিন্টার কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযোগ করার সময় কানেক্টরের ডিরেকশন ঠিক আছে কী না দেখে নিতে হবে।

খ. লেজার প্রিন্টার চিহ্নিতকরণ ও কন্ট্রোল প্যানেল পরিচিতি।

কাজের উদ্দেশ্য :

১. লেজার প্রিন্টার এর পরিচিতি।
২. লেজার প্রিন্টারের বহিঃস্থ অংশসমূহ চিহ্নিত করা।
৩. লেজার প্রিন্টারের কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন বাটন চিহ্নিকরণ।
৪. বাটনসমূহ ব্যবহার করে প্রিন্টার চালনায় দক্ষতা অর্জন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. একটি লেজার প্রিন্টার
২. পাওয়ার কর্ড ও প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল
৩. একটি কম্পিউটার পদ্ধতি
৪. স্টার ও ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার

ভূমিকা :

লেজার প্রিন্টার একটি নন—ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার। LASER এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তির মূলে রয়েছে আলোক পরিবাহী (Photo Conductive) পদার্থ (আলোর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী) আলোক পরিবাহি পদার্থ হিসেবে সেলিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। লেজার প্রিন্টারের ড্রামের গায়ে সেলিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া থাকে। প্রিন্টিং এর বিভিন্ন ধাপে এ সেলিনিয়ামকে চার্জিত করা হয় এবং পরবর্তীতে এর অংশবিশেষ প্রয়োজনমত লেজার বিম ফেলে চার্জমুক্ত করা হয়। লেজার প্রিন্টারে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের মত একটি একটি করে অক্ষর ছাপানো যায়। একটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ডেটা একত্রে প্রসেস করে থাকে। প্রতিটি পৃষ্ঠার জন্য একবার প্রিন্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। লেজার প্রিন্টারের অক্ষর ছাপানো হয় নন-ইমপ্যাক্ট ডট ম্যাট্রিক্স আকারে। এক্ষেত্রে ডটগুলো খুব ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে।

কাজের ধারা :

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ ও একটি লেজার প্রিন্টার সংগ্রহ করতে হবে।
২. প্রিন্টারের বহিঃস্থ অংশগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

চিত্র : লেজার প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ

৩. প্রিন্টারের কন্ট্রোল প্যানেলের বিভিন্ন বাটন/নব চিহ্নিত করতে হবে।

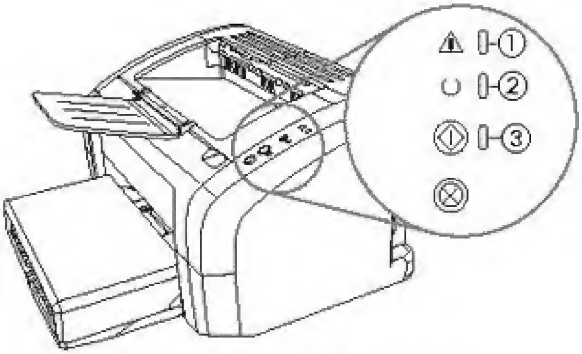

চিত্র : লেজার প্রিন্টারের বহিঃস্থ অংশসমূহ

৪. সকল নবের ব্যবহার শিখতে হবে।
৫. প্রিন্টারকে কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযোগ করতে হবে।
৬. প্রিন্টারের সেলফ টেস্ট নিতে হবে।
৭. প্রিন্টারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে।

সতর্কতা :

১. প্রিন্টার সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে যেন কোনো অংশ নষ্ট না হয়।
২. কন্ট্রোল প্যানেলের নবগুলোকে হালকাভাবে চাপ দিতে হবে।
৩. প্রিন্টার কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযোগ করার সময় কানেক্টরের ডিরেকশন ঠিক আছে কী না দেখে নিতে হবে।

জব নং—৫

জবের নাম : বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টারের কালি পুনঃস্থাপন।

কাজের উদ্দেশ্য :

১. ডট মেট্রিক্স, ইংক জেট ও লেজার প্রিন্টারে ব্যবহৃত কার্টিজসমূহের সাথে পরিচিত।
২. ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের রিবনে কালি পুনঃস্থাপন করা।
৩. ইংক জেট প্রিন্টারের ইংক কার্টিজ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি জানা।
৪. লেজার প্রিন্টারের টোনারে কালি পুনঃস্থাপন করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. একটি করে ডট মেট্রিক্স, ইংক জেট ও লেজার প্রিন্টার
২. প্রিন্টারের উপযোগী একটি রিবন কার্টিজ, ইংক কার্টিজ এবং একটি টোনার
৩. প্রিন্টারের পাওয়ার কর্ড ও প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল

ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের রিবনে কালি পুনঃস্থাপন করা

ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের রিবনে কালি পুনঃস্থাপন করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১। রিবনের জন্য বিশেষ ধরনের কালি সংগ্রহ করতে হবে।

২। কালি স্থাপন করার সময় টেবিলে যাতে কালি না লাগে সেজন টেবিলে কয়েকটি খবরের কাগজ অথবা অন্য কোনো কাগজ স্থাপন করতে হবে।

৩। বোতল থেকে ছোট কোনো পাত্রে কালি ঢেলে নিতে হবে। ইংক প্যাড ব্যবহার করলে তাতে কালি প্রয়োজনমতো ঢেলে দিতে হবে।

৪। যে রিবনটিতে কালি কার্টিজের কভার খুলতে হবে।

৫। রিবনকে ইংক প্যাডের উপর দিয়ে বসায়ে নিতে হবে অথবা রিবনে প্রয়োজন মতো কালি ঢালতে হবে।

৬। কালি লাগানো অংশটি টেনে নিতে হবে এবং কালি না লাগানো অংশে কালি লাগাতে হবে।

৭। সম্ভব হলে লুব্রিকেটিং ওয়েল দিয়ে কালি লাগানো রিবনকে শুকনো করতে হবে।

৮। রিবন কার্টিজের কভারটি লাগায়ে এটিকে ব্যবহার করতে হবে।

ইংক জেট প্রিন্টারের কার্টিজে কালি রিফিল করা

১। বাজার থেকে প্রিন্টারে কালি রিফিলের জন্য কালি কিনে আনতে হবে।

২। প্রিন্টারের ভেতর থেকে অতি সাবধানে Black Cartridge ও Color Cartridge দুইটিই বাহির করে আনতে হবে।

৩। কার্টিজ দুইটির উপরের স্টিকারটি তুলে ফেলতে হবে।

৪। স্টিকারের নিচে ফুটা করার স্থানে সুই বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে ফুটো করতে হবে। কালার কার্টিজে মোট তিনটি কালার কালি রিফিল করতে হবে। তাই নির্দিষ্ট স্থানে তিনটি ফুটো করতে হবে। আর ব্ল্যাক কার্টিজটির একটি স্থানে ফুটো করলেই চলবে।

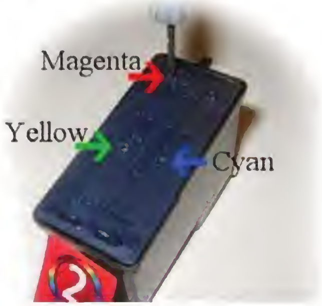

৫। একটি সিরিঞ্জে পরিমাণ মতো কালি নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করাতে হবে। সবশেষে আবার কার্টিজ দুইটি সঠিকভাবে প্রিন্টারে স্থাপন করতে হবে। কালি রিফিল করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রিন্ট করতে হবে।

ডট মেট্রিক্স প্রিন্টারের রিবনে কালি পুনঃস্থাপন করা

১। লেজার প্রিন্টারটির পাওয়ার ক্যাবল খুলে লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২। প্রিন্টার থেকে টোনারটি যথাযথভাবে খুলে আনতে হবে।

৩। ফেস প্লেটের উপরে থাকা টোনারের রিফিল হোলটি খুঁজে বের করতে হবে। এটি সাধারণত স্ক্রুর নিচে থাকে।

৪। রিফিল হোলের ক্যাপটি খুলে ফেলতে হবে।

৫। রিফিল টোনারের কালির বোতলের মুখটি খুলে পরিমাণ মতো কালি ঢালতে হবে।

৬। অনেক টোনার রিফিল করলেও কাজ করে না। এক্ষেত্রে পেজ—কাউন্ট চিপটি খুলে আবার লাগাতে হয় (রিসেট করতে হয়) অথবা পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণভাবে রিফিল কালির সাথেই এটি সংগ্রহ করতে হয়। প্রিন্টার টোনারের উপরের দিকের ডান অংশে সোনালী রঙ এর পেজ-কাউন্ট চিপটি থাকে। স্ক্রু খুলে এটি বের করে এটিকে রিসেট করতে হবে অথবা প্রয়োজনে নতুনটি লাগাতে হবে।

৭। টোনার রিফিল করার পর টোনারটিকে দুই হাতে ধরে হালকা করে উপর-নিচে ঝাকিয়ে টোনারটি প্রিন্টারে লাগাতে হবে।

সতর্কতা :

১। প্রিন্টার থেকে কার্টিজ, রিবন বা টোনার খোলার আগে প্রিন্টারটি সম্পূর্ণরূপে অফ করে নিতে হবে।

২। কালি রিফিল বা লাগানোর সময় হাতে গ্লাবস পড়ে নিতে হবে।

৩। পত্রিকা বা অন্য অপ্রয়োজনীয় কোনো কাগজ বিছিয়ে কাগজের উপর রিফিল করতে হবে যাতে টেবিলে বা ফ্লোরে কালি না পড়ে।

৪। খোলা এবং লাগানোর সময় সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে।

জব নং—৬

জবের নাম : ডিস্ক Clean up, Scandisk এবং Disk Defragment করার দক্ষতা অর্জন

উদ্দেশ্য :

১. ডিস্ক ক্লিনআপ এ দক্ষতা অর্জন করা

২. স্ক্যানডিস্ক (ডিস্ক চেক) করার দক্ষতা অর্জন করা

২. ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন এর দক্ষতা অর্জন করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : উইন্ডোজ অপারেটিং পদ্ধতি সংবলিত একটি কম্পিউটার

কাজের ধারা :

Disk Cleanup করা

১. পাওয়ার সুইচ অন করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।

২. Start > Programs >Accessories >System tools > Disk Cleanup নির্দেশ দিতে হবে।

৩. যে ড্রাইভ থেকে ফাইল মুছতে হবে তা নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪. যে সব অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছতে হবে সেগুলোর পাশের চেক বক্স নির্বাচন করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। সত্যিই ফাইলগুলো মুছে ফেলা হবে কী না তার জন্য সতর্ক বার্তা বক্স আসবে।

৫. Yes বাটনে ক্লিক করলে Disk Cleanup প্রোগ্রামটি কাজ করবে এবং নির্বাচিত অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো মুছে যাবে। উল্লেখ্য যে Disk Cleanup প্রোগ্রাম দিয়ে মুছে ফেলা ফাইল Recycle Bin ফোল্ডারে জমা হয় না। ফলে তা আর পুনরুদ্ধার করা যায় না।

Scandisk (Disk Check) করার দক্ষতা অর্জন

১. পাওয়ার সুইচ অন করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।

২. ডেস্কটপের My Computer আইকনে ডাবল ক্লিক করে প্রদর্শিত ড্রাইভসমূহ হতে যে ড্রাইভে চেক করা হবে সেটির উপর রাইট ক্লিক করতে হবে।

৩. প্রদর্শিত মেনু থেকে Properties এ ক্লিক করতে হবে।

৪. **Tools** ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। Check now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. চেক ডিস্ক উইন্ডো থেকে Automatically fix file system errors অপশনটি সিলেক্ট করে Start বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৬. যদি নির্বাচিত ড্রাইভটিতে অপারেটিং সিস্টেম থাকে অর্থাৎ এটি যদি সিস্টেম ড্রাইভ হয় তাহলে ওয়ার্নিং বার্তাসহ প্রদর্শিত ডায়ালগ বক্সের Schedule disk check অপশনে ক্লিক করতে হবে।

৭. এক্ষেত্রে সব প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে কম্পিউটার রিস্টার্ট করলে চেকিং অপশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে পরবর্তী উইন্ডো খোলার আগেই ফলাফল দেখাবে। যদি ড্রাইভটি সিস্টেম ড্রাইভ না হয় তাহলে কম্পিউটার রিস্টার্ট করার দরকার নেই। **Start** বাটনে ক্লিক করলে চেকিং শুরু হবে এবং ফলাফল দেখাবে।

Disk defragmentation করা :

১. পাওয়ার সুইচ অন করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে।

Start Programs > Accessories >System Tools > Disk Defragmentation নির্দেশ দিতে হবে।

৩. ডাইরেক্টরি নির্বাচনের জন্য ড্রাইভ লিস্ট প্রদর্শিত হবে।

৪. যে ডাইরেক্টরিটি Defrag করতে হবে তা নির্বাচন করে Defragment বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

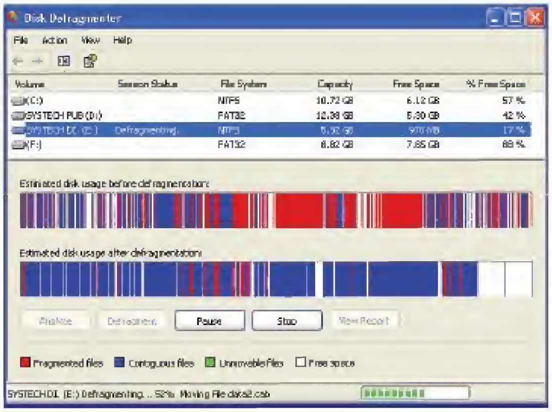

৫. Defragmenting প্রক্রিয়া শুরু হবে। কতটুকু Defragmenting হয়েছে তা উইন্ডোর নিচের দিকে প্রদর্শিত হবে।

৬. Disk Defragmentation প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলে নিম্নরূপ বার্তা প্রদর্শিত হবে।

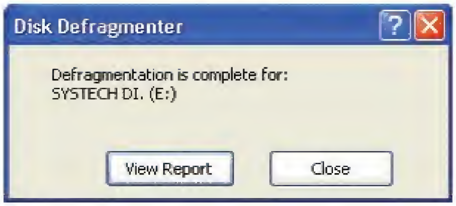

৮. প্রয়োজনমত View Report বা Close বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৯. View Report বাটনে ক্লিক করলে যে ড্রাইভের Defragmentation করা হয়েছে তার ফলাফল দেখাবে।

১০. Close বাটনে ক্লিক করলে উইন্ডোটি বন্ধ হয়ে যাবে।

System Restore করার দক্ষতা অর্জন

১০. Sart > Program > Accessories > System Tools > Backup নির্দেশ দিতে হবে। পর্দায় ব্যাকআপ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।

১১. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। প্রদর্শিত Backup উইজার্ড থেকে Backup files and settings রেডিও বোতামটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।

১২. ফাইলের ব্যাকআপ এবং সেটিংসে কপি করার জন্য Documents and settings রেডিও বাটনটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। ব্যাকআপ কপি কোথায় সংরক্ষণ করা হবে তা নির্বাচন করতে হবে।

১৩. Type a name for his backup টেক্সট বক্সের মধ্যে ব্যাকআপ ফাইলের নাম লিখে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৪. Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে। ব্যাকআপ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং প্রগ্রেস প্রদর্শন করার জন্য একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। ব্যাকআপ সম্পন্ন হওয়ার পর উইন্ডো আসবে।

১৫. ব্যাকআপ গ্রহণ সমাপ্ত হলে ☒ Close বোতাম ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করতে হবে।

১৬. কোনো Removble মিডিয়াতে ব্যাকআপ করলে তা সরিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।

ডেটা রিস্টোর করা

ব্যাকআপ করা ডেটা ব্যবহার করার জন্য রিস্টোর করে নিতে হয়। নিচে ব্যাকআপ করা ডেটা রিস্টোর করার জন্য :

১. কোনো Removble মিডিয়াতে ব্যাকআপকৃত ডেটা থাকলে তা কম্পিউটারে প্রবেশ/সংযোগ করতে হবে।

২. Start > All Programs > Accessories > System > Backup নির্দেশ দিতে হবে। পর্দায় Backup উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইজার্ড আসবে।

৩. Restore files and settings রেডিও বোতামটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবার উইজার্ডের পরবর্তী পর্যায় প্রদর্শিত হবে। যে মিডিয়াতে বা ডাইরেক্টরিতে ব্যাকআপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নির্বাচন করে পূর্বের ব্যাকআপকৃত ফাইল নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে Browse বোতাম ক্লিক করে যথাযথ ডাইরেক্টরি থেকে ব্যাকআপ ফাইল নির্বাচন করা যায়। কোথায় রিস্টোর করা হবে তা উইজার্ডের ডান দিকে নির্ধারিত হয়।

৪. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে নির্ধারিত Restore অপশনসমূহসহ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. Restore Process ডায়ালগ বক্স আসবে এবং নির্বাচিত ফাইলসমূহ Restore হওয়ার পর উহার তথ্য প্রদর্শন করবে।

৬. ☒ Close বোতাম ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করতে হবে। এখন টার্গেট ডাইরেক্টরি থেকে রিস্টোর করা ফাইলসমূহ ব্যবহার করা যাবে ।

জব নং–৭

জবের নাম : প্রোগ্রাম ও ডেটা ব্যাকআপ তৈরির দক্ষতা অর্জন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

উইন্ডোজ অপারেটিং পদ্ধতি সম্বলিত একটি কম্পিউটার ও ব্যাকআপ মিডিয়া (হার্ডডিস্ক)

উদ্দেশ্য :

১. ব্যাকআপ মিডিয়া সম্পর্কে জানা।
২. অপারেটিং সিস্টেমের বিল্ট ইন ব্যাকআপ ইউটিলিটির ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করা।

ভূমিকা :

ব্যাকআপ বলতে সাধারণত হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত প্রকৃত তথ্য ভাণ্ডারের একটি বিকল্প কপি তৈরি বা সংরক্ষণ করাকে বুঝায়। হার্ডডিস্কের তথ্যসমূহ দুর্ঘটনাবশত মুছে (Erage) যাওয়ার, প্রতিস্থাপন (Overwritten) বা অপ্রবেশযোগ্য (Inaccessible) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলত এ কারণেই প্রোগ্রাম ও ডেটার ব্যাকআপ করতে হয়। নিয়মিত ব্যাকআপ করলে হারিয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হওয়া (Damaged) ডেটার উক্ত কপি ব্যবহার করে ডেটাকে পুনরুদ্ধার (Restore) করা সম্ভব হয়। আধুনিক সকল অপারেটিং সিস্টেমেই বিল্ট ইন ব্যাকআপ ইউটিলিটি থাকে।

কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার বা হার্ড ডিস্ক দুর্ঘটনাজনিত বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে মূল্যবান তথ্যাবলি মুছে যেতে পারে। তাই কম্পিউটারে রক্ষিত তথ্যাবলির ব্যাপারে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তথ্যাবলির ব্যাকআপ রাখা উচিত। সাধারণত হার্ড ডিস্ক বা অন্য কোনো কমপ্যাক্ট ডিস্কে ব্যাকআপ কপি করে তৈরি করে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।

কাজের ধারা :

১. কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করে ডেস্কটপে আসতে হবে।

২. Start > Program > Accessories > System Tools > Backup নির্দেশ দিতে হবে।

৩. Next বাটনে ক্লিক করে প্রদর্শিত Backup উইজার্ড থেকে Backup files and settings রেডিও বোতামটি নির্বাচন করতে হবে।

৪. আবার Next বাটনে ক্লিক করলে উইজার্ড আসবে।

৫. ফাইলের ব্যাকআপ এবং সেটিংস কপি করতে হলে My Documents and settings রেডিও বাটনটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। ব্যাকআপ কপি কোথায় সংরক্ষণ করা হবে তা নির্বাচন করতে হবে।

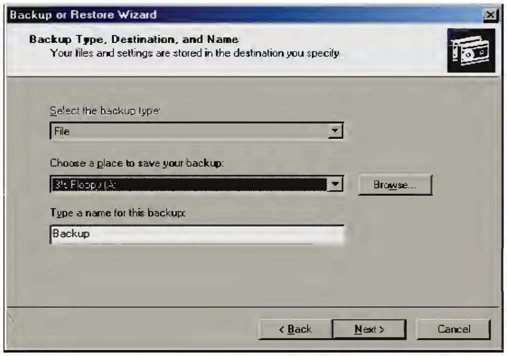

৬. Type a name for his backup টেকস্ট বক্সের মধ্যে ব্যাকআপ ফাইলের নাম লিখতে হবে।

৭. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। প্রদর্শিত উইজার্ড Backup-এর জন্য নির্ধারিত অপশনগুলো প্রদর্শিত করবে।

৮. Finish বোতাম ক্লিক করতে হবে। ব্যাকআপ সম্পন্ন হওয়ার পর উইন্ডো আসবে।

৯. ব্যাকআপ গ্রহণ সমাপ্ত হলে ☒ Close বোতাম ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করতে হবে।

১০. কোনো Removble মিডিয়াতে ব্যাকআপ করলে তা সরিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে ।

ডেটা রিস্টোর করা

ব্যাকআপ করা ডেটা ব্যবহার করার জন্য রিস্টোর করে নিতে হয়। নিচে ব্যাকআপ করা ডেটা রিস্টোর করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

১. কোনো Removble মিডিয়াতে ব্যাকআপকৃত ডেটা থাকলে তা কম্পিউটারে প্রবেশ/সংযোগ করতে হবে।

২. Start > All Programs > Accessories > System > Backup নির্দেশ দিতে হবে। পর্দায় Backup উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। Next বোতাম ক্লিক করতে হবে। উইজার্ড আসবে।

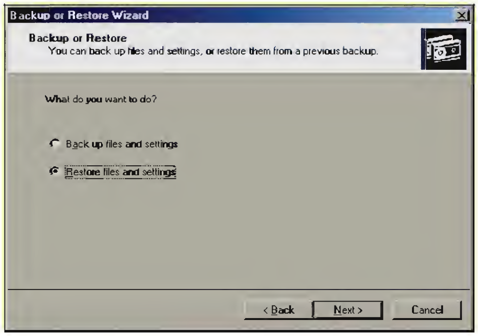

৩. Restore files and settings রেডিও বোতামটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে উইজার্ডের পরবর্তী পর্যায় প্রদর্শিত হবে। যে মিডিয়াতে বা ডাইরেক্টরিতে ব্যাকআপ রাখা হয়েছে তা নির্বাচন করে পূর্বের ব্যাকআপকৃত ফাইল নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে Browse বোতাম ক্লিক করে যথাযথ ডাইরেক্টরি থেকে ব্যাকআপ ফাইল নির্বাচন করতে হবে। কোথায় রিস্টোর করা হবে তা উইজার্ডের ডান দিকে নির্ধারিত হয়।

৪. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবারে নির্ধারিত Restore অপশনসমূহসহ উইজার্ড প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. Restore Process ডায়ালগ বক্স আসবে এবং নির্বাচিত ফাইলসমূহ Restore হওয়ার পর উহার তথ্য প্রদর্শন করবে।

৬. ☒ Close বাটনে ক্লিক করে ডায়ালগ বক্সটি বন্ধ করতে হবে। এখন টার্গেট ডাইরেক্টরি থেকে রিস্টোর করা ফাইলসমূহ ব্যবহার করা যাবে।

জব নং—৮

জবের নাম : এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

উইন্ডোজ অপারেটিং পদ্ধতি সম্বলিত একটি কম্পিউটার ও একটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার

উদ্দেশ্য :

১. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার সম্পর্কে জানা।
২. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন।

ভূমিকা :

এন্টিভাইরাস হলো কম্পিউটারের ভাইরাস প্রতিষেধক। কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহকে ভাইরাস মুক্ত রাখার এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই এন্টিভাইরাসের কাজ। বর্তমানে এ জাতীয় অনেক প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। যেমন– AVG, Panda Antivirus, Toolkit, Kaspersky, PC-Cillin, TrojanHunter, Avast AntiVirus, Norton Antivirus, McAfee ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রোগ্রামসমূহ এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে কম্পিউটারে ভাইরাস তল্লাশি করে। নতুন ভাইরাস দ্বারা কম্পিউটার আক্রান্ত হলে, আর যদি এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা দ্বারা তা শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তা অকার্যকর এন্টিভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত হয়। সে কারণে এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারকরা নিত্য নতুন সৃষ্ট ভাইরাসের প্রতিরোধের জন্য তাদের প্রোগ্রামগুলোর আপগ্রেড ভার্সন প্রকাশ করে থাকে।

কাজের ধারা :

১. বাজার থেকে সিডি/ডিভিডি মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে এন্টিভাইরাস সংগ্রহ করতে হবে।
২. এন্টিভাইরাসটির সেটআপ ফাইলটি রান করাতে হবে।
৩. সেটআপ হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং প্রথম উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।
৪. উইন্ডোর Install বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৫. এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল হতে শুরু করবে। ইন্সটলেশন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।
৬. নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। সবশেষে ইন্সটলেশন সম্পন্ন হওয়ার বার্তা সম্বলিত উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৭. পরবর্তীতে ক্ষেত্র বিশেষে অ্যাপ্লিকেশন লোডিং প্রক্রিয়া শুরু হয়ে অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাকটিভেট করার উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এন্টিভাইরাসটি কেনার সময় এর সাথে সরবারাহকৃত অ্যাকটিভেশন কোডটি টাইপ করে দিতে হবে। ফলে Activate বাটনটি অ্যাকটিভ হবে। এবার Activate বাটনে ক্লিক করতে হবে। এক্ষেত্রে এন্টিভাইরাস কোম্পানির অ্যাকটিভেশন সার্ভারের সাথে যুক্ত হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। অনলাইনে অ্যাকিটিভেশন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। কিছুক্ষণ পর অ্যাকটিভেশন সুসম্পন্নের বার্তা সম্বালিত উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৮ এন্টিভাইরাসটি এখন চালু হয়ে যাবে এবং স্টার্টিং উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। উইন্ডোতে এন্টিভাইরাসটি পরিচালনার যাবতীয় টুলগুলো পাওয়া যাবে। এছাড়া উইন্ডোর ডান দিকে এপ্লিকেশন কন্ট্রোল, নেটওয়ার্ক মনিটর এবং রিপোর্ট প্রদর্শিত হবে।

ক্যাসপারাস্কি এন্টিভাইরাসকে আপডেট করা

এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল করার পর পরই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবার প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। এজন্য ইন্টারনেট কানেকশন থাকা জরুরি। কোনো কারণে আপডেট প্রক্রিয়া শুরু না হলে Update আইকন সম্বলিত অপশনের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে সেটি আপডেট হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এন্টিভাইরাসের আপডেট ইন্টারনেট থেকে ফ্রি পাওয়া যাবে।

জব নং–৯

জবের নাম : এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

উইন্ডোজ অপারেটিং পদ্ধতি সম্বলিত একটি কম্পিউটার এবং কম্পিউটারে ইন্সটল করা একটি এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার

উদ্দেশ্য :

এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন

ভূমিকা :

কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা প্রতিনিয়ত কম্পিউটারের ক্ষতিকারক বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের সম্মুখীন হতে হয়। ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য বহুল প্রচলিত কোনো এন্টিভাইরাসের লেটেস্ট ভার্সন ইন্সটল করে ব্যবহার করতে হবে। এন্টিভাইরাস থাকলেই হবে না ইন্টারনেট থেকে মাঝে মাঝে এর আপডেট সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে। এন্টি ভাইরাস হলো কম্পিউটারের ভাইরাস প্রতিষেধক। কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহকে ভাইরাস মুক্ত রাখার এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই এন্টিভাইরাসের কাজ। ভাইরাস আক্রমণ না বুঝা গেলেও মাঝে মাঝে এন্টিভাইরাস চালিয়ে ডিস্ক স্ক্যান করা উচিত। বাহির থেকে কোনো ডিস্ক ব্যবহার করার পূর্বে এন্টিভাইরাস চালিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে ব্যবহার করতে হবে। এন্টিভাইরাস ব্যবহার করে স্ক্যান করার প্রক্রিয়া সব প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

কাজের ধারা :

১। কম্পিউটার চালু করে ডেস্কটপে আসতে হবে।

২। Start বাটনে ক্লিক করে All Programs এ ক্লিক করে কম্পিউটারে ইন্সটল করা এন্টিভাইরাসটির নামের উপর ক্লিক করতে হবে।

৩। যে ড্রাইভটি স্ক্যান করা দরকার সেটি সিলেকশনের অপশন থাকলে সিলেক্ট করতে হবে।

৪। স্ক্যান করার জন্য এর Scan এ ক্লিক করতে হবে। স্ক্যানিং অপশনগুলো প্রদর্শিত হয়।

৫। সাধারণভাবে ড্রাইভটি স্ক্যান করতে শুরু করে এবং বেশ কিছু সময় লাগে। যদি কোনো ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার পায় তাহলে তাদের তালিকা প্রদর্শন করে এবং এগুলো রিমুভ করবে কীনা জিজ্ঞেস করে। ওকে করলে রিমুভ করে এবং পরবর্তী স্ক্যান করতে থাকে।

৬। স্ক্যান করা শেষ হলে রিপোর্ট প্রদান করে।

ব্যবহারিক প্রজেক্ট

১. কম্পিউটারের ডিস্ক ক্লিন-আপ ও অপ্রয়োজনীয় ফাইল, ফোল্ডার ডিলিট করে ডিফ্র্যাগমেন্ট করা।
২. কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস ইনস্টল করে ভাইরাস মুক্ত করা।

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি—২

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অংশ : কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

অধ্যায়–১
কম্পিউটার সিস্টেমের স্পেসিফিকেশন

- **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –**
  - ১.১. একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সিস্টেম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব ।
  - ১.২. তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন যন্ত্রাংশের স্পেসিফিকেশন (গতি/ ধারণ ক্ষমতা/ মডেল ইত্যাদি) তৈরি করতে পারব ।

১.১ একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সিস্টেম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশসমূহ

কম্পিউটার সিস্টেমের ইউনিটসমূহ

পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সিস্টেম সাধারণত গড়ে ওঠে সিস্টেম ইউনিটসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে । কাজের ধরন অনুযায়ী কম্পিউটার সিস্টেমের ইউনিটগুলো হলো –

১. ইনপুট ডিভাইস
২. প্রসেসিং ডিভাইস
৩. আউটপুট ডিভাইস এবং
৪. মেমরি

কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ

বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার । এসব যন্ত্রাংশের মধ্যে রয়েছে :

- মাদারবোর্ড
- প্রসেসর
- ডিসপ্লে/ভিডিও/গ্রাফিক্স কার্ড (যদি বিল্ট ইন না থাকে)
- সাউন্ড কার্ড (যদি বিল্ট ইন না থাকে)
- হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ
- মনিটর
- মাউস
- কীবোর্ড
- সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ
- পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট
- কেসিং
- বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ও কানেক্টর
- প্রয়োজনীয় মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস (যেমন– মাইক্রোফোন, স্পিকার ইত্যাদি)

১.২ কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের স্পেসিফিকেশন

একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার তৈরির জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশসমূহের যথাযথ স্পেসিফিকেশন জানা জরুরি। কম্পিউটার এর স্পেসিফিকেশন বলতে একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটারের ভিন্ন ভিন্ন পার্টস এর গুণাগুণ সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে বুঝায়।

মাদারবোর্ড

মাদারবোর্ড বা মেইনবোর্ড হলো কম্পিউটারের ভেতরে অবস্থিত সার্কিট বোর্ড যাতে সিস্টেম এর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ডিভাইস পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং নতুন ডিভাইস সংযুক্ত করার ব্যাবস্থা থাকে। মাদারবোর্ড এর জন্য ভালো ব্র্যান্ডগুলো হলো : Gigabyte, Intel, Foxcon, Asus ইত্যাদি। মাদারবোর্ড সংগ্রহ করার আগে বেশ কিছু বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। এগুলো হলো :

১. মাদারবোর্ড অবশ্যই প্রসেসর সাপোর্টেড হতে হবে। যে স্পিডের প্রসেসর ব্যবহার করা হবে সে স্পিডের মাদার বোর্ড কিনতে হবে।
২. মাদারবোর্ডের বাস স্পিড কত সেটি জেনে নেই। স্পিড বেশি হলে কাজের গতি বেশি হবে।
৩. মাদারবোর্ডের বাস স্পিডের সঙ্গে ক্যাশ মেমরির স্পিডও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
৪. মাদারবোর্ড বাছাই করতে গেলে এর চিপসেট, বাস ও বায়োসের বিভিন্ন ফিচারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। চিপসেট মাদারবোর্ডের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। তাই চিপসেট ভালো মানের হওয়া আবশ্যক। ইন্টেলের তৈরি চিপসেট বেশি জনপ্রিয়।

৫. মাদারবোর্ডটি সর্বোচ্চ কত ক্ষমতা পর্যন্ত র‍্যামকে সাপোর্ট করে সেটি দেখে নিতে হবে।
৬. মাদারবোর্ডে হার্ডডিস্ক লাগানোর জন্য কয়টি পোর্ট আছে তা দেখে নিতে হবে। বেশি পোর্ট থাকলে ভালো।
৭. মাদারবোর্ডে কী কী ধরনের স্লট আছে এবং কয়টি করে আছে তা দেখে নিতে হবে। এক্ষেত্রে PCI এবং ISA স্লটগুলোর বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রসেসর

পিসির প্রধান কাজ করে প্রসেসর। একে পিসির মস্তিষ্ক বলা হয়। প্রসেসরের উপর ভিত্তি করেই পিসির ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। যত বেশি ক্ষমতার (ক্ষমতা মাপার একক হলো মেগাহার্টস MHz) প্রসেসর হবে পিসি তত দ্রুত কাজ করবে। মাদারবোর্ডের চিপসেট প্রসেসরসহ র‍্যাম ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের সাথে যে গতিতে যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম তাকে ফ্রন্টসাইড বাস স্পিড বলা হয়। যে প্রসেসরের বাস স্পিড যত বেশি সেটি তত উন্নত প্রসেসর হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমানে আইবিএম কম্প্যাটিবল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে দুইটি কোম্পানির তৈরি প্রসেসর বাজারে পাওয়া যায়। তার একটি হচ্ছে Intel এবং অপরটি হচ্ছে AMD। প্রসেসর কেনার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচ্য :

চিত্র : বিভিন্ন প্রসেসর

১. প্রসেসরের ক্লক স্পিড কত, সেটা লক্ষ করতে হবে। ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, প্রসেসরের প্রসেসিং ক্ষমতাও তত বেশি হবে।
২. প্রসেসরের সিরিজ কী, সেটা খেয়াল করতে হবে। সিরিজ যত উন্নত হবে, স্পিড তত বাড়বে। Intel এর প্রথম দিককার প্রসেসর এর মধ্যে রয়েছে, Pentium সিরিজ। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে এসেছে, Celeron সিরিজ,

Core সিরিজ, i সিরিজ। একই ক্লক স্পিডের P1 এর চাইতে P২ এর স্পিড বেশি। আবার, একইভাবে, Pentium সিরিজ এর চাইতে Core সিরিজ এর স্পিড বেশি। Core সিরিজ এর প্রসেসরগুলোর মধ্যে, Core 2 Quad এর স্পিড Core 2 Duo এর চেয়ে বেশি এবং Core 2 Duo এর স্পিড Dual Core এর চেয়ে বেশি। স্পিড আবার core i সিরিজের প্রসেসরগুলোর মধ্যে, Core i7 extreme> Core i7> Core i5> Core i3 ।

৩. প্রসেসরে কয়টি কোর (core) এবং কয়টি থ্রেড (thread) রয়েছে, তা খেয়াল করতে হবে। কোর এবং থ্রেড এর সংখ্যা বেশি হলে স্পিড বাড়বে।

৪. FSB (Front Serial Bus) এর পরিমাণ লক্ষ করতে হবে। FSB বেশি হলে স্পিড বেশি হবে। যদিও নতুন প্রসেসরগুলোতে FSB ব্যবহার করা হয় না। এর পরিবর্তে QPI ব্যবহৃত হয়।

৫. Cache Memory (ক্যাশ মেমরি) কত, তা লক্ষ করতে হবে। ক্যাশ মেমরির মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ক্যাশ মেমরি হলো L3 Cache.

৬. Intel Processor এর ক্ষেত্রে, Turbo Boost Technology রয়েছে কীনা, তা লক্ষ রাখতে হবে। এই প্রযুক্তি প্রয়োজনের সময় প্রসেসরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ডিসপ্লে/ভিডিও/গ্রাফিক্স কার্ড

ভিডিও কার্ড হলো একটি এক্সপ্যানশন কার্ড (Expansion Card) যার কাজ হলো ডিসপ্লের জন্য ইমেজসমূহ তৈরি ও আউটপুট প্রদান করা। আধুনিক হাই পারফরমেন্স ভিডিও কার্ডগুলো আরও বেশি গ্রাফিক্যালি চাহিদাসম্পন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– পিসি গেমস এর ক্ষেত্রে। আজকাল অধিকাংশ কম্পিউটারের সাথেই সাধারণত ডিসপ্লে/ভিডিও/গ্রাফিক্স কার্ড বিল্টইন অবস্থায় পাওয়া যায়। যাদের বেশি মাত্রায় গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করতে হয় কিংবা উন্নত মানের গেম খেলতে হয় তাদের জন্য ভালো মানের ভিডিও/গ্রাফিক্স কার্ড পৃথকভাবে সংযোজন করার প্রয়োজন হয়।

ভিডিও কার্ড কেনার সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

- ভিডিও কার্ডটি মাদারবোর্ড এবং প্রসেসরকে সাপোর্ট করে কীনা দেখে নিতে হবে।
- কার্ডের সিরিজ খেয়াল রেখে লেটেস্টটি কিনতে হবে। যেমন- সিরিজের চেয়ে সিরিজের কার্ডগুলো লেটেস্ট। লেটেস্ট কার্ডগুলো ভালো হয় এবং নতুন ফিচার যুক্ত থাকে।
- ট্রানজিস্টর সংখ্যা : কার্ডের ট্রানজিস্টর সংখ্যা বেশি হলে নয়েজ লেভেল কম হবে। ফলে ভিডিও ভালোভাবে ফিল্টার হবে।
- বাস স্পিড : বাস স্পিড বেশি হলে আউটপুট দ্রুত হবে। কিন্তু বাস খুব বেশি হলে আবার পাওয়ার খরচের পরিমাণটাও বেড়ে যাবে। মনিটর ছোট হলে বাস অব্যবহৃত থেকে যাবে।
- ক্লক স্পীড : এটা যত ভালো এবং বেশি হবে তত ভালো মানের performance পাওয়া যাবে।
- মেমরি : কার্ডের মেমরি সাইজ বেশি হলে ভালো মানের performance পাওয়া যাবে। কাজের ধরন অনুযায়ী মেমরি সাইজ নির্বাচন করতে হবে। অধিকাংশ আধুনিক ভিডিও কার্ডের মেমরির ক্ষমতা সাধারণত ১২৮ মেগাবাইট থেকে শুরু করে ৪ গিগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে।
- মেমরি টাইপ : DDR, DDR2, GDDR3... দেখে নিতে হবে। যত ভালো হবে, তত ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। অবশ্য GDDR5 এর দাম তুলনামূলক বেশি। একই মডেলের ২ জিবি এবং ১ জিবি কার্ডের স্পিড একই থাকে।

- ডিরেক্ট এক্স : ডিরেক্ট এক্স হলো মাইক্রোসফট এর অনন্য একটি সংযোজন। নতুন নতুন হার্ডওয়্যার, ভিডিও এক্সিলারেশান, সর্বোপরি নতুন গেমস চালানোর জন্য এটি অপরিহার্য। তাই গ্রাফিক্স কার্ড নতুন ভার্সন এর ডিরেক্ট এক্স সাপোর্ট করে কীনা তা দেখে নিতে হবে।
- ম্যাক্স আউটপুট : বর্তমানে প্রায় সব কার্ডের আউটপুট ১৬০০ x ১২০০ থেকে ২৫৬০ x ১৬০০ এর মধ্যে।
- পাওয়ার : কার্ডটি কত ওয়াট সাপ্লাইয়ের সেটি দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় পাওয়ার দিতে না পারলে কাজ করতে সমস্যা হতে পারে। সাধারণত ৪০০ থেকে ৮০০ ওয়াট দরকার হয়।
- একটি GeForce GTX 480 মডেলের গ্রাফিক্স কার্ডের স্পেসিফিকেশন

- **GPU Engine Specs:**
- Graphics Clock (MHz) : 700 MHz
- Processor Clock Tester(MHz) : 1401 MHz
- Texture Fill Rate (billion/sec) : 42
-
- **Memory Specs:**
- Memory Clock : 1848 MHz (3696 data rate)
- Standard Memory Config : 1536 MB
- Memory Interface : GDDR5
- Memory Interface Width : 384-bit
- Memory Bandwidth (GB/sec) : 177.4
-
- **Feature Support:**
- Bus Support : PCI-E 2.0 x16
- Supported Technologies : Direct X 11, 3D Vision, 3D Vision Surround, PhysX, CUDA, SLI
-
- **Display Support:**
- Maximum Digital Resolution : 2560 x 1600
- Maximum VGA Resolution : 2048 x 1536
- Standard Display Connectors : Two Dual Link DVI, Mini HDMI
-
- **Thermal and Power Specs:**
- Maximum GPU Temperature (in C) : 105 C
- Minimum System Power Requirement (W) : 600 W

সাউন্ড কার্ড

সাউন্ড কার্ডের কাজ হলো অডিও সিগনালকে কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণে এনে গান শোনা, মুভি দেখা, অডিও ভিডিও এডিটিং, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, গেমিং ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা। সাউন্ড কার্ড প্রস্তুতকারক কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ASUS, VIA Technologies, Realtek Semiconductor, C-Media, Creative Technology ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য মাদারবোর্ডের সাথে রিয়েলটেক বা সি-মিডিয়া চিপ

সেটের বিল্টইন সাউন্ড কার্ড দেওয়া থাকে। এ বিল্টইন সাউন্ড কার্ডগুলো যথেষ্ট ভালো মানের, তাই সাধারণত আলাদা সাউন্ড কার্ডের প্রয়োজন হয় না। তবে ভালো সাউন্ডের প্রয়োজন হলে উন্নতমানের স্পিকারের পাশাপাশি ভালো সাউন্ড কার্ড কিনে নেওয়া যেতে পারে। সাউন্ড কার্ড নির্বাচনের সময় বেশি বিট রেট বা রেজুলেশন যুক্ত কার্ড নির্বাচন করতে হবে। এখানে রেজুলেশন দ্বারা এনালগ থেকে ডিজিটাল ও ডিজিটাল থেকে এনালগে পরিণত করার ক্ষমতার পরিমাপককে বুঝায়। বাজারে সাধারণত ১৬, ২৪, ৩২, ৬৪ ও ১২৪ বিটের সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায়। সিডি কোয়ালিটি সাউন্ডের জন্য ১৬ বিট, আর ডিভিডি প্লেব্যাক ও হাই-এ্যান্ড গেমগুলোতে ২০ বা ২৪ বিট কোড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই ন্যূনতম ২৪ বিটের সাউন্ড কার্ড বেছে নিতে হবে।

হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

হার্ডডিস্ক যাবতীয় তথ্য বা ফাইল স্থায়ীভাবে জমা রাখা র কাজে ব্যবহার করা হয়। একে সেকেন্ডারি মেমরি বলে। হার্ডডিস্ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি :

- স্পেস সাইজ : হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রে স্পেসের সাইজ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজের ধরন অনুযায়ী সাইজ সিলেক্ট করতে হবে। হার্ড ডিস্কের ধারণক্ষমতা ৫০০ গিগাবাইট এবং ১ টেরাবাইট (১০২৪ গিগাবাইট) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০ টেরাবাইট বা তারচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

- ঘূর্ণন গতি : হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রে এর ঘূর্ণন গতি RPM (Rotation Per Minute) গুরুত্বপূর্ণ। ঘূর্ণন গতি বেশি হলে ডেটা রিড করা দ্রুততর হয়। ঘূর্ণন গতি কমপক্ষে ৭২০০ RPM (Rotation Per Minute) হওয়া উচিত।

- সিক টাইম ১৩ মিলি সেকেন্ড এর কম এবং এক্সেস টাইম ১৮ মিলি সেকেন্ডের কম হতে হবে।

- এক্সটারনাল ট্রান্সফাররেট ৫ থেকে ১০ মেগাবাইট/সেকেন্ড এর মধ্যবর্তী কীনা তা দেখে নিতে হবে।

- ইন্টারফেস : IDE হার্ডডিস্কের চেয়ে SATA হার্ডডিস্ক বেশ ভালো মানের এবং এর ডেটা ট্রান্সফার রেট PATA এর চেয়ে বেশি। বর্তমানে SATA-2 হার্ডডিস্ক বেশি ব্যবহৃত হয়। SCSI হার্ডডিস্কগুলো আকারে খুবই ছোট, হালকা এবং সহজে বহনযোগ্য। এতে ঘূর্ণনশীল কোন অংশ না থাকায় অধিকতর টেকসই হয়। এই হার্ডডিস্কগুলো সাধারণত ল্যাপটপে ব্যবহার করা হয়।

- ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল, তোশিবা, স্যামসাং ইত্যাদি কোম্পানি হার্ডডিস্ক তৈরি করে থাকে।

মনিটর

কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের ভেতরের ভিডিও কার্ড দ্বারা তৈরি লেখা এবং গ্রাফিক্স মনিটরের স্ক্রীনে প্রদর্শিত হয়। মনিটর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি :

- মনিটরের ধরন : বর্তমানে তিন ধরনের মনিটর পাওয়া যায়। যথা-এলসিডি মনিটর, এলইডি মনিটর এবং এএমওএলইডি মনিটর। LED মনিটর LCD মনিটরের উন্নত ভার্সন যাতে ডিসপ্লের জন্য LED (Light Emitting Diode) ব্যবহার করা হয়েছে। এটি

LCD মনিটরের মতোই কাজ করে কিন্তু এর ব্যাকলাইট ভিন্ন ধরনের। LCD মনিটর অপেক্ষা ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালো মানের এবং বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম। এটি চোখের জন্য বেশি স্বাচ্ছন্দময় এবং বেশিদিন লাস্টিং করে। AMOLED এর পারফরমেন্স LCD এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এর ইমেজ মান খুবই ভালো। এটি অনেক পাতলা ও হালকা। এ প্রযুক্তিতে আগের LCD এর চেয়ে ৩০–৫০% কম পাওয়ার লাগে। এর রেসপন্স টাইম এলসিডি এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি।

- মনিটরের সাইজ : মনিটরের স্ক্রীনের এক কোণা থেকে অন্য কোণার মাপকে মনিটরের সাইজ হিসেবে ধরা হয়। মনিটরের সাইজ ১৫ ইঞ্চি থেকে ৩৬ ইঞ্চি বা তার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। ডেস্কটপ পাবলিশিং এবং গ্রাফিক্সে কাজ করার জন্যে অথবা বড় স্প্রেডশিটে কাজ করার জন্যে বড় সাইজের মনিটর বেশি সুবিধাজনক।
- রেজুলেশন : মনিটরের রেজুলেশন হলো এর পিক্সেল সংখ্যা। পিক্সেল সংখ্যা যত বেশি হবে মনিটর তত ভালো ছবি দেখাবে। কোন মনিটর এর স্ক্রিণ রেজুলেশন ১৬০০ x ৯০০ বলতে বোঝায় যে অনুভূমিকভাবে পিক্সেল সংখ্যা ১৬০০ এবং অভিলম্বিকভাবে পিক্সেল সংখ্যা ৯০০। মোটামোটি ভাবে ভালো ছবি দেখার জন্য ১৬০০ x ৯০০ রেজুলেশন ভালো। তবে আরও ভালো চাইলে ১৯২০ x ১০৮০ রেজুলেশন হতে হবে।

একটি মনিটরের (Samsung PX2370 মডেলের) স্পেসিফিকেশন :

• Dimensions (WxDxH)	: 21.9 in x 9.2 in x 17.1 in
• Display Type	: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
• Aspect Ratio	: Widescreen
• Native Resolution	: Full HD 1920 x 1080
• Contrast Ratio	: 1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
• Color Support	: 16.7 million colors
• Horizontal Viewing Angle	: 170
• Vertical Viewing Angle	: 160
• Brightness	: 250 cd/m2
• Backlight Technology	: LED backlight

মাউস

বর্তমানে অটোমেকানিক্যাল মাউসের প্রচলন কমে গিয়ে সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে অপটিক্যাল মাউস। এ মাউসগুলো ইউএসবি বা পিএস/২ পোর্টের উপযোগী হয়ে থাকে। এছাড়া বেশি দামের ওয়্যারলেস মাউসও নির্বাচন করা যেতে পারে।

চিত্র : অপটিক্যাল মাউস

চিত্র : ওয়্যারলেস মাউস

কীবোর্ড

কীবোর্ড খুবই জনপ্রিয় ও অপরিহার্য একটি ইনপুট ডিভাইস যার মাধ্যমে কম্পিউটারে ডেটা ও কমান্ড প্রয়োগ করা হয়। কীবোর্ড দুই ধরনের। যথা– (১) সাধারণ ও (২) মাল্টিমিডিয়া। মাল্টিমিডিয়া কীবোর্ডে অতিরিক্ত কিছু কী সুইচ থাকে। এর সাহায্যে মিউজিক প্লেয়ার চালু করা, চলমান গানকে থামানো, গান পরিবর্তন করা, ভলিউম বাড়ানো ও কমানো, ওয়েব ব্রাউজার চালু করা, সরাসরি বাটন চেপে মাই কম্পিউটার বা মাই ডকুমেন্টে যাওয়া, সার্চ অপশন আনা, ক্যালকুলেটর সক্রিয় করা ইত্যাদি কাজ করা যায়।

চিত্র : সাধারণ কীবোর্ড

চিত্র : মাল্টিমিডিয়া কীবোর্ড

সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ

সিডি–রম (CD – Compact Disc) ডিস্কগুলো পড়ার জন্য যে ড্রাইভ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলা হয় সিডি–রম ড্রাইভ। আর ডিভিডি–রম ডিস্কগুলো (DVD – Digital Versatile Disc or Digital Video Disc) পড়ার জন্য যে ড্রাইভ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় ডিভিডি–রম ড্রাইভ। ডিভিডি–রম ড্রাইভগুলো সিডি (CD) এবং ডিভিডি (DVD) উভয় ধরনের ডিস্কই পড়তে পারে। তবে সিডি–রম ড্রাইভ সিডি-রম (CD) ডিস্কগুলো পড়তে পারলেও ডিভিডি ডিস্ক (DVD) পড়তে পারে না। ভার্চুয়ালি আধুনিক সবগুলো সিডি/ডিভিডি-রম ড্রাইভই অডিও এবং ভিডিও সিডি চালাতে পারে। গতি বা তথ্য স্থানান্তরের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এ ড্রাইভকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : Single Speed Drive–ইহা প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ কিলোবাইট ডেটা স্থানান্তর করতে পারে। এ ক্ষমতাকে X দ্বারা প্রকাশ করা হয়। Double Speed Drive-এ ধরনের ড্রাইভসমূহ প্রতি সেকেন্ডে ২X বা ৩০০ কিলোবাইট ডেটা স্থানান্তর করতে পারে। X এর মান বেশি হলে সিডি ড্রাইভ বেশি গতিতে ডেটা স্থানান্তর করে।

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

পিসির পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটি মূলত কোনো কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কম্পোনেন্টগুলোর জন্য প্রধান অল্টারনেটিং কারেন্টকে কম ভোল্টেজের নিয়মিত ডাইরেক্ট কারেন্টে রূপান্তর করে। সুতরাং কম্পিউটার পরিচালনার জন্য যথাযথ মানের ও উপযুক্ত পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট অপরিহার্য। পিসির জন্য সাধারণত ৪০০ থেকে ১০০০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এর

প্রয়োজন হয়। আধুনিক পিসিগুলো সাধারণত একটি সুইচড মোড পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ার ১১০ বা ২২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ ইনপুট নেয়। বেশিরভাগ পাওয়ার সাপ্লাইয়ার দুই ধরনের ইনপুটই সাপোর্ট করে। কিছু পাওয়ার সাপ্লাইয়ারে ভোল্টেজ সিলেক্টর সুইচ থাকে। পাওয়ার লাইন অনুযায়ী সিলেক্টরের মাধ্যমে ভোল্ট সিলেক্ট করতে হয়।
বর্তমানে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ৩ ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই সাধারণত বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো হলো ঃ

- এটি পাওয়ার সাপ্লাই (AT Power Supply) – পুরনো পিসিগুলোতে এখনও ব্যবহৃত হয়।
- এটিএক্স পাওয়ার সাপ্লাই (ATX Power Supply) – বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হয়।
- এটিএক্স-২ পাওয়ার সাপ্লাই (ATX-2 Power Supply) – এই স্ট্যান্ডার্ড সাম্প্রতিক কালে চালু হয়েছে।

কেসিং

কম্পিউটার কেস হলো এমন একটি এলাকা যা কম্পিউটারের প্রধান কম্পোনেন্টগুলোকে বহন করে। কম্পিউটার কেস সাধারণত স্টিল (স্টিল, ইলেকট্রিক্যালি ক্রোমেট কোটেড বা SECC) বা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। কেসিংয়ের সাথে কুলিং ফ্যান ও পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কুলিং ফ্যানের দরকার হতে পারে, সে জন্য কেসিংয়ের সাথে আলাদা কুলিং ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা আছে কীনা তা দেখতে হবে। কম্পিউটার কেসগুলো বিভিন্ন আকারে (ফর্ম ফ্যাক্টর নামে পরিচিত) আসতে পারে। কম্পিউটার কেসের আকার ও গঠন সাধারণত মাদারবোর্ডের গঠনের উপর নির্ভর করে। কারণ মাদারবোর্ড হলো কমপিউটারের সর্ববৃহৎ কম্পোনেন্ট। এছাড়াও পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ধরনের উপরও এটি নির্ভরশীল। কম্পিউটার কেসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–এটি কেস (AT Case) এবং এটিএক্স কেস (ATX Case)

বর্তমানে কমপিউটারের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ফর্ম ফ্যাক্টর হলো ATX (Advanced Technology Extended)। যদিও বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের কারণে microATX এবং ক্ষুদ্র ফর্ম ফ্যাক্টরগুলোও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শাটল ইঙ্ক. এবং এওপেন এর মতো কোম্পানিগুলো ছোট কেসগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

টাওয়ার কেসগুলো মিনি টাওয়ার, মিড টাওয়ার এবং বিগ টাওয়ার/ফুল টাওয়ার সাইজে পাওয়া যায়। ফুল টাওয়ার কেসগুলো সাধারণত উচ্চতায় ৩০ ইঞ্চি বা তার চাইতে বড় হয় এবং ফ্লোরে রাখতে হয়। এগুলোতে ছয়টি থেকে দশটি এক্সটার্নালি অ্যাকসেসেবল ড্রাইভ বে থাকে। মিড টাওয়ার কেসগুলো আকারে ছোট, প্রায় ২৪ ইঞ্চি উচ্চতার এবং এগুলোতে দুই থেকে চারটি এক্সটার্নাল বে থাকে। মিনি টাওয়ার কেসগুলোতে সাধারণত একটি বা দুটি এক্সটার্নাল বে থাকে এবং এগুলো ১২ থেকে ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। ATX কেসগুলোতে যে মাদারবোর্ড যুক্ত থাকে তাতে বহু সংখ্যক কানেক্টর থাকে। এসব মাদারবোর্ড আকৃতিও AT মাদারবোর্ডগুলোর চাইতে ছোট।

বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ও কানেক্টর

কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে জুড়ে দিতে নানা ধরনের ক্যাবল ও কানেক্টরের প্রয়োজন পড়ে। যেমন– সিপিউই এর সাথে মনিটরকে জুড়ে দিতে ভিজিএ ক্যাবল, বাইরের সোর্স থেকে কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে আবার পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে মনিটরে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে পাওয়ার ক্যাবল ব্যহৃত হয়। এই ধরনের ক্যাবলগুলো সাধারণত কম্পিউটার সিস্টেমের সাথেই পাওয়া যায়। মাউস, কীবোর্ড, মাইক্রোফোন, সাউন্ড বক্স, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি মাদারবোর্ডের সাথে সংযোজনের জন্য কম্পিউটারের কেসিংয়ের পেছনে বিভিন্ন ধরনের

পোর্ট ও কানেক্টর পাওয়া যায়। এছাড়া বাড়তি বিভিন্ন ক্যাবল যেমন— ইউএসবি ক্যাবল, নেটওয়ার্ক ক্যাবল ও কানেক্টর ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারকারীকে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পোর্টে ব্যবহার করতে হয়।

চিত্র : পাওয়ার ক্যাবল

চিত্র : পাওয়ার এক্সটেনশন কর্ড

চিত্র : ভিজিএ ক্যাবল

মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস

কম্পিউটারে আজকাল বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস ব্যবহার করা অনেকটা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন— মাইক্রোফোন, হেডফোন, স্পিকার ইত্যাদি। বাজারে বিভিন্ন মানের ও দামের মাইক্রোফোন/হেডফোন এবং স্পিকার পাওয়া যায়। ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন নিরূপণ করে নিজের পছন্দমতো এসব ডিভাইস সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারে।

চিত্র : মাইক্রোফোন

চিত্র : হেডফোন

চিত্র : সাউন্ড বক্স

এছাড়া কম্পিউটারে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে গেলে সেটি যেন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে না যায় এবং ব্যবহারকারী তার কাজগুলো সংরক্ষণে খানিকটা সময় পায় সেজন্য আজকাল প্রতিটি কম্পিউটারের সাথেই ইউপিএস (UPS - Uninterruptible Power Supply) ব্যবহার করা হয়। এগুলো কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহারকারীর কম্পিউটারের বিদ্যুতের সরবরাহ বজায় রাখে। ইউপিএস কেনার সময় বাজারের সেরা ব্র্যান্ড, কর্মদক্ষতা, ব্যাকআপ সময় ইত্যাদি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

একটি কম্পিউটার এর নমুনা স্পেসিফিকেশন

নিচে একটি কম্পিউটার এর স্পেসিফিকেশন তৈরি করা হলো :

ক্র/নং	মালামালের নাম ও বিবরণ
১.	**মাদারবোর্ড** : Intel DG45/DG41RQ/DG35, Speed–Minimum 3.3GHz/2.93GHz, Core 2 extreme/Core 2 Quad/Core 2 duo/Quad Core processor supported. Built in SVGA card, L2 Cache–Minimum 2Mega byte, DDR3/DDR–2 supported.
২.	**প্রসেসর** : Intel Core 2 extreme/Core 2 Quad/Core 2 duo/Quad Core/Core i5/Core i7 processor. Speed- Minimum 2.93GHz
৩.	**র‍্যাম** : 4GB, DDR–3 (Minimum bus speed 800 MHz)
৪.	**হার্ডডিস্ক ড্রাইভ** : Capacity–1 Terabyte, SATA/Parallel ATA, RPM–7200/10000
৫.	**সিডি ড্রাইভ/ডিভিডি রাইটার** : Minimum 56X for CD drive or Minimum 22X for DVD, SATA/Parallel ATA
৬.	**কেসিং** : ATX Thermal (24 pin) With power supply.
৭.	**মনিটর** : LCD 19 inch, Color, Minimum Resolution–1280X1024 pixel,
৮.	**কীবোর্ড** : USB/PS2/Wireless Port, (Standard) including Bangla layout.
৯.	**মাউস** : USB/PS2/Wireless Port, 3 button including scroll facilities Optical/Optomechanical
১০.	**স্পিকার সিস্টেম** : 2:1, Sub Wofer, Minimum 20 Watt (RMS), Sattlelite 5 Watt (RMS) x2
১১.	**ইউপিএস** : Minimum 650 VA
১২.	**প্রিন্টার** : Laser printer, Minimum 16 Pages per Minites (PPM)

প্রশ্নমালা–১

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার এর স্পেসিফিকেশন বলতে কী বোঝায়?
২. কাজের ধরন অনুযায়ী কম্পিউটার সিস্টেমের ইউনিটগুলোর নাম লেখ।
৩. সাধারণত কত কত বিটের সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায়?
৪. অপটিক্যাল ড্রাইভ বলতে কী বোঝ?
৫. হার্ডডিস্ক ইন্টারফেস এর নাম লেখ।
৬. বর্তমান বাজারে প্রচলিত হার্ডডিস্কের RPM উল্লেখ কর।
৭. মাল্টিমিডিয়া কীবোর্ডে অতিরিক্ত কী কী বাটন থাকে?
৮. ইউপিএস এর কাজ কী?
৯. কয়েকটি মাল্টিমিডিয়া ডিভাইসের নাম লেখ।
১০. পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভোল্টেজ সিলেক্টর সুইচের গুরুত্ব লেখ।
১১. ভিজিএ ক্যাবলের কাজ কী?
১২. কীবোর্ড প্রধানত কয় ধরনের ও কী কী?
১৩. পূর্ণরূপ লেখ : CD, DVD, SATA, USB, CRT, UPS, RPM, LCD, SATA, SCSI, SSD

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ন্যূনতম চাহিদা মোতাবেক কম্পিউটার যন্ত্রাংশের তালিকা তৈরি কর।
২. সিআরটি মনিটর ও এলসিডি মনিটরের গুণগত পার্থক্য লেখ।
৩. সাউন্ড কার্ড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।
৪. মাদারবোর্ড নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।
৫. পিসি এর জন্য সচরাচর কত ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয়।
৬. কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউপিএস এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি কম্পিউটার এর স্পেসিফিকেশন তৈরি কর।
২. কম্পিউটার এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

অধ্যায়–২
মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি ও ইন্সটলেশন

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

২.১. মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করতে পারব।
২.২. ক্যাসিং এ মাদারবোর্ড সেট করতে পারব।
২.৩. মাদারবোর্ডের প্রসেসর সকেটে প্রসেসরকে ইনস্টল করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারব।
২.৪. মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটে র‍্যাম মড্যুল ইনস্টল করার প্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে পারব।
২.৫. মাদারবোর্ডের এক্সপানশন স্লটে প্রয়োজনীয় কার্ডসমূহ ইনস্টল করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারব।

২.১ মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশ

মাদারবোর্ডে সাধারণত যেসব অংশ থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. সিপিইউ সকেট
২. সিপিইউ ফ্যান ও হিটসিঙ্ক মাউন্ট
৩. সিপিইউ ফ্যান কানেক্টর
৪. ডিআইএমএম (DIMM) মেমরি স্লট
৫. সুপার আইও চিপ
৬. ২৪-পিন এটিএক্স পাওয়ার কানেক্টর
৭. আইডিই কানেক্টর (এক্স২)
৮. সাটা কানেক্টর (এক্স৪)
৯. পিএলসিসি সকেটের মধ্যে বায়োস ফ্ল্যাশ চিপ
১০. সাউথব্রিজ (হিটসিঙ্কসহ)

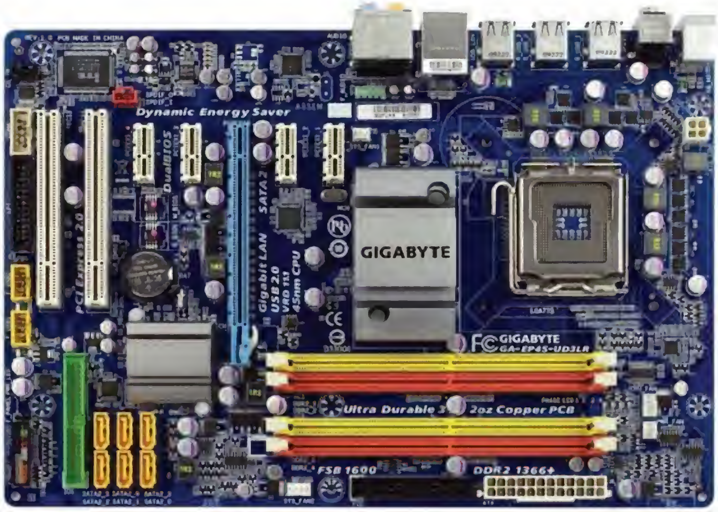

চিত্র : মাদারবোর্ড

১১. সিমস ব্যাকআপ ব্যাটারি
১২. ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স প্রসেসর (হিটসিঙ্কসহ)
১৩. পিসিআই স্লট (এক্স৩)
১৪. ইন্টিগ্রেটেড অডিও কোডেক চিপ
১৫. ইন্টিগ্রেটেড গিগাবিট ইথারনেট চিপ
১৬. পিসিআই এক্সপ্রেস স্লট
১৭. ইন্টিগ্রেটেড পেরিফেরালসমূহের কানেক্টর (পিএস/২ কীবোর্ড ও মাউস, সিরিয়াল পোর্ট, প্যারালাল পোর্ট, ভিজিএ, ফায়ারওয়্যার/আইইইই ১৩৯৪এ, ইউএসবি এক্স৪, ইথারনেট, অডিও এক্স৬ ইত্যাদি)

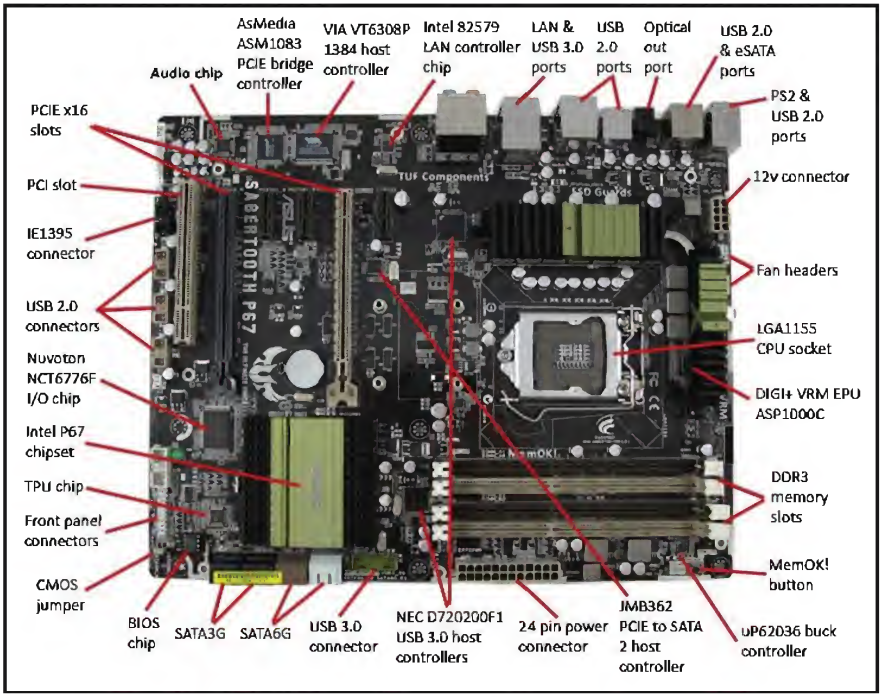

চিত্র : মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশ

বর্তমানে মাদারবোর্ডগুলোতে বেশ কিছু মাল্টিমিডিয়া ও নেটওয়ার্কিং ডিভাইসসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলোকে চাইলে ডিসাবল করে রাখা যায়। এগুলোর মধ্যে আছে যথাক্রমে :

- ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক কার্ড
- ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড
- ইন্টিগ্রেটেড সাউন্ডকার্ড
- আপগ্রেডেড হার্ডড্রাইভ কন্ট্রোলারসমূহ

উল্লেখ্য, এখানে যেসব অংশগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের মাদারবোর্ড ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সম্মিলিতভাবে সাধারণত যেসব অংশগুলো দেখা যায় সেগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক মাদারবোর্ড লেআউট

বর্তমান সময়ে প্রসেসরসহ অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো বেশ আধুনিক হওয়ায় সেগুলোর সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে মাদারবোর্ডেও এসেছে গুণগত পরিবর্তন। আধুনিক মাদারবোর্ডের লেআউট দেখলেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। নিচের এ ধরনের একটি লেআউট দেখানো হলো। এটি গিগাবাইট টেকনোলজির তৈরি একটি সাম্প্রতিক মাদারবোর্ড যার মডেল হলো GA-X58A-UD3R। এই মাদারবোর্ডটি Intel Core i7 প্রসেসর ফ্যামিলির জন্য একটি LGA1366 সকেট মাদারবোর্ড।

GA-X58A-UD3R Motherboard Layout

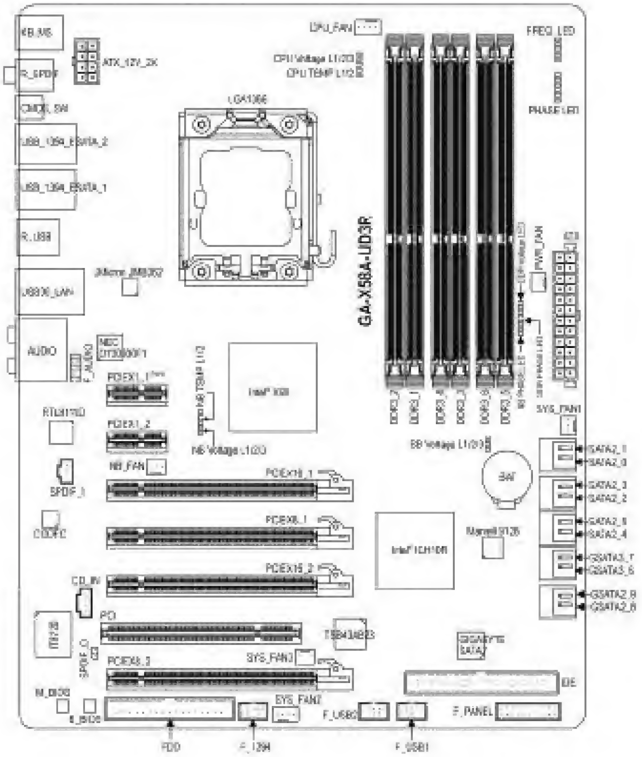

মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেল কানেক্টর ও পোর্টসমূহ :

আধুনিক মাদারবোর্ডে বেশ কিছু ব্যাক প্যানেল কানেক্টর রয়েছে। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

চিত্র। গিগাবাইট টেকনোলজির GA-X58A-UD3R মডেলের মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেল কানেক্টর

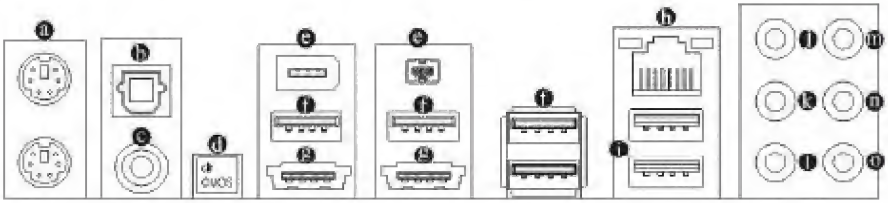

চিত্র। গিগাবাইট টেকনোলজির GA-X58A–UD3R মডেলের মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেল ডায়াগ্রাম

a. PS/2 Keyboard and PS/2 Mouse Port
b. Optical S/PDIF Out Connector
c. Coaxial S/PDIF Out Connector
d. Clearing CMOS Button
e. IEEE 1394a Port
f. USB 2.0/1.1 Port
g. eSATA/USB Combo Connector
h. RJ-45 LAN Port
i. USB 3.0/2.0 Port
j. Center/Subwoofer Speaker Out Jack (Orange)
k. Rear Speaker Out Jack (Black)
l. Side Speaker Out Jack (Gray)
m. Line In Jack (Blue)
n. Line Out Jack (Green)
o. Mic In Jack (Pink)

PS/2 Keyboard and PS/2 Mouse Port
এখানে থাকা উপরের সুবজ রঙের পোর্টটিতে পিএস/২ মাউস এবং নিচের পার্পল রঙের পোর্টটিতে পিএস/২ কীবোর্ড সংযুক্ত করতে হয়।

Optical S/PDIF Out Connector
ডিজিটাল অপটিক্যাল অডিও সমর্থিত একটি এক্সটার্নাল অডিও সিস্টেমে এই কানেক্টর ডিজিটাল অডিও সরবরাহ করে থাকে।

Coaxial S/PDIF Out Connector
ডিজিটাল কোয়াক্সিয়াল অডিও সমর্থিত একটি এক্সটার্নাল অডিও সিস্টেমে এই কানেক্টর ডিজিটাল অডিও সরবরাহ করে থাকে।

Clearing CMOS Button
CMOS ভ্যালুকে ক্লিয়ার করার জন্য এই সুইচটি চাপতে হয়।

IEEE 1394a Port
এই পোর্টটি IEEE 1394a স্পেসিফিকেশন সমর্থন করে যার রয়েছে উচ্চ গতি, উচ্চ ব্যান্ডউইডথ এবং হটপ্লাগ সক্ষমতা। IEEE 1394a ডিভাইসগুলো এই পোর্টে যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়।

USB 2.0/1.1 Port
এই ইউএসবি পোর্টটি USB 2.0/1.1 স্পেসিফিকেশন সমর্থন করে। ইউএসবি কীবোর্ড/মাউস, ইউএসবি প্রিন্টার, ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ইত্যাদির মতো আরও অসংখ্য ডিভাইসগুলোকে এই পোর্টে লাগিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

eSATA/USB Combo Connector
এই কানেক্টরটি SATA 3Gb/s এবং USB 2.0/1.1 স্পেসিফিকেশন সমর্থন করে। কোনো এক্সটার্নাল সাটা ডিভাইস কিংবা সাটা পোর্ট মাল্টিপ্লায়ার অথবা ইউএসবি কীবোর্ড/মাউস, ইউএসবি প্রিন্টার, ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ইত্যাদির মতো আরও অসংখ্য ডিভাইসগুলোকে এই পোর্টে লাগিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

RJ-45 LAN Port
এই ল্যান পোর্টটিতে RJ-45 ক্যাবল সংযুক্ত করতে হয় যা সর্বোচ্চ 1 Gbps ডেটা রেটে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে থাকে। নিচে ল্যান পোর্ট LED সমূহের অবস্থা দেখানো হলো।

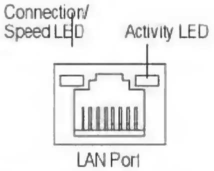

Connection/Speed LED:

State	Description
Orange	1 Gbps data rate
Green	100 Mbps data rate
Off	10 Mbps data rate

Activity LED:

State	Description
Blinking	Data transmission or receiving is occurring
Off	No data transmission or receiving is occurring

USB 3.0/2.0 Port

এই পোর্টটি USB 3.0 স্পেসিফিকেশনকে সমর্থন করে এবং USB 2.0/1.1 স্পেসিফিকেশনের সাথে কম্পাটিবল। ইউএসবি কীবোর্ড/মাউস, ইউএসবি প্রিন্টার, ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ইত্যাদির মতো আরও অসংখ্য ডিভাইসগুলোকে এই পোর্টে লাগিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

Center/Subwoofer Speaker Out Jack (Orange)

৫.১/৭.১–চ্যানেল অডিও কনফিগারেশনে সেন্টার/সাবউফার স্পিকারসমূহ যুক্ত করার জন্য এই অডিও জ্যাকটি ব্যবহার করা হয়।

Rear Speaker Out Jack (Black)

৭.১–চ্যানেল অডিও কনফিগারেশনে রিয়ার স্পিকারসমূহ যুক্ত করার জন্য এই অডিও জ্যাকটি ব্যবহার করা হয়।

Side Speaker Out Jack (Gray)

৪/৫.১/৭.১–চ্যানেল অডিও কনফিগারেশনে সাইড স্পিকারসমূহ যুক্ত করার জন্য এই অডিও জ্যাকটি ব্যবহার করা হয়।

Line In Jack (Blue)

ডিফল্ট লাইন ইন জ্যাক। অপটিক্যাল ড্রাইভ, ওয়াকম্যান ইত্যাদির মতো লাইন ইন ডিভাইসসমূহের জন্য এই জ্যাকটি ব্যবহার করা হয়।

Line Out Jack (Green)

এটি ডিফল্ট লাইন আউট জ্যাক। হেডফোন বা ২-চ্যানেল স্পিকারের জন্য এই অডিও জ্যাকটি ব্যবহার করতে হবে। ৪/৫.১/৭.১-চ্যানেল অডিও কনফিগারেশনে ফ্রন্ট স্পিকারসমূহ যুক্ত করার কাজেও এই জ্যাকটি ব্যবহার করা যায়।

Mic In Jack (Pink)

ডিফল্ট মাইক ইন জ্যাক। মাইক্রোফোনকে অবশ্যই এই জ্যাকটিতে যুক্ত করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন মডেলের মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেলে আরও কয়েকটি পোর্ট দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ভিজিএ পোর্ট, সিরিয়াল পোর্ট ও প্যারালাল পোর্ট অন্যতম। সাধারণত যেসব মাদারবোর্ডে গ্রাফিক্সকার্ড বা ভিজিএ বিল্টইন থাকে সেগুলোতে ভিজিএ পোর্ট প্রাথমিক অবস্থাতেই দেখতে পাওয়া যায়। আবার আলাদাভাবে মাদারবোর্ডে যখন গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো হয় তখন ভিজিএ পোর্ট দৃশ্যমান হয়। অনেক মাদারবোর্ডে মাউস ও মডেমের সংযোগের জন্য সিরিয়াল পোর্ট এবং প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি যুক্ত করার জন্য প্যারালাল পোর্টও থাকে।

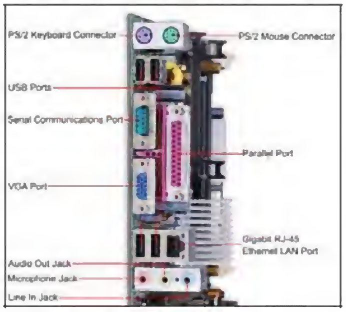

চিত্র : মাদারবোর্ডে বিভিন্ন পেরিফেরাল সংযুক্ত করার পোর্ট

সিরিয়াল পোর্ট

সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে সিরিয়াল ডিভাইসগুলো ডেটা আদান–প্রদান করে থাকে। সিরিয়াল পোর্টগুলো সাধারণত কম বা বেশি RS-২৩২ স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সমন্বয়কারী হার্ডওয়্যারগুলোকে শনাক্ত করে থাকে। মনিটর, প্রিন্টার, মডেম প্রভৃতি আউটপুট পেরিফেরালসসমূহ কম্পিউটারের ইনপুট/আউটপুট পোর্টের সাথে সিরিয়াল ইন্টারফেস ব্যবস্থায় যুক্ত থাকে।

প্যারালাল পোর্ট

প্যারালাল পোর্টের মাধ্যমে প্যারালাল ডিভাইসগুলো ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে। দ্রুতগতিতে তথ্য আদান প্রদানের জন্য এই ইন্টারফেসটি ব্যবহৃত হয়। সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ, জিপ ড্রাইভ, প্রিন্টার ইত্যাদি পেরিফেরালসগুলো পোর্টের মাধ্যমে প্যারালাল ইন্টারফেসের সাথে যুক্ত থাকে।

চিত্র : একটি ডিবি-২৫ প্যারালাল প্রিন্টার পোর্ট

চিত্র : মাইক্রো রিবন ৩৬ পিন ক্লিমেল পোর্ট

ভিজিএ/ডিভিআই কানেক্টর : প্রচলিত মনিটরগুলো মাদারবোর্ডে যুক্ত গ্রাফিক্স কার্ডের অপরপ্রান্ত যেটি কেসিংয়ের বাইরে থেকে দেখা যায় সেই ভিজিএ কানেক্টর বা সকেটে যুক্ত করা হয়। VGA (Video Graphics Array) হলো পিসি এর জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড। ভিডিও কার্ডের সাথে মনিটর বা প্রজেক্টর এ কানেক্টরে কানেক্ট করা হয়। ভিজিএ কানেক্টরে পনেরো টি পিন থাকে। DVI (Digital Visual Interface) হলো আরেক ধরনের ইন্টারফেস। তবে আজকাল ডিজিটাল ভিডিও ইন্টারফেস বা ডিভিআই সম্বলিত মনিটর পাওয়া যায় সেগুলোর ডিভিআই ক্যাবলটিকে সিপিইউ'র ডিভিআই কানেক্টর বা সকেটে যুক্ত করতে হয়। ভিজিএ হলো এনালগ কানেক্টর কিন্তু ডিভিআই হলো এনালগ এবং ডিজিটাল ইন্টারফেস। তাই এ প্রযুক্তিতে ভিডিও এর মান অনেক উন্নত এবং দ্রুততর।

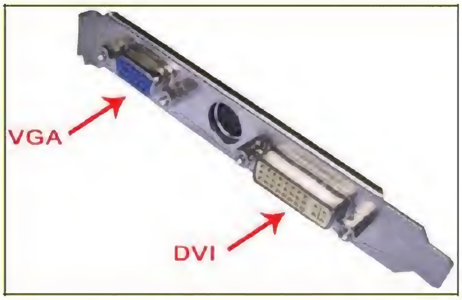

২.২ কেসিং এ মাদারবোর্ড সেট করা

মাদারবোর্ডের ইন্সটলেশন সতর্কতা

মাদারবোর্ডে অসংখ্য ইলেকট্রনিক সার্কিট ও কম্পোনেন্ট থাকে যেগুলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জের (ESD) কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্য মাদারবোর্ডটি এবং এতে কোনো যন্ত্রাংশ ইন্সটল করার আগেই সতর্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের নিয়ম-কানুনগুলো অনুসরণ করি :

১. ইন্সটলের সময় মাদারবোর্ডের সিরিয়াল নম্বর সম্বলিত স্টিকার এবং ওয়ারেন্টি স্টিকার সরাবে না কিংবা ভাঙবে না। ওয়ারেন্টি ভ্যালিডেশনের জন্য এসব স্টিকারের প্রয়োজন পড়বে।

২. মাদারবোর্ড কিংবা অন্যান্য হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টগুলো ইন্সটল ও রিমুভ করার আগে সব সময় পাওয়ার আউটলেট থেকে পাওয়ার কর্ডটি খুলে ফেলার মাধ্যমে AC পাওয়ার রিমুভ করতে হবে।

৩. মাদারবোর্ডের ইন্টারনাল কানেক্টরগুলোতে হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টসমূহ যুক্ত করার সময় নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে সেগুলো শক্ত ও নিরাপদে যুক্ত করা হয়েছে।

৪. মাদারবোর্ড নিয়ে কাজ করার সময় কোনো ধরনের ধাতব উপাদান বা কানেক্টরে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টসমূহ যেমন– মাদারবোর্ড, সিপিইউ বা মেমরি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার সময় একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ রিস্ট স্ট্র্যাপ [ElectroStatic Discharge (ESD) wrist strap] পরিধান করে নেওয়া উচিত। যদি হাতের কাছে কোনো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ রিস্ট স্ট্র্যাপ না থাকে তাহলে হাতগুলোকে শুকনো রাখতে হবে এবং প্রথমে কোনো ধাতব বস্তুতে স্পর্শ করতে হবে যাতে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি দূরীভূত হয়।

৬. মাদারবোর্ডটি ইন্সটল করার আগে এটিকে কোনো এন্টিস্ট্যাটিক প্যাড বা একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক শিল্ডিং কনটেইনারের উপর রাখতে হবে।

৭. মাদারবোর্ড থেকে পাওয়ার সাপ্লাই ক্যাবলটি সরিয়ে আনার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি বন্ধ করা হয়েছে।

৮. পাওয়ার চালু করার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে স্থানীয় ভোল্টেজ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ সেট করা হয়েছে।

৯. পণ্য ব্যবহারের আগে যাচাই করে দেখতে হবে হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টগুলোর সকল ক্যাবল ও পাওয়ার কানেক্টরগুলো সংযুক্ত আছে কীনা।

১০. মাদারবোর্ডটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বাঁধা দিতে মাদারবোর্ড সার্কিট বা এর কম্পোনেন্টগুলোতে যেন স্ক্রুর যোগাযোগ না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১১. কোনো ধরনের লেফটওভার স্ক্রু বা মেটাল কম্পোনেন্ট মাদারবোর্ড বা কম্পিউটার কেসিংয়ে স্থাপিত হয়নি– এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১২. কম্পিউটার সিস্টেমটিকে কোনো উঁচু নিচু তলের উপর স্থাপন করা যাবে না।

১৩. অতি উচ্চ তাপমাত্রার কোনো পরিবেশে কম্পিউটার সিস্টেমটিকে রাখা যাবে না।

১৪. ইন্সটলেশন প্রক্রিয়ার সময় কম্পিউটারের পাওয়ার যেন না চালু করা হয় সেটি খেয়াল রাখতে হবে। হঠাৎ পাওয়ার অন করে দিলে তা সিস্টেম কম্পোনেন্টের ক্ষতি করার পাশাপাশি দৈহিক ক্ষতিও করতে পারে।

১৫. ইন্সটলেশনের কোনো ধাপ নিয়ে যদি মনে শঙ্কা থাকে কিংবা পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো সমস্যা হয় তবে কোনো বিশেষজ্ঞ কম্পিউটার টেকনিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে।

কেসিং এ মাদারবোর্ড সেট করা

কম্পিউটারের কেসিং এর ভেতর মাদারবোর্ডকে সঠিকভাবে সেট করা জরুরি। কারণ এই মাদারবোর্ডের উপরই বসানো থাকে প্রসেসর, র‍্যাম, গ্রাফিক্স কার্ড, ল্যান কার্ড ইত্যাদিসহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ। এটি সেট করার জন্য নিচের প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করতে হবে :

১. কেসিং এ ব্যবহৃত ইনপুট/আউটপুট প্যানেলটি মাদারবোর্ডের সাথে আসে। এটি আমাদের ব্যবহার করতে হবে। কেসিং এর পেছন দিকে ইনপুট/আউটপুট প্যানেল লাগানোর জায়গাটি সাধারণত খালিই থাকে।

যদি ইতোমধ্যে একটি ইনপুট/আউটপুট প্যানেল সেখানে ইন্সটল করা হয়ে থাকে তবে সেটি খুলে ফেলতে হবে। এর বদলে নতুনটি লাগাতে হবে। আরও নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যেন ওরিয়েন্টেশনটি সঠিক হয়। যদি তা না হয় তবে পরবর্তীতে মাদারবোর্ডটি ইন্সটল করা সম্ভব হবে না।

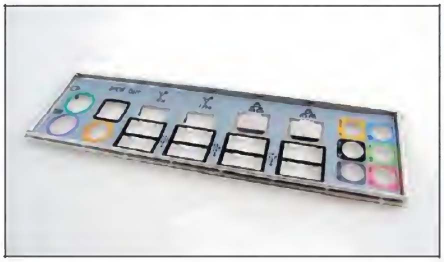

২. কেসিং এর একপাশের ঢাকনা খুলে সেটি কোনো সমতলের উপর রাখতে হবে। এর ফলে কেসিংয়ের ভেতরে ফাঁকা একটি স্থান দৃশ্যমান হবে। লক্ষ করলে সেখানো স্ক্রু লাগাবার অনেকগুলো ছিদ্র পাওয়া যাবে। এখানে আমাদের মাদারবোর্ড এবং কেসিং উভয়ের স্ক্রু এর অবস্থান শনাক্ত করার প্রয়োজন হবে।

কেসিং এর এই স্থানে মাদারবোর্ড স্থাপিত হবে

স্পেসার

৩. মাদারবোর্ডে স্ক্রু এর অবস্থান শনাক্ত করার পর স্পেসারগুলোকে প্যাঁচিয়ে চেসিস এর মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

৪. নিশ্চিত হতে হবে যেন স্পেসারগুলো নিরাপদে আটকানো থাকে। স্পেসারগুলোর পাশাপাশি লেবেলের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সেগুলোই বলে দেবে কোন ধরনের মাদারবোর্ডের জন্য কোন স্ক্রু পজিশন হবে।

স্পেসার এর সঠিক অবস্থান

স্পেসারসমূহ, ইনপুট/আউটপুট প্যানল এবং মাদারবোর্ডের অ্যালাইনকৃত অবস্থা

৫. স্পেসারগুলো জায়গামতো বাসানোর ফলে এবার আমরা মাদারবোর্ডটি ইন্সটল করতে পারব। এ সময় নিশ্চিত হতে হবে মাদারবোর্ডটি যেন স্পেসারসমূহ এবং ইনপুট/আউটপুট প্যানেলের সাথে অ্যালাইন অবস্থায় থাকে। পেছনের ইনপুট/আউটপুট প্যানেলটি সহজে অ্যাকসেস করার উপযোগি অবস্থায় থাকতে হবে।

৬. এবার আমাদের স্ক্রু এর মাধ্যমে মাদারবোর্ডটিকে কেসিংয়ের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে।

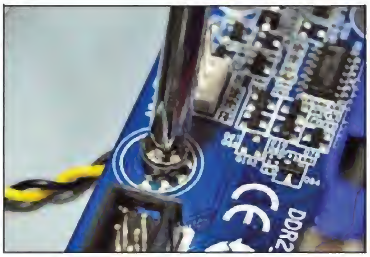

৭. মাদারবোর্ডটিকে সঠিক স্থানে আটকানোর সময় নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে একটু আগে ইন্সটল করা স্পেসারগুলো মাউন্টিং হোলগুলোর সাথে যথাযথভাবে অ্যালাইন করা রয়েছে। আরও নিশ্চিত হতে হবে যে মাদারবোর্ডটিকে আটকানোর জন্য প্রতিটি স্পেসার ব্যবহৃত হয়েছে। অব্যবহৃত স্পেসারগুলো শর্ট সার্কিট এর উদ্ভব ঘটাতে পারে।

৮. এভাবে সবগুলো স্ক্রু লাগিয়ে ফেললে মাদারবোর্ডটিও কেসিংয়ের ভেতর যথাযথভাবে ইন্সটল বা সেট হয়ে যাবে।

২.৩ মাদারবোর্ডের প্রসেসর সকেটে প্রসেসরকে ইন্সটল করা

প্রসেসর সকেট বা স্লট (Processor socket or slot)

কম্পিউটারের প্রত্যেকটি মাদারবোর্ডে প্রসেসর তথা মাইক্রোপ্রসেসর লাগানোর স্লট থাকে। এটিকে প্রসেসর সকেট/স্লট বলা হয়। সকেটে কী ধরনের প্রসেসর লাগানো যাবে তা মাদারবোর্ডের সাথে দেওয়া ম্যানুয়াল দেখে বুঝা যাবে। মাদারবোর্ডের সাথে সমন্বয় করে প্রসেসর ক্রয় করতে হবে।

মাদারবোর্ডের প্রসেসর সকেটে প্রসেসর সেট করা

১. প্রসেসরটিকে সব সময় পাশের অংশগুলোতে আঙুলের সাহায্যে ধরে রাখতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন কোনোভাবেই কনট্যাক্ট প্যাডে স্পর্শ না লাগে।

২. মাদারবোর্ডে প্রসেসর সকেটের উপর স্থাপিত প্লাস্টিকের কভারটি অপসারণ করতে হবে। লেভেলটিকে উঠাতে হবে এবং উপরের দিকে টানতে হবে। এটি করা হয়ে গেলে কভারটিকে হালকাভাবে টেনে উঠাতে হবে।

৩. প্রসেসরের নচগুলোর দিকে খেয়াল করে সতর্কতার সাথে প্রসেসরটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে।

প্রসেসরকে বসানো হয়েছে

মেটাল কভারকে নামিয়ে ও আটকে দিয়ে প্রসেসরকে ঠিকভাবে বসানো হয়েছে

৪. প্রসেসরটিকে ঠিকভাবে বসানোর পর মেটাল কভারটিকে নিচের দিকে নামিয়ে এনে লেভেলটিকে খানিকটা নিচের দিকে ধাক্কা দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লক করতে হবে।

৫. প্রসেসরটিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রসেসরের সকেটের সাথে কুলার লাগাতে হবে। কুলারটি ইন্সটল করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যেন পুশ-পিনগুলো কুলারে ৯০ ডিগ্রি পজিশনে খোলা থাকে।

প্রসেসরের কুলার

কুলারের খোলা পিন

৬. এবার কুলারটিকে প্রসেসরের উপরে বসিয়ে মাদারবোর্ডের বিপরীতে পুশ-পিনগুলোকে সাজাতে হবে। এরপর পিনগুলোকে নিচের দিকে সজোরে ততক্ষণ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে বসাতে হবে। কুলারটি ঠিকভাবে বসলে মাদারবোর্ডের উল্টো দিকে পুশ-পিন এর প্রান্ত দেখা যাবে।

৭. এরপর কুলারটি থেকে পাওয়ার কানেক্টরটি নিয়ে সেটিকে মাদারবোর্ডে থাকা সংশ্লিষ্ট কানেক্টরে যুক্ত করতে হবে। এভাবে কুলারটি পরিপূর্ণভাবে প্রসেসরের উপর স্থাপিত হবে।

২.৪ মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটে র‍্যাম মড্যুল ইনস্টল করা

র‍্যাম একটি অস্থায়ী স্মৃতি। কম্পিউটারে ডেটা এবং প্রোগ্রাম অস্থায়িভাবে র‍্যাম মেমরিতে লোড হয়। কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটে র‍্যাম সংযোগ করতে হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের র‍্যাম পাওয়া যায়। মাদারবোর্ডের স্লটে যে ধরনের র‍্যাম সংযোগ সাপোর্ট করে সে ধরনের র‍্যাম সংযোগ করতে হবে। তাই মাদারবোর্ডের সাথে সমন্বয় করে র‍্যাম কিনতে হবে। মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটে র‍্যাম সংযোগ করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটের দুই দিকের নব দুইটিকে আঙুল দিয়ে চেপে বাহিরের দিকে সরাতে হবে।

২. র‍্যামের পিনযুক্ত মাথাকে স্লটে সঠিকভাবে বসাতে হবে। লাগানোর আগে ভালো করে দেখে নিতে হবে।

৩. স্লটে র‍্যাম বসানোর পর আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

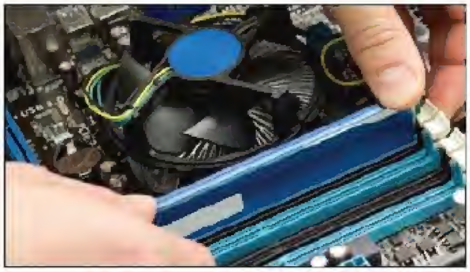

৪. স্লটের দুই দিকের নব দুইটিকে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ভিতরের দিকে সরাতে হবে।

২.৫ মাদারবোর্ডর এক্সপানশন স্লটে প্রয়োজনীয় কার্ডসমূহ ইন্সটল করা

কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ডিভাইস সংযুক্ত করা হয়। এদেরকে এক্সপানশন কার্ড বলা হয়। যেমন– সাউন্ড কার্ড, এজিপি কার্ড, ক্যাপচার কার্ড ইত্যাদি। মাদারবোর্ডের এক্সপ্যানশন স্লটে এক্সপ্যানশন কার্ড লাগানো হয়। মাদারবোর্ডের সাথে সমন্বয় করে এক্সপানশন কার্ড ক্রয় করতে হয়।

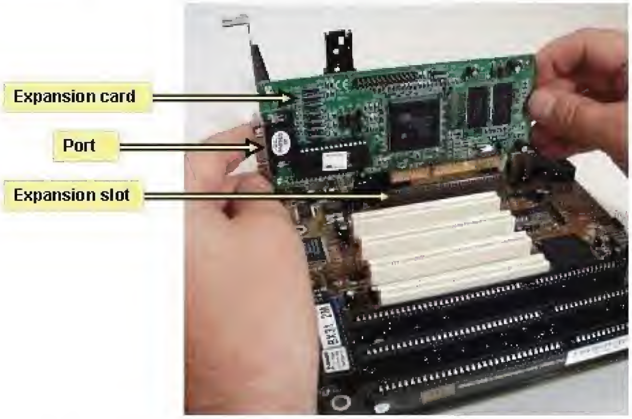

মাদারবোর্ডে ব্যবহৃত এক্সপানশন স্লটসমূহ

কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে বেশ কিছু স্লট রয়েছে। এদের কোনো কোনোটিকে আলাদা নামে ডাকা হয় আবার কখনও কখনও এদের কয়েকটিকে একসাথে এক্সপ্যানশন স্লট (Expansion slots) নামেও ডাকা হয়। এক্সপ্যানশন স্লট হলো এমন কিছু কম্পার্টমেন্ট যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্যানশন কার্ডকে যুক্ত করা যায়। এসব কার্ড কম্পিউটারে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে এবং এর কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন ধরনের স্লটগুলোর মধ্যে রয়েছে :

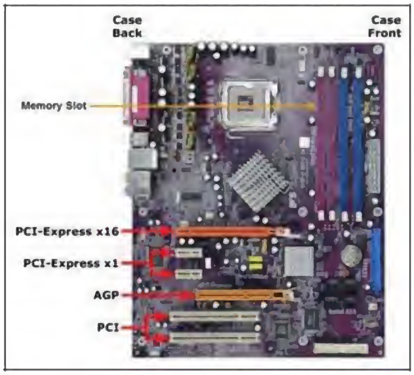

- **আইএসএ স্লট (ISA – Industry Standard Architechture) :** আইএসএ স্লটসমূহ সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে কম গতিরগুলো ১৬—বিট এর।
- **পিসিআই স্লট (PCI – Peripheral Component Interconnect) :** পিসিআই কার্ডসমূহ সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত হয় যেগুলো আইএসএ কার্ডগুলো থেকে বহুগুণ দ্রুতগতির এবং ৩২ বিটে চলে। এই স্লটে সাধারণত সাউন্ডকার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড, মডেম ইত্যাদি সংযোজন করা হয়।
- **এজিপি স্লট (AGP – Accelarated Graphic Port) :** গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য একটি দ্রুতগতির পোর্ট।
- **পিসিআই এক্সপ্রেস স্লট (PCI Express–Peripheral Component Interconnect Express) :** এটি এজিপি এবং পিসিআই বাসগুলোর চাইতে দ্রুতগতির বাস আর্কিটেকচার। এ স্লটগুলোতে পিসিআই এক্সপ্রেস এবং এজিপি কার্ড সংযোজন করা হয়।

মাদারবোর্ডের এক্সপানশন স্লটে এক্সপানশন কার্ড ইন্সটল করা

মাদারবোর্ডের এক্সপানশন স্লটে প্রয়োজনীয় এক্সপানশন কার্ড সংযোজন করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. কম্পিউটারে এক্সপানশন কার্ড লাগানোর আগে কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে পাওয়ার লাইন থেকে ক্যাবল খুলে নিতে হবে। মাদারবোর্ড এবং এক্সপানশন কার্ড হাতে স্পর্শ করার আগে এন্টিস্টেটিক রিস্ট স্ট্র্যাপ হাতে লাগিয়ে নিলে ব্যবহারকারীর শরীর থেকে বাহিত ইলেক্ট্রোস্টেটিক থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করে।

২. এক্সপানশন কার্ডটি যে ধরনের স্লটের উপযোগি মাদারবোর্ডের সে স্লট বরাবর কেসিং থেকে ডামি ফেসপ্লেটটি সরিয়ে আনতে হবে।

৩. কানেক্টরের যথাযথ স্থানে মিল রেখে ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বসিয়ে হালকা করে চাপ দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এটি যেন শক্তভাবে সঠিক স্থানে বসে থাকে। এর আউটপুটগুলো যেন কেসিং বাহির থেকে অ্যাকসেস করার উপযোগি থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. কার্ডটি সঠিক স্থানে বসানোর পর এটিকে কেসিংয়ের ফেসপ্লেটের সাথে ভালোভাবে আটকে রাখতে হবে।

৫. এভাবে লাগানোর পর পাওয়ার লাইনে পাওয়ার কর্ডটি সংযুক্ত করে কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে। সংযুক্ত এক্সপানশন কার্ডটি যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে না পায় তাহলে এর ড্রাইভার সফটওয়্যারটি ইন্সটল করে নিতে হবে।

প্রশ্নমালা—২

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাদারবোর্ড বলতে কী বোঝায়?
২. মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।
৩. প্রসেসর সকেট বা স্লট কী?
৪. এক্সপানশন কার্ড কী?
৫. সাউন্ডকার্ড কী?
৬. নিক বলতে কী বোঝায়?
৭. পূর্ণরূপ লিখ : PCB, ESD, ISA, PCI, AGP, NIC, RJ।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাদারবোর্ডের কোন কোন মাল্টিমিডিয়া ও নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহকে প্রয়োজনে ডিসাবল করে রাখা যায়?
২. মাদারবোর্ড এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম উল্লেখ কর।
৩. মাদারবোর্ডে র‍্যাম সংযোজন প্রক্রিয়া লেখ।
৪. মাদারবোর্ডে ব্যবহৃত এক্সপানশন স্লটগুলো কী কী?
৫. মাদারবোর্ডের এজিপি ও পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটে গ্রাফিক্স কার্ড সংযোজন প্রক্রিয়া লেখ।
৬. সাউন্ডকার্ডের ব্যবহার উল্লেখ কর।
৭. মাদারবোর্ডে নেটওয়ার্ক কার্ড সংযোজন করার পদ্ধতি উল্লেখ কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাদারবোর্ডের ইন্সটলেশন সতকর্তাগুলো উল্লেখ কর।
২. কেসিংয়ে মাদারবোর্ড সেট করার প্রক্রিয়া লেখ।
৩. মাদারবোর্ডে প্রসেসর সংযোজনের প্রক্রিয়া উল্লেখ কর।
৪. মাদারবোর্ডে সাউন্ডকার্ড সংযোজনের প্রক্রিয়া উল্লেখ কর।

অধ্যায়-৩
কেসিং ও মাদারবোর্ডে পেরিফেরালস সংযোজন

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

৩.১. কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত পেরিফেরালসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারব।

৩.২. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ ইত্যাদি পেরিফেরালকে ক্যাসিং এ যথাস্থানে ইনস্টল করতে পারব।

৩.৩. বিভিন্ন কানেক্টরসমূহকে মাদারবোর্ডের সংশ্লিষ্ট কানেক্টরে যুক্ত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারব।

৩.৪. সকল ডিভাইস ক্যাসিং এ সেট করার পর ক্যাসিং এর কভার লাগাতে পারব।

৩.১ কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত পেরিফেরালসমূহ

কেসিং ও মাদারবোর্ডে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকার ডিভাইস, কার্ড ও পেরিফেরালসমূহের মধ্যে রয়েছে :

১. হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ
২. অপটিক্যাল ড্রাইভ (সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ/ডিভিডি রাইটার)
৩. কীবোর্ড
৪. মাউস
৫. প্রিন্টার
৬. ফ্ল্যাশ ডিস্ক
৭. মডেম
৮. স্ক্যানার
৯. জয় স্টিক
১০. সাউন্ড বক্স
১১. হেডফোন/ মাইক্রোফোন
১২. টিভি টিউনার
১৩. সাউন্ড কার্ড
১৪. এজিপি কার্ড
১৫. টিভি কার্ড
১৬. নেটওয়ার্ক কার্ড ইত্যাদি।

৩.২ কেসিংয়ে যথাস্থানে বিভিন্ন ধরনের পেরিফেরাল সংযোজন করা

কেসিংয়ে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সংযোজন করা (সাটা হার্ড ডিস্ক)

কম্পিউটার কেসে থাকা ৩.৫ ইঞ্চি মাপের বে (bay) তে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ স্থাপন করা হয়ে থাকে। প্রথমে এই বে (bay) তে ড্রাইভটি ঢুকানো হয় এরপর স্ক্রু-এর লোকেশন ঠিক করে অ্যালাইন করে ড্রাইভটিকে স্ক্রু লাগিয়ে আটকে দেওয়া হয়। হার্ড ডিস্ক লাগানোর সময় মাস্টার ও স্লেভ ড্রাইভ নির্ধারণ করে দিতে হয়। কিন্তু সাটা প্রযুক্তিতে যতক্ষণ হার্ড ডিস্কটি এক পাশ থেকে অপর পাশে লাগানো থাকে ততক্ষণ কোনো ধরনের জাম্পার ম্যানিপুলেশনের প্রয়োজন পড়ে না। আর এই হার্ড ডিস্ক কম্পিউটার কেসে ইন্সটল করাও সহজ। একটি সাটা হার্ড ডিস্ক কম্পিউটার কেসের মধ্যে ইন্সটল করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. যে সাটা হার্ড ডিস্কটি কম্পিউটার কেসে ইন্সটল করা হবে তা নিতে হবে। আজকাল সাটা হার্ড ডিস্ক লাগানোর জন্য কম্পিউটার কেসটিকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। এসব কেসে স্ক্রু ছাড়াই মাউন্টিং র‍্যাকের সাহায্যে হার্ডডিস্ককে খুব সহজেই মাউন্টেড করা যায়। এ ধরনের একটি কেসিং সংগ্রহ করলেই ভালো হয়। স্ক্রু ব্যবহারের ঝামেলা তাতে কমবে।

দুই পাশে মাউন্টিং র‍্যাকসহ একটি সাটা হার্ডডিস্ক

হার্ডডিস্কে মাউন্টিং র‍্যাক ফিট করা হয়েছে

২. মাউন্টিং র‍্যাকগুলো কেসিং থেকে খুলে নেওয়া যায়। এগুলোকে খুলে এনে শুধু হার্ড ডিস্কে ফিট করতে হবে।

৩. এবার হার্ড ডিস্কের সাথে লাগানো মাউন্টিং র‍্যাকসহ পুরো অংশটিকে হার্ড ডিস্ক এ সংযুক্ত করতে হবে। হার্ড ডিস্কটি সঠিকভাবে ও সঠিক স্থানে ঢুকানো হলে র‍্যাকগুলো জায়গামতো বসে যাবে।

মাউন্টিং র‍্যাকসহ হার্ডডিস্কটিকে বে তে সংযুক্ত করা হয়েছে

৪. এবার হার্ড ডিস্কের জন্য যে সাটা কানেক্টরগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে হবে। এদের মধ্যে একটি ডেটার জন্য এবং অপরটি পাওয়ারের জন্য। হার্ড ডিস্কের যথাযথ স্থানে এই দুইটি কানেক্টর লাগিয়ে দিতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন এগুলো পুরোপুরি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোথাও কোনো ফাঁকা থাকা চলবে না।

দুইটি সাটা কানেক্টর

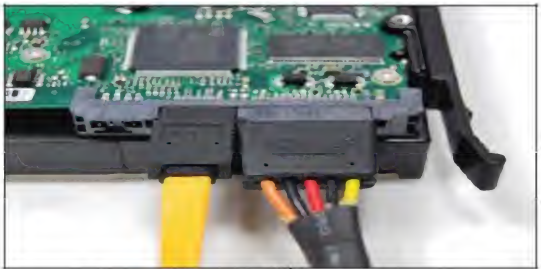

সাটা কানেক্টরগুলো হার্ডডিস্কে সংযুক্ত করা হয়েছে

৫. এরপর সাটা হার্ড ডিস্কের সাথে যে ডেটা কানেক্টরটি বা ক্যাবলটি সংযুক্ত হয়েছে তার অপর প্রান্তটি মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট সাটা পোর্টে লাগাতে হবে। মাদারবোর্ডে সাধারণত ৬টি সাটা পোর্ট থাকে।

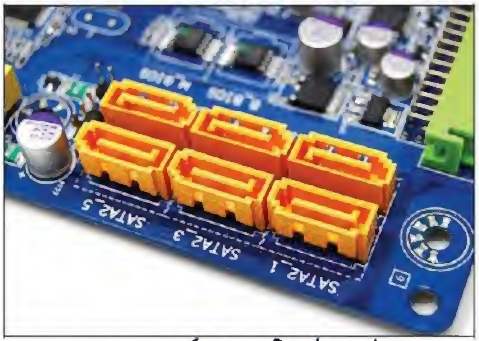

মাদারবোর্ডে থাকা ৬টি সাটা পোর্ট

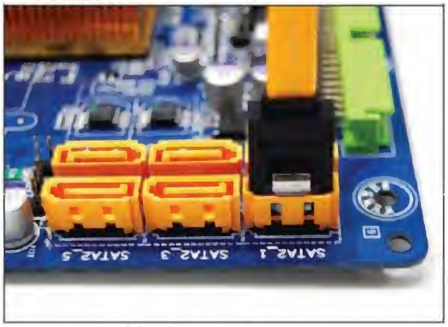

সাটা পোর্টে সাটা ক্যাবল যুক্ত করা হয়েছে

৬. সাটা ডেটা ক্যাবলটি শক্ত করে পোর্টে লাগিয়ে দিতে হবে। এ সময় একটি ক্লিক শব্দ শোনা যাবে।

৭. এর মাধ্যমে কেসিংয়ে আমাদের সাটা হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করা এবং মাদারবোর্ডে সেটিকে সংযুক্ত করার কাজ সুসম্পন্ন হবে।

কেসিংয়ে সিডি/ডিভিডি–রম ড্রাইভ সংযোজন করা

সিডি-রম (CD) ডিস্কগুলো পড়ার জন্য যে ড্রাইভ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলা হয় সিডি–রম ড্রাইভ। আর ডিভিডি–রম ডিস্কগুলো (DVD) পড়ার জন্য যে ড্রাইভ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় ডিভিডি–রম ড্রাইভ। ডিভিডি–রম ড্রাইভগুলো সিডি (CD) এবং ডিভিডি (DVD) উভয় ধরনের ডিস্কই পড়তে পারে। তবে সিডি–রম ড্রাইভ সিডি–রম (CD) ডিস্কগুলো পড়তে পারলেও ডিভিডি ডিস্ক (DVD) পড়তে পারে না। ভার্চুয়ালি আধুনিক সবগুলো সিডি/ডিভিডি–রম ড্রাইভই অডিও এবং ভিডিও সিডি চালাতে পারে। এছাড়া যথাযথ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অন্যান্য ফরমেটের সিডি বা ডিভিডিও এগুলো চালাতে পারে।

কেসিংয়ে সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভ সংযুক্ত করতে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. সিডি/ডিভিডি—রম ড্রাইভটিকে কম্পিউটার কেসের নির্ধারিত বে তে সংযুক্ত করতে হবে। সিডি/ডিভিডি—রম ড্রাইভটি সঠিকভাবে ও সঠিক স্থানে ঢুকানো হলে র‍্যাকগুলো জায়গা মতো বসে যাবে।

২. এবার অপটিক্যাল ড্রাইভের জন্য যে সাটা কানেক্টরগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে হবে। এদের মধ্যে একটি ডেটার জন্য এবং অপরটি পাওয়ারের জন্য। সিডি—রম/ডিভিডি—রম ড্রাইভের যথাযথ স্থানে এই দুইটি কানেক্টর লাগিয়ে দিতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন এগুলো পুরোপুরি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোথাও কোনো ফাঁকা থাকা চলবে না।

৩. এরপর সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভের সাথে যে ডেটা কানেক্টরটি বা ক্যাবলটি সংযুক্ত হয়েছে তার অপর প্রান্তটি মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট সাটা পোর্টে (মাদারবোর্ডে সাধারণত ৬টি সাটা পোর্ট থাকে) শক্ত করে লাগিয়ে দিতে হবে। এ সময় একটি ক্লিক শব্দ শোনা যাবে।

৪. এর মাধ্যমে কেসিংয়ে আমাদের সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভ ইন্সটল করা এবং মাদারবোর্ডে সেটিকে সংযুক্ত করার কাজ সুসম্পন্ন হবে।

৩.৩ বিভিন্ন কানেক্টরসমূহকে মাদারবোর্ডের সংশ্লিষ্ট কানেক্টরে যুক্ত করা

কম্পিউটার মাদারবোর্ডে লক্ষ করলে নিচের চিত্রের (চিত্র-১) এর মতো এর ফ্রন্ট প্যানেল কানেক্টরগুলো দেখা যাবে। কম্পিউটারের কেসিং বা কেস থেকে যে সমস্ত তার চলে এসেছে সংশ্লিষ্ট সেসব তারগুলো (চিত্র-২) মাদারবোর্ডের এসব কানেক্টরে ইন্সটল করা হয়।

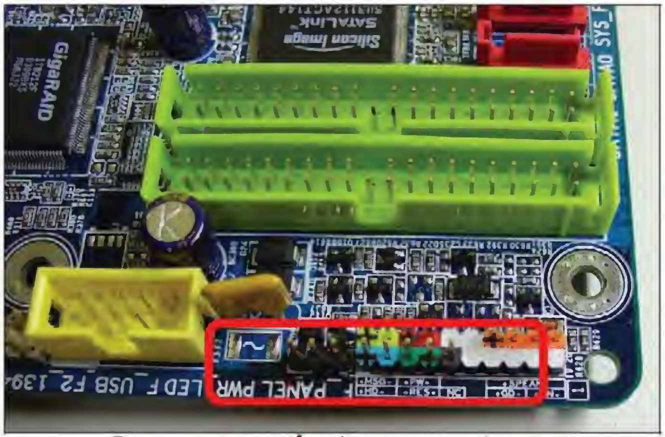

চিত্র-১ : মাদারবোর্ডের ফ্রন্ট প্যানেল কানেক্টরসমূহ

চিত্র-২ : কেসের ফ্রন্ট প্যানেল থেকে আগত তারসমূহ

এখানে যেসব তার বা ওয়্যার রয়েছে সেগুলো হলো :

- রিসেট স্যুইচ (কোনো পোলারিটির প্রয়োজন পড়ে না)
- পাওয়ার স্যুইচ (কোনো পোলারিটির প্রয়োজন পড়ে না), কখনও কখনও স্টান্ডবাই স্যুইচ নামেও ডাকা হয়।
- পাওয়ার এলইডি (পোলারিটির প্রয়োজন পড়ে), অনেক সময় মেসেজ এলইডি নামেও ডাকা হয়।
- এইচডিডি এলইডি (পোলারিটির প্রয়োজন পড়ে)
- স্পিকার (পোলারিটির প্রয়োজন পড়ে)

এই তারগুলোকে মাদারবোর্ডে একই নামের কানেক্টরগুলোতে ইন্সটল করে দিতে হয়। যে সমস্ত তারের ক্ষেত্রে পোলারিটির প্রয়োজন পড়ে সেগুলোকে মাদারবোর্ড হতে দেখে দেখে পজিটিভ (+) ও নেগেটিভ (-) মিলিয়ে দিতে হয়। সাদা (কিংবা কালো) রঙের তারকে বোর্ডে নেগেটিভ (-) হিসেবে চিহ্নিত করা পিনে ইন্সটল করা উচিত। এছাড়াও অনেক সময় কানেক্টরগুলো বিভিন্ন রঙে থাকতে পারে, তবে কানেক্টরগুলোর রঙ কদাচিৎ তারের রঙের সাথে মিলে যেতে পারে। সুতরাং, ফ্রন্ট প্যানেল তারসমূহকে ইন্সটলের জন্য মাদারবোর্ডের কালার স্কিমকে অনুসরণ করা উচিত নয়।

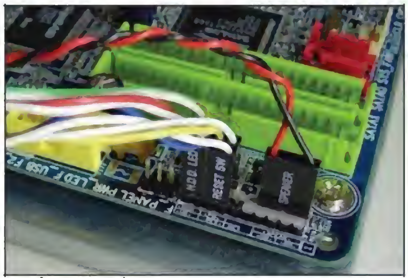

চিত্র-৩ : ফ্রন্ট প্যানেল থেকে আগত তারসমূহ যথাযথভাবে মাদারবোর্ডে ইন্সটল করা হয়েছে

ফ্রন্টাল ইউএসবি (USB) পোর্টসমূহ ইন্সটল করা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের কেসিং এ ফ্রন্টাল ইউএসবি পোর্টসমূহ থাকে। ব্যবহারের জন্য সেগুলোকে কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

চিত্র-১ : ফ্রন্টাল দুইটি ইউএসবি পোর্ট

বর্তমানে মাদারবোর্ডে ৪টি, ৬টি কিংবা ৮টি করে ইউএসবি পোর্ট থাকতে পারে, তবে সাধারণত এদের মধ্যে শুধু ২টি বা ৪টি সরাসরিভাবে মাদারবোর্ডের সাথে ঝালাই করা অবস্থায় থাকে। এই কারণে মাদারবোর্ডে সাধারণত ২টি ইউএসবি পোর্ট অবশিষ্ট থাকে। অবশিষ্ট এই পোর্টগুলো সচরাচর ৯ বা ১০ পিন কানেক্টর রূপে থাকে। এগুলো ঐ কানেক্টরগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে কেসিং এর ফ্রন্ট প্যানেলের ইউএসবি পোর্টগুলোতে ইন্সটল করতে হয়।

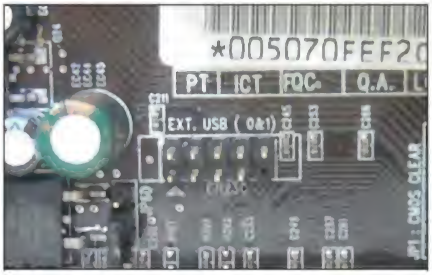

চিত্র : মাদারবোর্ডে ৯-পিনের ইউএসবি হেডার যেখানে ফ্রন্টাল ইউএসবি পোর্টসমূহ ইন্সটল করা উচিত

চিত্র : মাদারবোর্ডে ৯-পিনের ইউএসবি হেডারের আরেকটি উদাহরণ যেখানে ফ্রন্টাল ইউএসবি পোর্টসমূহ ইন্সটল করা উচিত। এক্ষেত্রে মাদারবোর্ডে দুইটি কানেক্টর রয়েছে যাদের মধ্যে কেবল একটি ব্যবহৃত হবে।

এক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের সাথে দেওয়া ম্যানুয়াল দেখে কানেক্টরে ইন্সটল করতে হবে।

চিত্র : কেস এর ফ্রন্টাল ইউএসবি পোর্টসমূহ থেকে আগত তারসমূহ

প্রতিটি ওয়্যার কানেক্টরের উপর থেকে এর অর্থ পড়ে নেওয়া যায় যা +5V (অথবা VCC বা Power), D+, D – এবং GND হতে পারে। এসব অর্থের পাশাপাশি প্রতিটি কানেক্টর হতে এটি কী পোর্ট-১ (কিংবা A বা X) নাকি পোর্ট-২ (কিংবা B বা Y) এর জন্য তা পড়ে নেওয়া যায়। ইন্সটলেশনের আগের প্রথম পদক্ষেপ হলো তারগুলোকে পোর্ট অনুযায়ী পৃথক করে নেওয়া। অর্থাৎ তারগুলোকে পোর্ট-১ ও পোর্ট-২ এই দুইটি গ্রুপে পৃথক করা।

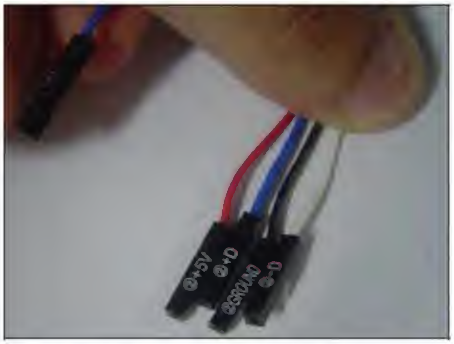

চিত্র : কেস এর দুইটি ইউএসবি ফ্রন্টাল পোর্টের মধ্যে একটির তারসমূহ

মাদারবোর্ডের সাথে দেওয়া ম্যানুয়ালে প্রতিটি কানেক্টর পিনের অর্থ দেওয়া থাকে। ব্যবহারকারীকে ম্যানুয়ালে দেখানো নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি তারকে (+5V, D+, D – এবং GND) সঠিক স্থানে লাগাতে হবে।

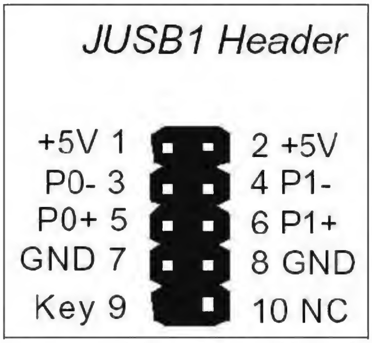

চিত্র-৬ : একটি নমুনা মাদারবোর্ড ম্যানুয়াল হতে ইউএসবি হেডার পিনআউট

ফ্রন্টাল অডিও প্লাগসমূহ ইন্সটল করা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পিউটার কেসের বাইরের দিকে ইউএসবি পোর্টগুলোর সাথেই মাইক্রোফোন (মাইক ইন) এবং লাউড স্পিকারসমূহের (কিংবা এয়ারফোন) প্লাগগুলো অবস্থান করে। বাইরে থেকে খুব সহজেই এগুলোকে ব্যবহার করা যায়। তবে ভেতরের দিক থেকে যদি মাদারবোর্ডে যথাযথভাবে বিভিন্ন প্লাগগুলো যুক্ত না থাকে তবে এগুলো কাজ করবে না। এজন্য মাদারবোর্ডের সাথে সাধারণত একটি ইন্টিগ্রেটেড সাউন্ডকার্ডের (অন্য কথায় অনবোর্ড সাউন্ড) প্রয়োজন হয়।

চিত্র-১ : ফ্রন্টাল ইউএসবি পোর্ট এর সাথে অনবোর্ড অডিও জ্যাকসমূহ

সাউন্ডকার্ডের প্লাগের সাথে ৭টি তারের একটি গ্রুপ থাকে। প্রতিটি তারের শেষ প্রান্তে একটি করে কালো রঙের কানেক্টর থাকে এবং এসব কানেক্টরের গায়ে এদের ফাংশনগুলো পড়ে নেওয়া যায়। এখানে যেসব তার থাকে সেগুলো হলো– Mic-In (or Mic Data), Ret-L, Ret-R, L-Out (or Ear L), R-Out (or Ear R) এবং ২টি Gnd (or Ground)।

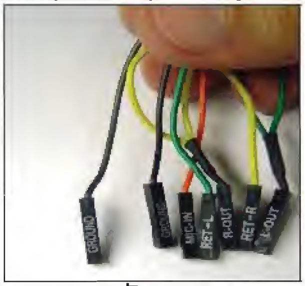

চিত্র-২ : কেসের ফ্রন্টাল প্লাগগুলোর তারসমূহ

খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ করলে দেখা যাবে, Ret-L ও L-Out তারগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। ঠিক একই বিষয় ঘটে Ret-R এবং R-Out তারগুলোর ক্ষেত্রে। ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে এছাড়াও যদি একটি ইনপুট প্লাগ (লাইন ইন) থাকে তবে সেক্ষেত্রে আরও দুইটি তার Line In L এবং Line In R থাকবে।

এ সমস্ত তারগুলোকে মাদারবোর্ডের কোন স্থানে ইন্সটল করতে হবে সেটি আগে থেকেই দেখে নেওয়া প্রয়োজন। এই জায়গাটি Audio, External Audio, Ext Audio, Front Audio, F Audio কিংবা এই ধরনের কোনো নামে থাকবে। এসব পিনগুলোর মধ্যে কয়েকটির সংযোগ তৈরিতে জায়গাটি একটি ৯-পিন কনেক্টর নিয়ে গঠিত এবং সেখানে ২টি জাম্পার ইন্সটল করা থাকে। এই কানেক্টরের প্রকৃত অবস্থান নির্ভর করে মাদারবোর্ডেও মডেলের উপর এবং প্রকৃত অবস্থান খুঁজে বের করতে অনেক সময় মাদারবোর্ডের ম্যানুয়ালের প্রয়োজন পড়তে পারে।

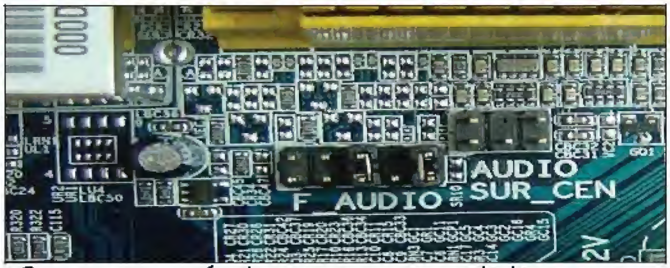

চিত্র-৩ : মাদারবোর্ডের এই স্থানে কেস ওয়্যারগুলো ইন্সটল করতে হবে

তারগুলোকে ইন্সটল করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো মাদারবোর্ড কানেক্টরের পিন নাম্বারিং সিস্টেমটিকে বুঝা। কানেক্টরে ৯টি পিন থাকে তবে কানেক্টরটিকে একটি ১০-পিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়; কারণ এদের মধ্যে একটি পিনকে (পিন-৮) অপসারণ করা হয়েছে। জাম্পারগুলো পিন-৫ ও পিন-৬ এবং পিন-৯ ও পিন-১০ কে যুক্ত করে। যেহেতু এখানে একটি পিন (পিন-৮) ছাড়াই স্থান রয়েছে সেহেতু অন্যান্য পিনগুলোর নাম্বারিংটিকে আবিষ্কার করে নেওয়া খুব সহজ। লক্ষ রাখতে হবে, পিনগুলো এক পাশ হতে বিজোড়ভাবে (১ থেকে ৯) এবং অন্য পাশ থেকে জোড়ভাবে (২ থেকে ১০) থাকে।

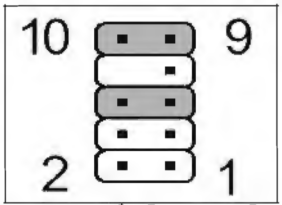

চিত্র-৪ : মাদারবোর্ড অডিও হেডার পিনআউট

জাম্পারগুলো অপসারণ করতে হবে। তারসমূহের সংযোগটিকে অবশ্যই এরকম করে করতে হবে- Mic-In কে পিন-১; Gnd কে পিন-২ এবং পিন-৩; R-Out কে পিন-৫; Ret-R কে পিন-৬; L-Out কে পিন-৯ এবং Ret-L কে পিন-১০।

৩.৪ সকল ডিভাইস কেসিং এ সেট করার পর কেসিং কভার লাগানো

কম্পিউটার কেস খোলা বা লাগানোর কাজটি খুবই সহজ। যদিও অনেকেই এটিকে জটিল মনে করে থাকে। প্রতিটি কম্পিউটার কেসের পেছনের দিকে সাধারণত কিছু স্ক্রু দিয়ে এক পাশের ঢাকনা লাগনো থাকে। এসব স্ক্রু খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন স্ক্রু ড্রাইভারটি যেন ভালো মানের হয়। বাজার থেকে ভালো মানের যেসব উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। সেগুলো হলো :

১. ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার বা নাট ড্রাইভার
২. ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার

কম্পিউটার কেস এর কভার লাগানো

কম্পিউটারের কেসিংয়ে যাবতীয় ডিভাইসগুলো সেট করার পর এর ঢাকনা বা কভারটি অবশ্যই লাগিয়ে দিতে হবে। এর আগে আরেকবার দেখে নিতে হবে সবকিছু যথাযথভাবে যুক্ত রয়েছে কীনা। কোনো ভুল হলে তা ঠিক করে নিতে হবে।

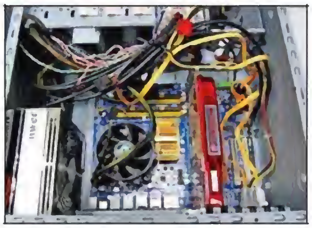

এ সময় ক্যাবলগুলো এলোমেলো থাকবে। এসব ক্যাবল যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সবগুলো ক্যাবলকে ধরে প্লাস্টিকের কোনো তার বা প্লাস্টিক জাতীয় কিছু দিয়ে এগুলোকে একত্রে বেঁধে দিতে হবে। এতে ক্যাবলগুলো গুছানো অবস্থায় থাকবে। এরপর উপরের ঢাকনাটি লাগিয় দিতে হবে। যেসব ক্যাসিংয়ে স্ক্রু লাগানেরা ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে স্ক্রু লাগাতে হবে আবার যেখানে ক্লিপ জাতীয় ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে তা ক্লিপের মাধ্যমে লাগিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্নমালা—৩

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কেসিং কী?
২. আইডিই প্যারালাল এটিএ ও সাটা হার্ডডিস্ক এর ক্যাবল ও কানেকটর কয় পিনের?
৩. SATA ড্রাইভগুলো সাধারণ ট্রান্সফার রেট কত?
৪. একটি SCSI ক্যাবলে সর্বোচ্চ কয়টি ড্রাইভ সংযুক্ত করা যায়?
৫. আইডিই ডিভাইসের মাস্টার—স্লেভ বলতে কী বুঝায়?
৬. মাউস ও কীবোর্ড সচরাচর কোন পোর্টে সংযোগ করা হয়।
৭. কম্পিউটার কেসিং খোলা বা লাগানোর জন্য কোন ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার বেশি উপযোগী?
৮. আরজে—৪৫ কানেকটর কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
৯. পূর্ণরূপ লেখ : PATA, IDE, SATA, SCSI, WWN, SAS।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কেসিং ও মাদারবোর্ডে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকার ডিভাইস, কার্ড ও পেরিফেরালস এর একটি তালিকা তৈরি কর।
২. হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সাধারণত কয় প্রকার ও কী কী?
৩. আইডিই বা পাটা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৪. সাটা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৫. স্ক্যাজি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৬. সাটা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৭. কেসিংয়ে সিডি/ডিভিডি-রম ড্রাইভ সংযোজনের ধাপসমূহ লেখ।
৮. সিরিয়াল ও প্যারালাল পোর্টের কাজ কী?
৯. মাদারবোর্ডে পাওয়ার কানেক্টর সংযোজন প্রক্রিয়া লেখ।
১০. মাদারবোর্ডের সাথে মনিটরের সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১১. সাউন্ড কার্ডের পোর্টগুলোর সংযোগ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
১২. কেসিং কভার লাগানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. কেসিংয়ে হার্ডডিস্ক ড্রাইভ সংযোজনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. কেসিং ও মাদারবোর্ডে পেরিফেরালস সংযুক্তির জন্য বহিঃস্থ কানেকটরসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।

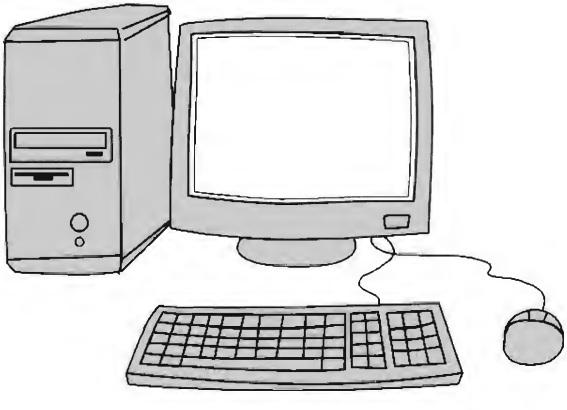

অধ্যায়-৪
কম্পিউটারের বায়োস (BIOS) কনফিগারেশন

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

৪.১. বায়োসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানব।
৪.২. বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড ও এডভান্স ফিচারসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারব।
৪.৩. কম্পিউটার এর পাওয়ার সুইচ চালু (ON) করে বায়োসে প্রবেশ করতে পারব।
৪.৪. বায়োসে সময়, তারিখ, সেট করতে পারব।
৪.৫. এডভান্স সেটআপ এ গিয়ে বুট সিকুয়েন্স ঠিক করতে পারব।
৪.৬. সেটআপ ও আপরেটিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড প্রয়োগ ও অপসারণ করতে পারব।

৪.১ বায়োসের (BIOS) উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

BIOS এর পূর্ণনাম Basic Input Output System। এটি এক ধরনের চিপ, যেখানে কিছু বিশেষ নির্দেশ বা প্রোগ্রাম সংরক্ষিত থাকে। BIOS এ কিছু রুটিন প্রোগ্রাম বিল্টইন থাকে। তাছাড়া BIOS এ সিস্টেম সেটআপ ইউটিলিটি প্রোগ্রামও সংরক্ষিত থাকে। বায়োস এর ভেতরেই কম্পিউটার চালু হওয়ার সব তথ্য বিস্তারিত থাকে। কম্পিউটারের পাওয়ার অন করার পর তা কাজের উপযোগী হওয়া পর্যন্ত কম্পিউটারের ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস এবং সব অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ঠিক আছে কী না এই চিপের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। কম্পিউটার কাজের উপযোগী হওয়ার আগ পর্যন্ত সেলফ পাওয়ার টেস্টের দায়িত্বটুকু পালন করে বায়োস। বায়োস মূলত একটি পিসি বুট ফার্মওয়্যার প্রোগ্রাম। যখন একটি পিসি অন করা হয়, বায়োস তখন প্রথমে পিসিতে সংযুক্ত প্রধান বা মৌলিক হার্ডওয়্যারগুলো পরীক্ষা করে, যাকে বলে পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট (POST) এবং এটি নির্ধারণ করে যে উপস্থিত হার্ডওয়্যারগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে। তারপর এটি কম্পিউটারের র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরিতে (RAM) -অপারেটিং সিস্টেম লোড করে। কম্পিউটার অন হওয়ার পর বায়োস হার্ডওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

বাজারে সাধারণত তিনটি কোম্পানির BIOS ব্যবহৃত হয়। যথা :

১. Phonix Technologics Ltd. এর Phonix BIOS
২. American Megatrends Inc. এর AMI BIOS
৩. AWARD SOFTWARE Inc. এর AWARD BIOS

সাধারণত AWARD এবং AMI BIOS ক্লোন পিসিতে ব্যবহার করা হয়। Phonix BIOS ব্র্যান্ড পিসিতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া কোনো কোনো ব্রান্ড পিসি তাদের নিজস্ব নামের BIOS ব্যবহার করে থাকে। যেমন– IBM BIOS, Compaq BIOS ইত্যাদি। সাধারণ AWARD এবং AMI BIOS এর বেলায় Del কী চেপে সেটআপ ইউটিলিটি রান করতে হয়। আবার, Phonix BIOS এর বেলায় Ctrl + Alt + Esc কী বা Ctrl + Alt + Enter কী চেপে সেটআপ ইউটিলিটি (Run) করানো হয়।

বায়োস সেটআপের গুরুত্ব

BIOS ROM এ একটি বিল্টইন সেটআপ প্রোগ্রাম থাকে যার মাধ্যমে ইউজার তার সিস্টেম-এর বেসিক কনফিগারেশন ইনফরমেশনগুলো মডিফাই বা পরিবর্তন করতে পারে। এই হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন ইনফরমেশনগুলোকে CMOS র‍্যাম-এ সংরক্ষিত করে রাখে। কম্পিউটারের পাওয়ার অফ অবস্থায় একটি রিচার্জেবল ব্যাটারির মাধ্যমে এই CMOS র‍্যামকে পাওয়ার সরবরাহ করে। কম্পিউটার বুটআপ-এর সময় BIOS এই ইনফরমেশনগুলোকে পড়ে নেয়।

৪.২ বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড ও এডভান্স ফিচারসমূহ

আমরা এবার বায়োস এর স্ট্যান্ডার্ড ও এডভান্স ফিচার সম্পর্কে জানবো। এক্ষেত্রে AWARD বায়োসের যে ভার্সনটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি হলো ৬.০০পিজি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে যে বায়োস প্রোগ্রামটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার সাথে এর হুবহু মিল নাও থাকতে পারে। কারণ বিভিন্ন ভার্সনে এর ফিচারের ভিন্নতা দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মিল পাওয়া যাবে।

প্রধান বায়োস মেনু (Main BIOS Menu)

কম্পিউটার চালু করলে স্ক্রিনের উপরে AWARD Modular BIOS v6.00pg দেখার সাথে সাথে কীবোর্ড থেকে Delete কী চাপতে হবে। CMOS Setup Utility এর প্রধান বায়োস মেনুর স্ক্রিনটি দেখতে পাওয়া যাবে।

স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচার (Standard CMOS Features)

বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচার অপশনটি নির্বাচন করলে এর অধীন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অপশনসমূহ প্রদর্শিত হবে। কম্পিউটারের সাথে একাধিক হার্ডডিস্ক থাকলে কোনটিকে মাস্টার এবং কোনটিকে স্লেভ হিসাবে নির্ধারণ করা হবে তা নির্বাচন করা যায়। কম্পিউটার বুটাবল করতে কোন ড্রাইভ থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা হবে তা ও এখানে নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ভার্সনের বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচারসমূহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে কয়েক ধরনের বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচার দেখানো হয়েছে।

প্রধান বায়োস মেনু

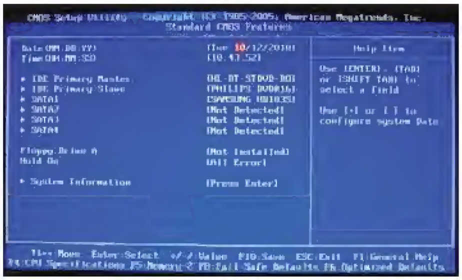

স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচারসমূহ

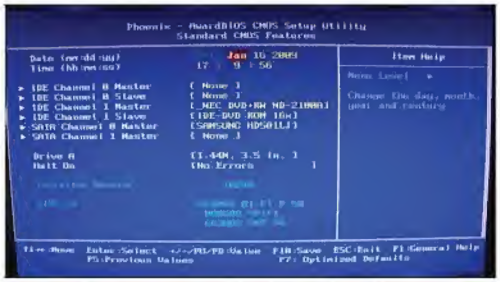

অ্যাওয়ার্ড বায়োস এর একটি ভার্সনে স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচারসমূহ

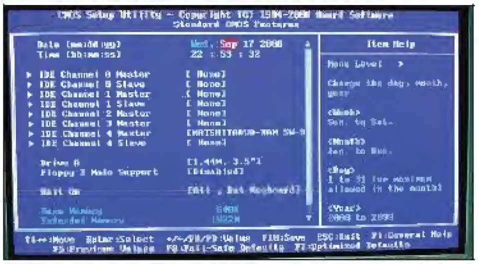

অ্যাওয়ার্ড বায়োস আরেকটি ভিন্ন ভার্সনে স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচারসমূহ

বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচারগুলোর মধ্যে সাধারণত যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হলো :

- Date (Moth/Day/Year)
- Time (Hour : Minute : Second)
- IDE Channel Master, IDE Channel Slave
- IDE Channel Master
- IDE Channel Slave
- SATA Channel Master
- SATA Channel Master
- Video
- Halt On
- Installed Memory
- Base Memory
- Extended Memory
- Total Memory
- BIOS ID প্রভৃতি।

IDE Channel এর Master কিংবা Slave এর সংখ্যা পাশেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন বায়োসে (ভার্সন ভেদে) IDE Channel এর আইটেম কম বা বেশি হতে পারে। এছাড়া অন্যান্য আইটেমও থাকতে পারে।

অ্যাডভান্সড বায়োস ফিচার (Advanced BIOS Features)

বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ভার্সনের বায়োসের এডভান্সড বায়োস ফিচারসমূহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে কয়েক ধরনের বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড সিমস ফিচার দেখানো হয়েছে।

অ্যাডভান্সড বায়োস ফিচারগুলোর মধ্যে যেগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে সেগুলো হলো—

- Hard Disk Boot Priority
- First Boot Device
- Second Boot Device
- Third Boot Device
- Password Check
- HDD S.M.A.R.T Capability
- CPU Multi–Threading
- Limit CPUID Max. to 3
- No-Execute Memory Protect
- CPU Enhanced Halt (C1E)
- CPU Thermal Monitor 2(TN2)
- CPU EIST Function
- Virtualization Technology
- Delay For HDD (Secs)
- Full Screen LOGO Show
- Init Display First
- BIOS Write Protect
- PS/2 Mouse Function Control
- PCI/VGA Palette Snoop প্রভৃতি।

৪.৩ কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করে বায়োসে প্রবেশ করা

কম্পিউটারের বায়োসে প্রবেশ করতে হলে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. প্রথমে ভালো করে দেখে নিতে হবে কম্পিউটারটিতে বিদ্যুতের সংযোগ আছে কীনা। না থাকলে বিদ্যুতের সংযোগ প্রদান করতে হবে।

২. এবার কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচটি চাপতে হবে। ফলে কম্পিউটারটি চালু হবে। এই অবস্থায় কম্পিউটারের পর্দায় কিছু টেক্সট প্রদর্শিত হবে। এটিকে বুট স্ক্রিন বলে। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির মাদারবোর্ডে এসব টেক্সট তথা বুট স্ক্রিন ভিন্ন ভিন্ন আসতে পারে। তবে তাদের মূল বিষয়বস্তু একই ধরনের হয়ে থাকে।

বায়োস কনফিগারেশন মেনু

৩. বুট স্ক্রিনটি প্রদর্শিত হলে দেরি না করে তৎক্ষণাৎ কীবোর্ড থেকে DEL কী চাপতে হবে (কোন কী চাপতে হবে সেটি নির্ভর করে মাদারবোর্ডের বায়োসের উপর। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই DEL কী চাপতে হয়)।

৪. একটু পরেই স্ক্রিনে বায়োস কনফিগারেশন মেনু প্রদর্শিত হবে।

৫. এর মাধ্যমেই বায়োসে প্রবেশ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এরপর এখান থেকে বিভিন্ন বিষয় সেট করা যাবে।

৪.৪ বায়োসে সময়, তারিখ সেট করা

বায়োসে সময় ও তারিখ সেট করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে :

১. প্রথমে কম্পিউটার চালু করার পর আগত বুট স্ক্রিনে DEL কী চাপতে হবে।

২. বায়োস কনফিগার মেনুতে প্রবেশ করবে।

৩. এখান থেকে Standard CMOS Features নির্বাচন করতে হবে।

৪. স্ক্রিনে Standard CMOS Features ফিচারগুলো প্রদর্শিত হবে।

৫. এসব ফিচারের একেবারে শুরুতেই Date (mm/dd/yy) এবং Time (hh/mm/ss) এর অপশন দুইটি পাওয়া যাবে।

৬. প্রথমে Date (mm/dd/yy) অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। ফলে এটি কার্যকরী হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে আপ, ডাউন, লেফট ও রাইট অ্যারো চেপে উপরে-নিচে-ডানে বামে যাওয়া যাবে। Date এর মাস, দিন ও বছরের ঘরগুলোতে এসব কী এর সাহায্যে গিয়ে সেখানে বর্তমান তারিখ লিখে দিতে হবে।

৭. এরপর Time (hh/mm/ss) অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে এবং উপরের মতো একই উপায়ে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ড এর ঘরগুলোতে বর্তমান সময় লিখে দিতে হবে।

৮. এবার এইমাত্র করা পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য কীবোর্ড থেকে F10 কী চাপতে হবে। সেভ করে বেরিয়ে যেতে চাই কীনা সেই বার্তা প্রদর্শিত হবে।

৯. এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে Y কী চাপতে হবে। তাহলে পরিবর্তনগুলো বায়োসে সেভ হয়ে যাবে এবং বায়েসের কনফিগার মেনু থেকে বেরিয়ে যাবে।

৪.৫ এডভান্স সেটআপ এ গিয়ে বুট সিকোয়েন্স ঠিক করা

কম্পিউটারকে সুইচ টিপে চালু করার পর অপারেটিং সিস্টেমে প্রবেশের জন্য বুট হবার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে কম্পিউটার সাধারণত প্রথমে হার্ডডিস্ক হতে বুট হবার চেষ্টা করে। বায়োসে বুট সিকোয়েন্সে ফার্স্ট বুট ডিভাইস হিসেবে হার্ডডিস্ক নির্ধারণ করা থাকলেই কেবল তা হার্ডডিস্ক থেকে বুট হবে। নতুবা অন্য যেকোনো ড্রাইভ যেমন— সিডি—রম/ডিভিডি—রম ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভ প্রভৃতি থেকে বুট হবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ কম্পিউটার ফার্স্ট বুট ডিভাইস থেকে বুট হতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে সে সেকেন্ড বুট ডিভাসই বা থার্ড বুট ডিভাইস ইত্যাদি ক্রম অনুযায়ী বুট হবার চেষ্টা করে। এ কারণে কম্পিউটারে বুট সিকোয়েন্স ঠিক করে দেওয়া প্রয়োজন। এটি করতে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

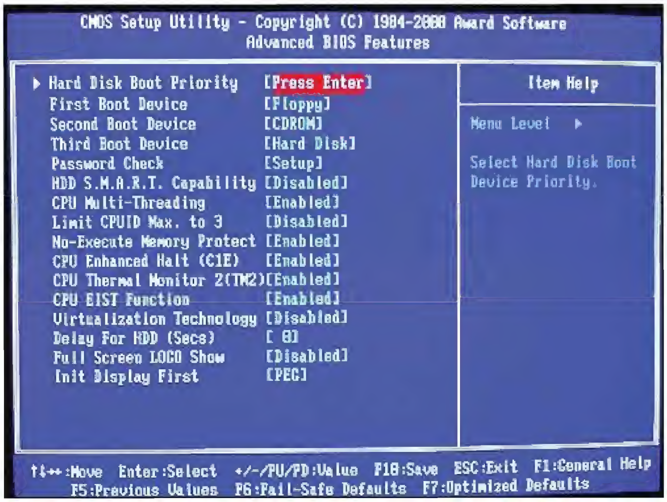

১. প্রথমে কম্পিউটার চালু করার পর আগত বুট স্ক্রিনে DEL কী চাপতে হবে।

২. বায়োস কনফিগার মেনুতে প্রবেশ করতে হবে।

৩. এখান থেকে Advanced BIOS Features নির্বাচন করতে হবে।

৪. স্ক্রিনে Advanced BIOS Features ফিচারগুলো প্রদর্শিত হবে।

৫. এখানে First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device ইত্যাদি অপশনগুলো পাওয়া যাবে।

৬. যে ডিভাইসটিকে যে ধরনের বুট সিকুয়েন্সে রাখতে চাই সেই অপশনটি সিলেক্ট করে হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক বা সিডি-রম/ডিভিডি-রম সিলেক্ট করে দিতে হবে।

৭. এরপর পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য কীবোর্ড থেকে F10 কী চাপতে হবে। সেভ করে বেরিয়ে যেতে চাই কীনা সেই বার্তা প্রদর্শিত হবে।

৮. এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে Y কী চাপতে হবে। তাহলে পরিবর্তনগুলো বায়োসে সেভ হয়ে যাবে এবং বায়েসের কনফিগার মেনু থেকে বেরিয়ে যাবে।

৯. মনে রাখতে হবে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করতে চাইলে First Boot Device হিসেবে সিডি-রম/ডিভিডি-রম ড্রাইভ সিলেক্ট করতে হবে। আর অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল হয়ে গেলে পরবর্তীতে First Boot Device হিসেবে হার্ডডিস্ককে সিলেক্ট করে দিতে হবে। নতুবা প্রথমে কোনো সিডি/ডিভিডি পেলে কম্পিউটারটি সেখান থেকে বুট হাবার চেষ্টা করবে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে হার্ডডিস্ক থেকে বুট হবে। এতে কম্পিউটার চালু হতে প্রচুর সময় ব্যয় হবে। বিষয়টি বেশ বিরক্তিকরও।

৪.৬ সেটআপ ও অপারেটিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড প্রয়োগ ও অপসারণ করা

বায়োস সেটআপ সিস্টেমে পাসওয়ার্ড প্রয়োগ

কম্পিউটারের বায়োসে পাসওয়ার্ড প্রদান করে এটিকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা যায়। অননুমোদিত ব্যক্তি যেন কোনো ব্যবহারকারীর কম্পিউটারের বায়োস সেটআপে কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে না পারে সেজন্য বায়োসে পাওয়ার্ড প্রদান করা জরুরি। এটি করতে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. প্রথমে কম্পিউটার চালু করার পর আগত বুট স্ক্রিনে DEL কী চাপতে হবে।
২. সিমস সেটআপ ইউটিলিটিতে প্রবেশ করবে। এখানে মেনু আকারে অনেকগুলো অপশন পাওয়া যাবে। এর মধ্যে Set Supervisor Password এবং Set User Password নামে দুইটি অপশন রয়েছে।
৩. সুপারভাইজার পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে দুই-একটি বিষয় ছাড়া পুরো বায়োসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সুরক্ষিত রাখা যাবে। অন্যদিকে ইউজার পাসওয়ার্ড প্রদান করলে পরবর্তীতে কেবল দুই একটি কাজ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করা যায় না।
৪. এখান থেকে Set Supervisor Password নির্বাচন করতে হবে।
৫. Enter Password নামে একটি বক্স দেখা যাবে। সেখানে কাঙ্ক্ষিত পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে।

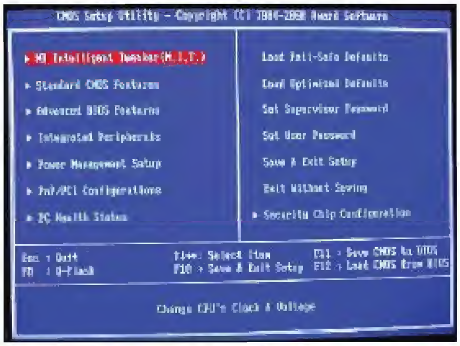

৬. এন্টার চাপতে হবে। ফলে পুনরায় ওই পাসওয়ার্ডটিই আবার প্রদান করতে হবে।
৭. এবার Set User Password নির্বাচন করতে হবে। পুনরায় Enter Password নামে একটি বক্স দেখা যাবে। এখানে উপরের মতো একইভাবে দুইবার পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে।

৮. এরপর পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য কীবোর্ড থেকে F10 কী চাপতে হবে। সেভ করে বেরিয়ে যেতে চাই কীনা সেই বার্তা প্রদর্শিত হবে।
৯. এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে Y কী চাপতে হবে। তাহলে পরিবর্তনটি বায়োসে সেভ হয়ে যাবে এবং বায়েসের কনফিগার মেনু থেকে বেরিয়ে যাবে।

বায়োস সেটআপ সিস্টেমে প্রদানকৃত পাসওয়ার্ড অপসারণ

বায়োসে প্রদানকৃত Supervisor এবং User Password অপসারণ করতে চাইলে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. প্রথমে কম্পিউটার চালু করার পর আগত বুট স্ক্রিনে DEL কী চাপতে হবে।
২. বায়োসে ঢুকার জন্য পাসওয়ার্ড চাইবে। এখানে Supervisor পাসওয়ার্ডটি প্রদান করতে হবে।
৩. সিমস সেটআপ ইউটিলিটিতে প্রবেশ করবে। এখানে মেনু আকারে অনেকগুলো অপশন পাওয়া যাবে। এর মধ্যে Set Supervisor Password এবং Set User Password নামে দুইটি অপশন পাওয়া যাবে।
৪. প্রথমে Set Supervisor Password নির্বাচন করতে হবে।

৫. Enter Password নামে একটি বক্স দেখা যাবে। এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে Esc কী চাপতে হবে। নিচের মতো বার্তা প্রদর্শিত হবে।

```
PASSWORD DISABLED!!!
Press any key to Continue…
```

৬. এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে যেকোনো কী চাপতে হবে। তাহলে পাসওয়ার্ডটি ডিজ্যাবল হয়ে যাবে।

৭. এবার Set User Password নির্বাচন করতে হবে। একই পদ্ধতিতে এখান থেকেও পাসওয়ার্ড অপসারণ করতে হবে।

৮. এরপর পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য কীবোর্ড থেকে F10 কী চাপতে হবে। সেভ করে বেরিয়ে যেতে চাই কীনা সেই বার্তা প্রদর্শিত হবে।

৯. এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে Y কী চাপতে হবে। তাহলে পরিবর্তনটি বায়োসে সেভ হয়ে যাবে এবং বায়েসের কনফিগার মেনু থেকে বেরিয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা—৪

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বায়োস কী?
২. দুইটি বায়োস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।
৩. BIOS এর পূর্ণ নাম লেখ।
৪. বায়োস এর কাজ কী?
৫. বুট সিকোয়েন্স বলতে কী বোঝায়?
৬. কম্পিউটারে সময় ও তারিখসহ অন্যান্য সেটিং ধরে রাখার জন্য কোন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়?
৭. বায়োস এ প্রবেশ করার জন্য সাধারণত কোন কী চাপতে হয়?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বায়োস সেটআপের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
২. বায়োসের স্ট্যান্ডার্ড ও এডভান্স ফিচার কী কী?
৩. বায়োসে সময় ও তারিখ সেট করার পদ্ধতি লেখ।
৪. বায়োস এ প্রবেশ করার প্রক্রিয়া লেখ।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. বায়োসে এ বুট সিকুয়েন্স নির্ধারণ করার ধাপসমূহ লেখ।
২. বায়োস সেটআপ ও অপারেটিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড প্রয়োগ ও অপসারণের প্রক্রিয়া লেখ

অধ্যায়-৫
কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

৫.১. বিভিন্ন প্রকার অপারেটিং সিস্টেমের নাম উল্লেখ করতে পারব।
৫.২. উইন্ডোজ ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা ও তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যক্ত করতে পারব।
৫.৩. "সিডি কী/সিরিয়াল কী" কী তা চিহ্নিত করতে পারব।
৫.৪. সিডি রম ড্রাইভ থেকে কম্পিউটারকে বুট করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারব।
৫.৫. হার্ডডিস্কে প্রয়োজনীয় পার্টিশন সম্পাদন করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারব।
৫.৬. বিভিন্ন প্রকার ফাইল সিস্টেমের নাম উল্লেখ করতে পারব।
৫.৭. পার্টিশনকৃত ড্রাইভকে নির্ধারিত ফাইল সিস্টেমে ফরমেট করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারব।
৫.৮. নির্দিষ্ট ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার ধাপসমূহ ব্যক্ত করতে পারব।

৫.১ অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন এক ধরনের সিস্টেম প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত সকল প্রকার রিসোর্সকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। অপারেটিং সিস্টেমের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে রিসোর্স ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা। মূল লক্ষ্য হলো প্রসেসর ব্যবস্থাপনা, মেমরি ব্যবস্থাপনা, ফাইল ব্যবস্থাপনা, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা, ডাটার নিরাপত্তা বিধান করা।

অর্থাৎ, "যে সফটওয়্যার কম্পিউটার প্রোগ্রামের কার্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং শিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট নিয়ন্ত্রণ, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, তথ্যাবলি সংরক্ষণ কার্যক্রম, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক কাজসমূহ করতে পারে তাকে অপারেটিং সিস্টেম বলে।"

কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অপারেটিং সিস্টেম ধারাবাহিকভাবে কাজ করে থাকে। এই কাজগুলো করার জন্য অপারেটিং সিস্টেমের ভেতরে বিভিন্ন সাব সিস্টেম আছে তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম আছে। অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো–

১. কম্পিউটার চালু ও পরিচালনা করা।
২. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।
৩. ইনপুট/আউটপুট অপারেশন।
৪. ফাইল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ।
৫. কার্যাবস্থায় সমস্যার রিপোর্ট করা ও সমাধান দেওয়া।
৬. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।
৭. একাউন্টিং।
৮. তত্ত্বাবধান।
৯. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১০. নেটওয়ার্কিং।

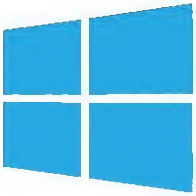

চিত্র : Windows 8

চিত্র : Macintos

চিত্র : Linus

অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ

ইউজার ইন্টারফেস, ব্যবহারকারীর সংখ্যা, ব্যবহৃত প্রসেসরের সংখ্যা, প্রোগ্রামের মালিকানা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

ইউজার ইন্টারফেস অনুসারে প্রকারভেদ

১. টেক্সট ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Text Based Interface)
২. চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Graphical User Interface)

ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে প্রকারভেদ

১. সিঙ্গেল ইউজার অপারেটিং সিস্টেম (Single User Operating System)
২. মাল্টি ইউজার অপারেটিং সিস্টেম (Multi User Operating System)

প্রসেসরের সংখ্যা অনুসারে প্রকারভেদ

১. সিঙ্গেল প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম (Single Processing Operating System)
২. মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম (Multi Processing Operating System)

মালিকানা বা স্বত্ব অনুসারে প্রকারভেদ

১. ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম (Open Source Operating System)
২. প্রোপ্রাইয়েটরি অপারেটিং সিস্টেম (Proprietory Operating System)

টেক্সট ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Text Based Interface)

কম্পিউটার পরিচালনার জন্য পূর্বে টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হতো। টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কমান্ডসমূহ কমান্ড প্রম্পটে এর গঠন অনুযায়ী লিখে প্রয়োগ করা হতো। কমান্ডসমূহ গঠনের উপাদান ছিল কোন বর্ণ, শব্দ, সংখ্যা, প্রতীক ইত্যাদি। কমান্ড সিন্ট্যাক্স অনুযায়ী টাইপ করে এবং কী-বোর্ড থেকে বোতাম চাপ দিয়ে কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করতে গেলে ব্যবহারকারীকে আগে থেকে কমান্ড জানা থাকতে হবে এবং সিন্টেক্স অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে হবে। DOS বা UNIX টেক্সটভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ।

চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Graphical User Interface)

গ্রাফিক্স বা চিত্রের মাধ্যমে কমান্ড প্রয়োগ করে কম্পিউটার পরিচালনা করা গেলে তাকে চিত্রভিত্তিক ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম বলে। চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দেশের গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা (আইকন) এবং পুল ডাউন মেনু থাকে। মাউস বা কীবোর্ড ব্যবহার করে কমান্ড প্রয়োগ করা যায়। উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ৭, উইন্ডোজ ৮, উইন্ডোজ ১০, ম্যাক ওএস এক্স, উবুন্টু, লিনাক্স মিন্ট ইত্যাদি চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদারহণ।

পার্সোনাল কম্পিউটারের অধিক ব্যবহৃত সাধারণ অপারেটিং সিস্টেমসমূহ

বর্তমান সময়ে পার্সোনাল কম্পিউটারগুলোতে সাধারণ যেসব অপারেটিং সিস্টেমসমূহ বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো–

- **মাইক্রোসফট উইন্ডোজ (Microsoft Windows) :** Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016 প্রভৃতি।
- **অ্যাপল ম্যাক ওএস এক্স (Apple Mac OS X) :** OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, OS X 10.11 প্রভৃতি।
- **লিনাক্স (Linux) :** Ubuntu, Linux Mint, Debian, CentOS/Red Hat Enterprise Linux, Mageia/Mandriva, Fedora, openSUSE, PCLinuxOS, Manjaro, Arch, Puppy প্রভৃতি।

৫.২ উইন্ডোজ ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা ও তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ

মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ এবং ওপেনসোর্সভিত্তিক লিনাক্স দুটোই বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম। যদিও বিশ্বজুড়ে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহারকারীর সংখ্যাই বেশি। সেই তুলনায় লিনাক্স বেশ পিছিয়ে। তবে কিছু অতুলনীয় সুবিধার কারণে ধীরে ধীরে লিনাক্স-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ঈর্ষণীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লিনাক্সের প্রতি সবার আগ্রহও দিনে দিনে বাড়ছে। নিচে এই দুইটি অপারেটিং সিস্টেমের কিছু সুবিধা ও তুলানামূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

বিষয়	উইন্ডোজ	লিনাক্স
মূল্য	মাইক্রোসফট উইন্ডোজের মূল্য লিনাক্সের চাইতে অনেক বেশি। প্রতিটি লাইসেন্স কপির মূল্য কয়েকশ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।	লিনাক্সের রয়েছে বিভিন্ন সংস্করণ যেগুলোর বেশিরভাগই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংস্করণ কিনে ব্যবহার করতে হয় তবে তার মূল্য মাইক্রোসফটের উইন্ডোজের চাইতে খুবই কম।
সহজে ব্যবহার	মাইাক্রোসফট তার অপারেটিং সিস্টেমকে ব্যবহারকারীদের কাছে সহজ করার জন্য এগুলোকে বেশ কিছু উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধন করেছে। তারপরও এটি লিনাক্সের চাইতে ব্যবহার করা সহজ হলেও সবচাইতে সহজ তা বলা যাবে না।	যদিও লিনাক্সের অধিকাংশ সংস্করণই বেশ উন্নত হওয়ায় ব্যবহার করা সহজ। তারপরও নতুন কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে উইন্ডোজকে যথেষ্ট সহজ মনে হবে।
নির্ভরযোগ্যতা	যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে নিজ অপারেটিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিতে মাইক্রোসফট বেশ উন্নতি করেছে তারপরও এটি লিনাক্সের মতো ততটা নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি।	লিনাক্সের বেশিরভাগ সংস্করণই তুলনামূলকভাবে বেশি নির্ভরযোগ্য। এগুলো মাসের পর মাস এমনকি কয়েক বছর চললেও রিবুট করার প্রয়োজন হয় না।
সফটওয়্যার	মাইক্রোসফট উইন্ডোজের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এর সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি ও গেমসের পরিমাণও অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের চাইতে বেশি।	লিনাক্সের রয়েছে বিশাল পরিমাণের ও ধরনের সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি এবং গেমসের সমাহার। তবে উইন্ডোজের এই সম্ভারের পরিমাণ লিনাক্সের চাইতেও বেশি।
সফটওয়্যার মূল্য	যদিও উইন্ডোজের ফ্রি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি এবং গেমস রয়েছে তবে তাদের পরিমাণ খুবই কম। অধিকাংশ প্রোগ্রামের প্রতি কপির মূল্য ২০ ডলার থেকে শুরু করে ২০০ ডলারের চাইতেও বেশি।	লিনাক্সের বেশিরভাগ সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি এবং গেমসগুলো ফ্রিওয়্যার কিংবা ওপেনসোর্স ধরনের। এমনটি জিম্প, ওপেনঅফিস, স্টারঅফিস এবং ওয়াইনের মতো জটিল সব প্রোগ্রামগুলোও হয় বিনামূল্যে নয়তো নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়।
হার্ডওয়্যার	মাইক্রোসফট উইন্ডোজের বিশাল সংখ্যক ইউজার এবং প্রচুর ড্রাইভারের সাপোর্ট থাকায় হার্ডওয়্যার ডিভাইসের ক্ষেত্রে আরও বেশি সাপোর্ট পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ হার্ডওয়্যার উৎপাদকরা তাদের পণ্যকে মাইক্রোসফট	লিনাক্সের কোম্পানিগুলো এবং হার্ডওয়্যার উৎপাদকেরা সকলেই লিনাক্সের জন্য হার্ডওয়্যার সাপোর্টের ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধন করেছে এবং আজ অধিকাংশ হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলোই লিনাক্সকে সমর্থন করে। যদিও

বিষয়	উইন্ডোজ	লিনাক্স
	উইন্ডোজের উপযোগি করেই তৈরি করে থাকে।	অনেক কোম্পানি এখনও লিনাক্সে তাদের হার্ডওয়্যারের জন্য ড্রাইভার বা সাপোর্ট প্রদান করছে না।
নিরাপত্তা	বিগত কয়েক বছর ধরে মাইক্রোসফট তার অপারেটিং সিস্টেমের নিরাপত্তার দিকটিকে আরও বেশি শক্তিশালী করলেও কম্পিউটার ভাইরাস ও অন্যান্য ধরনের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুই থাকে এই অপারেটিং সিস্টেম। তাই নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করলে এতে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।	লিনাক্স সবসময়েই একটি নিরাপদ অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে পরিগণিত। তুলনামূলকভাবে এতে উইন্ডোজের চাইতে হ্যাকিং বা অন্যান্য সাইবার আক্রমণের পরিমাণ কম। তাই এটি অনেক বেশি নিরাপদ।
ওপেন সোর্স	মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ওপেন সোর্স নয় এবং উইন্ডোজের অধিকাংশ প্রোগ্রামও ওপেন সোর্স নয়।	লিনাক্সের অধিকাংশ ধরন এবং প্রোগ্রামগুলো ওপেন সোর্সভিত্তিক। ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে এগুলোকে কাস্টোমাইজ বা এদের কোডগুলোতে আরও উন্নয়ন করতে পারে।
সাপোর্ট	মাইক্রোসফট উইন্ডোজের রয়েছে নিজস্ব হেল্প সেকশন, প্রচুর পরিমাণে অনলাইন ডকুমেন্টেশন ও হেল্প এবং উইন্ডোজের প্রতিটি সংস্করণের উপর বই।	যদিও লিনাক্সের সকল ধরনের সাথে ফ্যামিলিয়ার হওয়া খুবই কষ্টকর তারপরও অনলাইনে লিনাক্সের জন্য প্রচুর ডকুমেন্টেশন ও হেল্প, বই এবং সাপোর্ট পাওয়া সম্ভব।

৫.৩ সিডি কী/সিরিয়াল কী

সিডি কী বা সিরিয়াল কী হলো বেশ কিছু সংখ্যা বা বর্ণের একটি গ্রুপ যেটি সফটওয়্যার পাইরেসি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। যে সমস্ত সফটওয়্যারের জন্য সিডি কী এর প্রয়োজন পড়ে সেগুলোতে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ভ্যালিড সংখ্যা প্রবেশ করানো না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি কোনো কম্পিউটারে ইন্সটল করা যায় না। এটিকে অ্যাকটিভেশন কোড, প্রোডাক্ট কী, প্রোডাক্ট আইডি, রেজিস্ট্রেশন কী ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। ক্রয়কৃত অপারেটিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য সিডি কী বা সিরিয়াল কী এর প্রয়োজন পড়ে। বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের সময়ই একটি ভ্যালিড কী এর সাথে দেওয়া থাকে। কোনো প্রোগ্রাম যে অরিজিনাল সেটি শনাক্ত করতে সিডি কী এর প্রয়োজন পড়ে। কিছু কিছু সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সিডি কী প্রদানের পরেও বাড়তি অনলাইন অ্যাকটিভেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে।

৫.৪ সিডি রম ড্রাইভ থেকে কম্পিউটার বুট করা

BIOS এ বুটাবল সিডি সেটআপ করার মাধ্যমে সিডি রম ড্রাইভ থেকে কম্পিউটারকে বুট করানো যায়। BIOS সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা : AWARD BIOS, AMIBIOS, MICROID BIOS I এবং Phoenix BIOS। এই চার প্রকার BIOS ছাড়াও ব্র্যান্ড পিসিগুলোতে তাদের নিজস্ব বায়োস সিস্টেম দেখা যায় যেগুলো তাদের নিজস্ব এবং আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন

করে। Award এবং AMI BIOS সম্বলিত পিসি স্টার্ট করলেই স্ক্রিনে কীবোর্ড হতে Del কী চেপে প্রবেশ করার বার্তা প্রদর্শিত হয়। PHONEX BIOS সম্বলিত পিসি স্টার্ট স্ক্রিনে কীবোর্ড হতে F2 কী চেপে প্রবেশ করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ড পিসির বায়োস সেট-আপ-এ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রবেশ করতে হয়। সাধারণ ব্যবহারকারীরা বায়োস সেটআপ না করাটাই ভালো। কারণ সঠিকভাবে না করতে পারলে কম্পিউটার চালনায় অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রত্যেকটি কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথে স্টার্ট স্ক্রিনেই ঐ কম্পিউটারের বায়োস সেটআপ-এ প্রবেশ করার পদ্ধতি মেসেজ আকারে প্রদর্শিত হয় যেমন– AMIBIOS সম্বলিত পিসি চালু করলে স্টার্ট স্ক্রিনেই Press DEL to run Setup মেসেজ আসে।

এখন বায়োসের সেটআপ স্ক্রিনে Boot অপশনটি সিলেক্ট করে Boot Device Priority এর 1st Boot Device এর [CDROM] অপশনটি সিলেক্ট করে F10 কী চেপে নির্বাচনটি সেভ করে বের হয়ে যেতে হবে।

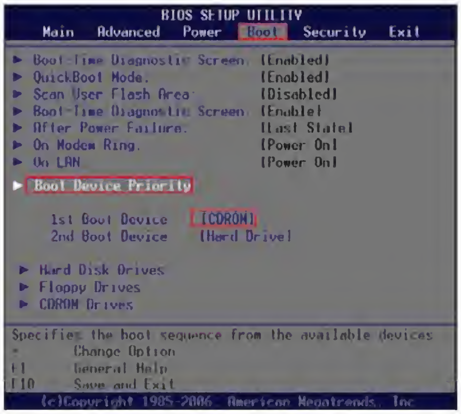

AWARD বায়োস সম্বলিত পিসি চালু করলে স্টার্ট স্ক্রিনের নিচের দিকে Press DEL to run Setup মেসেজ আসে। কীবোর্ড থেকে DEL কী চাপলে অ্যাওয়ার্ড বায়োসের সেটআপ স্ক্রিন আসবে। Advanced BIOS Features অপশনটি সিলেক্ট করে এন্টার কী চাপতে হবে।

এখন First Boot Device এর [CDROM] অপশনটি সিলেক্ট করে F10 কী চেপে নির্বাচনটি সেভ করে বের হয়ে যেতে হবে।

কিছু ডেল পিসি চালু করলে তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের স্টার্ট স্ক্রিনের উপরের দিকে F2 = Setup মেসেজ আসে। এখন Boot Sequence সিলেক্ট করে + চেপে সিডি রম ডিভাইস সিলেক্ট করে ESC কী চেপে সেভ করে বের হয়ে আসতে হবে।

PhoenixBIOS বায়োস সম্বলিত পিসি চালু করলে স্টার্ট স্ক্রিনের নিচের দিকে Press F2 to Enter Setup মেসেজ আসে।

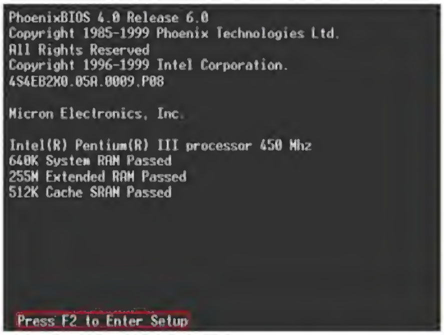

BIOS FEATURES SETUP অপশনটি সিলেক্ট করে এন্টার কী চাপতে হবে। Boot Sequence এ ক্লিক করে A, CDROM, C অপশনটি সিলেক্ট করে Esc কী চেপে F10 কী চেপে নির্বাচনটি সেভ করে বের হয়ে যেতে হবে।

৫.৫ হার্ড ডিস্কে প্রয়োজনীয় পার্টিশন সম্পাদন করা

অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করার সময় হার্ড ডিস্ককে পার্টিশন করে নেওয়া যায়। কিংবা চাইলে বিদ্যমান অপারেটিং সিস্টেমে থেকেই নতুন ইন্সটলেশনের পূর্বে হার্ড ডিস্কে পার্টিশন তৈরি করা যায়।

উইন্ডোজ ইন্সটলের সময়

কম্পিউটারে উইন্ডোজ ৭ (উইন্ডোজ ৮ বা তদুর্ধ ভার্সনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি) ইন্সটলের সময় পৃথকভাবে একটি

ডেটা পার্টিশন তৈরি করে নেওয়ার জন্য ইন্সটল প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে "Which type of installation do you want?" স্ক্রিনটি আসার পর Custom অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী স্ক্রিনে Drive options (advanced) লিংকে ক্লিক করতে হবে।

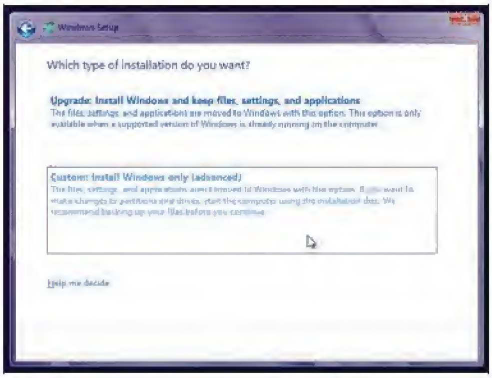

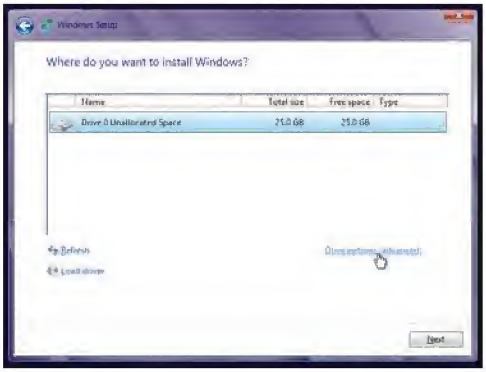

New বাটনটিতে ক্লিক করে এবং প্রতিটি পার্টিশনের জন্য সাইজ প্রদান করে বেশ কয়েকটি পার্টিশন তৈরি করে নেওয়া যায়।

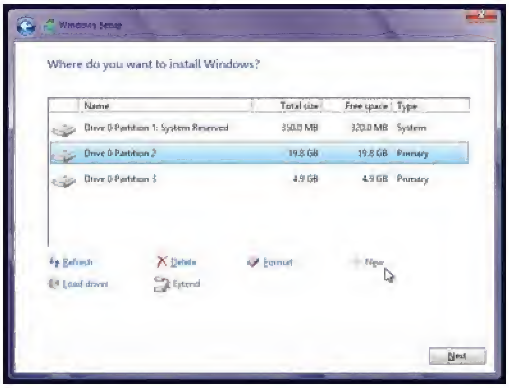

উইন্ডোজ ইন্সটলের পর

উইন্ডোজ ইন্সটল করার সময় চাইলে হার্ড ডিস্কে বেশ কয়েকটি পার্টিশন তৈরি করে নেওয়া যায়। আবার চাইলে এটিতে শুধু একটি পার্টিশনই তৈরি করে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করে নেওয়া যায় এবং পরবর্তীতে অপারেটিং সিস্টেমের ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুল ব্যবহার করে এই একটি পার্টিশনকে ভেঙে বেশ কয়েকটি পাটিশন তৈরি করা যায়। উইন্ডোজ ৭ এবং তার পরবর্তী ভার্সনগুলো যেমন– উইন্ডোজ ৮ ও উইন্ডোজ ১০ এও এই সুবিধা পাওয়া যায়।

- উইন্ডোজ ৭ এর ব্যবহারকারী হলে কীবোর্ড থেকে Start বাটনে চেপে স্টার্ট মেনুর সার্চ বক্সে manage disks টাইপ করতে হবে এবং আগত আইটেমগুলো হতে Create and format hard disk partitions এ ক্লিক করতে হবে।
- Disk Management টুলটি ওপেন হবে। টুলটি চালু থাকা অবস্থায় এর উইন্ডোর C: পার্টিশনের উপর রাইট ক্লিক করতে হবে এবং আগত কনটেক্সট মেনু থেকে Shrink Volume নির্বাচন করতে হবে।

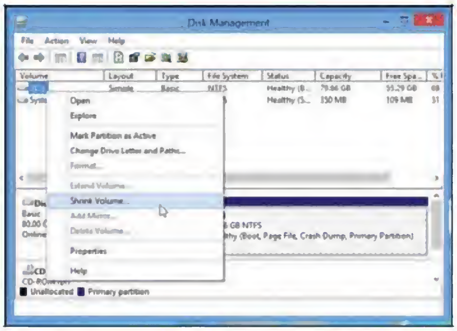

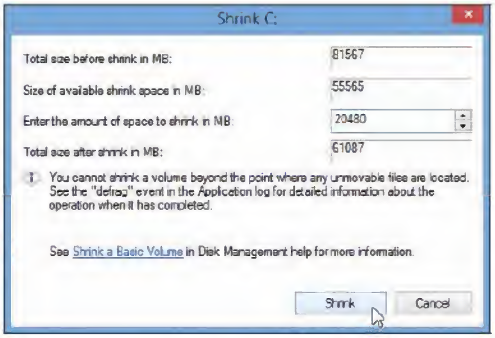

- পার্টিশনটিতে কী পরিমাণ স্পেস কমিয়ে নতুন পার্টিশন তৈরি করতে চাই তার পরিমাণ MB তে লিখে দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি চাই যে 100 GB এর নতুন একটি ডেটা পার্টিশন তৈরি করব তবে বক্সে 102400 লিখে Shrink বাটনে ক্লিক করতে হবে।
- প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে আনঅ্যালোকেটেড স্পেসের মধ্যে রাইট-ক্লিক করতে হবে এবং আনপার্টিশনড স্পেস হতে নতুন একটি পার্টিশন তৈরির জন্য আগত কনটেক্সট মেনু থেকে New Simple Volume নির্বাচন করতে হবে।

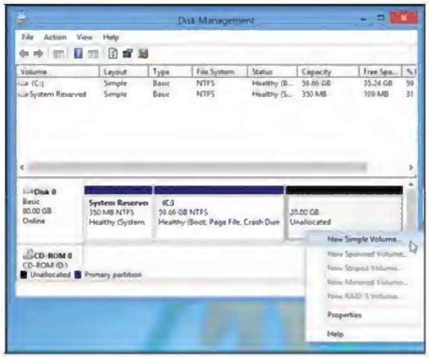

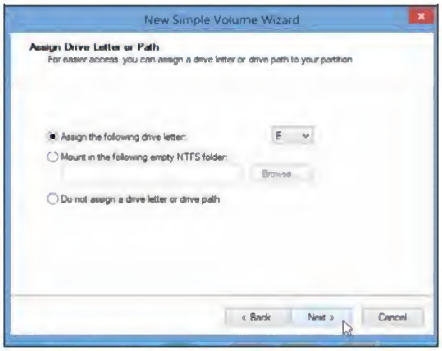

- উইজার্ডটি অনুসরণ করতে হবে এবং নতুন পার্টিশনে কাঙ্ক্ষিত ড্রাইভ লেটার প্রদান করতে হবে। প্রক্রিয়াটি যখন সম্পন্ন হবে তখন পৃথক একটি ডেটা পার্টিশন দেখতে পাওয়া যাবে।

সতর্কতা : পার্টিশন নিয়ে কাজ করার সময় গুরুত্বপূর্ণ ডেটাগুলোর ব্যাকআপ আছে কীনা তা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। ভুলবশত কিছু করে ফেললে সেক্ষেত্রে ডেটা লসের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

৫.৬ বিভিন্ন প্রকার ফাইল সিস্টেম

ফাইল সিস্টেম হলো যে উপায়ে কম্পিউটারটি হার্ড ডিস্কে ডেটা সংরক্ষণ করে। সাধারণ ফাইল সিস্টেমগুলোর মধ্যে আছে :

- ফ্যাট ১৬ (FAT16)
- ফ্যাট ৩২ (FAT32)
- এনটিএফএস (NTFS)

ফ্যাট ১৬ (FAT16)

এটি পুরনো কম্পিউটারগুলোর জন্য একটি সিস্টেম। ফ্যাট এর মানে হলো 'ফাইল অ্যালোকেশন টেবল (FAT -

File Allocation Table)'। ফ্যাট ১৬ হলো খুবই সীমিত একটি ফাইল সিস্টেম যার মাধ্যমে খুবই অপর্যাপ্ত ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। এই সিস্টেমে সর্বনিম্ন ক্লাস্টার সাইজ 32Kb হওয়ায় প্রতিটি ফাইল সর্বনিম্ন ওই পরিমাণ জায়গা নেবে। এটি কেবল হার্ড ডিস্কের ২ গিগাবাইট জায়গা ব্যবহার করতে সক্ষম।

ফ্যাট ৩২ (FAT32)

ফ্যাট ১৬ এর সমস্যাগুলো সমাধান করতেই ফ্যাট ৩২ (FAT32) এর আবির্ভাব ঘটেছে। এটি ক্লাস্টারের সাইজকে কমিয়ে 4kb তে এনেছে যা প্রচুর অপচয় হওয়া স্পেসকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং ২ টেরা বাইট পর্যন্ত ডেটাকে সমর্থন করে।

এনটিএফএস (NTFS)

যেকোনো FAT সিস্টেমের চাইতে NTFS হলো অনেক অনেক বড় ফাইল সিস্টেম। এর মানে হলো 'এনটি ফাইল সিস্টেম (NTFS - NT File System)'। এর ক্লাস্টার সাইজ 512bytes যার মানে হলো হার্ড ডিস্কের প্রায় কোনো জায়গারই অপচয় হয় না। এর ডিস্ক সাইজও অকল্পনীয়। NTFS এ ফাইল লসের জন্য নিরাপত্তা যুক্ত করা হয়েছে।

৫.৭ পার্টিশনকৃত ড্রাইভকে নির্ধারিত ফাইল সিস্টেমে ফরমেট করা

অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটলের পর চাইলে C:\ ব্যতিত (উইন্ডোজ ৭ ও এর পরবর্তী ভার্সনে তা সম্ভব) হার্ড ডিস্কের যেকোনো পার্টিশনকে ফরমেট করা যাবে। এটি করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. যে পার্টিশন বা ড্রাইভটিকে ফরমেট করা হবে সেটিতে যেন কোনো প্রকার ডেটা না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত পার্টিশনের যাবতীয় ডেটার ব্যাকআপ নিয়ে নিতে হবে।

২. উইন্ডোজ ৭ এর ব্যবহারকারী হলে কীবোর্ড থেকে Start বাটনে চেপে স্টার্ট মেনুর সার্চ বক্সে Administrative Tools টাইপ করতে হবে এবং আগত আইটেমগুলো হতে Administrative Tools এ ক্লিক করতে হবে।

৩. এরপর আগত উইন্ডো থেকে Computer Management শর্টকাটে ডাবল-ক্লিক করতে হবে।

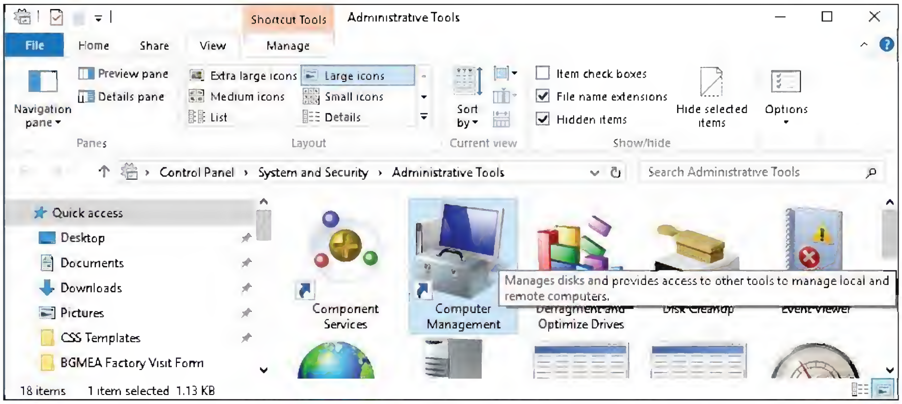

৪. Computer Management টুলটি চালু হবে। এখানে বাম দিকের তালিকায় থাকা Storage অধীন Disk Management সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে কম্পিউটারে যুক্ত হার্ড ডিস্ক বা হার্ড ডিস্কগুলোর সকল পার্টিশন বাম দিকে প্রদর্শিত হবে।

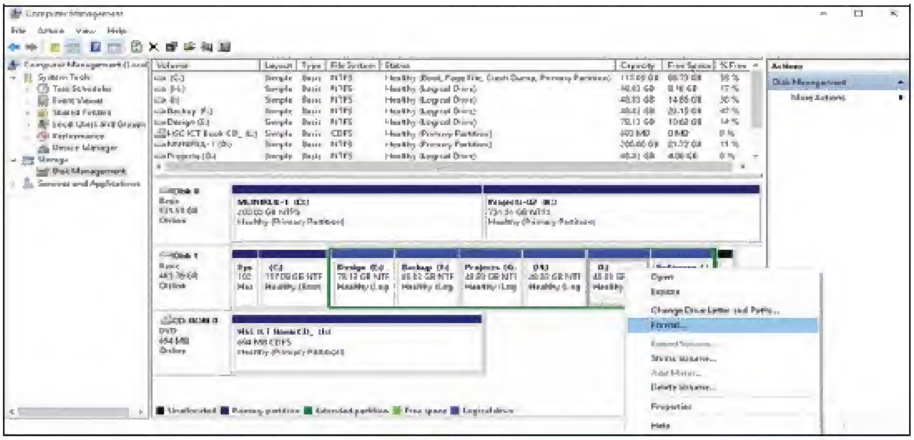

৫. যে পার্টিশনটি ফরমেট করতে ইচ্ছুক সেই পার্টিশনটি সিলেক্ট করে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। আগত মেনু থেকে Format সিলেক্ট করতে হবে।

৬. ফরমেট উইন্ডো আসবে। এখানে Volume label: এ পার্টিশনটির একটি নাম দিতে হবে। File system: হতে NTFS বা FAT নির্বাচন করতে হবে। তবে NTFS ফাইল সিস্টেম নির্বাচন করাই ভালো। ড্রাইভটির সাইজ কতটুকু করতে চাই তা Allocation unitt size অংশে লিখে দিতে হবে। যদি পুরো পার্টিশনটিই রাখতে চাই তবে Default নির্বাচন করতে হবে। আর এই পার্টিশনটি ভেঙে আরও নতুন পার্টিশন তৈরি করতে চাইলে এখানে পার্টিশন সাইজ লিখে দিতে হবে। দ্রুত ফরমেট প্রক্রিয়া চালাতে চাইলে Perform a quick format অপশনটি সিলেক্ট করে দিতে হবে। ফাইল ও ফোল্ডারকে কমপ্রেশন করার সুবিধাটি রাখতে চাইলে Enable file and folder compression অপশনটি সিলেক্ট করে দেওয়া যায়। এরপর OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

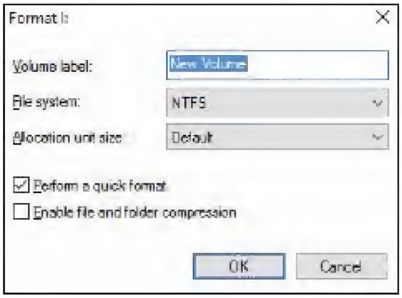

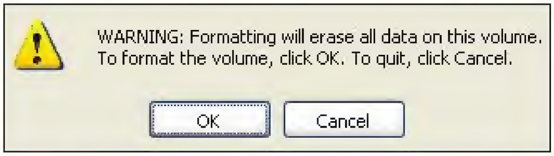

৭. একটি সতর্কবার্তা আসবে যেখানে বলা হবে ভলিউমটি ফরমেট করলে ওই ভলিউমের যাবতীয় তথ্য মুছে যাবে। এ অবস্থায় OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৮. ফরমেট প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এতে কিছুটা সময় নিতে পারে যা পার্টিশনটির সাইজের উপর নির্ভরশীল এবং কুইক ফরমেট না চালালে তা বেশি সময় নিতে পারে। তবে Perform a quick format অপশনটি সিলেক্ট না করে ফরমেট চালানোই উত্তম।

৫.৮ নির্দিষ্ট ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেমকে ইনস্টল করার ধাপসমূহ

উইন্ডোজ পরিবারের অন্যতম জনপ্রিয় একটি অপারেটিং সিস্টেম হলো উইন্ডোজ সেভেন (Windows 7)। এই অপারেটিং সিস্টেমটি কীভাবে কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হয় আমরা এখন সেটি ধাপে ধাপে দেখব। এই অপারেটিং সিস্টেমটি বেশ উন্নত হওয়ায় এর জন্য ন্যূনতম কিছু সিস্টেম রিকয়ারমেন্টের প্রয়োজন হয়।

ন্যূনতম সিস্টেম রিকয়ারমেন্ট

- ১ গিগাহার্টজ ৩২-বিট বা ৬৪-বিট প্রসেসর
- ৩২-বিট উইন্ডোজ ৭ এর জন্য ১ গিগাবাইট র‍্যাম বা ৬৪-বিট উইন্ডোজ ৭ এর জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যাম
- ৩২-বিট উইন্ডোজ ৭ এর জন্য ১৬ গিগাবাইট ফ্রি হার্ড ডিস্ক স্পেস বা ৬৪-বিট উইন্ডোজ ৭ এর জন্য ২০ গিগাবাইট ফ্রি হার্ড ডিস্ক স্পেস
- ১২৮ মেগাবাইট মেমরিসহ DirectX 9 এর সমর্থন থাকতে হবে (Aero থিম এনাবল করার জন্য)
- DVD-R/W ড্রাইভ
- উইন্ডোজ ৭ অ্যাকটিভ করার জন্য ইন্টারনেট বা ফোনের অ্যাকসেস

উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করার ধাপসমূহ

উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে:

১. BIOS এ প্রথম বুট ডিভাইস হিসেবে CD/DVD ড্রাইভ নির্বাচন করা আছে কীনা প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। যদি না থাকে তবে BIOS এ গিয়ে তা করে আসতে হবে। (ফ্লাস ডিস্ক থেকে ইন্সটল করতে হলে বুট ডিভাইস হিসেবে Flash Disk নির্বাচন করতে হবে।)

২. উইন্ডোজ সেভেন এর DVD টি কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করতে হবে।

৩. কিছুক্ষণ পর DVD থেকে বুটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিছু ফাইল লোড হতে থাকবে। কিছু আলোর রেখা স্ক্রিনে দেখা যাবে এবং উইন্ডোজ স্টার্ট হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আলোর ঝলকানি থেকে উইন্ডোজ সেভেনের লোগো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হবে।

৪. কিছুক্ষণ পর ল্যাংগুয়েজ সিলেক্ট করার অপশন পাওয়া যাবে। Language to install অংশে English নির্বাচন করতে হবে। এরপর Time and Currency format এর ঘরে English (United States) এবং Keyboard or input method এর ঘরে US লিখে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. পরবর্তী উইন্ডো থেকে Install Now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৬. লাইসেন্স আইটেমের পেইজ আসবে। এখান থেকে I accept the license terms অপশনটি সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭. পরবর্তী উইন্ডো থেকে Custom (advanced) সেটআপ নির্বাচন করতে হবে।

৮. পরবর্তী উইন্ডোতে প্রবেশ করবে। এখানে থাকা Drive options (advances) লিঙ্কে ক্লিক করে পার্টিশন ও ফরমেটিংয়ের কাজগুলো করা যাবে। পার্টিশন ও ফরমেটিংয়ের কাজগুলো শেষ করার পর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৯. অনেকেই পুরনো অপারেটিং সিস্টেমের (উইন্ডোজ এক্সপি বা উইন্ডোজ ভিসতা) হার্ড ডিস্কে উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করতে পারে। সেক্ষেত্রে পার্টিশন পূর্বে থেকেই করা থাকে। যে পার্টিশনে উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করতে হবে সেটি সিলেক্ট করতে হবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১০. উক্ত পার্টিশনে অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকলে একটি সতর্কবার্তা দেখাবে যে ব্যবহারকারীর পুরনো ফাইলগুলোকে Windows.old নামের একটি ফোল্ডারে ব্যাকআপ রাখা হচ্ছে যা চাইলে তিনি অ্যাকসেস করতে পারলেও পুরনো ভার্সনের উইন্ডোজ ব্যবহার করতে পারবে না। Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১১. উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং ফাইল কপি হওয়া শুরু হবে।

১২. এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক মিনিট সময় নেবে। ফাইলগুলো এক্সট্র্যাক্ট হবার পর সেটআপটির একটি রিস্টার্টের প্রয়োজন পড়বে। এটি নিজে থেকেই রিস্টার্ট হবে।

১৩. রিবুট হবার পর উইন্ডোজ সেভেন সার্ভিসসমূহ চালু করে দেবে এবং ইন্সটলেশন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখবে।

১৪. ইন্সটলেশন প্রগ্রেস বার দেখাবে যেখানে Completing Installation টেক্সট প্রদর্শিত হবে।

১৫. সেটআপটি আরেকবার রিস্টার্ট হবার স্ক্রিন প্রদর্শন করবে।

১৬. উইন্ডোজ রিস্টার্ট হবার পর ব্যবহারকারীকে একটি ইউজার নেম দিতে হবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৭. পরবর্তী উইজার্ড আসবে যেখানে ব্যবহারকারীকে পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে। প্রথমবার দেওয়া পাসওয়ার্ডটি পুনরায় দিতে হবে। এরপর নিচে একটি পাসওয়ার্ড হিন্ট প্রদান করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৮. উইন্ডোজ প্রোডাক্ট কী চাইবে। আপারেটিং সিস্টেমটির সাথে সরবরাহ করা প্রোডাক্ট কী এখানে লিখে দিতে হবে। এখানে থাকা "Automatically activate Windows when I'm online." অপশনটি নির্বাচন করে দিলে তা ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই কম্পিউটারটির জন্য উইন্ডোজ সেভেন এর অ্যাকটিভেশন করে দেবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৯. Microsoft Windows Updates মেথডের স্ক্রিন প্রদর্শিত হলে "Ask me later" অপশনটি নির্বাচন করে দিতে হবে।

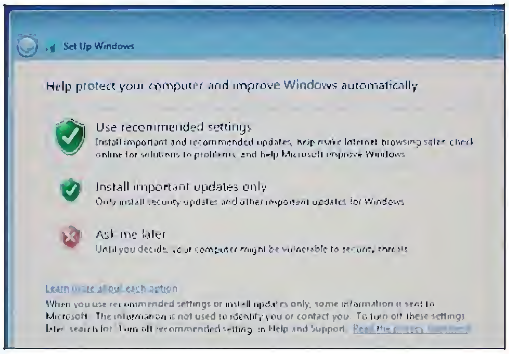

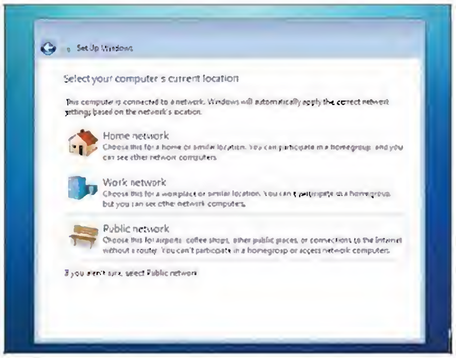

২০. টাইম ও ডেট সেটিং উইজার্ড আসবে। এখান থেকে টাইম ও ডেট সেট করে দিতে হবে। তারপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

২১. নেটওয়ার্ক সেটিংয়ের জন্য উইজার্ড আসবে।

২২. প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কটি সেট করার জন্য তালিকা থেকে সেটি সিলেক্ট করতে হবে। নেটওয়ার্ক তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

২৩. হোমগ্রুপ তৈরির উইজার্ড আসবে। এটি সেটআপ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় অপশনগুলো সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করা যাবে কিংবা এটি স্কিপ করতে চাইলে Skip বাটনে ক্লিক করতে হবে।

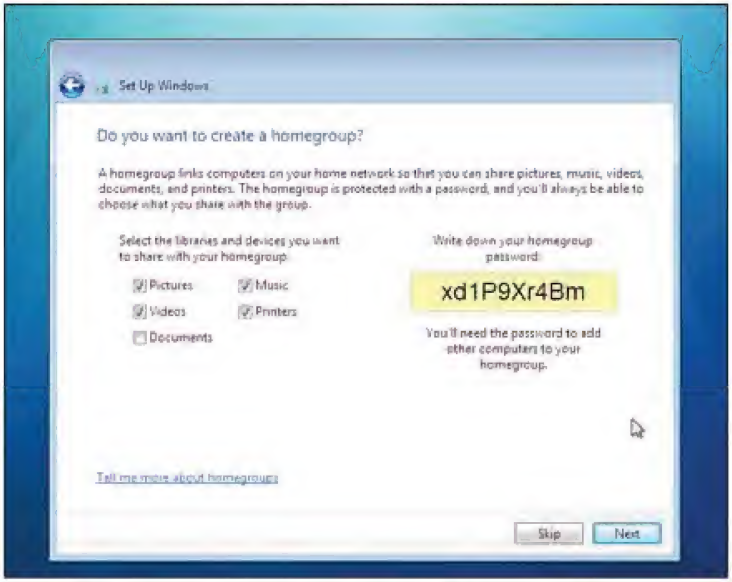

২৪. উইন্ডোজ সেভেন যাবতীয় সেটিংয়ের কাজ সম্পন্ন করার বার্তা দেখাবে। কিছুক্ষণ পর উইন্ডোজ সেভেন এর ওয়েলকাম স্ক্রিন আসবে।

২৫. ডেস্কটপটি তৈরি হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিছুক্ষণ পর উইন্ডোজ সেভেন এর ডেস্কটপ দেখা যাবে।

প্রশ্নমালা–৫

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অপারেটিং সিস্টেম বলতে কী বোঝায়?
২. ইউজার ইন্টারফেস অনুসারে অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ লেখ।
৩. ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ লেখ।
৪. প্রসেসরের সংখ্যা অনুসারে অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ লেখ।
৫. স্বত্ব বা মালিকানা অনুসারে অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ লেখ।
৬. টেক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম বলতে কী বোঝায়?
৭. একটি নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।
৮. চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম বলতে কী বোঝায়?
৯. DOS কী?
১০. UNIX কী?
১১. কয়েকটি লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেমের নাম উল্লেখ কর।
১২. লিনাক্স কী?
১৩. অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন বলতে কী বোঝায়?
১৪. অপারেটিং সিস্টেম এর উদ্দেশ্য কী?
১৫. হার্ড ডিস্ক পার্টিশন করার সময় কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?
১৬. অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশনে হার্ডডিস্ক ফরমেটিং অপশনসমূহ লেখ।
১৭. NTFS ফরমেট এর প্রধান সুবিধা কী?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অপারেটিং সিস্টেমের কাজসমূহ উল্লেখ কর।
২. পার্সোনাল কম্পিউটারে অধিক ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।
৩. অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স কী কী?
৪. সিডি কী বা প্রোডাক্ট কী এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
৫. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৬. উইন্ডোজ ইন্সটলের সময় হার্ড ডিস্কের পার্টিশন করার পদ্ধতি লেখ।
৭. উইন্ডোজ ইন্সটলের পর হার্ড ডিস্কের পার্টিশন করার পদ্ধতি লেখ।
৮. FAT ও NTFS ফাইল সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৯. উইন্ডোজ ৭ ইন্সটল করার ন্যূনতম সিস্টেম রিকয়ারমেন্ট লেখ।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশনের ধাপসমূহ লেখ।
২. সিডি রম ড্রাইভ থেকে কম্পিউটার বুট করার পদ্ধতি উল্লেখ কর।
৩. হার্ড ডিস্ক পার্টিশন করার পদ্ধতি লেখ।
৪. পার্টিশনকৃত ড্রাইভকে NTFS ফাইল সিস্টেমে ফরমেট করার প্রক্রিয়া লেখ।
৫. বিভিন্ন প্রকার ফাইল সিস্টেম সম্পর্কে লেখ।
৬. লিনাক্স ও উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৭. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

অধ্যায়-৬
প্যাকেজ সফটওয়্যার ইনস্টল করা

■ **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**

৬.১. মাইক্রোসফট অফিস এর প্যাকেজসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারব।
৬.২. প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসের নির্দিষ্ট প্যাকেজসমূহ নির্বাচন করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারব।
৬.৩. নির্দেশনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে অপিস প্যাকেজসহ ইনস্টল সম্পাদন করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারব।
৬.৪. বাংলা সফটওয়্যারের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।
৬.৫. সফটওয়্যারে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলা সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারব।
৬.৬. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার এর নাম ব্যক্ত করতে পারব।
৬.৭. সিডি থেকে কিংবা নির্দিষ্ট ড্রাইভ হতে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করার ধাপসমূহ উল্লেখ করতে পারব।

৬.১ মাইক্রোসফট অফিস এর প্যাকেজসমূহ

প্যাকেজ সফটওয়্যার (Package Software)

যেসকল সফটওয়্যারে আগে থেকেই সকল কমান্ড এবং কাজের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রোগ্রামিং করা থাকে, তাকেই প্যাকেজ সফটওয়্যার বলে। এসব সফটওয়্যারে পূর্ব থেকেই সব কিছু প্রোগ্রামিং করা থাকে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কাজের জন্য তৈরি করা এসব প্রোগ্রাম বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে সফলতা লাভের জন্য বড় বড় সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রেতাদের চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে প্যাকেজ প্রোগ্রাম তৈরি করে থাকে। ব্যবহারকারী এসব প্রোগ্রামের কোনরূপ পরিবর্তন, সংযোজন, সংকোচন করতে পারে না। ব্যবহারকারী এসব সফটওয়্যার সংগ্রহ করে কম্পিউটারে ইনস্টল করে পছন্দমতো কমান্ড দিয়ে শুধু কাজ করতে পারে।

মাইক্রোসফট অফিস (Microsoft Office)

বিখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের তৈরিকৃত জনপ্রিয় প্যাকেজ প্রোগ্রাম হলো "মাইক্রোসফট অফিস"। এটি একটি সমন্বিত প্যাকেজ প্রোগ্রাম। এর অধীন বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে। মাইক্রোসফট বিভিন্ন সময়ে তাদের অফিস প্রোগ্রামটিকে বিভিন্ন নামে বের করে থাকে। যেমন– মাইক্রোসফট অফিস ৯৭, মাইক্রোসফট অফিস এক্সপি, মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭, মাইক্রোসফট অফিস ২০১০ ইত্যাদি। মাইক্রোসফট অফিসের জনপ্রিয় ও উন্নত একটি ভার্সন হলো 'মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭'। অনন্য কিছু সুবিধা রাখা হয়েছে এই ভার্সনে।

মাইক্রোসফ্ট অফিস প্যাকেজ এর বিভিন্ন প্রোগ্রামসমূহ হলো–

১. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ২০০৭
২. মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭
৩. মাইক্রোসফট একসিস ২০০৭
৪. মাইক্রোসফট ইনফোপাথ ২০০৭
৫. মাইক্রোসফট ওয়াননোট ২০০৭
৬. মাইক্রোসফট আউটলুক ২০০৭

৭. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭
৮. মাইক্রোসফট পাবলিশার ২০০৭
৯. মাইক্রোসফট গ্রুভ ২০০৭
১০. মাইক্রোসফট ভিজিও ২০০৭
১১. মাইক্রোসফট প্রজেক্ট ২০০৭
১২. মাইক্রোসফট কমিউনিকেটর ২০০৭
১৩. মাইক্রোসফট শেয়ার পয়েন্ট ডিজাইনার ২০০৭

৬.২ প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসের নির্দিষ্ট প্যাকেজসমূহ নির্বাচন করা

মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামটি কম্পিউটারে ইন্সটল করা থাকলে সহজেই প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসের নির্দিষ্ট প্যাকেজসমূহ নির্বাচন করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসের নির্দিষ্ট প্যাকেজ নির্বাচন করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. Start মেনুতে ক্লিক করতে হবে।
২. প্রদর্শিত তালিকা থেকে Programs বা All Programs এ ক্লিক করতে হবে।
৩. Microsoft Office নির্বাচন করলে ইনস্টল করা প্রোগ্রামগুলোর তালিকা প্রদর্শিত হবে।
৪. যে প্রোগ্রামটি ওপেন করা দরকার তালিকা হতে সে প্রোগ্রামটির নামের উপর ক্লিক করে নির্বাচন করলে সেই প্রোগ্রামটি ওপেন হবে।

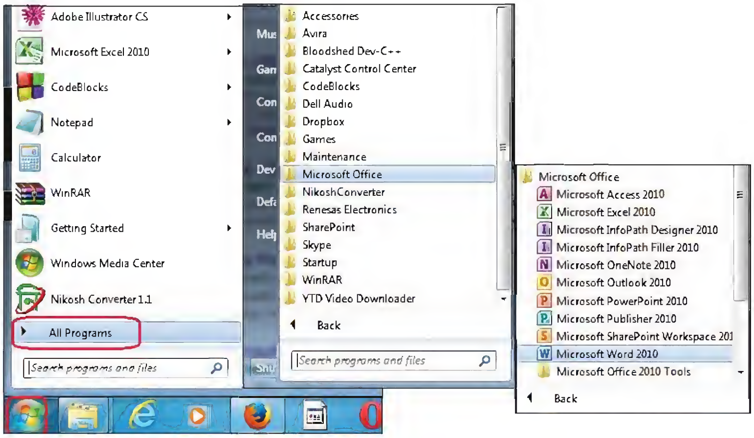

৬.৩ নির্দেশনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে অফিস প্যাকেজসমূহ ইন্সটল করা

মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ প্রোগ্রাম যেমন– মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ প্যাকেজ প্রোগ্রামটি ইন্সটল করার জন্য বাজার থেকে 'মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭' এর সিডি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করে অফিস প্রোগ্রামটি ইন্সটল করতে হবে :

১. কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভে বাজার হতে সংগ্রহ করা ইন্সটলার সিডিটি প্রবেশ করাতে হবে।
২. কম্পিউটারের অটোরান এনাবল্ড থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচের উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। আর যদি অটোরান অফ করা থাকে তবে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে সিডিটি ব্রাউজ করে এর Setup.exe ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করলে উইন্ডো আসবে।
৩. সিডির সাথে সরবরাহ করা ২৫ ক্যারেক্টারের প্রোডাক্ট কী এখানে লিখে দিতে হবে। ভুল কী প্রবেশ করালে তা জানাবে। আর প্রোডাক্ট কী সঠিক হলে নিচের উইন্ডোর মতো প্রোডাক্ট কী এর ডান পাশে একটি রাইট চিহ্ন দেখাবে। এই অবস্থায় Continue বাটনে ক্লিক করে পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে হবে।

৪. মাইক্রোসফট সফটওয়্যার লাইসেন্স টার্ম উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

৫. এখানে উইন্ডোর নিচের দিকে থাকা I accept the term of this agreement অপশনটি সিলেক্ট করে (টিক চিহ্নের মাধ্যমে চেক করে দিয়ে) Continue বাটনে ক্লিক করলে পরবর্তী উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

৬. উইন্ডো থেকে Install Now বাটনে ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ এর অধীনে থাকা সকল প্রোগ্রাম ও টুলসমূহ ইনস্টল হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রোগ্রাম ও টুল নির্বাচন করে ইনস্টল করতে হলে Customize বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭. সবগুলো প্রোগ্রাম ও টুলের তালিকা প্রদর্শিত হবে। প্রতিটি প্রোগ্রাম ও টুলের নিচে একটি ডাউন অ্যারো প্রদর্শিত হবে যেখানে ক্লিক করলে বেশ কিছু অপশন পাওয়া যাবে। যে প্রোগ্রামটি ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই সেটির ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করতে হবে এবং আগত অপশন থেকে Not Available সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে তার পাশে একটি ক্রস চিহ্ন বসে যাবে অর্থাৎ সেটি অনির্বাচিত হবে।

৮. এভাবে একে একে অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো ইনস্টলেশনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে Install Now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৯. ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং প্রোগ্রেস বারে সামগ্রিক প্রোগ্রেস প্রদর্শিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় খানিকটা সময় লাগবে।

১০. এভাবে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে যাতে ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার বার্তা দেখাবে। এই অবস্থায় চাইলে Go to Office Online বাটনে ক্লিক করে মাইক্রোসফট অফিস অনলাইনে প্রবেশ করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ থাকতে হবে। তবে এটি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। সেক্ষেত্রে Close বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইন্ডোটি বন্ধ হয়ে যাবে।

৬.৪ বাংলা সফটওয়্যারসমূহ

বর্তমানে লেখালেখি করার জন্য বেশ কয়েকটি বাংলা সফটওয়্যার রয়েছে। নিচে বেশি প্রচলিত বাংলা সফটওয়্যারসমূহের তালিকা দেওয়া হলো :

১.	বিজয় বাংলা	২.	অভ্র	৩.	লেখনি
৪.	নিকশ	৫.	প্রশিকা	৬.	মুনির ইত্যাদি।

৬.৫ সফটওয়্যারে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলা সফটওয়্যার ইন্সটল করা

বাংলা ইন্সটল করে সহজেই ব্যবহার করা যায়। যেমন ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে বিজয় বায়ান্নো ইন্সটল করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. বাজার থেকে বিজয় বায়ান্নোর সিডি সংগ্রহ করতে হবে।

২. এটি ইন্সটল করার আগে কম্পিউটারে উইন্ডোজ এবং এমএস ওয়ার্ড ইন্সটল করতে হবে।

৩. যদি বিজয়ের পুরনো ভার্সন ইন্সটল করা থাকে তবে ফন্টসহ সেটি আগে রিমুভ করে নিতে হবে।

৪. এবার বিজয় বায়ান্নোর সফটওয়্যার সিডিটি কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি-রম ড্রাইভে প্রবেশ করাতে হবে।

৫. উইন্ডোজ ৭ বা এর পরবর্তীতে ভার্সনগুলোতে এই সফটওয়্যারটি ইন্সটল করতে গেলে সিডিটি অটোরান না হয়ে ব্যবহারকারী কী করতে চায় তা জানতে চাইবে। এক্ষেত্রে উক্ত মেসেজে ক্লিক করতে হবে। ফলে বেশ কিছু অপশন প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে Run Bayanno2011.exe এ ক্লিক করতে হবে (প্রয়োজন হলে সিডি ব্রাউজ করে আলাদাভাবেও এটি করা যাবে)।

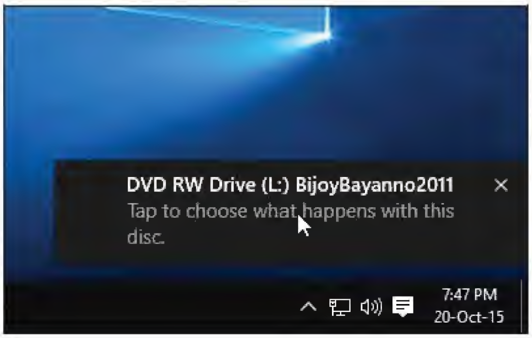

৬. বিজয় বায়ান্নোর ইন্সটলেশন ইন্টারফেস চালু হবে। এখান থেকে "বিজয় বায়ান্নো ২০১১" এর আইকনে ক্লিক করতে হবে। ফলে ইন্সটলারটি ওপেন হবে। এখান থেকে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী উইজার্ডে প্রবেশ করবে।

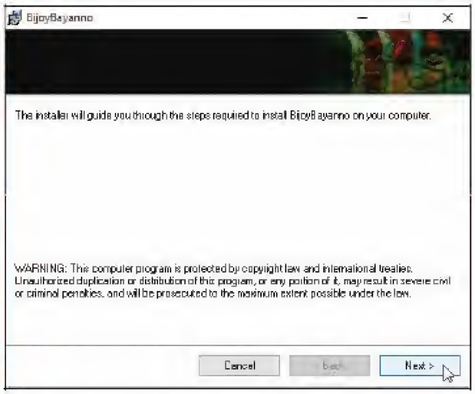

৭. সফটওয়্যারটি কোথায় ইনস্টল করতে চাই তা এই উইজার্ড হতে নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। তবে বাইডিফল্ট যা আছে তা রেখে দেওয়াই উত্তম। এরপর এটি কে বা কারা ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ Everyone নাকি Just me তার অপশনটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

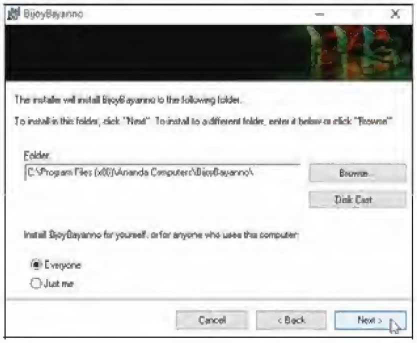

৮. লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট এর উইজার্ড আসলে I Agree অপশনটি নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

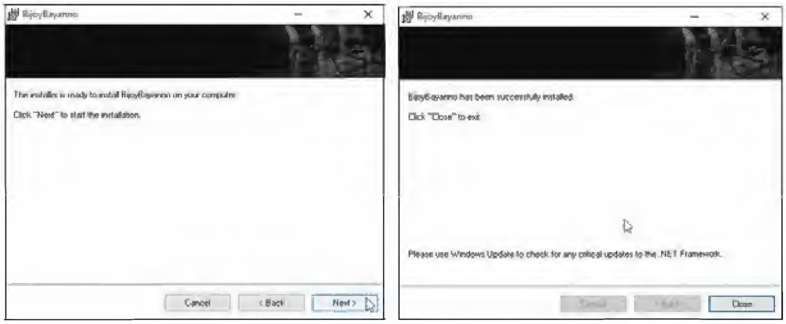

৯. এবার সফটওয়্যারটি ইন্সটলের জন্য প্রস্তুত হবে। Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং অতিদ্রুত এটি সমাপ্ত হয়ে বার্তা প্রদর্শন করবে। Close বাটনে ক্লিক করে উইন্ডোটি বন্ধ করতে হবে।

এবার কম্পিউটারটি একবার রিস্টার্ট দিলে ভালো হয়। উল্লেখ্য, এটি ইন্সটল করার জন্য ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে .NET Framework ইনস্টল করা থাকতে হবে। এটি না থাকলে তা ডাউনলোড করে আগে ইন্সটল করে রাখতে হবে।

৬.৬ বিভিন্ন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার

প্রতিদিন সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য নতুন নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ভাইরাসের উপর গবেষণা করে এর প্রতিষেধক অর্থাৎ এন্টিভাইরাসও তৈরি হচ্ছে। ভাইরাসের সাথে তাল মিলিয়ে এন্টিভাইরাস তৈরি করা অনেক সময়, মেধা ও অর্থের প্রয়োজন। তাই বৃহৎ কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আপডেটেড এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম তৈরি করা অসম্ভব। সর্বদা সাম্প্রতিক সময়ের লেটেস্ট ভার্সনের এন্টিভাইরাস সংগ্রহ করে সেটি ব্যবহার করতে হবে। ইন্টারনেটের সংযোগ থাকলে নির্দিষ্ট সময় ব্যবহৃত এন্টিভাইরাসের আপডেটি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে জনপ্রিয় কয়েকটি এন্টিভাইরাস হলো:

১. এভিজি (AVG)
২. আভাস্ত (AVAST!)
৩. আভিরা (Avira)
৪. ক্যাসপারেস্কি (Kaspersky)
৫. ম্যাকএফির ভাইরাস স্ক্যান (McAffy's Virus Scan)
৬. নর্টন এন্টিভাইরাস (Norton Anti Virus - NAV)
৭. আইবিএম এন্টিভাইরাস (IBM AntiVirus)
৮. পিসি সিলিন (PC Cillin)
৯. কোবরা (Cobra)
১০. পান্ডা এন্টিভাইরাস (Panda AntiVirus) ইত্যাদি।

৬.৭ এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটল করা

যে কোন এন্টিভাইরাস ইন্সটল করার জন্য প্রথমে এটিকে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে সিডি বা ডিভিডি ছাড়া অনলাইনে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়। এছাড়াও নির্দিষ্ট কোন ড্রাইভে যদি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি সেভ করা থাকে তাহলে উক্ত ড্রাইভের এন্টিভাইরাস ফোল্ডারটিতে ডাবল ক্লিক করে ফোল্ডারটি ওপেন করে এন্টিভাইরাসের সেটআপ বা এক্সিকিউটিবল ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করে ইন্সটল করতে হবে। সব এন্টিভাইরাসেই

ইন্সটল করার নিয়মাবলী দেওয়া থাকে। ম্যানুয়াল দেখে অথবা অনলাইনের হেলপ থেকে ইন্সটল করার ধাপসমূহ জানা যায়। সব এন্টিভাইরাস একই নিয়মে ইন্সটল করা যায় না। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নিয়ম মেনে ইন্সটল করতে হয়। তবে সব ধরনের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম নির্দেশাবলি মেনে ইন্সটল করতে হয়। নিচে একটি (ক্যাসপারাস্কি ২০১৬) এন্টিভাইরাস ইন্সটল করার ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো।

১. এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল করার জন্য ব্যবহারকারীর কমপিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ থাকতে হবে। কাজেই প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে কমপিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ঠিক রয়েছে কীনা।
২. বাজার থেকে সংগ্রহ করা এন্টিভাইরাসের ইন্সটলার সিডিটি সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভে প্রবেশ করাতে হবে।
৩. ব্যবহারকারীর কমপিউটারে অটোরান এনাবল্ড করা থাকলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপেন হবে। আর তা না হলে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে সিডিটি ব্রাউজ করে এন্টিভাইরাসটির সেটআপ ফাইলটিতে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ডাবল ক্লিক করতে হবে। ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল নোটিফিকেশন আসলে Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৪. সেটআপ হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।
৫. Install বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৬. পরবর্তী উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। উইন্ডোতে নির্দেশনা অনুসারে কমান্ড বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৭. কম্পাটিবিলিটি ঠিকঠাক থাকলে এন্টিভাইরাসটি ইন্সটল হতে শুরু করবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি ইন্সটল হয়ে যাবে এবং উইন্ডোতে বার্তা প্রদর্শিত হবে। Finish বাটনে ক্লিক করতে হবে।

প্রশ্নমালা—৬

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্যাকেজ সফটওয়্যার কী?
২. মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজের প্রোগ্রামগুলোর নাম উল্লেখ কর।
৩. লেখালেখির কাজে ব্যবহৃত ২টি বাংলা সফটওয়্যারের নাম লেখ।
৪. এন্টিভাইরাস কী?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাইক্রোসফট অফিস এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২. মাইক্রোসফট অফিসের নির্দিষ্ট প্যাকেজ নির্বাচনের পদক্ষেপগুলো উল্লেখ কর।
৩. জনপ্রিয় ৪টি এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামের নাম লেখ।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে অফিস প্যাকেজসমূহ ইনস্টল করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. কম্পিউটারে বিজয় বাংলা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার প্রক্রিয়া উল্লেখ কর।
৩. কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস ইনস্টলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অধ্যায়-৭
উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের অ্যাডভান্সড ফিচারসমূহ

- এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–
  - ৭.১. অপারেটিং সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেলের ফিচারস (Font, Display, Programs & Features, Administrative tools, Device Manager, Devices and Printer) সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞাত হব।
  - ৭.২. বিভিন্ন প্রকার স্টোরেজ ডিভাইস–(Pen drive/Flash drive, CD/DVD Rom) এর File/Folder Computer এর হার্ডডিস্কে স্থানান্তর করতে পারব।

৭.১ অপারেটিং সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেলের ফিচারসমূহ

ফন্ট ইনস্টল ও ডিলিট করা

কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার সময় কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কতিপয় ফন্ট ইনস্টল হয়। এছাড়াও প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত ফন্ট ইনস্টল করে নেওয়া যায় কিংবা কোনো অপ্রয়োজনীয় ফন্ট মুছে ফেলা যায়। উইন্ডোজ কীবোর্ড লেআউট ছাড়া অন্য কোনো কীবোর্ড লেআউট ব্যবহার করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ইন্টারফেস এবং তার ফন্টগুলো ইন্সটল করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন– বাংলা ব্যবহার করতে চাইলে আমরা বিজয়, মুনির ইত্যাদি ইন্টারফেস ব্যবহার করে থাকি। তখন এ সকল ইন্টারফেসের ফন্টসমূহ ইনস্টল করার প্রয়োজন হয়। নিচে নতুন ফন্ট ইন্সটল করা এবং কোনো ফন্ট মুছে ফেলার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

নতুন ফন্ট ইনস্টল করা :

১. স্টার্ট মেনু থেকে Control Panel বাটনে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করতে হবে।

২. কন্ট্রোল প্যানেল এর View by: হতে Large Icon সিলেক্ট করতে হবে। ফলে All Control Panel Items উইন্ডোতে প্রবেশ করবে।

৩. এখান থেকে Fonts লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। Fonts উইজার্ড আসবে।

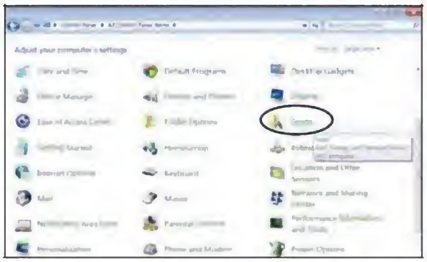

৪. সিস্টেমে ইনস্টল করা সকল ফন্ট দেখা যাবে। এখানে ফন্টের আইকনগুলো বড় আকারে প্রদর্শিত হলে এদের ভিউকে পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে। এজন্য মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করলে যে পপআপ মেনু আসবে সেখান থেকে পছন্দের ভিউ, সর্ট বাই, গ্রুপ বাই ইত্যাদি নির্ধারণ করে নেওয়া যায়। এছাড়া ফন্ট উইন্ডোটির উপরের ডান দিকে থাকা ভিউ আইকনে (যেমনটা উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে থাকে) ক্লিক করে ফন্ট আইকনগুলোকে বিভিন্নভাবে দেখা ও বিন্যস্ত করা যায়।

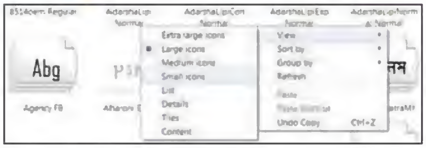

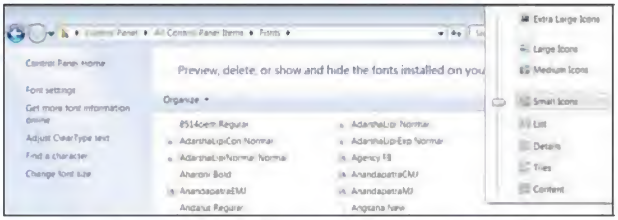

৫. নতুন ফন্ট ইনস্টল করতে চাইলে উক্ত ফন্টকে কপি করে ফন্ট ফোল্ডারে পেস্ট করতে হবে।

ফন্ট মুছে ফেলা

১. যে ফন্ট বা ফন্টগুলো মুছতে চাই তা নির্বাচন করতে হবে।

২. মাউসের ডান বোতাম ক্লিক করতে হবে।প্রদর্শিত শর্টকাট মেনু থেকে Delete এ ক্লিক করতে হবে।

৩. সত্যিই মুছে ফেলা হবে কীনা তার জন্য মেসেজ বক্স প্রদর্শিত হবে। Yes বোতাম ক্লিক করলে নির্বাচিত ফন্ট বা ফন্টগুলো মুছে যাবে।

কালার রেজুল্যুশন ও স্ক্রিন এরিয়া নির্ধারণ

ডেস্কটপে Colour Resolution কেমন হবে, ডেস্কটপ এরিয়া কতটুকু হবে, স্ক্রিন এরিয়া কতটুকু হবে ইত্যাদি বিষয় কন্ট্রোল প্যানেলের Display উইন্ডো থেকে নির্ধারণ করা যায়। এজন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

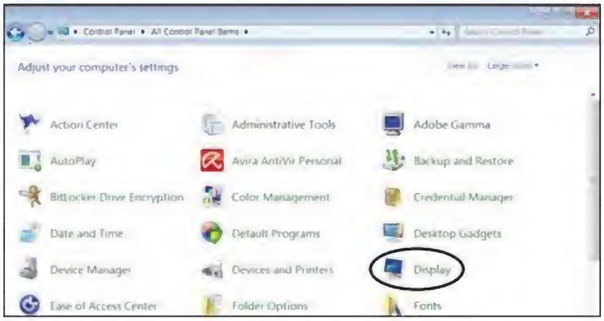

১. স্টার্ট মেনু থেকে Control Panel বাটনে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করতে হবে।

২. কন্ট্রোল প্যানেল এর View by: হতে Large Icon সিলেক্ট করতে হবে। ফলে All Control Panel Items উইন্ডোতে প্রবেশ করবে।

৩. এখান থেকে Display লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। Display উইন্ডোতে প্রবেশ করবে।

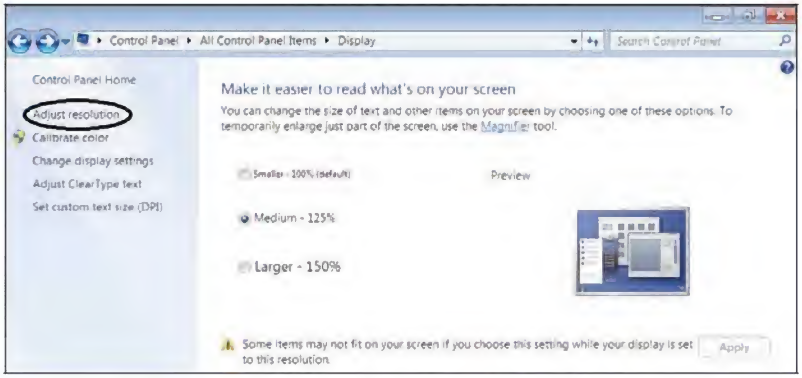

৪. ব্যবহারকারী স্ক্রিনের টেক্সট সাইজ ও অন্যান্য আইটেমকে পরিবর্তন করতে পারবেন। এজন্য Smaller, Medium ও Larger অপশনগুলো থেকে যেকোনোটি নির্বাচন করতে হবে। যে অপশনটি নির্বাচন করা হবে তার ভিউ কেমন হবে তা পাশেই ছোট আকারে প্রদর্শিত হবে। পরিবর্তন স্থায়ী করার জন্য Apply বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. উইন্ডোর বাম দিকে থাকা তালিকা থেকে Adjust Resolution লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। ফলে Screen Resolution উইন্ডোতে প্রবেশ করবে।

৬. এখানে ব্যবহারকারী তার ডিসপ্লের অ্যাপিয়ারেন্স পরিবর্তন করতে পারেন। এখানে থাকা Display ও Resolution এর পাশের ড্রপডাউন মেনু থেকে প্রয়োজনীয় ডিসপ্লে ও রেজ্যুল্যুশন নির্বাচন করে দেওয়া যায়।

৭. এবার Advanced Settings লিঙ্কটিতে ক্লিক করতে হবে।

৮. আগত উইন্ডো থেকে Monitor ট্যাবটি নির্বাচন করতে হবে।

৯. নিচের দিকের Color এর ঘরের ড্রপডাউন মেনু থেকে প্রয়োজনীয় অপশনটি নির্বাচন করতে হবে।

১০. এবার যথাক্রমে Apply ও OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। পূর্ববর্তী উইন্ডোতে ফেরত আসবে।

১১. পুনরায় Apply ও OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

প্রোগ্রাম আনইনস্টল করা বা সরিয়ে ফেলা

উইন্ডোজ-এ ইনস্টল করা অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম আনইনস্টল করা বা সরিয়ে ফেলা যায়। কন্ট্রোল প্যানেলের আওতায় Programs এর অধীন Uninstall অপশনটি ব্যবহার করে ইন্সটল করা কোন প্রোগ্রামকে আনইন্সটল করা যায়। সেজন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. স্টার্ট মেনু থেকে Control Panel বাটনে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করতে হবে।

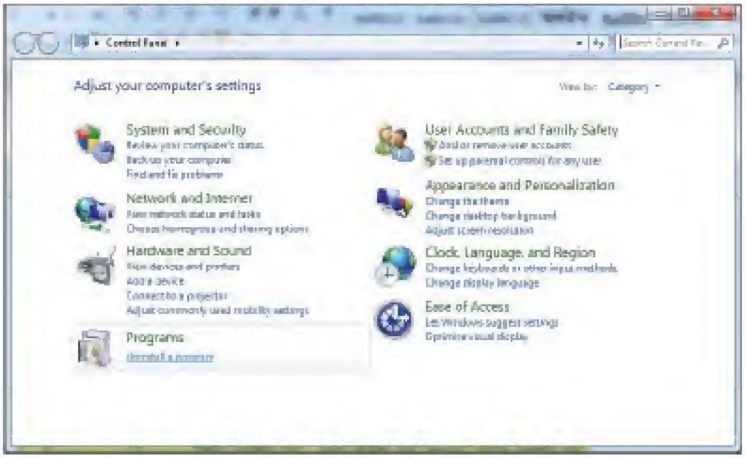

২. Uninstall a Program লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। ইনস্টল করা সব প্রোগ্রামসমূহের তালিকা দেখাবে।

৩. যে প্রোগ্রামটি অপসারণ করা দরকার সেটি নির্বাচন করতে হবে। এর ফলে উইন্ডোর উপরে Uninstall/Change নামের একটি বাটন প্রদর্শিত হবে। সেটিতে ক্লিক করতে হবে।

৪. প্রোগ্রামটি সত্যিই মুছে ফেলা হবে কীনা তার জন্য সতর্ক মেসেজ প্রদর্শিত হবে।

৫. Yes নির্বাচন করলে প্রোগ্রামটি কম্পিউটার থেকে অপসারিত হবে।

হার্ডওয়্যার ইনস্টল করা

কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রকার হার্ডওয়্যার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। উইন্ডোজে Plug and Play নামক একটি প্রোগ্রাম যুক্ত রয়েছে। এর ফলে সিস্টেমের সাথে কোনো নতুন হার্ডওয়্যার বা কোনো ডিভাইস লাগিয়ে তা ইনস্টল করা যায়। হার্ডওয়্যার ইনস্টল করার পদ্ধতি মোটামুটি একই ধরনের হলেও বিভিন্ন শ্রেণির হার্ডওয়্যারের জন্য কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে মৌলিক বিষয় জানা থাকলে যেকোনো শ্রেণির হার্ডওয়্যার ইনস্টল করা যাবে।

১. স্টার্ট মেনু থেকে Control Panel বাটনে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করতে হবে।
২. কন্ট্রোল প্যানেল এর View by: হতে Large Icon সিলেক্ট করতে হবে। ফলে All Control Panel Items উইন্ডোতে প্রবেশ করবে।

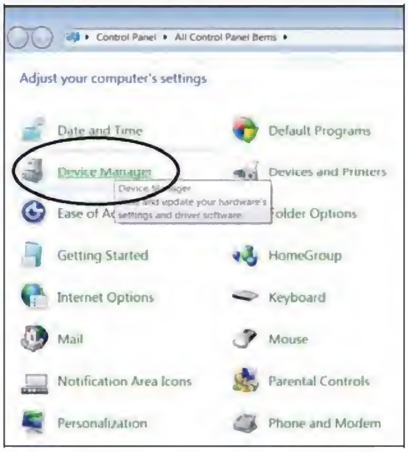

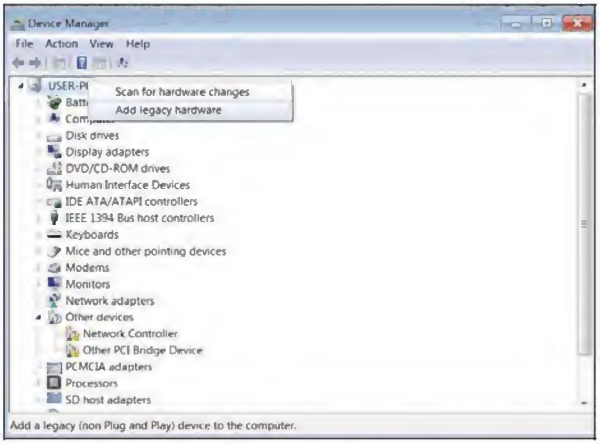

৩. Device Manager লিংকে ক্লিক করতে হবে। ডিভাইস ম্যানেজার উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে।
৪. এর একেবারে উপরের দিকে USER-PC লেখার উপর মাউস পয়েন্টার রেখে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। আগত মেনু থেকে Add Legacy Hardware নির্বাচন করতে হবে। অ্যাড হার্ডওয়্যার উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।

৫. Next বাটনে ক্লিক করলে পরবর্তী উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।
৬. নতুন যে হার্ডওয়্যার ইনস্টল করতে চাই তা উইন্ডোজ প্রোগ্রাম খুঁজে দেখবে কীনা তা এখান থেকে নির্ধারণ করতে হয়। উক্ত উইজার্ডে Search for and install the hardware automatically (Recommended) এবং Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) নামের দুইটি অপশন রয়েছে। প্রথম অপশনটি নির্বাচন করলে কম্পিউটার নিজে থেকে ডিভাইসটি খুঁজে নেবে এবং দ্বিতীয়টি নির্বাচন করলে

ব্যবহারকারীকে তালিকা থেকে ডিভাইসটি নির্বাচন করে দিতে হবে। উক্ত উইজার্ড থেকে দ্বিতীয় অপশনটি নির্বাচন করে Next বাটন ক্লিক করি। একটি উইজার্ড পাওয়া যাবে।

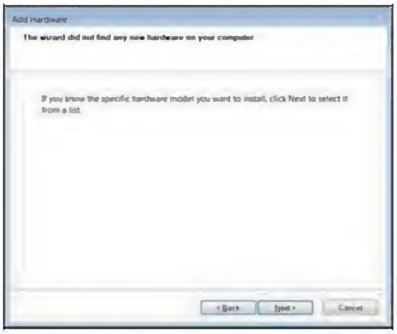

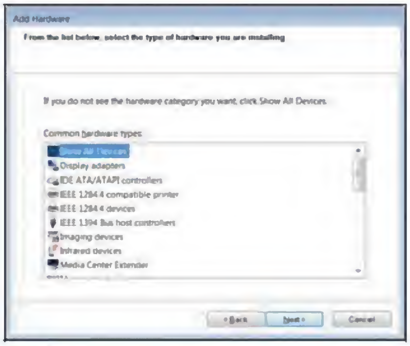

৭. Next বাটন ক্লিক করতে হবে। একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

৮. যে হার্ডওয়্যার ডিভাইসটি ইন্সটল করতে চাই তা উপরিউক্ত তালিকা থেকে নির্বাচন করে দিতে হবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ডিভাইসটি খুঁজে নিবে। সে অবস্থায় পর্দায় খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হবে। এই উইন্ডোতে নির্বাচিত হার্ডওয়্যারের প্রস্তুতকারকের নাম ও ব্র্যান্ড বা মডেল প্রদর্শিত হবে। সেখান থেকে হার্ডওয়্যার ডিভাইসটির প্রস্তুতকারকের নাম এবং মডেল নির্বাচন করতে হবে।

৯. প্রস্তুতকারকের নাম এবং মডেল নির্বাচন করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হার্ডওয়্যারের জন্য প্রস্তুতকারকের নাম এবং মডেলের নাম ভিন্ন রকম হবে।

১০. এ অবস্থায় কখনো হার্ডওয়্যার সামগ্রী অ্যাডজাস্ট করতে বলতে পারে বা Resource Type নির্ধারণ করতে বলতে পারে। তখন যথাযথ Resource Type নির্ধারণ করে Next বাটন নির্বাচন করতে হবে।

১১. আবার কখনো কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে অবস্থায় Trouble shooting টুলস দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে।

১২. অবশেষে সফটওয়্যার ড্রাইভার সংবলিত ডিস্ক প্রবেশ করাতে বলবে অথবা সিস্টেমের মধ্যে ড্রাইভার ইন্সটল করা থাকলে তা নির্ধারণ করবে এবং আরেকটি উইজার্ড প্রদর্শিত হবে।

১৩. ডিভাইসটির একটি নাম নির্ধারণের উইজার্ড আসতে পারে। এক্ষেত্রে একটি নাম লিখে দিয়ে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

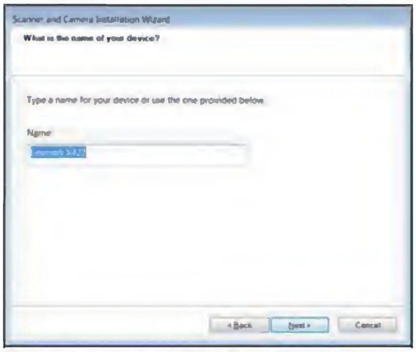

১৪. Finish বাটনে ক্লিক করলেই পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পাদন হবে এবং ডিভাইস ম্যানেজার উইন্ডোতে ফিরে আসবে। এখানে কম্পিউটারে যুক্ত করা হার্ডওয়্যারটির নাম প্রদর্শিত হবে।

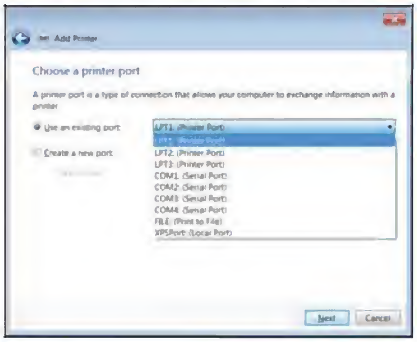

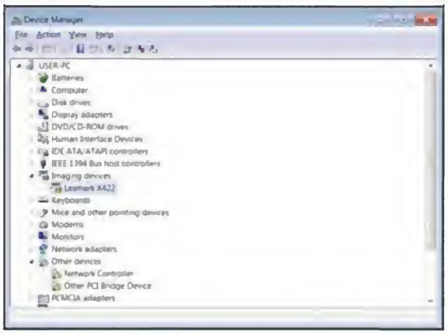

প্রিন্টার ইনস্টল করা

প্রিন্টার ইন্সটল করার অর্থ হচ্ছে প্রিন্টার সংযোগ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট প্রিন্টারের ড্রাইভার ইন্সটল করা। প্রিন্টার ড্রাইভার হচ্ছে একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা দিয়ে কোনো প্রিন্টারের ফিচারসমূহ কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। নিচে প্রিন্টার ড্রাইভার ইন্সটল করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

১. স্টার্ট মেনু থেকে Device and Printers বাটনে ক্লিক করতে হবে।
২. কন্ট্রোল প্যানেলের Device and Printers উইন্ডো আসবে।

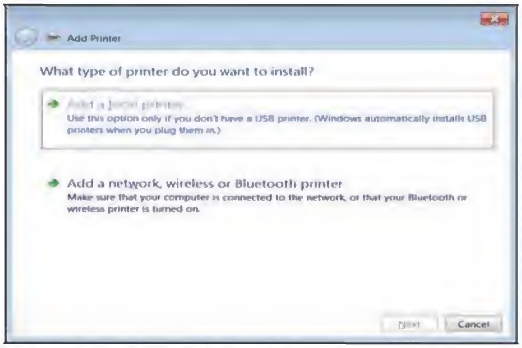

৩. পূর্বে কোনো প্রিন্টার ইনস্টল করা থাকলে তার নাম প্রিন্টার ফোল্ডারের মধ্যে দেখা যাবে। এই উইন্ডোর উপরের দিকে থাকা Add a printer বাটনে ক্লিক করতে হবে। একটি উইজার্ডটি প্রদর্শিত হবে।

৪. এখান থেকে Add a local printer অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে কিছুক্ষণ পর নিচের উইজার্ডটি প্রদর্শিত হবে।

৫. এখানে Use an existing port অপশনটি সিলেক্ট করে এর ডান দিকের ড্রপডাউন বাটনে ক্লিক করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের পোর্টের একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় পোর্টটি সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৬. প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টলের উইজার্ড আসবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টারের ব্র্যান্ড এবং মডেলের একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে। স্ক্রিনের বাম কলাম থেকে প্রস্তুতকারকের নাম এবং ডান কলাম থেকে প্রিন্টারের মডেল নির্বাচন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনবোধে প্রিন্টার ম্যানুয়াল দেখে নেওয়া যেতে পারে। কম্পিউটারে প্রিন্টার ড্রাইভার খুঁজে না পেলে এ পর্যায়ে প্রিন্টারের সাথে প্রদত্ত সিডি প্রবেশ করাতে বলবে। সিডি প্রবেশ করালে সেখান থেকে ড্রাইভার খুঁজে নেবে।

৭. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরবর্তী উইজার্ড আসবে এবং সেখানে নির্বাচিত প্রিন্টারটি নাম প্রদর্শিত হবে।

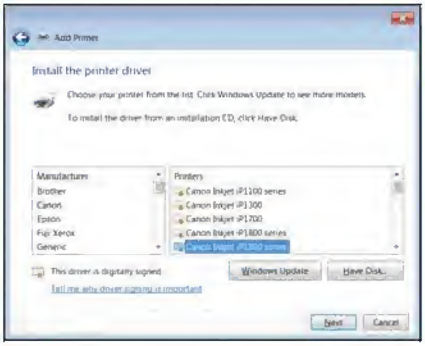

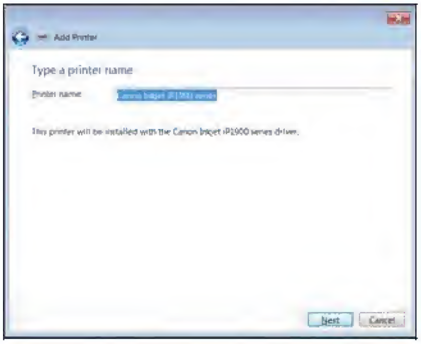

৮. Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

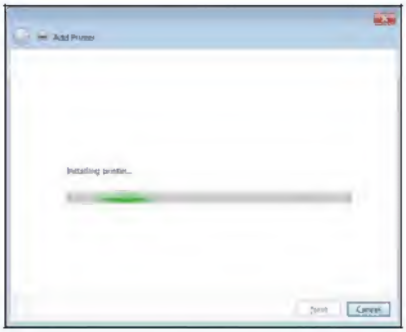

৯. প্রিন্টার অ্যাড করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিছুক্ষণ পর প্রিন্টার শেয়ারিং উইজার্ডটি প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে প্রিন্টারকে শেয়ার করা কিংবা না করা যাবে। ধরা যাক, আমরা এখন কাউকে এই প্রিন্টারটি শেয়ার দিতে চাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে Do not share this printer অপশনটি সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১০. প্রিন্টারটি অ্যাড হয়ে যাবে। এই অবস্থায় প্রিন্টারটি অবশ্যই নির্দিষ্ট পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকতে হবে।

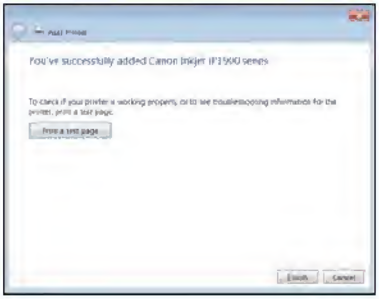

১১. সঠিকভাবে প্রিন্টারটি ইনস্টল হলো কীনা তা যাচাই করতে নমুনা প্রিন্ট করার উদ্দেশ্যে প্রিন্টারটি চালু করে সেখানে একটি কাগজ দিতে হবে। উইজার্ড থেকে Print a test page বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১২. আশা করা যায় সফলভাবেই একটি নমুনা প্রিন্ট হবে। এবার Finish বাটনে ক্লিক করে প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত করতে হবে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস

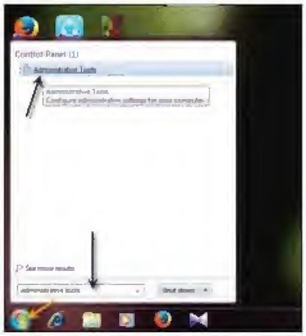

কম্পিউটারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টুল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—কম্পোনেন্ট সার্ভিসেস, কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, ডেটা সোর্স (ওডিবিসি), ইভেন্ট ভিউয়ার, আইএসসিএসআই ইনিশিয়েটর, লোকাল সিকিউরিটি পলিসি, পারফরমেন্স মনিটর, প্রিন্ট ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিসেস, সিস্টেম কনফিগারেশন, টাস্ক শিডিউলার, উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল উইথ অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি, উইন্ডোজ মেমরি ডায়াগনস্টিক, উইন্ডোজ পাওয়ারশেল মডিউলস ইত্যাদি। প্রয়োজনবোধে এই টুলগুলো ব্যবহার করা যায়। এই টুলগুলোকে অ্যাকসেস করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. কম্পিউটার এর স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করতে হবে। আগত সার্চ বক্সে Administrative Tools টাইপ করলে উপরের লিস্টে টুলটি দেখা যাবে সেটিতে ক্লিক করতে হবে।

২. কন্ট্রোল প্যানেলের Administrative Tools উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। এখানে প্রয়োজনীয় টুলগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। যে টুলটি প্রয়োজন সেটিতে ডাবল-ক্লিক করলে টুলটি ওপেন হবে।

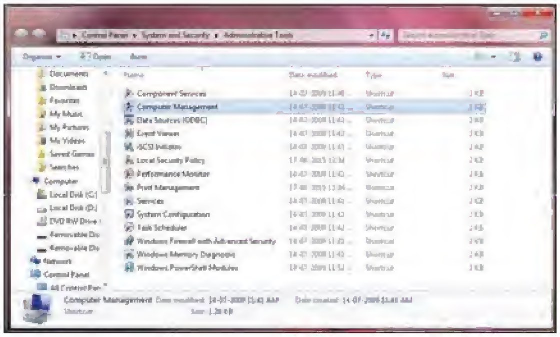

৩. আমরা যদি Computer Management টুলটি ওপেন করতে চাই তবে এর শর্টকাট লিংকটিতে ডাবল-ক্লিক করলে সেটি ওপেন হবে।

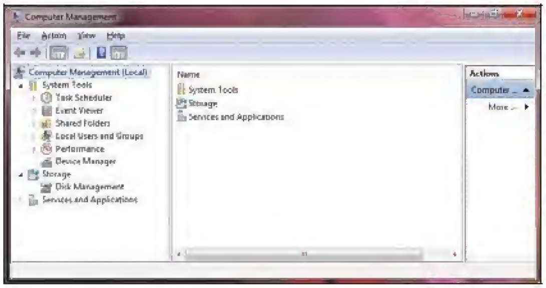

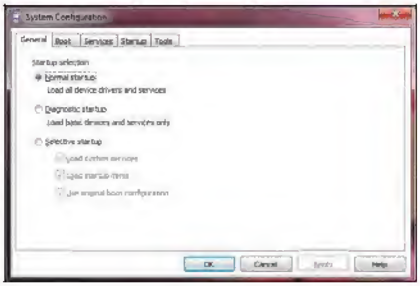

৪. একইভাবে সিস্টেম কনফিগারেশন টুলটি ওপেন করতে চাইলে System Configuration এর লিংকে ডাবল-ক্লিক করতে হবে।

৭.২ বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইসের ফাইল বা ফোল্ডার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে স্থানান্তর

কম্পিউটারের সাথে বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের জন্যই মূলত এগুলো ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ডিভাইসের মধ্যে রয়েছে পেন ড্রাইভ বা নানা ধরনের ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, সিডি ও ডিভিডি-রম। কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়লে এসব ডিভাইসে সংরক্ষিত ডেটাকে পুনরায় কম্পিউটারে স্থানান্তর করতে হয়। খুব সহজেই এই কাজটি করা যায়। উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে একই পদ্ধতিতে এসব পেন ড্রাইভ/ফ্ল্যাশ ড্রাইভ কিংবা সিডি/ডিভিডি-রম কে ব্রাউজ করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ফাইল বা ফোল্ডারগুলো কপি করে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে পেস্ট করার মাধ্যমে ডেটা নামিয়ে নেওয়া যায়। ধরা যাক আমরা একটি সিডি-রম হতে তথ্য কম্পিউটারে কপি করে নিয়ে আসবো। এজন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. যে সিডি/ডিভিডি-রম হতে ডেটাকে নিয়ে আসতে হবে সেটি কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি-রম ড্রাইভে প্রবেশ করাতে হবে।

২. সিডিটি অটোরানসমৃদ্ধ হলে এবং কম্পিউটারে অটোরান অপশন এনাবল্ড থাকলে অটোপ্লে উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এখান থেকে সরাসরি সিডি/ডিভিডি রম এর ফোল্ডারটি ওপেন করতে চাইলে লিংকে ক্লিক করতে হবে।

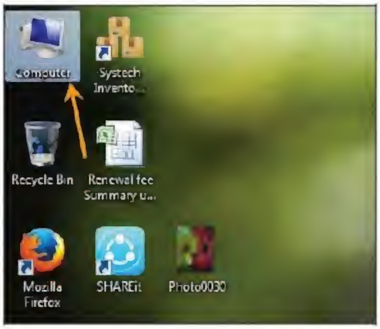

৩. ইচ্ছে করলে ভিন্নভাবেও এই ফোল্ডারটি অ্যাকসেস করা যাবে। সেজন্য ডেস্কটপ থেকে Computer আইকনে ডাবল-ক্লিক করতে হবে কিংবা কীবোর্ড হতে Windows Key + E কিদ্বয় একত্রে চাপতে হবে।

৪. উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ওপেন হবে। সেখান থেকে সিডি/ডিভিডি-রম ড্রাইভটি সিলেক্ট করলে এর ভেতরে থাকা ফাইল ও ফোল্ডারসমূহ দৃশ্যমান হবে। এখান থেকে যে ফাইল বা ফোল্ডার/ফোল্ডারসমূহ হার্ড ডিস্কে নিয়ে আসতে হবে সেটি বা সেগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে। এরপর কীবোর্ড হতে Ctrl + C চাপতে হবে কিংবা সিলেক্ট অবস্থায় মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করলে যে পপ-আপ মেনু আসবে সেখান থেকে Copy সিলেক্ট করতে হবে।

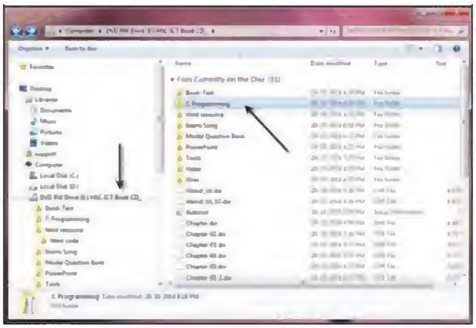

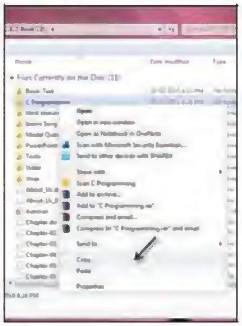

৫. এবার হার্ড ডিস্কের যে লোকেশনে এই ডেটাকে সংরক্ষণ করতে হবে সেখানে গিয়ে কীবোর্ড থেকে Ctrl + V চাপলে কপিকৃত ডেটা সেখানে পেস্ট করা যাবে। এই সময় কপি হওয়ার প্রক্রিয়া দেখাতে থাকবে।

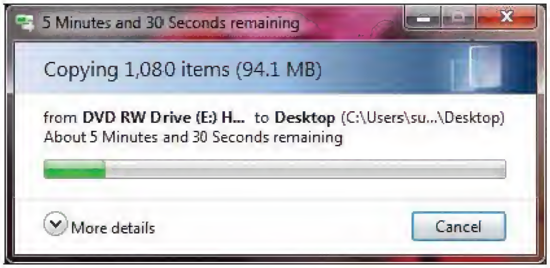

প্রশ্নমালা—৭

■ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার করতে চাইলে কী করতে হবে?
২. কম্পিউটারে কালার রেজুল্যুশন ও স্ক্রিন এরিয়া নির্ধারণে কন্ট্রোল প্যানেলের কোন আইটেমটি ব্যবহৃত হয়?
৩. গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলগুলোর নাম লেখ।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে নতুন কোনো ফন্ট ইনস্টল করার প্রক্রিয়া লেখ।
২. কীভাবে কম্পিউটারে ইনস্টল করা ফন্টকে মুছে ফেলা যায়?
৩. কম্পিউটার হতে প্রোগ্রাম আনইন্সটল করার পদ্ধতি লেখ।
৪. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলগুলো অ্যাকসেস করার প্রক্রিয়া লেখ।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফন্ট ইনস্টল ও ডিলিট করার পদ্ধতি লেখ।
২. কম্পিউটারে কালার রেজুল্যুশন ও স্ক্রিন এরিয়া নির্ধারণের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৩. কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার ইন্সটল করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. কম্পিউটারে প্রিন্টার ইনস্টল করার পদ্ধতি লেখ।
৫. বিভিন্ন স্টোরেজ ডিভাইস হতে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে ফাইল বা ফোল্ডার সংরক্ষণ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অংশ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট

অধ্যায়-৮
কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রাথমিক ধারণা

■ **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**

৮.১. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
৮.২. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলো ব্যক্ত করতে পারব।
৮.৩. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ক্যাবলসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
৮.৪. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ব্যবহৃত কানেকটরসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
৮.৫. LAN, MAN ও WAN কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
৮.৬. LAN–এ ব্যবহৃত কানেকটিভিটি ডিভাইসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
৮.৭. LAN–এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারব।

৮.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network)

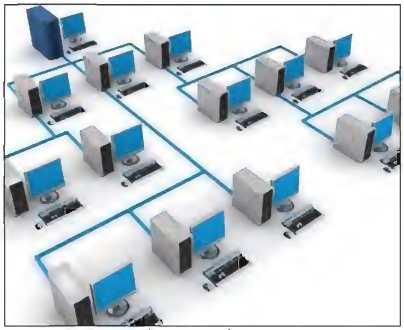

দুই বা ততোধিক বস্তুকে কোন কিছুর মাধ্যমে সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকে নেটওয়ার্ক (Network) বলা হয়। তদ্রূপ Cable, Modem বা Satellite এর মাধ্যমে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারকে সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকেই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলা হয়। ষাটের দশকে মিনি ও মেইনফ্রেম কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথম নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে আশির দশকের গোড়ার দিকে পার্সোনাল কম্পিউটারের (PC) মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়া যাত্রা শুরু করে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারের সময় একই সময়ে একটি কম্পিউটারে মাত্র একজন ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে। PC-তে নেটওয়ার্কিং-এর ফলে একটি কম্পিউটারে একই সময়ে যেমন একাধিক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে; তেমনিভাবে একজন ব্যবহারকারী একই সময়ে একাধিক কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় কম্পিউটারে নেটওয়ার্কের ফলে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটার একই সিস্টেমের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ অংশ সমন্বিত হয়ে একটি প্রক্রিয়াকরণ অংশে পরিণত হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রয়োগক্ষেত্র

বর্তমানে নেটওয়ার্কবিহীন আধুনিক বিশ্ব কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন অফিস, আদালত, ব্যবসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, শিল্প কারখানা ইত্যাদিতে ব্যাপক হারে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

১. স্বয়ংক্রিয় অফিস ও কারখানা ব্যবস্থাপনা
২. ডিসট্রিবিউটেড কমপিউটিং
৩. অগ্নিনির্বাপন ও নিরাপত্তা
৪. ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ
৫. ইলেকট্রনিক বুলেটিন বোর্ড
৬. দূরবর্তী প্রোগ্রাম ও ডাটাবেসে প্রবেশ
৭. রেলওয়ে বা বিমান রিজার্ভেশন সিস্টেম
৮. ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর
৯. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং
১০. ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট
১১. টেলি ও ভিডিও কনফারেন্সিং
১২. ফাইল স্থানান্তর
১৩. ফ্যাক্স ও টেলেক্স সার্ভিস
১৪. ইন্টারনেট ফোন
১৫. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইত্যাদি।

৮.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর সুবিধাসমুহ

কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তা নিচে তুলে ধরা হলো :

১. ব্যবসায়িক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হয়তো সব ধরনের তথ্য বিনিময় বা শেয়ার করা নিরাপদ নয়। তবে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সহজেই সব ধরনের তথ্য বিনিময় করা যায়।

২. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং করা যায়। যেমন– নেটওয়ার্কভুক্ত কোন কম্পিউটারের সাথে যুক্ত প্রিন্টার অন্যান্য কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করা যায়। একইভাবে শেয়ারযোগ্য যেসকল হার্ডওয়্যার রিসোর্স যেমন- স্ক্যানার, প্লটার, হার্ড ডিস্ক স্পেস এবং মডেম ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

৩. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করা যায়। যেমন– কোনো প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয়ভাবে সফটওয়্যার ইন্সটল ও কনফিগার করা হয়, তখন ঐ সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম পুরো প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ক্লায়েন্টদের জন্য ব্যবহারযোগ্য রিসোর্স হয়ে যায়।

৪. তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। নেটওয়ার্কিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটি কেন্দ্রীয় স্টোরেজ মিডিয়া বা সার্ভারে নেটওয়ার্ক ক্লায়েন্ট যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।

৫. তথ্য সুরক্ষা করা যায়। যেমন– নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয় এমন কেউ ইচ্ছে করলেই সংরক্ষিত কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে না।

৬. বার্তা বা মেসেস আদান–প্রদান করা যায়। নেটওয়ার্কভুক্ত ক্লায়েন্ট একে অপরের সাথে ইলেকট্রনিক মেইল বা ই-মেইল আকারে ডকুমেন্ট লেনদেন এবং তাৎক্ষণিক বার্তা বিনিময় করতে পারে।

৮.৩ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ক্যাবলসমুহ

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। নিচে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

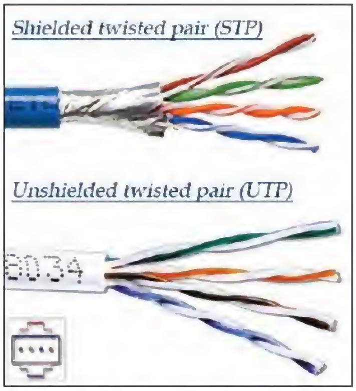

১. **টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল :** দুইটি প্যাঁচানো কপার তার দিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। প্রতি ক্যাবলে ইনসুলেটর জ্যাকেট ও কন্ডাক্টর থাকে। দুইটি তারের মধ্যে একটি রিসিভার এর নিকট সিগন্যাল বহনে ব্যবহৃত হয়, আর অপরটি গ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে। সুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার এবং (খ) আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার।

ক. **শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল :** শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর সংক্ষিপ্ত নাম এসটিপি। অনাকাঙ্ক্ষিত নয়েজ প্রতিহত করার জন্য পরিবাহী আবরণ এবং জোড়া তারের সমন্বয়ে এসটিপি ক্যাবল গঠিত হয়। তারের প্রত্যেক জোড়াই ধাতব পাত দ্বারা মোড়ানো থাকে। এসটিপি ক্যাবলে দুইটি অংশ থাকে। যথা– (১) জোড়া তারের প্রত্যেকটির ধাতব সুতা এবং (২) তার উপর ধাতবপাত দ্বারা মোড়ানো আবরণ।

খ. **আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল :** টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল। এটিকে সংক্ষেপে ইউটিপি (UTP) ক্যাবল বলা হয়। ইউটিপিকে চার জোড়া বিশিষ্ট ওয়্যার মিডিয়াও বলে। ইউটিপি ক্যাবলের ৮টি কপার তার এর প্রত্যেকটি অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে।

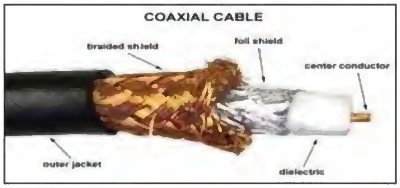

২. **কো-এক্সিয়াল ক্যাবল :** কো-এক্সিয়াল ক্যাবল টুইস্টেড পিয়ার ক্যাবলের চেয়ে তুলনামুলকভাবে হাই ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল বহন করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো এমন এক ধরনের ক্যাবল,যাতে

গোলাকার আকৃতির দুইটি কন্ডাক্টর, ১টি ইনসুলেটর এবং একটি জ্যাকেট থাকে। দুইটি কন্ডাক্টর এর মধ্যে একটি কন্ডাক্টরকে বলা হয় ইনার কন্ডাক্টর এবং অপরটিকে বলা হয় আউটার কন্ডাক্টর। ইনার কন্ডাক্টর সাধারণত কপার দিয়ে তৈরি। ইনার কন্ডাক্টর এর বাইরের চারপাশ নমনীয় অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এ অপরিবাহীর বাইরে আউটার কন্ডাক্টর থাকে, যা ধাতব পাত বা ধাতব সুতা কিংবা দুইয়ের সংমিশ্রণে তৈরি। আউটার কন্ডাক্টর সিলিন্ডার আকৃতি বিশিষ্ট। আউটার কন্ডাক্টরের বাইরে পুরো তারকে ঢেকে দেওয়ার জন্য প্লাস্টিক কভার থাকে, যাকে ক্যাবল জ্যাকেটও বলা হয়।

৩. **ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল :** ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল তৈরি করতে খুব সরু কাচের তন্তু বা প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। এ তন্তু দিয়ে আলোর গতিতে প্রবাহিত লেজার রশ্মির সাহায্যে ডেটা স্থানান্তর করা হয়। ক্যাবলের শুরুতে তড়িৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে রূপান্তরের জন্য একটি কনভার্টার এবং ক্যাবলের শেষ প্রান্তে আলোকশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরের জন্য অন্য একটি কনভার্টার ব্যবহার করা হয়। অপটিক্যাল ফাইবার ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ট্রান্সমিট করতে পারে না। ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে তাই আলোক সিগন্যালে পরিবর্তন করে ট্রান্সমিট করতে হয়।

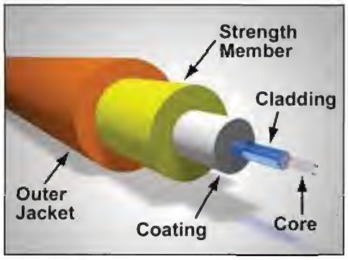

অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে যে সরু কাঁচের তন্তু থাকে তাকে কোর (Core) বলা হয়। কোরের বাইরের চারপাশে যে কনসেনট্রিক ধাতব লেয়ার থাকে, তাকে ক্ল্যাডিং (Cladding) বলা হয়। সাধারণত কোরের ব্যাস ৬২.৫ মাইক্রোনস (১ মাইক্রোনস = ১ মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) এবং ক্ল্যাডিং এর ব্যাস হলো ১২৫ মাইক্রোন। ক্লাডিং এর উপর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি যে পাতলা আবরণ (Coating) থাকে তাকে জ্যাকেট (Jacket) বলা হয়। এই জ্যাকেট বাইরের ঘর্ষণ, দ্রাবক ও অন্যান্য ক্ষতিকারক নিয়ামক থেকে ফাইবারের কোর এবং ক্ল্যাডিংকে রক্ষা করে।

৮.৪ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কানেক্টরসমূহ

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC–Network Interface Card) বা নিক এবং ক্যাবলের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ডিভাইসটি হচ্ছে ক্যাবল কানেক্টর। অর্থাৎ এটি নেটওয়ার্কের ক্যাবল এবং নিককে সংযুক্ত করে থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকার ক্যাবলের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধরন ও স্ট্যান্ডার্ড এর কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ইউটিপি ক্যাবলের সাথে আরজে–৪৫ (RJ–45), কানেকটর, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল এর সাথে বিএনসি কানেক্টর এবং ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাথে SC, ST, MT–RJ, LC, FC নামক কানেক্টর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নেটওয়ার্কে সাধারণত নিম্নোক্ত তিন ধরনের কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে–

কানেক্টরের ধরন	বর্ণনা
ক. আরজে–৪৫ (RJ–45) (RJ–Registered Jack)	এনআইসি'র সাথে ইউটিপি ক্যাবলের সংযোগ প্রদানে এটি ব্যবহৃত হয়।
খ. আরজে–৫৮	এটি কো–এক্সিয়াল বিএনসি (BNC) কানেক্টর নামে পরিচিত। এ ধরনের কানেক্টর থিননেট বা ১০ বেজ ২ ক্যাবলে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
গ. এইউআই (AUI–Attachment User Connector)	এটি ১৫ পিনবিশিষ্ট কানেক্টর বা এইউআই ড্রপ ক্যাবলে সংযোগ প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
ঘ. এসসি, এসটি, এমটি–আরজে, এলসি ও এফসি (SC, ST, MT–RJ, LC, FC)	SC কানেক্টরটি একটি পুশ-পুল কানেক্টর ব্যবহার করে যেটি সাধারণ অডিও ও ভিডিও এর প্লাগ ও সকেটসমূহের মতোই। ST কানেক্টরটি একটি হাফ-টুইস্ট বেয়োনেট ধাঁচের লক ব্যবহার করে। MT–RJ হলো খুবই ক্ষুদ্র ফর্ম ফ্যাক্টরে দুইটি

	ফাইবারের জন্য একটি জনপ্রিয় কানেক্টর। LC কানেক্টরগুলোর উপরের দিকে RJ–45 কানেক্টরের মতোই একটি ক্ল্যাম্প থাকে যা পোর্টে কানেক্টরটিকে ভালোভাবে আটকে রাখে ও সুরক্ষা দেয়। FC কানেক্টরগুলো সিঙ্গেল মোড ও মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক ক্যাবলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চিত্র : একটি RJ-45 কানেক্টর

চিত্র : একটি RG-58 কানেক্টর

চিত্র : একটি RJ–45 কানেক্টর

চিত্র : একটি কো-অক্সিয়াল কানেক্টর

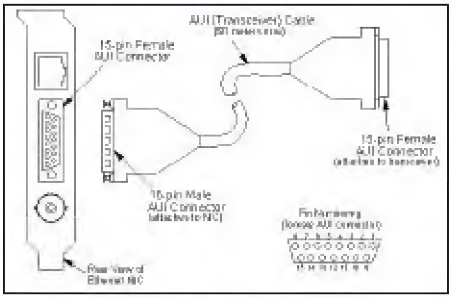

চিত্র : AUI ক্যাবল ও কানেক্টর

চিত্র : ফাইবার অপটিকের সাধারণ কানেক্টরসমূহ

৮.৫ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network–LAN)
২. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropoliton Area Network–MAN)
৩. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network–WAN)

নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান (LAN–Local Area Network)

একটি নির্দিষ্ট ভবন বা ক্যাম্পাসে যদি একদল কম্পিউটার নেটওয়ার্কযুক্ত হয়, তাহলে সেটি ল্যান নামে পরিচিত হবে। ল্যানের অধীনে কোন একটি ভবনের একই তলায় অবস্থিত সকল কম্পিউটার থাকতে পারে, অথবা কোন একটি কোম্পানির একই ভবনের কাছাকাছি ফ্লোরের কম্পিউটারগুলো ল্যানযুক্ত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কম্পিউটারগুলোকে থাকতে হবে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যাবলি :

১. ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ
২. উপাত্ত স্থানান্তরের হার সাধারণত ১০ মেগাবিট/সেঃ থেকে ১০০০ মেগাবিট/সেঃ

৩. শ্রেণি সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত হয়।
৪. এই নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজসাধ্য ও ব্যয়বহুল নয়।

মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN–Metropoliton Area Network)

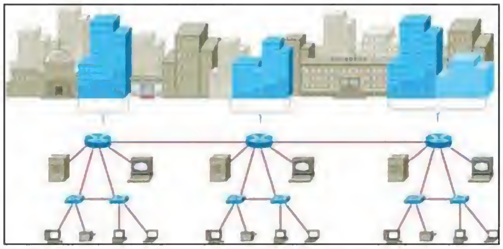

ম্যান বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক হচ্ছে কতকগুলো ল্যান নেটওয়ার্কের সমন্বয় যা একটি পুরো শহর বা বড় আকারের কোন এলাকাব্যাপী বিস্তৃত।

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN–Wide Area Network)

ওয়ান বা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক হচ্ছে কতকগুলো কম্পিউটার বা ল্যানের নেটওয়ার্ক যারা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত। ওয়ানের আওতায় কম্পিউটারগুলো কেবল একটি শহরেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে। তবে ওয়ানের পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে ফিজিক্যাল লাইন, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন এবং মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশনের উপর।

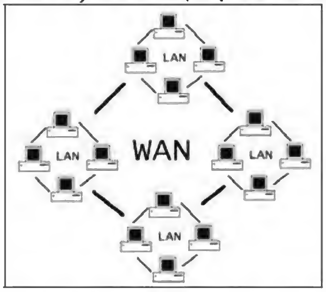

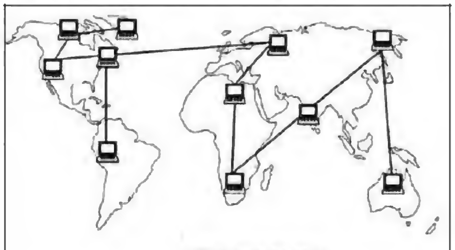

Wide area network

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নানা সুযোগ–সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন–

১. বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত উপাত্ত, পত্র–পত্রিকা, বই, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।
২. ইলেকট্রনিক মেইল প্রক্রিয়ায় বিশ্বের যেকোন স্থানে চিঠিপত্র প্রেরণ করা যায়।
৩. ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।
৪. অনলাইন শপিং করা যায়।
৫. সর্বোপরি, সমগ্র নেটওয়ার্ক-বিশ্বকে টেবিলে বসে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেট সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং কম খরচের ওয়ান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ওয়ানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এর সীমিত পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth)। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যানের তুলনায় ওয়ানের ডেটা ট্রান্সমিশন গতি অত্যন্ত কম। ফলে ওয়ানের মাধ্যমে অডিও, ভিডিও ফাইলের মতো বড় আকারের ফাইল আদান-প্রদান বেশ সমস্যাপূর্ণ।

৮.৬ ল্যানে ব্যবহৃত কানেকটিভিটি ডিভাইসসমূহ

একটি নেটওয়ার্ক যে ডিভাইস এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ (Expansion) করা হয় তাকে নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস বলা হয়। নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইসগুলো হচ্ছে–

১. নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC–Network Interface Card)
২. রিপিটার (Repeater)
৩. হাব (Hub)
৪. সুইচ (Switch)
৫. ব্রিজ (Bridge)
৬. রাউটার (Router)

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC–Network Interface Card) : নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) বা নেটওয়ার্ক এডাপ্টর কার্ড একটি পিসি বা কম্পিউটারে ইন্সটল করা হয়। এটি মাদারবোর্ডে অবস্থিত ডেটা বাস

নেটওয়ার্ক মিডিয়া বা ক্যাবলের মধ্যে ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে সকল কম্পিউটারের মাদারবোর্ডেই নেটওয়ার্ক এডাপ্টার কার্ড বিল্ট ইন থাকে। ট্রান্সরিসিভার (Transreceivers) অনুরূপ একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা একটি নির্দিষ্ট মিডিয়ামে সিগন্যালের ট্রান্সমিশন ও রিসিপশন উভয় কাজ সম্পাদন করতে পারে।

রিপিটার (Repeater) : রিপিটার এক ধরনের কানেকটিভিটি ডিভাইস যা দুর্বল সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফাই বা শক্তিশালী করে অথবা সিগন্যাল Regenerate করে।

চিত্র : রিপিটার

চিত্র : হাব

চিত্র : সুইচ

হাব (Hub) : স্টার টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি হচ্ছে বা যা নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে। ইহা সিগন্যাল গ্রহণ করার পর কোন প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন ছাড়া অন্য কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। হাব তিন প্রকার। যথা–

ক. একটিভ হাব (Active Hub)
খ. প্যাসিভ হাব (Passive Hub) ও
গ. ইন্টিলিজেন্ট হাব (Intelligent Hub)

সুইচ (Switch) : সুইচ একটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস। হাবের সাথে এর প্রধান পার্থক্য হলো সুইচ সিগন্যাল রিসিভ করার পর তা শুধুমাত্র টার্গেট পোর্ট বা নোডসমূহে প্রেরণ করে থাকে।

ব্রিজ (Bridge) : একাধিক ল্যান (LAN) কে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ওয়ান (WAN) গঠনের জন্য ব্রিজ ব্যবহার করা হয়। ব্রিজ সাধারণত একই ধরনের ল্যান (LAN) কে সংযুক্ত করে।

চিত্র : ব্রিজ

চিত্র : ওয়্যারল্যাস রাউটার

রাউটার (Router) : রাউটার এক ধরনের ইন্টারনেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস। একটি ব্রিজের মতোই রাউটার নেটওয়ার্কের ডেটার প্যাকেট ফিল্টার এবং তা ফরোয়ার্ড করতে পারে। রাউটারের দুইপাশের নেটওয়ার্ক পৃথক পৃথক নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮.৭ ল্যান এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

অতি সাধারণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একাধিক কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপনে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়। সবগুলো ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড যুক্ত থাকতে হয়। এরপর প্রয়োজন হয় হাবের। সবগুলো কম্পিউটারের একপ্রান্ত আরজে-৪৫ কানেক্টরের মাধ্যমে ক্যাট-৫/ক্যাট-৬ ক্যাবল দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং ক্যাবলের অপর প্রান্ত যুক্ত থাকে হাবের নির্ধারিত পোর্টের সাথে। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে যুক্ত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এরপর প্রতিটি কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের কন্ট্রোল প্যানেল হতে নেটওয়ার্ক কানেকশন অপশন ব্যবহার করে লোকাল এরিয়া কানেকশন তৈরি করতে হয়। প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য নির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে। এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটার অপর কম্পিউটারকে চিনতে পারে। ফলে পরস্পরের মধ্যে ডেটা আদান প্রদানের সুবিধা সৃষ্টি

হয়। এই প্রক্রিয়ায় ল্যানভুক্ত সকল ব্যবহারকারী একটি প্রিন্টারকেও ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, ল্যানের সাথে সুইচ, রাউটার ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হতে ইন্টারনেট এর কানেকশন গ্রহণ করে ল্যানভুক্ত সকল ব্যবহারকারীই বৃহত্তর ল্যান পরিবেশ বা ওয়ানে অর্থাৎ আরও সহজভাবে বলতে গেলে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে বিশ্বের বৃহত্তর নেটওয়ার্কভুক্ত হতে পারে।

প্রশ্নমালা—৮

■ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে কী বোঝায়?
২. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক মূলত কয় প্রকার ও কী কী?
৩. LAN ও WAN কী?
৪. হাব কী?
৫. সুইচ কী?
৬. ব্রিক কী?
৭. রাউটার কী?
৮. রিপিটার কী?
৯. নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডের কাজ কী?
১০. WWW কী?
১১. রিপিটারের কাজ কী?
১২. কোর কী?
১৩. ক্ল্যাডিড কী?
১৪. কোর ও ক্ল্যাডিডের ব্যাস কত?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর।
২. সুইচ ও হাবের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
৫. নেটওয়ার্কের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো বর্ণনা কর।
৬. নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির তালিকা প্রণয়ন কর।
৭. কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর।
৮. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য লেখ।
৯. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কানেকটরসমূহের নাম লেখ।
১০. ল্যান এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের করা যায় কীভাবে?

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।
২. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ক্যাবলসমূহের গঠন বর্ণনা কর।
৩. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কানেকটরসমূহের বর্ণনা দাও।
৪. নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইসসমূহের কাজ বর্ণনা কর।

অধ্যায়-৯
ইন্টারনেটের প্রাথমিক ধারণা

- **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**
  - ৯.১. ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেটের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারব।
  - ৯.২. ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট এর তুলনা করতে পারব।
  - ৯.৩. ইন্টারনেটের সুবিধাসমূহ উল্লেখ করতে পারব।
  - ৯.৪. সমাজে ইন্টারনেটের সুফল ও কুফল বর্ণনা করতে পারব।
  - ৯.৫. নেটওয়ার্ক সার্ভারের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
  - ৯.৬. ইন্টারনেট রিসোর্স ও সার্ভিসসমূহের বর্ণনা করতে পারব।

৯.১ ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট (Internet and Intranet)

ইন্টারনেট (Internet) হলো পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমবায়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটারের সাথে ভিন্ন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটারের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ইন্টারনেটওয়ার্কিং (Internetworking) বলা হয়। সে হিসেবে ইন্টারনেটকে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটওয়ার্কও বলা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সমন্বিত অবস্থাই ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের উপাদান হলো এর ব্যবহারকারী, তথ্য, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার প্রভৃতি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক হিসেবে ইন্টারনেটকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ বর্তমানে ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে গ্লোবাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত কোনো কম্পিউটার বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সার্ভার ও কম্পিউটার থেকে তথ্য অ্যাকসেস করতে পারে।

ইন্টারনেট বর্তমান বিশ্বের গতিময়তার মাইলফলক। এটি তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের এটি একটি অন্যতম মাধ্যম। ইন্টারনেট দিয়ে বিভিন্নভাবে তথ্য সঞ্চালন ও আহরণ করা যায়। নিত্য নতুন উদ্ভাবনের ফলে দিন দিন ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা এবং তথ্যের সমারোহ বেড়ে চলেছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন শব্দ ও বিষয়। সাইবার ক্যাশ, সাইবার ক্যাফ, সাইবার কয়েন, ইন্টারনেট কমার্স, ইন্টারনেট ফোন, ইলেকট্রনিক মেইল, ইলেকট্রনিক বুক, ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি, ইলেকট্রনিক ক্যাম্পাস এ ধরনের কয়েকটি বিষয়।

আরপানেট (Arpanet– Advanced Research Projects Administration Network) দিয়ে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস–এর UCLA ল্যাবরেটরিতে আরপানেটের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রথম কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এরপর ৫ ডিসেম্বর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় লস এঞ্জেল্স, মেনলো পার্ক, সান্তা বারবারা ও উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতায় এনে আরপানেট এর অফিসিয়াল উদ্বোধন ঘোষণা করে। প্রাথমিক অবস্থায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ নেটওয়ার্কের ব্যবহার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী

হয়নি। তারপর ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী ইন্টারনেট প্রোটোকল টিসিপি/আইপি উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়।

২০০০ সালে ইন্টারনেটে সংযুক্ত হোস্ট বা সেবাদানকারী কম্পিউটারের সংখ্যা ছিল একশ মিলিয়ন এবং ওয়ার্কস্টেশন কম্পিউটারের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ মিলিয়ন। বর্তমানে বিশ্বে ইন্টারনেটে সংযুক্ত কম্পিউটার-এর সংখ্যা প্রতি বছর দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা কয়েক বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।
ইন্টারনেট সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৯৬৯ হতে ১৯৮৩ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পর্যায়; এ সময়ে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ হয় ধীর গতিতে এবং বিশটি দেশে সংযুক্ত কম্পিউটারের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইশত। সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো আশির দশক। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক (NSFNET) প্রতিষ্ঠার ফলে আরপানেটের প্রভাব কমে যায় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক উন্নয়নে শরিক হয়। অবশেষে ১৯৯০ সালে আরপানেটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি ইন্টারনেট নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৯ সালে আইএসপি (ISP–Internet Service Provider) বা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান চালুর ফলে সকলের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইন্ট্রানেট এবং এক্সট্রানেট

ধরা যাক একটি বৃহৎ কোম্পানি যার অফিস দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় সদরে এবং দেশের বাইরেও আরও কয়েকটি দেশব্যাপি বিস্তৃত। এই কোম্পানির প্রতিটি অফিসেই ল্যান রয়েছে এবং দেশে ও দেশের বাইরের এই ল্যানগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত। এ ধরনের নেটওয়ার্ককে ওয়ান বলা যায়। তবে পার্থক্য হচ্ছে, এই ওয়ানের একটি অংশ বা রিসোর্স (যেমন : আর্থিক হিসাব, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক কৌশল ইত্যাদি) অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শুধু কোম্পানির নিজস্ব লোকজন এসব রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে। কোম্পানির সুরক্ষিত রিসোর্স সংবলিত এই নেটওয়ার্ক অংশটিকে বলা হয় ইন্ট্রানেট (Intranet)। ইন্টারনেটের মতোই সম্প্রতি ইন্ট্রানেটও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

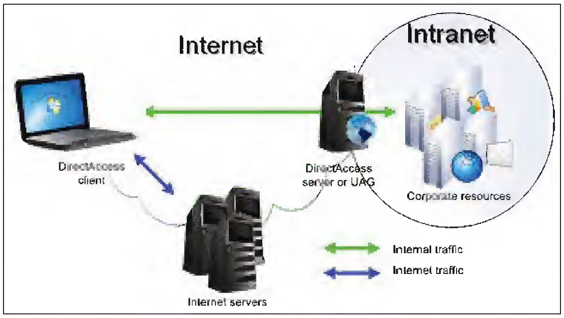

'ইন্ট্রানেট' হচ্ছে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা 'ইন্টারনেট প্রটোকল' প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য, কর্মক্ষম সিস্টেম অথবা কম্পিউটিং সেবা শেয়ার করে। কোন কোম্পানির ওয়ানের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা এর রিসোর্স সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে। এসব উন্মুক্ত রিসোর্সের মধ্যে থাকতে পারে কোম্পানির প্রোফাইল, প্রজেক্ট এবং প্রোগ্রাম, শেয়ার স্ট্যাটাস, বাৎসরিক প্রতিবেদন ইত্যাদি। কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ ইউজাররা এসব তথ্য দেখতে পারে বা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারে। ওয়ানের এ ধরনের উন্মুক্ত অংশকে বলা এক্সট্রানেট (Extranet)।

৯.২ ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট এর তুলনা

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইন্টারনেট (Internet) হলো পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমবায়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সমন্বিত অবস্থাই ইন্টারনেট। বর্তমানে ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে গ্লোবাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত কোনো কম্পিউটার বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সার্ভার ও কম্পিউটার থেকে তথ্য অ্যাকসেস করতে

পারে। এই তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। অন্যদিকে ইন্ট্রানেট হলো এমন ধরনের নেটওয়ার্ক যেটি ছোট একটি গ্রুপের ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের ভেতরের লোকজনই এটি অ্যাকসেস করতে পারে। তারা নিজেদের মধ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার ও সার্ভারসমূহের ভেতর বিভিন্ন ফাইল ও অ্যাপ্লিকেশন আদান-প্রদান ও ব্যবহার করতে পারে।

ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট এর মধ্যে তুলনা/পার্থক্যসমূহ

ইন্টারনেট	ইন্ট্রানেট
১. ইন্টারনেট হলো কম্পিউটারসমূহের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত।	১. ইন্ট্রানেটও কম্পিউটারসমূহের একটি নেটওয়ার্ক তবে সেটি নির্দিষ্ট একটি গ্রুপের সদস্যদের জন্যই নকশা করা হয়।
২. ইন্টারনেট নিজেই বিশাল সংখ্যক ইন্ট্রানেটকে ধারণ করে।	২. ইন্টারনেট থেকে ইন্ট্রানেটকে অ্যাকসেস করা যেতে পারে তবে সেটি কেবল নির্ধারিত ব্যক্তিদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে।
৩. ইন্টারনেটের ব্যবহারকারীর সংখ্যা অগণিত ও অসীম।	৩. ইন্ট্রানেট এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা সীমিত।
৪. ইন্টারনেটের ভিজিটর ট্রাফিক অসীম হয়ে থাকে।	৪. ইন্ট্রানেট এর ভিজিটর ট্রাফিক খুবই সীমিত।
৫. ইন্টারনেট বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য এনে সবার সামনে হাজির করে এবং এটি সকলের কাছেই সহজলভ্য।	৫. ইন্ট্রানেট শুধু নির্দিষ্ট গ্রুপের তথ্যই ধারণ করে।

সুতরাং, ইন্টারনেট হলো উন্মুক্ত, পাবলিক স্পেস অন্যদিকে ইন্ট্রানেটকে শুধু একটি প্রাইভেট স্পেসের জন্যই নকশা করা হয়। কোনো ইন্ট্রানেটকে ইন্টারনেট থেকে অ্যাকসেস করা গেলেও সেটি পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং শুধু অনুমোদিত ব্যক্তিরাই সেটি অ্যাকসেস করার অধিকার রাখে।

৯.৩ ইন্টারনেট এর প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাসমূহ

কম্পিউটার বিশ্বে ইন্টারনেট হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপ্লব। ইন্টারনেট হচ্ছে একটি কম্পিউটারনির্ভর নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, তাই কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহারের উপর ইন্টারনেটের ব্যবহার নির্ভর করে। শুরুতে কেবল তথ্যের আদান-প্রদান করার জন্য ইন্টারনেটের জন্ম হলেও যতই দিন যাচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের বহুমুখিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার বিস্তৃত হচ্ছে, এটা কেবল গবেষণাকর্ম বা সরকারি কর্মকান্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য ইন্টারনেট এখন উন্মুক্ত। বাণিজ্যিকভিত্তিতে ব্যবহার ইন্টারনেটকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। যেকোন ধরনের ব্যবসায়িক যোগাযোগ কিংবা বিজ্ঞাপনের জন্য ইন্টারনেটকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেট একাধারে সারা বিশ্বের ব্রডকাস্টিংয়ের দায়িত্ব নিতে পারে, তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং ভৌগোলিক সীমারেখা পার হয়ে যেকোন স্থানের ব্যক্তি এবং কম্পিউটারের Interaction-এর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। নিচে সংক্ষেপে ইন্টারনেটের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

তথ্যের আদান–প্রদান :

১. বর্তমানে ইন্টারনেট তথ্যের আদান–প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোন প্রান্তে ই–মেইল করে তথ্য প্রেরণ করা যায়। প্রচলিত ডাক ব্যবস্থায় এটি কল্পনাও করা যায় না। এসব ই–মেইলের সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট বা ফাইলগুলোও যুক্ত করে পাঠানো যায়।

২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া যায়।

৩. ভিওআইপি বা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকলের মাধ্যমে প্রচলিত ফোনের চাইতে খুব কম খরচে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে কথা বলা যায়।

তথ্য আহরণ :

১. ইন্টারনেট হলো তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার। এমন কোন তথ্য নেই যা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না। তাই যেকোন তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। গুগল, বিং, ইয়াহু, আলাতাভিস্তা প্রভৃতির মতো সার্চইঞ্জিনগুলোতে কাঙ্ক্ষিত তথ্যের নাম লিখে সার্চ করলেই বিশ্বের অসংখ্য সার্ভারে থাকা তথ্যগুলো চোখের সামনে হাজির হয়ে যায়। ব্যবহারকারী ব্রাউজিং করে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি কম্পিউটারের পর্দায় প্রদর্শন করতে পারেন কিংবা নিজের কম্পিউটারে সংরক্ষণ বা প্রিন্ট করতে পারেন।

২. বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, ফ্রিওয়্যার, বিনোদন উপকরণ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে :

১. আজকাল ইন্টারনেট জ্ঞান অর্জনের মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। জীবনের যেকোন প্রয়োজনীয় শিক্ষামুলক তথ্য ইন্টারনেট থেকে আহরণ করে জ্ঞানার্জন করা যায়।

২. অনলাইনে যেকোনো লাইব্রেরি থেকে কিংবা অনলাইনে অবস্থিত যেকোনো পুস্তক অধ্যয়ন করা যায়।

৩. ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়ে যেকোনো করসপন্ডেন্স কোর্স করা যায়। ঘরে বসেই বিশ্বের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে :

অনলাইনে চিকিৎসা সেবা নেওয়া যায়। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে বিশ্বের নামকরা চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে এই সেবা পাওয়া যায়। ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে বিদেশে না গিয়ে দেশেই চিকিৎসা নেবার ক্ষেত্রে এটি বেশ কার্যকর।

বিনোদন ও অনলাইন মিডিয়া :

১. ইন্টারনেট টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালুর ফলে ঘরে বসেই কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়।

২. অসংখ্য ইন্সট্যান্ট মেসেঞ্জারের মাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে থাকা যেকোন ব্যক্তির সাথে টেক্সট চ্যাট করা, কথা বলা, ভিডিও চ্যাট করা যায়। ইন্টারনেট রিলে চ্যাট (IRC) দিয়ে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায়।

৩. সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশিত হবার ফলে এখন ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা পড়া যায়। দৈনিক পত্রিকাগুলোর কাগজের কপি বাজারে আসার পূর্বেই তা অনলাইনে বসে পড়ে নেওয়া যায়। দেশ বিদেশে টাটকা খবরগুলো অডিও, ভিডিও এবং স্থিরচিত্রসহ সাথে সাথে জানিয়ে দিচ্ছে নিউজ সাইটগুলো।

বাণিজ্যিক :

১. ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্সের সাহায্যে ঘরে বসেই পণ্য কেনা যায়।

২. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইন্টারনেট একদিকে যেমন ব্যবসায়িক যোগাযোগ বা করসপন্ডেন্সের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে পণ্যের বিপণন ও বিজ্ঞাপনের জন্য ওয়েবপেজ বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। ওয়েবপেজে একটি বিজ্ঞাপন যেভাবে নিমেষেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কোন পত্রপত্রিকা মারফত তা সম্ভব নয়।

বৈশ্বিক অবস্থান সম্বন্ধীয় সেবা :

১. গুগল ম্যাপস এর মতো সেবার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন স্থানের স্যাটেলাইট মানচিত্র দেখে ওই স্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ওইসব স্থানের ছবি জুম করে বড় করে খুব কাছে থেকেও দেখা যায়।

২. গ্লোবাল পজিশনিংয়ের সেবাও পাওয়া সম্ভব ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

৯.৪ সমাজে ইন্টারনেট এর সুফল ও কুফল

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বিশ্বের দেশগুলো আজ বৃহৎ আকারের এক সামাজিক গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর তা সৃষ্টি করেছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট এর ব্যাপক ব্যবহার। ইন্টারনেটের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনের গতিবিধি পাল্টে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিক্ষাব্যবস্থা, অফিস-আদালত থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনে অপরিহার্য প্রযুক্তি উপকরণে পরিণত হচ্ছে ইন্টারনেট। ফলে সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ক্রিয়া ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে।

সমাজে ইন্টারনেট এর সুফল

সমাজে ইন্টারনেটের বেশ কিছু সুফল পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. ইন্টারনেট আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের তথ্য প্রদান করছে। মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী তথ্য পাওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দিয়েই তথ্যের মহাসমুদ্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে আনা যাচ্ছে।

২. ইন্টারনেট এর সাহায্যে বিভিন্ন বিশ্বকোষ ও অভিধান হতে তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ ঘটছে। শিক্ষার প্রসারে যা বিশাল ভূমিকা রাখছে। এতে সমাজের উন্নতি ঘটছে।

৩. ইন্টারনেট পুরো বিশ্ব এবং এর আগ্রহের বিষয়গুলোকে সুসমন্বয় করছে। এক দেশের সমাজের সাথে অন্য দেশের সমাজের মিশ্রণ ঘটিয়ে এদের মিথস্ক্রিয়াতে ভূমিকা রাখছে।

৪. একই ধরনের মানসিকতার লোকজনের চিন্তাধারার বিনিময় ঘটাতে সাহায্য করছে। ফলে একই দেশ কিংবা নিজ ভৌগোলিক সীমানার বাইরে গিয়েও মানুষ একত্রিত হতে পারছে। ভাবনার আদান-প্রদান ঘটাতে পারছে। সমাজের উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. ইন্টারনেট পুরো বিশ্বকে মানুষের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। মানুষ এখন সেই ভিলেজের বাসিন্দা। ফলে নাটকীয় দ্রুততার সাথে সামাজিক উন্নতি ঘটছে।

৬. ই-গভর্নেন্স এর প্রচলন ঘটেছে। ফলে সরকারি কাজগুলো এখন অনলাইনের আওতায় আসছে। মানুষের সরকারি তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হচ্ছে এবং মানুষের দ্বারগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহকে নিয়ে আসা যাচ্ছে। এতে দেশ ও সমাজে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে চলেছে।

৭. ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্তমান বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে কী ঘটছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে। বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, ফ্যাশন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের খবরাখবর ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যাচ্ছে। প্রতিটি সমাজের লোকজনই এখন অনেক বেশি আপডেট থাকার সুযোগ পাচ্ছে।

৮. ইলেকট্রনিক কমার্স ব্যবসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ঘরে বসেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার ও তার পেমেন্ট করা যাচ্ছে। আবার ঘরে বসেই এসব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এটি কেনাকাটার ক্ষেত্রে সমাজে একটি ভিন্ন ধারার সূচনা করেছে।

৯. ঘরে বসেই ইন্টারনেট এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার ফলে এসব কাজের জন্য মানুষের ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমে আসছে। এতে সময় বেঁচে যাচ্ছে। মানুষ তার পরিবার ও সমাজে সেই সময়টি নানা কাজে ব্যবহার করতে পারছে।

১০. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্কিং মাধ্যম ও শেয়ারিং সাইটসমূহ যেমন– ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যুক্ত। পুরনো দিনের বন্ধুদেরও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এসব মাধ্যমে। ফলে হারানো সম্পর্ক নতুন করে জুড়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

১১. বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, গঠনমূলক প্রচারণা, উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম এখন ইন্টারনেটে পরিচালনা করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই কাজগুলোকে আরও গতিময়তা দিচ্ছে। এককথায়, সমাজের ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সমাজে ইন্টারনেট এর কুফল

সমাজে ইন্টারনেটের বেশ কিছু কুফল পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. শিক্ষার্থী, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা তাদের মূল্যবান সময়গুলোকে গঠনমূলক কাজে না লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটে ডুবে থাকছে যা তাদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং শিক্ষাজীবনে ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

২. ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের সাথে চ্যাটিং করে দীর্ঘ নিষ্ফল সময় পার করছে যা তাদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

৩. ইন্টারনেটে কুরুচিপূর্ণ ছবি ও যৌনতার বিভিন্ন উপকরণসমূহ খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে বলে তা মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা।

৪. ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে কম্পিউটারের সংযুক্তির ফলে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরাপত্তা কোড ভেঙ্গে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন কম্পিউটারের স্মৃতিতে রক্ষিত ডেটার পরিবর্তন বা ক্ষতিসাধন একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া অনুমতি না নিয়ে ব্যক্তিগত ডেটা অন্যরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে। এতে সমাজের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল সমাজে হ্যাকার নামক একটি শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে। হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি চুরি হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের নম্বর চুরি হওয়ার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা আর থাকছে না। এতে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সুনামও ক্ষুন্ন হচ্ছে।

৬. ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের প্রাপ্যতা অনেক বেশি নিশ্চিত হওয়ার ফলে ক্ষতিকর তথ্যও সকলের হাতের নাগালে চলে এসেছে। এসব তথ্যর মধ্যে হানাহানি, মারামারির মতো সাংস্কৃতিক উপাদানও রয়েছে যা অন্য দেশের সমাজকেও প্রভাবিত করছে।

৭. অনলাইনে ভায়োলেন্সপূর্ণ কম্পিউটার গেমস দেখে ও খেলে শিশু–কিশোররা ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠতে পারে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া এসব অনলাইন কম্পিউটার গেমস মানুষের মাঝে আসক্তি তৈরি করছে যার ফলে মৃত্যুবরণ করার মতো ঘটনাও ঘটছে।

৮. ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের টরেন্ট সাইটের আবির্ভাবের ফলে এগুলোর মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, মুভি কিংবা অন্য যেকোনো কনটেন্ট সহজেই মানুষের হাতে চলে আসছে। ফলে পাইরেসির ব্যাপক বিস্তার ঘটছে।

৯. কোনো কারণ ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেট এর ব্যবহার মানুষের মধ্যে এক ধরনের আসক্তি সৃষ্টি করছে। এটি মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সমাজে এর কুফল ক্রমেই প্রকট হচ্ছে।

১০. সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর বহুল প্রচলন ঘটায় মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাতে বুঁদ হয়ে থাকছে। এই আসক্তি চাকরিজীবী মানুষকে কাজের প্রতি অনিহা তৈরিতে ও কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখছে। শিক্ষার্থীরাও তাদের পড়ালেখায় ফাঁকি দিচ্ছে।

১১. সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর মাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজে হানাহানি, মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির প্রসার ঘটানোর অপচেষ্টাও লক্ষ করা যাচ্ছে যা সমাজের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

ইন্টারনেটকে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক দুইভাবেই ব্যবহার করা যায়। তবে এটি যাতে ইতিবাচকভাবেই ব্যবহৃত হয় সেজন্য বিভিন্ন দেশের সরকার নিজস্ব উপায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

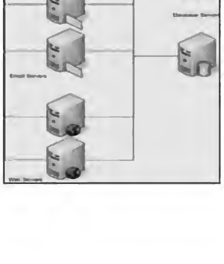

৯.৫ নেটওয়ার্ক সার্ভার

নেটওয়ার্ক সার্ভার হলো একটি কম্পিউটার সিস্টেম যা তথ্য এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যেগুলো একটি নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে শেয়ার হয় সেগুলোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহস্থল (Central Depository) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেকোনো নেটওয়ার্কের

জন্য সার্ভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সার্ভারকে বলা যায় নেটওয়ার্কের প্রাণ। সার্ভার ঠিকমতো সার্ভিস দিতে ব্যর্থ হলে পুরো নেটওয়ার্কটি ভেঙে পড়তে বাধ্য। নেটওয়ার্কভুক্ত অন্যান্য পিসিকে সাপোর্ট বা সার্ভিস প্রদানে সার্ভার সর্বদা নিয়োজিত থাকে। সার্ভারের ভূমিকা কী হবে সেটা নির্ভর করছে কিন্তু ঐ নেটওয়ার্কের ধরনের উপর। এবার বিভিন্ন ধরনের সার্ভার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

ক. **ফাইল সার্ভার (File Server) :** এ ধরনের সার্ভার নেটওয়ার্ক ইউজারদের ফাইল শেয়ার করার সুযোগ করে দেয়। এছাড়া ফাইল সার্ভার ডেটা বা ফাইল সংরক্ষণ (Storage), উত্তোলন (Retrieve) এবং এক পিসি থেকে অন্য পিসিতে স্থানান্তরের সুবিধা প্রদান করে। ফাইল সার্ভার ক্লায়েন্ট পিসির জন্য কোন প্রকার ডেটা প্রসেসিং এর কাজ করে না।

খ. **প্রিন্ট সার্ভার (Print Server) :** প্রিন্ট সার্ভার মূলত কোন নেটওয়ার্কে একটি একক প্রিন্টার বা কতকগুলো প্রিন্টারের গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশেষ করে ক্লায়েন্ট পিসি থেকে আগত প্রিন্টিং অর্ডারকে জমা করে রাখে। এ বিষয়টিকে বলা হয় কিউইয়িং (Queuing) বা স্পুলিং (Spooling)। প্রিন্ট সার্ভার স্পুলারের সাহায্যে প্রিন্ট অর্ডারকে ধরে রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রিন্টার প্রিন্ট করার উপযোগী হয়। প্রিন্টার একবার প্রস্তুত হয়ে গেলেই প্রিন্ট সার্ভার তাতে প্রিন্টিং কাজ (Print Job) পাঠিয়ে দেয়।

গ. **এপ্লিকেশন সার্ভার (Applicatoin Server) :** এ ধরনের সার্ভার নেটওয়ার্কের অতিরিক্ত কম্পিউটিং ক্ষমতা ও অত্যন্ত দামী সফটওয়্যার ক্লায়েন্ট পিসিকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়। এপ্লিকেশন সার্ভার মূল প্রোগ্রামটি তার শক্তিশালী মেশিনে চালিয়ে দেয় এবং ক্লায়েন্ট পিসির চাহিদা অনুযায়ী ডেটা প্রসেস করে ফলাফল পুনরায় ক্লায়েন্টের নিকট ফেরত পাঠায়। এতে ক্লায়েন্ট পিসির বোঝা অনেকখানি হালকা হয়ে যায়।

ঘ. **মেসেজ সার্ভার (Message Server) :** ফাইল সার্ভিসের মাধ্যমে ডেটা শুধু ফাইলের আকারে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে চলাচল করে। কিন্তু মেসেজ সার্ভিসের সাহায্যে ডেটা গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, টেক্সট এবং বাইনারি আকারে নেটওয়ার্কে চলাচল করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে এ কারণে মেসেজ সার্ভিস নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। মেসেস সার্ভিসকে ইউজার, ডকুমেন্ট এবং এপ্লিকেশনসমূহের মধ্যে জটিল প্রকৃতির ইন্টারএ্যাকশনের (Interaction) সমন্বয় সাধন করতে হয়। মেসেজ সার্ভিস মূলত ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে—

- ইলেকট্রনিক মেইল বা ই–মেইল (Electronic Mail)
- ওয়ার্কগ্রুপ এপ্লিকেশন (Workgroup Application)
- অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এপ্লিকেশন (Object Oriented Application)
- ডিরেক্টরি সার্ভিসেস (Directory Services)

ঙ. **ডেটাবেজ সার্ভার (Database Server) :** নেটওয়ার্কে ডেটাবেজ সার্ভার অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির পিসি বা ওয়ার্কস্টেশনকে শক্তিশালী ডেটাবেজ ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। অধিকাংশ ডেটাবেজ সিস্টেমই ক্লায়েন্ট-সার্ভার (Client-Server) ভিত্তিক। ক্লায়েন্ট-সার্ভার ডেটাবেজ বলতে যা বুঝানো হয় তা হলো ডেটাবেজের দুটো অংশ থাকবে। এর একটি অংশ রান করবে ক্লায়েন্ট পিসিতে এবং অন্যটি সার্ভারে। মূলত ক্লায়েন্ট পিসিতে ডেটাবেজের একটি ইন্টারফেস (Interface) তৈরি হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ফাংশনগুলো (যেমন কোন বিশেষ ডেটার জন্য অনুরোধ) এখানে কাজ করে। ডেটাবেজ অপারেশনের ভারী ফাংশনগুলো সম্পন্ন হয় সার্ভার প্রান্তে। ডেটাবেজের সার্ভার অংশে মূলত যে কাজগুলো সম্পন্ন হয় তা হলো— ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, ইউজার বা ক্লায়েন্টদের পক্ষ থেকে আসা বিভিন্ন কোয়েরি বা প্রশ্ন প্রসেস করা এবং প্রশ্নকারী ক্লায়েন্টকে এর উত্তর পাঠানো ইত্যাদি। এর বাইরে আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস প্রদানের জন্য ডেটাবেজ সার্ভার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উল্লেখযোগ্য সার্ভিসগুলোর মধ্যে আছে ডেটা সিকিউরিটি প্রদান, ডেটাবেজ অপটিমাইজেশন (Optimization) অর্থাৎ ক্লায়েন্টদের চাহিদা মোতাবেক ডেটাবেজ ডিজাইন করা, ডেটা বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউশন (Distribution) ইত্যাদি।

এখানে একটি বিষয়ে বলে রাখা ভালো যে, যথেষ্ট ক্ষমতাধর একটি মাত্র সার্ভার উপরিউক্ত পাঁচটি অর্থাৎ ফাইল, প্রিন্ট, এপ্লিকেশন, মেসেজ এবং ডেটাবেজ সার্ভার হিসেবে একই সময়ে কাজ করতে পারে। তবে নেটওয়ার্কের সর্বোত্তম দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে এক একটি সার্ভিসের জন্য পৃথক পৃথক সার্ভার ব্যবহারই শ্রেয়তর। এ ধরনের সার্ভারকে বলা হয় ডেডিকেটেড (Dedicated) সার্ভার। উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার সার্ভারের বাইরেও এখন মেইলসার্ভার (MailServer), ওয়েবসার্ভার (WebServer) ইত্যাদি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৯.৬ ইন্টারনেট রিসোর্স ও সার্ভিসসমূহ

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট হলো বিশ্বের একটি বিশাল তথ্য ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার তার অফুরন্ত তথ্যসম্পদ হতে চাহিদামতো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণকে তথ্যের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে মানুষ পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা। এখানে ইন্টারনেটের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সার্ভিস নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব : ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে অনেকে সংক্ষেপে ওয়েব নামেও অভিহিত করে থাকেন। ওয়েব বলতে আমরা বুঝি একটি বৃহৎ সিস্টেমকে যা অনেকগুলো সার্ভার (যা ওয়েব সার্ভার হিসেবে বিবেচিত হয়) সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। এসব ওয়েব সার্ভার ইন্টারনেট ইউজারদের যেকোনো ধরনের তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। এ তথ্য হতে পারে প্রচলিত টেক্সট ফাইল, ছবি, শব্দ বা অন্য কোনো ফরমেটের ডেটা। এ সকল তথ্য ব্যবহার করতে হলে ইউজারকে একটি ক্লায়েন্ট বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয় যা ব্রাউজার (Browser) নামে পরিচিত। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কতিপয় ব্রাউজার হচ্ছে মোজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, মাইক্রোসফট এজ (প্রাক্তন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার), অপেরা, নেটস্কেপ নেভিগেটর ইত্যাদি।

ই-গভর্নেন্স সার্ভিস : এই সার্ভিসের মাধ্যমে যাবতীয় সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো হয়। শাসন ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রচলনের ফলে সর্বত্র স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত হয়। জনগণ অতি সহজে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবাসমূহ ভোগ করতে পারে।

সার্চ ইঞ্জিন সার্ভিস : এই সেবার মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ বড় বড় সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তাদের কাঙ্ক্ষিত তথ্যকে খুঁজে বের করে আনতে পারে। গুগল, বিং, ইয়াহু ইত্যাদির মতো আরও বেশ কিছু সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারকারীদেরকে তথ্য, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি ধরনে তথ্য সরবরাহ করে। সার্চিং সেবা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবার একটি।

ইমেইল সার্ভিস : ইলেকট্রনিক মাধ্যমে চিঠি বা মেইল পাঠানোর পদ্ধতিই হলো ইমেইল। ইমেইল এর প্রচলনের ফলে আজকাল মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। চাইলে মেইলের সাথে বিভিন্ন ডকুমেন্টকে অ্যাটাচ করেও পাঠানো যায়। এটি সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটায়। অনলাইন ভিত্তিক বিনামূল্যের বেশ কিছু ইমেইল সেবা রয়েছে। এদের মধ্যে জনপ্রিয় হলো– জিমেইল, ইয়াহু মেইল প্রভৃতি।

চ্যাটিং ও ভিডিও কল সার্ভিস : টেক্সট লিখে লিখে আলাপচারিতাকে চ্যাটিং বলা হয়। ইন্টারনেট এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন পরস্পরের মধ্যে পৃথকভাবে কিংবা গ্রুপ আকারে চ্যাটিং করতে পারে। এছাড়া স্কাইপ কিংবা এজাতীয় অন্য কোনো ভিডিও কল কলার অ্যাপ ব্যবহার করে সরাসরি ভিডিও কল করেও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। মোবাইল ফোনে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধা চালুর ফলে ভিডিও কলিং এর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ক্লাউড ভিত্তিক স্টোরেজ সার্ভিস : বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড ভিত্তিক স্টোরেজ সেবাসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এদের কিছু কিছু পয়সা দিয়ে ব্যবহার করতে হয় আবার কিছু কিছু বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ, ড্রপবক্স ইত্যাদির মতো বেশ কিছু স্টোরেজ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডকুমেন্টসমূহকে এখন অনলাইনেই সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং ইন্টারনেট রয়েছে বিশ্বের এমন যেকোনো স্থান ও যেকোনো ডিভাইস থেকে এসব তথ্য ও ডকুমেন্টকে অ্যাকসেস করা যায়।

ই-লার্নিং সার্ভিস : ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাই হচ্ছে ই-লার্নিং। ই-লার্নিং পদ্ধতিতে যে কোন সময় যে কোন স্থানে জানা বা শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। বর্তমানে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ই-লার্নিং পোর্টাল চালু হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই পছন্দের বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। এদের কিছু সার্ভিস বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। যেমন– খান একাডেমি (https://www.khanacademy.org/)। আবার বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের কোর্সসমূহ নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে অনলাইনে করার সুযোগ দেয়। ঘরে বসেই ডিগ্রি অর্জন করা যায়।

এম লার্নিং : এম লার্নিং (মোবাইল লার্নিং) হলো ই-লার্নিং এর একটি পদ্ধতি। এতে যে কোন স্থানে বসে যেমন গাড়িতে বা ঘরের বাহিরে বসে ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্ট ফোন, নোটবুক, ই-বুক রিডার ইত্যাদি প্রযুক্তি ডিভাইস ব্যবহার করে ই-লার্নিং করতে পারে।

ভিডিও শেয়ারিং সার্ভিস : নিজের তোলা ভিডিওকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে চালু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও শেয়ারিং সাইটের। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ইউটিউব (https://www.youtube.com/)। এসব সেবা এতটাই সমৃদ্ধ যে শিক্ষামূলক থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের বিষয় নিয়েই ভিডিও পাওয়া যায়। এটি মানুষের জানা ও জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করে চলেছে। এসব সেবার বেশির ভাগই বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

ফটো শেয়ারিং সার্ভিস : ফ্লিকার, শাটারফ্লাই, ইন্সটাগ্রাম, ফটোলগ, ডেভিয়েন্ট আর্ট ইত্যাদির মতো নানা ধাঁচের ফটো শেয়ারিং সাইটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের তোলা ও ডিজাইন করা ছবিগুলো সকলের সাথে শেয়ার করতে পারে।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিস : সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো বর্তমান সময়ে লোকজনকে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকার বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। দীর্ঘদিন যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না তাদের সাথেও এর মাধ্যমে যুক্ত থাকা যায়। এছাড়া নতুন নতুন বন্ধুও তৈরি করা যায়। বিভিন্ন গ্রুপ ও পেইজ তৈরি করে তাতে একই ঘরানার লোকজনকে একত্রিত করা যায়, সামাজিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমও পরিচালনা করা যায়। ফেসবুক, টুইটার, লিংকডইন ইত্যাদি সেবার মাধ্যমে মানুষ এখন পরস্পরের সাথে আগের চাইতে অনেক বেশি সংযুক্ত থাকার সুবিধা পাচ্ছে।

নিউজ সার্ভিস : বর্তমান যুগ হলো তথ্যনির্ভর। প্রতিমুহূর্তে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো অনলাইনের কল্যাণে তাৎক্ষণিকভাবেই বিশ্বের লোকজনের সামনে টেক্সট, ছবি ও ভিডিও আকারে হাজির হচ্ছে। বিভিন্ন নিউজ পোর্টালগুলো এই সেবাকে সহজলভ্য করে তুলেছে।

ইন্টারনেট টিভি ও রেডিও সার্ভিস : ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের টিভি ও রেডিও সার্ভিসের মাধ্যমে এখন দেশ বিদেশের নিয়মিত টিভি ও রেডিও স্টেশনগুলোর সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপভোগ করা যাচ্ছে। পাশাপাশি শুধুমাত্র ইন্টারনেট ভিত্তিক টিভি ও রেডিও চ্যানেলও পরিচালনা করা যাচ্ছে। এদের কিছু কিছু সার্ভিস বিনামূল্যের আবার কিছু সার্ভিস নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়।

ওয়েবকাস্টিং : ইন্টারনেটে সম্প্রচারকেই ওয়েবকাস্ট বলা হয়। স্ট্রিমিং মিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি একক কনটেন্ট সোর্সকে অসংখ্য নিরবচ্ছিন্ন শ্রোতা ও দর্শকের কাছে বিতরণ করা যায়। ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে লাইভ কিংবা অন ডিমান্ড এর ভিত্তিতে সম্প্রচার করা যায়। বর্তমান সময়ের টিভি ও রেডিও স্টেশনগুলো ওয়েবকাস্ট প্রক্রিয়ায় অনলাইনেও সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। ফলে বিশ্বের যে প্রান্তে কোনো টিভি বা রেডিও চ্যানেল সহজলভ্য নয় তা ইন্টারনেটে সহজলভ্য হয়ে উঠে। তাছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের লাইভ ইভেন্টও ওয়েবে সম্প্রচার করা যায়। ফলে অতি দ্রুত বহু সংখ্যক লোকের কাছে তথ্যকে পৌঁছে দেওয়া যায়।

ই-কমার্স সার্ভিস : ই-কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ বিদেশের নানা পণ্যের অর্ডার দেওয়া যায় এবং ঘরে বসেই সেসব পণ্য গ্রহণও করা যায়। আর্থিক লেনদেন ঘটে ক্রেডিট কার্ড জাতীয় ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে। বর্তমানে ই-কমার্স সেবা সারাবিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়।

ই-ব্যাংকিং সার্ভিস : এর মাধ্যমে ঘরে বসেই কিংবা বাড়ির কাছাকাছি থেকে ব্যাংকিং কাজকর্ম সারা যায়। পেমেন্ট ট্রান্সফার, বিভিন্ন বিল পরিশোধ, অর্থ উত্তোলনসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা পাওয়া যায়। এতে সময় ও অর্থের অনেক সাশ্রয় ঘটে।

প্রশ্নমালা—৯

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইন্টারনেট কী?
২. ইন্ট্রানেট কী?
৩. ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয় কীভাবে?
৪. এক্সট্রানেট কী?
৫. তথ্য আদান প্রদানে ইন্টারনেটের গুরুত্ব লেখ।
৬. নেটওয়ার্ক সার্ভার কী?
৭. ই-গর্ভনেন্স সার্ভিস কী?
৮. ইমেইল সার্ভিস কী?
৯. ওয়েবকাস্ট কী?
১০. জনপ্রিয় একটি ই—লার্নিং সাইটের নাম উল্লেখ কর।
১১. পূর্ণ অর্থ লেখ : ARPANET, NSFNET, ISP।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২. ইন্টারনেট প্রচলন ঘটে কীভাবে?
৩. ইন্ট্রানেট ও এক্সট্রানেটের পার্থক্য কী?
৪. ফাইল সার্ভার কী?
৫. প্রিন্ট সার্ভারের কাজ লেখ।
৬. অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের কাজ কী?
৭. মেসেজ সার্ভার কী? এর শ্রেণিবিভাগগুলো উল্লেখ কর।
৮. ডেটাবেজ সার্ভার বলতে কী বোঝায়?
৯. ওয়েবকাস্ট বলতে কী বোঝায়?

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. নেটওয়ার্কের সুবিধাবলি বর্ণনা কর।
২. ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণ কর।
৩. ইন্টারনেটে প্রাপ্ত সুযোগ—সুবিধাগুলো লেখ।
৪. সমাজে ইন্টারনেটের সুফলগুলো আলোচনা কর।
৫. সমাজে ইন্টারনেটের কুফলগুলো আলোচনা কর।
৬. বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক সার্ভার বর্ণনা কর।
৭. ইন্টারনেট রিসোর্স ও সার্ভিসসমূহের বর্ণনা দাও।

অধ্যায়-১০
ই-মেইলের প্রাথমিক ধারণা

- **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**
  - ১০.১. ই–মেইল কি তা ব্যক্ত করতে পারব।
  - ১০.২. ই–মেইল এর সুবিধা উল্লেখ করতে পারব।
  - ১০.৩. ই–মেইলের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ সফটওয়্যার এর তালিকা তৈরি করতে পারব।
  - ১০.৪. ই–মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারব।
  - ১০.৫. ই–মেইল প্রেরণের বিভিন্ন ফিচার (CC, BCC, Attached File, Download File) ব্যবহার করতে পারব।

১০.১ ই-মেইল (E-mail or Email) কী?

ই-মেইল (E-mail/Email – Electronic Mail) হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা। ই-মেইল করে টেক্সট বার্তার সাথে কম্পিউটার ফাইলও পাঠানো যায়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত স্থানের মধ্যে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের যেকোনো স্থানে ই-মেইল পাঠানো যায়।

ডাকযোগে চিঠি পাঠাতে হলে যেমন ঠিকানা প্রয়োজন তেমনি ই-মেইল পাঠাতেও ঠিকানা প্রয়োজন। ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের ঠিকানা আছে। যেমন : admin@systechpublications.com, mrspsd@gmail.com। বর্তমানে অনেক ওয়েব সার্ভার যেমন : জিমেইল, ইয়াহু, হটমেইল ইত্যাদি ব্যবহার করে ফ্রি ই-মেইল একাউন্ট খোলা যায়। ই-মেইল ঠিকানার দুইটি অংশ। প্রথমটি হলো User এবং @ চিহ্নের পরে থাকে host-এর নাম। User-এ ব্যবহারকারীর পরিচিতি (User identify) এবং host হলো ডোমেইন নাম (Domain Name)।

ই-মেইল প্রোগ্রামে ঢুকে কিংবা ওয়েব ভিত্তিক মেইল এর সাইটে গিয়ে ই-মেইল টাইপ করে প্রাপকের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে Send নির্দেশ দিলে ই-মেইল তথ্য সরাসরি প্রাপকের কম্পিউটারে না গিয়ে তার টার্মিনাল বা ওয়ার্কস্টেশন বা সার্ভারে গিয়ে জমা হয়। প্রাপক তার নামে কোন মেইল আসছে কীনা তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলে টার্মিনাল থেকে প্রাপকের কম্পিউটারে মেইলটি চলে আসে। একটি মেইল একই সঙ্গে অনেকের নিকট পাঠানো যায়। অন্য প্রোগ্রামে করা ফাইলকে (টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও) ই-মেইলের সাথে যুক্ত করে পাঠানো যায়। একে ফাইল অ্যাটাচমেন্ট (Attachment) বলা হয়। ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল সেবাগুলোতে সাধারণত সর্বোচ্চ ২৫ মেগাবাইটের তথ্য বা ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করা যায়।

বর্তমানে ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল সেবা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে জিমেইল (Gmail), ইয়াহু! (Yahoo!), হটমেইল (Hotmail), ইয়ানডেক্স.মেইল (Yandex.Mail), রিডিফ (Rediff) ইত্যাদি অন্যতম।

১০.২ ই-মেইল এর সুবিধাসমূহ

ইলেকট্রনিক মেইলের সুবিধা বহুবিধ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. এটি দ্রুত গ্রাহকের কাছে মেইল পৌঁছে দিতে পারে।
২. ই-মেইল পাঠাতে খরচ কম পড়ে
৩. যে কোন সময় ই-মেইল আদান প্রদান করা যায়।
৪. এর ফ্লেক্সিবিলিটি অন্যান্য সিস্টেমের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

৫. যথাযথ সিস্টেম ব্যবহার করে ই-মেইলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করা যায়।

বর্তমানে আমরা মেইল শব্দটি শোনা মাত্র ধরে নেই যে এটি ই-মেইল। ইলেকট্রনিক মেইলের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে আমরা যেন এখন পোস্টাল মেইল থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় প্রচলিত পোস্টাল মেইলের তুলনায় ইলেকট্রনিক মেইল ব্যবহার অনেক বেশি সুবিধাজনক।

১০.৩ ই-মেইল এর জন্য ব্যবহৃত সাধারণ সফটওয়্যারসমূহ

ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল এর বাইরে ই-মেইলের জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রোগ্রামও ব্যবহার করা যায়। এদের কিছু বিনামূল্যে পাওয়া যায় আবার কিছু কিনে ব্যবহার করতে হয়। বিনামূল্যের ই-মেইল ক্লায়েন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- মোজিলা থান্ডারবার্ড (Mozilla Thunderbird)
- ইএম ক্লায়েন্ট (eM Client)
- ক্লজ মেইল (Claws Mail)
- ফক্সমেইল (Foxmail)
- অপেরা এমং মেইল ক্লায়েন্ট (Opera M2 Mail Client)
- পেগাসাস মেইল (Pegasus Mail)
- ইনক্রেডিমেইল (Incredimail)
- মালবেরি (Mulberry)
- ড্রিমমেইল (DreamMail)
- সিলফিড (Sylpheed) ইত্যাদি।

কিনে ব্যবহার করতে হয় এরূপ ই-মেইল ক্লায়েন্ট এর মধ্যে রয়েছে–

- আউটলুক (Outlook)
- জিমব্রা (Zimbra)
- ইঙ্কি (Inky)
- পোস্টবক্স (Postbox) ইত্যাদি।

১০.৪ ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ করা

ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ করা খুবই সহজ। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ই-মেইল ক্লায়েন্ট ব্যবহার করলে সেটি আয়ত্বে আসতে কিছুটা সময় নিতে পারে। তবে ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল সেবাগুলো ব্যবহার করলে ঝামেলা অনেক কম। খুব সহজেই এগুলো ব্যবহার করা যায়। বিনামূল্যের হওয়ায় এদের ব্যবহারকারীও বেশি। এই ধরনের সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে জিমেইল (Gmail) সর্বশীর্ষে অবস্থান করছে। আমরা বহুল ব্যবহৃত এই জিমেইল নিয়েই এখানে আলোচনা করবো।

জিমেইলে ফ্রি অ্যাকাউন্ট খোলা

জিমেইল বর্তমান সময়ের খুবই জনপ্রিয় একটি ফ্রি ই-মেইল সেবা। জনপ্রিয় সার্চইঞ্জিন গুগল এই সেবা দিয়ে থাকে। জিমেইলে ফ্রি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. অনলাইনে থাকা অবস্থায় যেকোনো ওয়েব ব্রাউজারে http://mail.google.com লিখে এন্টার কী চাপতে হবে। পেইজ ওপেন হবে।

২. পেইজের নিচের ডান দিকে থাকা Create an Account বাটনে ক্লিক করতে হবে। নিচের মতো একটি অ্যাকাউন্ট তৈরির পেইজ প্রদর্শিত হবে।

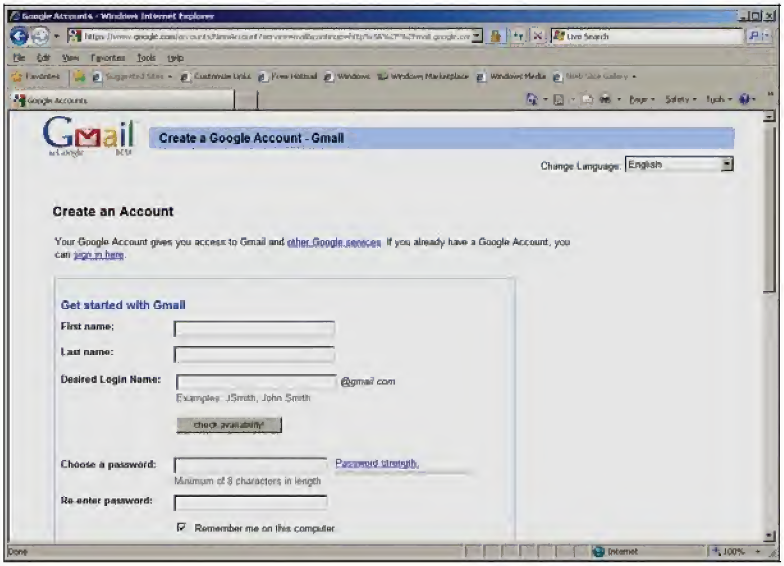

৩. এখানে থাকা Get started with Gmail অংশের অধীন থাকা ঘরগুলো আপনাকে পূরণ করে দিতে হবে। প্রথমে First name: এবং Last name: লিখতে হবে। এরপর যে নামে জিমেইলের অ্যাকাউন্টটি আশা করা হচ্ছে সেই নামটি Desired Login Name: অংশে লিখতে হবে। যে নামটি লিখা হবে সেই নামেই যে আইডি পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ কাঙ্ক্ষিত আইডি অন্য কোনো ব্যক্তি আগে নিয়ে ফেললে সেটি পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোনো নাম দিয়ে তা করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত আইডি খালি আছে কীনা তা পরীক্ষা করার জন্য ওই ঘরের নিচের দিকে থাকা Check avaibility! বাটনে ক্লিক করতে হবে। আইডি খালি না থাকলে বার্তা প্রদর্শিত হবে এবং তার কাছাকাছি কোনো আইডি দেবার জন্য কিছু নামের তালিকা দেখাবে। ইচ্ছে করলে সেগুলো থেকে কোনোটি নেওয়া যাবে। আবার অন্য কোনো নামও নতুন করে দেওয়া যাবে। নিচের চিত্রটি দেখলে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

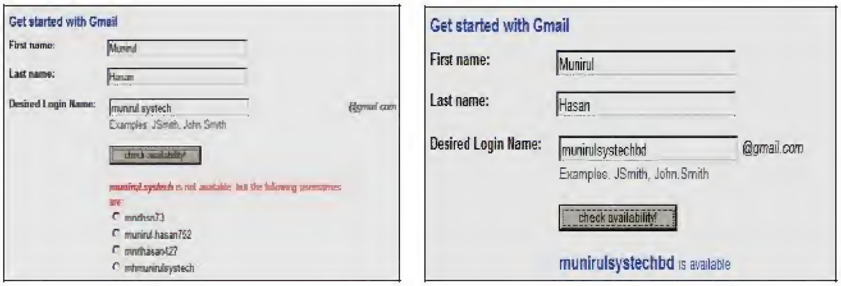

৪. আইডি গৃহীত হলে Choose a password: এর ঘরে একটি পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে। পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই আট অক্ষরের হতে হবে। Re-enter password: এর ঘরে পুনরায় ওই একই পাসওয়ার্ডটি লিখে দিতে হবে। এরপর তার নিচে থাকা Security Question: এর ঘর হতে পপআপ বাটনে ক্লিক করে যেকোনো একটি প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে এবং তার নিচের Answer: ঘরে ওই প্রশ্নের উত্তরটি লিখে দিতে হবে।

৫. Secondary email: এর ঘরে অন্য কোনো মেইল সেবার কোনো অ্যাকাউন্ট থাকলে সেটি লিখে দিতে হবে। Location: এর ঘরে বাংলাদেশ নিজে থেকেই চলে আসবে। কোনো কারণে সেটি না আসলে এর পপআপ বাটনে ক্লিক করে Bangladesh নামটি সিলেক্ট করে দিতে হবে।

৬. এবার Word Verification: ঘরে আসতে হবে। এখানে একটি শব্দ প্রদর্শিত হবে। সেই শব্দটির হুবহু শব্দের নিচের টেক্সট বক্সে লিখে দিতে হবে। একটু খেয়াল করে টেক্সট বসাতে হবে।

৭. সবশেষে নিচের দিকে থাকা I accept. Create my account. বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৮. একটি পেইজ আসবে।

৯. এখান থেকে Show me my account বাটনে ক্লিক করতে হবে। নতুন তৈরি হওয়া জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করবে।

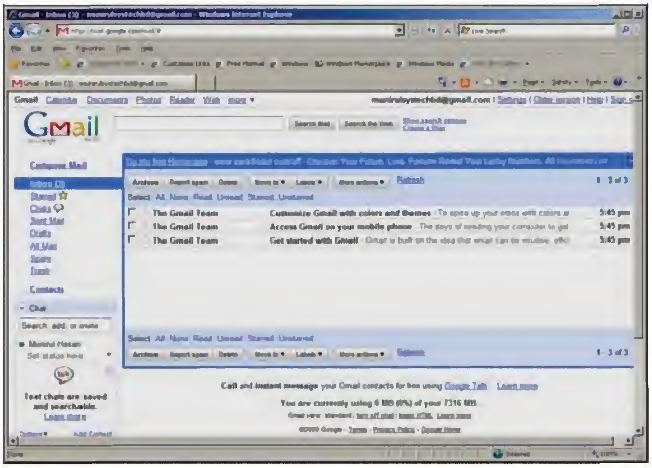

১০. জিমেইল অ্যাকাউন্টটি তৈরি হয়ে গেল। এখন এখান থেকে মেইল পড়া যাবে এবং নতুন মেইল প্রেরণ করা যাবে। পাশাপাশি জিমেইলে অ্যাকাউন্টধারী অন্য ব্যক্তিদের যুক্ত করে এই পেইজ থেকেই চ্যাট করা যাবে। এজন্য গুগলটক ম্যাসেঞ্জারের প্রয়োজন হবে না। এছাড়া বাড়তি একটি প্লাগইন ব্যবহার করে ভিডিও চ্যাটও করা যাবে।

জিমেইল অ্যাকাউন্টে সাইন ইন (Sign In) করা

১. ইন্টারনেটের যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার খুলে অ্যাড্রেসবারে http://mail.google.com লিখে এন্টার চাপলে নিচের মতো একটি পেইজ আসবে।

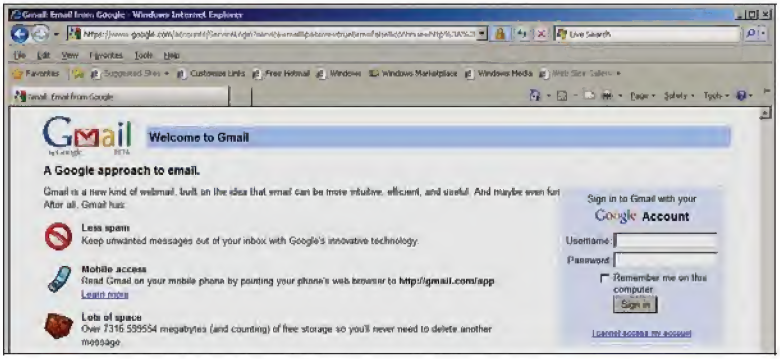

২. এখানে পেইজের উপরের ডান দিকে থাকা Sign In এর অংশে আপনার ইউজার নেম (ইউজার নেম অংশে আপনার পুরো ই-মেইল আইডি লিখে দিতে হবে (যেমন– mrspsd@gmail.com) ও পাসওয়ার্ড লিখে দিয়ে Sign In বাটনে ক্লিক করুন। অ্যাকউন্টে প্রবেশ করবে।

জিমেইলে ই-মেইল প্রেরণের জন্য যা করতে হবে :

১. ইন্টারনেট সংযোগ থাকা অবস্থায় ব্রাউজারে https://www.gmail.com/ টাইপ করতে হবে।

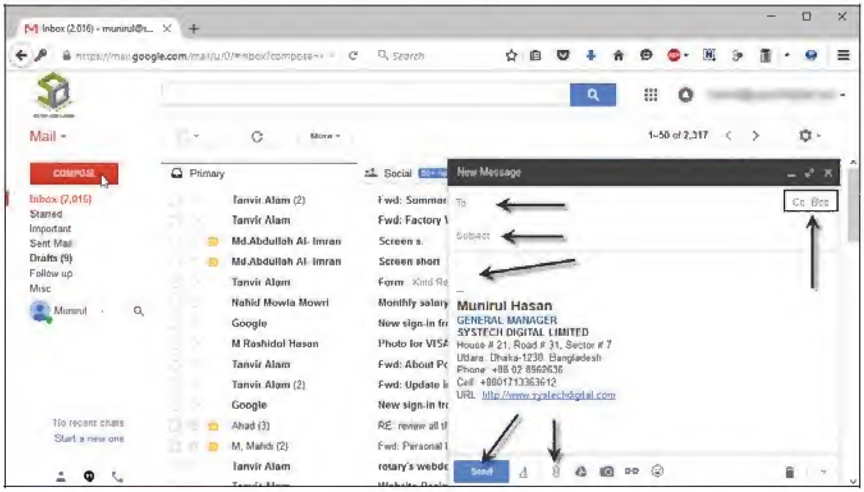

২. ব্যবহারকারীর জিমেইল অ্যাড্রেস ও তার পাসওয়ার্ড প্রদান করে Sign In বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩. জিমেইল উইন্ডো ওপেন হবার পর উইন্ডোর বাম দিক হতে COMPOSE বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪. মূল উইন্ডোর ডানের নিচের দিক হতে New Message উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

৫. To এর ঘরে যাকে মেইল পাঠাতে চাই তার ইমেইল অ্যাড্রেসটি টাইপ করে দিতে হবে।

৬. একাধিক ব্যক্তিকে একই মেইল পাঠাতে চাইলে এর কার্বন কপি প্রদানের জন্য Cc তে ক্লিক করতে হবে এবং Cc ঘরটি দৃশ্যমান হলে সেখানে একে একে বাকি ই-মেইল অ্যাড্রেসগুলো টাইপ করে দিতে হবে।

৭. আবার এমন যদি চাই যে একাধিক ব্যক্তিকে মেইল পাঠাবো কিন্তু কেউ কারো ই-মেইল অ্যাড্রেস দেখতে পাবে না অর্থাৎ প্রত্যেকে আলাদা ভাবে ই-মেইল পাবে তবে ব্লাইন্ড কার্বন কপি পাঠানোর জন্য Bcc তে ক্লিক করতে হবে এবং Bcc ঘরটি দৃশ্যমান হলে সেখানে একে একে বাকি ই-মেইল অ্যাড্রেসগুলো টাইপ করে দিতে হবে।

৮. Subject এর ঘরে ই-মেইলের একটি সাবজেক্ট লিখে দিতে হবে।

৯. বডিতে যে টেক্সটটুকু পাঠাতে চাই তা টাইপ করে দিতে হবে।

১০. মেইল লেখা শেষ হলে প্রেরণকৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর (প্রয়োজন মনে করলে) লিখে দিতে হবে।

১১. ই-মেইলের সাথে অ্যাটাচমেন্ট পাঠাতে চাইলে জেমস ক্লিপ আকৃতির আইকনে ক্লিক করে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট লোকেশনে থাকা ডকুমেন্টকে অ্যাটাচমেন্ট আকারে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

১২. ফন্টের সাইজ, কালার, ফেস ইত্যাদিও এখান থাকে টাইপ এর আইকনে ক্লিক করে পরিবর্তন করা যাবে।

১৩. ই-মেইলে গুগল ড্রাইভ থেকে কোনো ফাইল ইনসার্ট করা, কম্পিউটার থেকে কোনো ছবি ইনসার্ট করা, টেক্সটে লিংক ইনসার্ট করা, ইমোটিকন ইনসার্ট করাসহ টাইপকৃত টেক্সটকে মুছে দিতে চাইলে সেগুলোও সংশ্লিষ্ট আইকনে ক্লিক করে করা যাবে।

১৪. সকল কাজ সম্পন্ন হলে Send বাটনে ক্লিক করলে মেইলটি নির্দিষ্ট ই-মেইল অ্যাড্রেস/অ্যাড্রেসগুলোতে প্রেরিত হবে।

জিমেইলে ই-মেইল গ্রহণ তথা পড়তে যা করতে হবে :

১. জিমেইল উইন্ডোর বাম দিক হতে Inbox ক্লিক করতে হবে।

২. আগত সকল মেইল ডান দিকে একটির পর একটি সাবজেক্ট আকারে প্রদর্শিত হবে। যেসব ই-মেইল এর সাথে অ্যাটাচমেন্ট যুক্ত থাকবে সেগুলোর একেবারে ডানে একটি জেমস ক্লিপ এর আইকন প্রদর্শিত হবে।

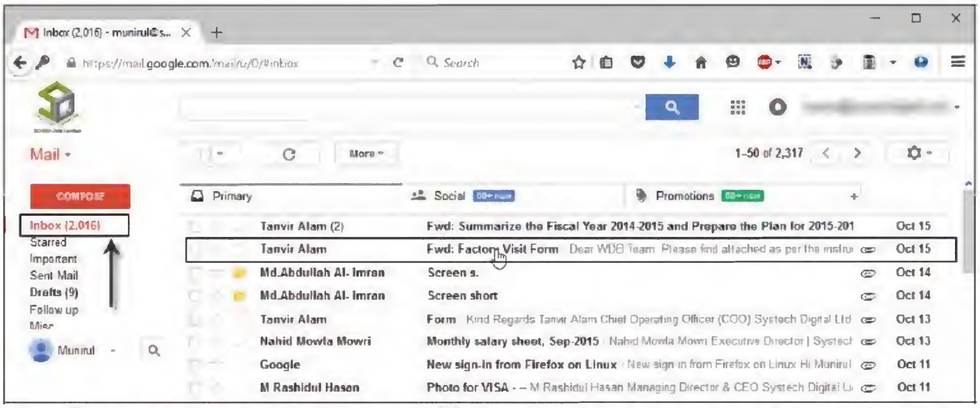

৩. পড়া হয়নি এরূপ মেইলগুলোর গাঢ় রঙে প্রদর্শিত হবে। আর পড়া হয়েছে এরূপ মেইলগুলো হালকা রঙে প্রদর্শিত হবে। যে মেইলটি পড়তে চাই সেটিতে ক্লিক করতে হবে।

৪. ই-মেইলের বিষয়বস্তু ডানে বিস্তারিত আকারে প্রদর্শিত হবে। এখানে ই-মেইলটি কার কাছ থেকে এসেছে, সাবজেক্ট, মূল টেক্সট ইত্যাদিসহ সবশেষে মেইল প্রদানকারীর কিছু তথ্য প্রদর্শিত হবে।

৫. ই-মেইলের সাথে কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকলে তা মেইলের শেষে প্রদর্শিত হবে। অ্যাটাচমেন্ট এর উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে ডাউনলোডের আইকন প্রদর্শিত হবে। সেখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড প্রক্রিয়া শুরু হবে।

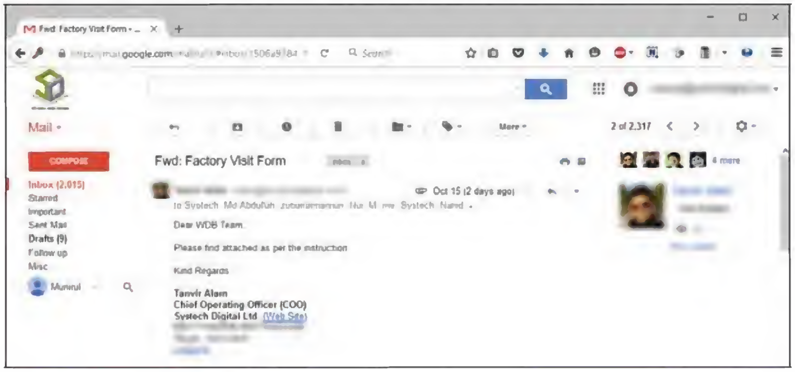

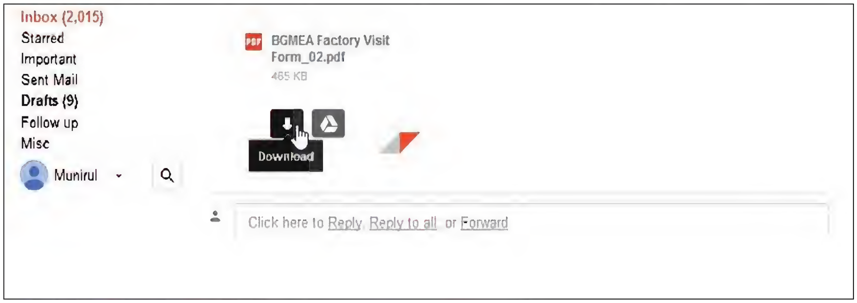

৬. অ্যাটাচমেন্ট ডাউনলোড হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটি দেখা যাবে।

১০.৫ ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণের বিভিন্ন ফিচার

ই-মেইল প্রেরণের সময় ব্যবহারকারী বেশ কিছু ফিচারকে ব্যবহার করে ই-মেইলকে নিজের মতো করে সাজাতে ও কাঙ্ক্ষিত ই-মেইল অ্যাড্রেসে প্রেরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে যেসব ফিচারের গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো—

কার্বন কপি (Cc)

অনেক সময় একই ই-মেইল একাধিক ব্যক্তিকে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে কার্বন কপি বা Cc (Carbon Copy) এর মাধ্যমে এই সুবিধা পাওয়া যায়। পুরো মেইলটি ঠিক রেখে কেবল Cc তে ক্লিক করে এটিকে সক্রিয় করে নিতে। ফলে বাড়তি একটি ঘর প্রদর্শিত হয় যেখানে কার্বন কপির জন্য ই-মেইলসমূহ টাইপ করে দেওয়া যায়।

ব্লাইন্ড কার্বন কপি (Bcc)

অনেক সময় একই ই-মেইল একাধিক ব্যক্তিকে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে। অথচ তুমি চাইছো যাদেরকে ই-মেইলটি পাঠাবে তাদের কেউ কারো ই-মেইল অ্যাড্রেস দেখতে পাবে না অর্থাৎ প্রত্যেকে আলাদা ভাবে ই-মেইল পাবে। সেক্ষেত্রে ব্লাইন্ড কার্বন কপি বা Bcc (Blind Carbon Copy) এর মাধ্যমে এই সুবিধা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পুরো মেইলটি ঠিক রেখে কেবল Bcc তে ক্লিক করে এটিকে সক্রিয় করে নিতে। ফলে বাড়তি একটি ঘর প্রদর্শিত হয় যেখানে ব্লাইন্ড কার্বন কপির জন্য ই-মেইলসমূহ টাইপ করে দেওয়া যায়।

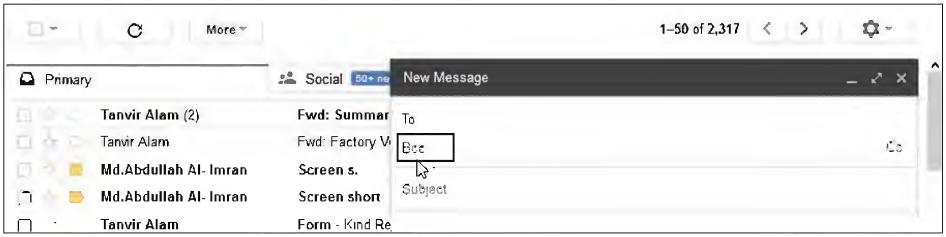

অ্যাটাচ ফাইল (Attach Files)

ই-মেইলের সাথে কোনো ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে দেওয়াকে অ্যাটাচ ফাইল বুঝায়। এটিকে অ্যাটাচমেন্টও বলে। ওয়েবভিত্তিক মেইলে সাধারণত সর্বোচ্চ ২৫ মেগাবাইট পর্যন্ত সাইজের ডকুমেন্টকে অ্যাটাচ করে দেওয়ার সুবিধা পাওয়া যায়। ই-মেইলের সাথে অ্যাটাচমেন্ট পাঠাতে চাইলে জেমস ক্লিপ বা যেকোনো ক্লিপ আকৃতির আইকনে ক্লিক করে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট লোকেশনে থাকা ডকুমেন্টকে অ্যাটাচমেন্ট আকারে সংযুক্ত করে দিতে হয়।

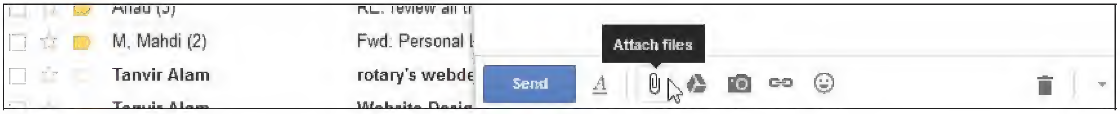

ডাউনলোড ফাইল (Download Files)

সাধারণত কোনো ই-মেইলের সাথে অ্যাটাচমেন্ট যুক্ত থাকলে সেটি কম্পিউটারে সংরক্ষণের জন্য ডাউনলোড করে নিতে হয়। অ্যাটাচমেন্টগুলো সাধারণত ই-মেইলের শেষের দিকে প্রদর্শিত হবে। অ্যাটাচমেন্ট এর উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে ডাউনলোডের আইকন প্রদর্শিত হবে। সেখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড প্রক্রিয়া শুরু হয়। ই-মেইলের সাথে একাধিক ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করা থাকলে সেগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে কিংবা চাইলে একসাথে জিপ আকারে ডাউনলোড করে নেওয়া যায়।

প্রশ্নমালা—১০

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ই-মেইল কী?
২. ই-মেইল ঠিকানার কয়টি অংশ ও কী কী?
৩. ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল অ্যাটাচমেন্ট এর সর্বোচ্চ সীমা কত মেগাবাইট?
৪. কয়েকটি ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল সেবার নাম উল্লেখ কর।
৫. কিনে ব্যবহার করতে হয় এরূপ ই-মেইল ক্লায়েন্টসমূহের নাম উল্লেখ কর।
৬. পূর্ণ রূপ লেখ : E–mail, Cc, Bcc।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ই-মেইল অ্যাড্রেসের প্রধান অংশ কয়টি ও কী কী?
২. ই-মেইল এর সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।
৩. বিনামূল্যের ই-মেইল ক্লায়েন্টসমূহের তালিকা উল্লেখ কর।
৪. জিমেইলে ই-মেইল গ্রহণের পদ্ধতি উল্লেখ কর।

■ রচনামূলক প্রশ্ন

১. জিমেইলে ই-মেইল প্রেরণের পদ্ধতি উল্লেখ কর।
২. ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণের বিভিন্ন ফিচারগুলো উল্লেখ কর।

অধ্যায়–১১
ওয়েবসাইট ব্রাউজিং

■ **এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–**

১১.১. ওয়েবপেজ কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
১১.২. URL, http, WWW এবং HTML, XML কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
১১.৩. ইন্টারনেট ব্রাউজিং কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
১১.৪. সার্চ ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারব।
১১.৫. ব্রাউজিং সফটওয়্যার ও সার্চ ইঞ্জিনের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।
১১.৬. ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করতে পারব।

১১.১ ওয়েবপেজ কী?

ইন্টারনেট তথা ওয়েবে তথ্য (লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন ইত্যাদি) সংবলিত পেজ রাখা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য ওয়েবে পরিবেশন করছে। ওয়েবে এরূপ কোন তথ্য রাখার পেজকে ওয়েবপেজ বলা হয়। সরাসরি এইচটিএমএল এর মাধ্যমে অথবা অন্য কোন টুলস এর মাধ্যমে ওয়েবপেজ তৈরি করে এইচটিএমএল এ কনভার্ট করা যায়। ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েবপেজকে প্রদর্শন করা যায়। এক ওয়েবপেজের সাথে অন্য পেজের লিংক তৈরি করা যায়। একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র কোন পেজকে ওয়েবপেজ বলা হয়। একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়। ওয়েবপেজগুলো কোনো একটি ওয়েবসাইটের অংশ। একটি ওয়েবসাইটে অসংখ্য ওয়েবপেজ থাকতে পারে। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সার্ন (CERN) এর বিজ্ঞানী টিম বার্নার্স-লি (Tim Berners-Lee) প্রথম ওয়েবপেজ তৈরি করেন।

১১.২ ইউআরএল, এইচটিটিপি, ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ, এইচটিএমএল ও এক্সএমএল ইউআরএল (URL)

কোনো ওয়েব পেইজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL (Universal Resource Unique Locator) হলো ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা। প্রতিটি URL এ থাকে :

১. ওয়েব প্রোটোকল
২. ওয়েব সার্ভারের নাম
৩. সার্ভারের ডিরেক্টরি (অথবা ফোল্ডার) এর নাম
৪. ওই ডিরেক্টরির মধ্যকার ফাইলসমূহ (html অথবা htm এক্সটেনশনযুক্ত) এবং এক্সটেনশন

প্রোটোকল ওয়েব সার্ভারের নাম (ডোমেইন নেম) ডিরেক্টরি নাম (পাথ) ফাইল

http://www.systechdigital.com/itcom/main.htm

এইচটিটিপি (HTTP or http)

এইচটিটিপি (HTTP – Hyphertext Transfer Protocol) হলো একটি প্রোটোকল। এটি তথ্য বিনিময়ের যোগাযোগ নিয়ম যা ওয়েব ব্রাউজারকে ওয়েব সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়। সাধারণত প্রায় সব ওয়েব অ্যাড্রেসই শুরু হয় http:// দিয়ে। তাই ওয়েব অ্যাড্রেসে এ অংশটি লিখা হয় না। www অংশ দিয়েই শুরু করা হয়।

ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ (WWW)

ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ এর পুরো অর্থ হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW – World Wide Web)। অনেকে এটিকে সংক্ষেপে ওয়েব নামেও অভিহিত করে থাকেন। ওয়েব বলতে আমরা বুঝি এটি একটি বৃহৎ সিস্টেম যা অনেকগুলো সার্ভার (যা ওয়েব সার্ভার হিসেবে বিবেচিত হয়) সংযুক্তি মাধ্যমে গঠিত হয়। এসব ওয়েব সার্ভার ইন্টারনেট ইউজারদের যেকোনো ধরনের তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। এ তথ্য হতে পারে প্রচলিত টেক্সট ফাইল, ছবি, শব্দ বা অন্য কোনো ফরমেটের ডেটা। এ সকল তথ্য ব্যবহার করতে হলে ইউজারকে একটি ক্লায়েন্ট বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয় যা ব্রাউজার (Browser) নামে পরিচিত।

ওয়েবে তথ্য মূলত সংরক্ষিত হয়ে থাকে পেইজ (Page) বা পৃষ্ঠার আকারে। প্রতিটি পেইজে শুধু তথ্যই থাকে না, বরং এখান থেকে অন্য পেইজে যাবার জন্য থাকে বিশেষ ধরনের লিংক (Link) প্রদান করা হয়। ইন্টারনেট উপযোগী বিশেষ ধরনের এই লিংককে বলা হয় হাইপারলিংক (Hyperlink)। ওয়েবে তুমি যখন একটি পৃষ্ঠা পড়তে থাকবে তখন হাইপারলিংক ব্যবহার করে খুব সহজেই এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় চলাচল করতে পারে।

এইচটিএমএল (HTM)

এইচটিএমএল (HTML) এর পুরো অর্থ হলো 'হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ (HTML - Hyper Text Markup Language)'। প্রকৃত অর্থে এটি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয় বরং একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ যা একসারি মার্কআপ ট্যাগ এর সমন্বয়। ওয়েব সাইট বা ওয়েব পেইজকে বর্ণনা করার জন্য এসব মার্কআপ ট্যাগগুলোকে HTML ব্যবহার করে থাকে। HTML ডকুমেন্টগুলো HTML ট্যাগসমূহ এবং প্লেইন টেক্সট বহন করে। এগুলোকে ওয়েব পেইজও বলা হয়।

এক্সএমএল (XML)

এক্সএমএল এর পুরো অর্থ হলো 'এক্সটেনসিবল মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ (XML - EXtensible Markup Language)'। এটি HTML এর মতোই একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ যা মূলত তৈরি করা হয়েছে ডেটাকে প্রদর্শনের জন্য নয় বরং ডেটা পরিবহন করতে। সুতরাং HTML এর পরিবর্তে XML এসেছে সেটি ভাবার কোনো কারণ নেই। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই দুইটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজের উদ্ভব ঘটেছে। XML এর ট্যাগগুলো প্রিডিফাইন্ড নয়; ব্যবহারকারী নিজেই নিজের জন্য ট্যাগ নির্ধারণ করতে পারবে। সেলফ-ডেসক্রিপটিভ রূপে একে তৈরি করা হয়েছে। এটি W3C এর অনুমোদিত।

XML এর তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। এটি শুধু কিছু টেক্সট সম্বলিত একটি ফাইল। যেসব সফটওয়্যার প্লেইন টেক্সট নিয়ে কাজ করতে পারে সেগুলো XML নিয়েও কাজ করতে পারে। যদিও XML-সচেতন অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিশেষভাবে XML ট্যাগগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারে। ট্যাগগুলোর ফাংশনাল মিনিং নির্ভর করে অ্যাপ্লিকেশনের প্রকৃতির উপর।

উদ্ভবের পর থেকেই অতি দ্রুত XML স্ট্যান্ডার্ডটি দাঁড়িয়ে গেছে। বিশাল সংখ্যক সফটওয়্যার ভেন্ডর এখন এই স্ট্যান্ডার্ডটিকে নিজেদের পণ্যে প্রয়োগ করছে। HTML এর মতোই XML আজ ওয়েবের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই তাই XML এর দেখা পাওয়া যায়। সকল ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ডেটা সম্প্রচারের জন্য এটি অতি সাধারণ একটি টুল এবং তথ্যের সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত শত শত XML ভিত্তিক ল্যাংগুয়েজ ডেভেলপ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো RSS, Atom, SOAP এবং XHTML। XML ভিত্তিক ফরমেটগুলো আজ অধিকাংশ অফিস প্রোডাক্টিভিটি টুলের জন্য ডিফল্ট হয়ে উঠেছে। যেমন— মাইক্রোসফট অফিস (Office Open XML), OpenOffice.org (OpenDocument) এবং Apple's iWork।

১১.৩ ইন্টারনেট ব্রাউজিং কী?

তথ্যের মহাসমুদ্র ইন্টারনেটে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ অবগাহন করছে। এমন কোনো বিষয় নেই যা ইন্টারনেটে নেই। ৫০০ বছর বিরাট নদী অথবা সমুদ্র থেকে জেলেরা যেমন জাল দিয়ে মাছ ধরে; ঠিক তেমনিই ইন্টারনেটের বিশাল সমুদ্র থেকে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য খুঁজে বের করাকে ব্রাউজ করা বা ইন্টারনেট ব্রাউজিং বলা হয়। ব্রাউজিং এর জন্য বিভিন্ন ব্রাউজিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। এসব প্রোগ্রামকে ব্রাউজার বলা হয়।

১১.৪ সার্চ ইঞ্জিন ও এর প্রয়োজনীয়তা

সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine) বা ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন হলো এক ধরনের টুল যেগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব থেকে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সার্চের ফলাফলটি সাধারণত একটি তালিকা আকারে প্রদর্শিত হয়। এই তথ্যসমূহের মধ্যে থাকতে পারে ওয়েব পেইজ, ইমেজ, ভিডিও, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও ফাইল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ইংরেজি ভাষারগুলোই স্বাভাবিকভাবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

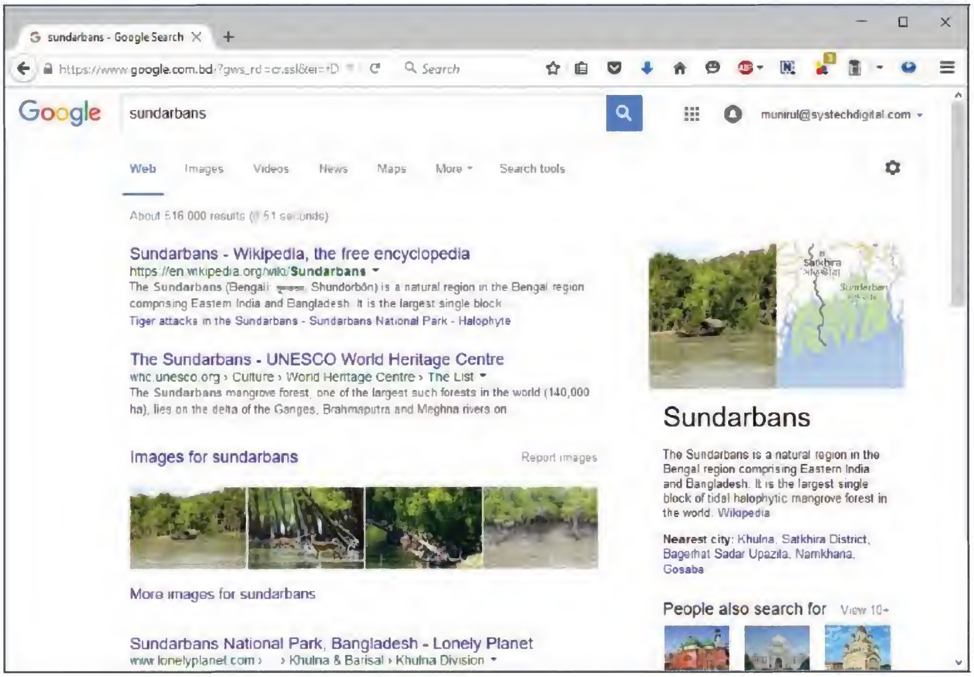

বিশ্বে যত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছেন নিঃসন্দেহে তাদের বেশিরভাগই সার্চ ইঞ্জিনগুলোর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ একজন ব্যক্তি যে তথ্যটি চায় সেটির শব্দ, শব্দাংশ, বাক্য বা বাক্যাংশ সার্চ ইঞ্জিনে টাইপ করে দিলে বিশ্বের লাখ লাখ সার্ভার ঘেঁটে সার্চ ইঞ্জিন ঐ ব্যক্তির জন্য তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যকে হাজির করে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় মুহূর্তের ভেতর। সার্চ ইঞ্জিন এমন একটি টুল যা সমস্ত ইন্টারনেটে বিস্তৃত ওয়েব সাইটগুলোকে আয়ত্তের মধ্যে রাখে বা সার্বক্ষণিক এগুলোকে ট্র্যাক (Track) করতে থাকে। এই টুলকে কাঙ্ক্ষিত তথ্যের সংশ্লিষ্ট

ওয়েব সাইট বা ওয়েব সাইটসমূহ খুঁজে বের করে দিতে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানের সার্চ ইঞ্জিনগুলো এতটাই আধুনিক যে তাতে পৃথকভাবে ওয়েব, ইমেজ, ভিডিও, নিউজ, ম্যাপ, বই, অ্যাপ ইত্যাদি খুঁজে বের করা যায়। এসব ইঞ্জিনের অনেকগুলোতেই আবার সার্চ টুল সংযোজিত থাকে যেখানে বিভিন্ন দেশ, সময়, ফলাফল, স্থান অনুযায়ী ফিল্টারিংও করা যায়। ছবি খোঁজার ক্ষেত্রে অতি বৃহৎ থেকে শুরু করে ছোট সাইজের ছবিও খোঁজার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। সার্চ টুলগুলো ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অপশন প্রদর্শন করে যাতে করে ব্যবহারকারী আরও সুবিধাজনকভাবে তার সার্চ প্রক্রিয়াকে চালিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারে। অনেক সার্চ ইঞ্জিনে সেফ সার্চ ও ফিল্টারিং এর সুবিধাও রয়েছে। সুতরাং তথ্যের দ্রুত প্রাপ্তির কারণে সার্চ ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১১.৫ উল্লেখযোগ্য কিছু ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার ও সার্চ ইঞ্জিন

ওয়েব ব্রাউজিং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। ইউজার ইন্টারফেস, কার্যক্ষমতা, দ্রুততা ইত্যাদির নিরিখে ব্রাউজারগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্য কিছু ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে রয়েছে :

১. মোজিলা ফায়ারফক্স (Mozilla Firefox)
২. গুগল ক্রোম (Google Chrome)
৩. ওপেরা (Opera)
৪. সাফারি (Safari)
৫. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (উইন্ডোজ ১০ ভার্সনে মাইক্রোসফট এজ) (Internet Explorer)
৬. টর্চ (Torch)
৭. ম্যাক্সথন (Maxthon)
৮. সিমাংকি (SeaMonkey)
৯. আভান্ত ব্রাউজার (Avant Browser)
১০. ডিপনেট এক্সপ্লোরার (Deepnet Explorer)

আজকাল কোনো কিছু সার্চ করতে গেলেই সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। যে সার্চ ইঞ্জিন যত দ্রুত ও যত ধরনে ব্যবহারকারীদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হাজির করতে পারে সে সার্চ ইঞ্জিনটি তত বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ দিক থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে গুগল। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু সার্চ ইঞ্জিনের নাম দেওয়া হলো :

১. গুগল (https://www.google.com/)
২. বিং (https://www.bing.com/)
৩. ইয়াহু (https://www.yahoo.com/)
৪. আসক ডট কম (http://www.ask.com/)
৫. এওএল ডট কম (www.aol.com)
৬. ব্লেক্কো ডট কম (http://blekko.com/)
৭. উল্ফ্রাম আলফা (http://www.wolframalpha.com/)
৮. ডাকডাকগো (https://duckduckgo.com/)
৯. ওয়েব্যাক মেশিন (www.waybackmachine.org/)
১০. চাচা ডট কম (http://www.chacha.com/)
১১. পিপীলিকা ডট কম [বাংলা সার্চ ইঞ্জিন] (www.pipilika.com/)

১১.৬ ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করা

আমরা আগেই জেনেছি বিভিন্ন ধরনের ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার পাওয়া যায়। ঠিক একইভাবে ইন্টারনেটে অসংখ্য সার্চ ইঞ্জিনও রয়েছে। যার যেটি পছন্দ সেটি ব্যবহার করতে পারে। তবে ওয়েব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে যেহেতু

মোজিলা ফায়ারফক্স এর অবস্থান উপরের সারিতে এবং ঠিক একইভাবে সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে গুগল যেহেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেহেতু আমরা এখন মোজিলা ফায়ারফক্স ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে গুগল সার্চ ইঞ্জিন এর ব্যবহার দেখব। উল্লেখ্য, অন্যান্য ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও ব্যবহারবিধি প্রায় একই রকম।

ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হলে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. ইন্টারনেটের সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. যে ওয়েব ব্রাউজারটি ব্যবহার করব সেটি ওপেন করতে হবে (ব্রাউজারটি কম্পিউটারে ইন্সটল করা থাকতে হবে)।

৩. ওয়েব ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে যে সার্চ ইঞ্জিনটি ব্যবহার করতে চাই তার ওয়েব অ্যাড্রেস টাইপ করে এন্টার চাপতে হবে।

৪. সার্চ ইঞ্জিনটি ওপেন হবার পর এর সার্চ বারে যে জিনিসটি সার্চ করতে চাই তা টাইপ করে দিয়ে এন্টার চাপতে হবে কিংবা সার্চ বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. স্বাভাবিকভাবে কোনো সার্চ দিলে ওয়েবের সামগ্রিম বিষয়গুলো ফলাফল হিসেবে হাজির করবে যেখানে বিভিন্ন ওয়েবের লিংক এবং ইমেজ কিংবা কোনো ভিডিওর থাম্বনেইল প্রদর্শিত হবে।

৬. শুধু ইমেজ সার্চ করতে চাইলে সার্চ বক্সের উপরের দিকে থাকা Images লিংকে ক্লিক করতে হবে। এরপর ইমেজের Search Tools হতে বিভিন্ন সাইজ নির্বাচন করে ফিল্টার করা যাবে।

৭. শুধু ভিডিও সার্চ করতে চাইলে সার্চ বক্সের উপরের দিকে থাকা Videos লিংকে ক্লিক করতে হবে। এরপর ভিডিওর Search Tools হতে বিভিন্ন সাইজ নির্বাচন করে ফিল্টার করা যাবে।

৮. শুধু নিউজ সার্চ করতে চাইলে সার্চ বক্সের উপরের দিকে থাকা News লিংকে ক্লিক করতে হবে। এরপর নিউজের Search Tools হতে বিভিন্ন সাইজ নির্বাচন করে ফিল্টার করা যাবে।

৯. ম্যাপ দেখতে চাইলে সার্চ বক্সের উপরের দিকে থাকা Maps লিংকে ক্লিক করতে হবে।

১০. সার্চ বক্সের উপরের দিকে থাকা More এর ড্রপডাউনে ক্লিক করে আরও কিছু সার্চ অপশন পাওয়া যাবে।

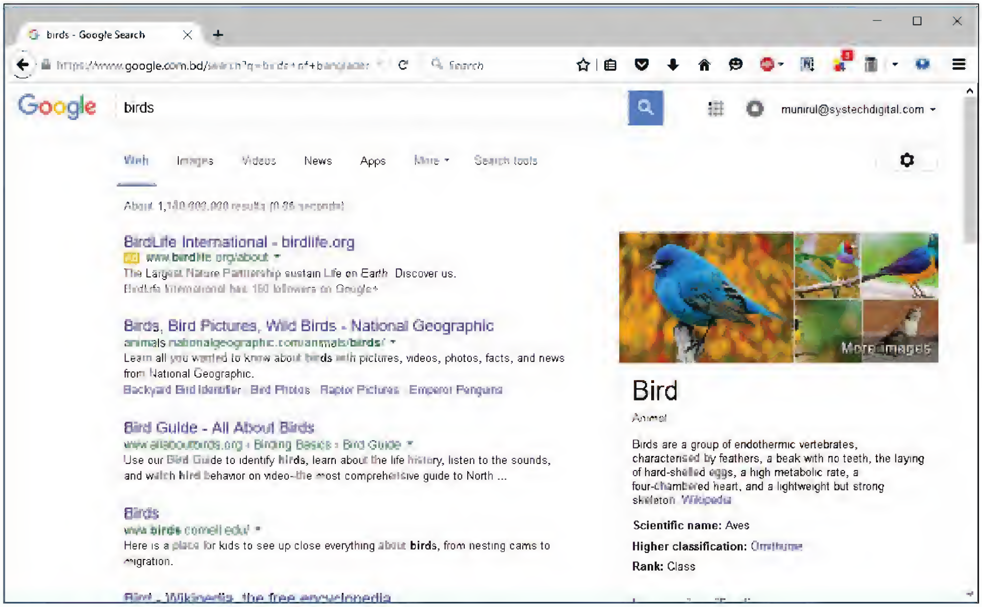

প্রশ্নমালা—১১

■ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. ওয়েবপেজ কী?
২. সর্বপ্রথম কে ওয়েবপেজ তৈরি করেন?
৩. প্রতিটি ইউআরএল এ কয়টি অংশ থাকে ও কী কী?
৪. ব্রাউজার কী?
৫. একটি বাংলা সার্চ ইঞ্জিনের নাম লেখ।
৬. পূর্ণ রূপ লেখ : URL, HTTP, WWW, HTML, XML।

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. ওয়েবপেজ বলতে কী বোঝায়?
২. ইন্টারনেটে ব্রাউজিং বলতে কী বোঝায়?
৩. উল্লেখযোগ্য ৪টি ওয়েব ব্রাউজারের নাম লেখ।
৪. উল্লেখযোগ্য ৪টি সার্চ ইঞ্জিনের নাম লেখ।

■ **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. WWW সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।
২. XML সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।
৩. সার্চ ইঞ্জিন এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৪. ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারের প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

অধ্যায়-১২
আউটসোর্সিং

■ এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–
১২.১. আউটসোর্সিং কী তা ব্যক্ত করতে পারব।
১২.২. আউটসোর্সিং এর সুবিধা ও অসুবিধা ব্যক্ত করতে পারব।
১২.৩. আউটসোর্সিং এ কাজ করার নিয়মাবলি ও যোগ্যতা ব্যক্ত করতে পারব।
১২.৪. আউটসোর্সিং মার্কেট প্লেস এর তালিকা তৈরি করতে পারব।

১২.১ আউটসোর্সিং

অনলাইন মার্কেটপ্লেসের হাজার হাজার কাজ থেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো কাজ খুঁজে নেওয়া ও সেটি সম্পাদন করার পর বায়ারের কাছ থেকে তার পেমেন্ট গ্রহণ করার মাধ্যমে যে উন্মুক্ত পেশা বা ফ্রিল্যান্সিং কাজের সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে আউটসোর্সিং বলে।

অফশোর আউটসোর্সিং

আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিগত বায়ার তার নিজস্ব কাজের জন্য অনলাইনে ভিন্ন দেশ থেকে এমপ্লয়িকে হায়ার করে থাকে। সাধারণত এক্ষেত্রে কোন কোম্পানির সম্পৃক্ততা থাকে না। কিন্তু অফশোর আউটসোর্সিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি সুনির্দিষ্ট কোম্পানি তার কোন প্রজেক্টের জন্য বাইরের দেশের কোন কোম্পানি বা একাধিক বিদেশি এমপ্লয়িদের অনলাইনে হায়ার করে থাকে। যেমন ধরা যাক, আমেরিকার কোন কোম্পানি কম্পিউটার তৈরি এবং বিক্রির জন্য বাজারজাত করল। এখন এর কাস্টমার সার্ভিস এবং টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্য কোম্পানিটি বিদেশি কোন কোম্পানি বা বিদেশি বিভিন্ন এমপ্লয়িকে হায়ার করতে পারে যারা ওভার টেলিফোনে নিজ দেশে বসে থেকে এই কাজগুলো সম্পন্ন করবে। সাধারণত ডেটা এন্ট্রি এবং কল সেন্টারের আউটসোর্সিং এর কাজগুলো অফশোর আউটসোর্সিং এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অফশোর আউটসোর্সিং এর বেশ কিছু ক্যাটাগরি রয়েছে। যেমন ITO ক্যাটাগরিতে কোন কোম্পানি বিদেশি কোন কোম্পানি বা এমপ্লয়িকে হায়ার করে তাদের ইনফরমেশন টেকনোলজি সংক্রান্ত কাজের আউটসোর্সিং করিয়ে থাকে। BPO ক্যাটাগরি হলো বিজনেস প্রসেসিং আউটসোর্সিং যেমন কল সেন্টার ম্যানেজমেন্টের কাজ এর অন্তর্গত। এছাড়াও অফশোর আউটসোসর্সিং এর মাধ্যমে সফটওয়্যার ডেভলপমেন্টের কাজ করা হলে সেটি Software R & D (Research and Development) ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

ফ্রিল্যান্সিং ও ফ্রিল্যান্সার

ফ্রিল্যান্সার হচ্ছে এমন একজন কর্মী যিনি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি ছাড়া কাজ করেন। ফ্রিল্যান্সার যে কাজগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সম্পন্ন করে থাকে তাকে ফ্রিল্যান্সিং বলে। একজন ফ্রিল্যান্সার স্বাধীনভাবে তার কাজ নির্ধারণ করতে পারে। গতানুগতিক সময়ভিত্তিক কাজের মধ্যে ফ্রিল্যান্সার কখনো সীমাবদ্ধ নন।

সারাবিশ্বে এখন ইন্টারনেট যথেষ্ট সহজলভ্য হয়ে ওঠায় ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ ক্রমেই ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একটি কম্পিউটার এবং মোটামুটি গতির একটি ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে বিশ্বের যে কোন স্থানে বসে ফ্রিল্যান্সিং করা সম্ভব। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো ডেটা এন্ট্রি, লেখালেখি করা, ছবি সম্পাদনা, টুডি বা থ্রিডি এনিমেশন তৈরি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, ভিডিও তৈরি প্রভৃতি।

ফ্রিল্যান্সিং কাজে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ফ্রিল্যান্সিং কাজ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

১. যে কাজগুলোতে যথেষ্ঠ দক্ষতা আছে সেই কাজগুলোর জন্য বিড করতে হবে।

২. বায়ারের পোস্টকৃত কাজে কী চাওয়া হচ্ছে সেটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কাজটি করা সম্ভব হবে কীনা সেটি বিবেচনা করে অতঃপর কাজের জন্য বিড করতে হবে।

৩. কাজের জন্য অতিরিক্ত বেশি মূল্য বা কম মূল্য দিয়ে বিড করা যাবে না। একটি যৌক্তিক মূল্য উল্লেখ করে বিড প্রদান করতে হবে।

৪. পেমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

৫. কাজটি সময়মতো জমা দিতে হবে।

১২.২ আউটসোর্সিং এর সুবিধা ও অসুবিধা

আউটসোর্সিং এর যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আউটসোর্সিং এর সুবিধা

১. এর মাধ্যমে বায়ারগণ অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক দামে এমনকি কখনও কখনও স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা হয়তো নিয়মিত কর্মীদের মাধ্যমে করালে অনেক বেশি খরচ পড়তো।

২. তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ করিয়ে আনা হয় বলে কাজের মান উন্নত হয়। ফ্রিল্যান্সারগণ পরবর্তী কাজ পাবার আশায় প্রতিটি কাজে নিজস্ব দক্ষতার ছাপ রাখার চেষ্টার করেন।

৩. বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে কাজ করিয়ে আনা যায় বলে প্রচলিত কর্মীর কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

৪. বায়ারগণ খণ্ডকালীন রূপে কাউকে কাজের জন্য নিয়োগ দিতে পারেন।

৫. ফ্রিল্যান্সারগণ ঘরে বসেই কাজ করতে পারেন। ফলে অনেকে পূর্ণকালীন চাকরির পাশাপাশি অবসরে খণ্ডকালীন চাকরি হিসেবে আউটসোর্সিং এ যুক্ত হতে পারেন।

৬. আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে কর্মদাতাকে কোনো অফিস নেবার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে অবকাঠামোগত বিভিন্ন সুবিধা যেমন– কর্মীর বসার সংস্থান, উন্নত মানের কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এতে খরচ বেঁচে যায়।

৭. বায়ারগণ টাইম জোন এর সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারেন। বিশ্বের একপ্রান্তে যখন রাত অন্য প্রান্তে তখন দিন। ফলে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কাজ করালে বায়রগণ যখন ঘুমে বিভোর তখন অন্য প্রান্তে তার কাজটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এতে সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায়। বায়ারগণ হয়তো সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

৮. আউটসোর্সিং এর মাধ্যম ফ্রিল্যান্সারগণ নিজের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে পারেন। এর মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জনের সুযোগ রয়েছে।

৯. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান করা সম্ভব। ফলে দেশের সার্বিক উন্নতি ঘটানো যায়।

১০. আউটসোর্সিং কে শিল্পে পরিণত করা গেলে তা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আউটসোর্সিং এখন অনেকেরই পেশায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর আউটসোর্সিং হতে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় করে। শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী এই শিল্পকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অনেকে এই খাতে বিনিয়োগ করছে। ফলে বহু লোক সম্পৃক্ত হচ্ছে বিভিন্ন কাজে, সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান।

আউটসোর্সিং এর অসুবিধা

১. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কাজ করালে অনেক সময় কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির গোপনীয়তা তৃতীয় পক্ষের দ্বারা ভঙ্গ হতে পারে। বিশেষ করে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান এইচআর, পেরোল ও নিয়োগ সেবাকে আউটসোর্স করে দেয় তখন প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

২. অনেক সময় বায়ারগণ সঠিক আউটসোর্স কর্মী খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে যথা সময়ে তার কাজটি সম্পন্ন নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন ধরনের ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারেন। পাশাপাশি নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিরাট আর্থিক ক্ষতিও ঘটে যেতে পারে।

৩. যদিও সার্বিক বিবেচনায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কাজ করানো অর্থসাশ্রয়ী তারপরও এতে কিছু হিডেন কস্ট থাকতে পারে যা পরবর্তীতে বায়ারের খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে বায়ার যখন কোনো বাইরের কোম্পানির সাথে আউটসোর্সিংয়ের চুক্তি করেন তখন চুক্তির শর্ত মোতাবেক তার বিভিন্ন ধরনের খরচ বেড়ে যেতে পারে।

৪. আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলোকে ভালোভাবে চলতে হলে মুনাফা সৃষ্টি করতে হয়। বায়ার কর্তৃক কাজের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকলে এবং সব সময় এই হার একই থাকলে তখন মুনাফা সৃষ্টির জন্য উক্ত কোম্পানির কাছে যে পথটি খোলা থাকে তা হলো খরচ কমানো। আর এটি করতে গিয়ে কাজের মান নেমে যেতে পারে।

৫. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আয়কৃত অর্থ নিজ দেশে উত্তোলন করতে গিয়ে ফ্রিল্যান্সারগণ অনেক সময় নানা

ধরনের ঝামেলায় পড়তে পারেন। যেমন– ফ্রিল্যান্সারগণকে বিভিন্ন পেমেন্ট মেথডের মধ্য থেকে তাদের উপযোগী মেথডটি গ্রহণ করতে হয়। অনেক সময় নিজ দেশে ঐ সেবা চালু নাও থাকতে পারে। ফলে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তবে আশার কথা, পেওনিয়ার এর মতো ক্রেডিট কার্ড থাকলে বিশ্বের যেকোনো এটিএম থেকেই উপার্জিত অর্থ উত্তোলন করা যায়

১২.৩ আউটসোর্সিং এ কাজ করার যোগ্যতা ও নিয়মাবলি

আউটসোর্সিং এ কাজ করার যোগ্যতা

আউটসোর্সিং এর কাজ করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকেই তথা ফ্রিল্যান্সারকে কিছু যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :

১. ফ্রিল্যান্সিংয়ে আগ্রহ ব্যক্তি যে ধরনের কাজ করতে ইচ্ছুক তাকে সে ধরনের কাজে পারদর্শী হতে হবে নতুবা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। একটি কাজের বিপরীতে শত শত ফ্রিল্যান্সার কাজের আগ্রহ প্রকাশ করে বিডে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্য থেকে একজন বায়ার তার কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তিটিকে খুঁজে পেতে ইন্টারভিউও নেন। এতে উৎরে যেতে না পারলে কাজ পাওয়াটা দুরূহ হয়ে পড়ে।

২. কাজের ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম যেহেতু ইংরেজি সেহেতু ফ্রিল্যান্সারগণকে মোটামুটি মানের ইংরেজি জানা থাকতে হয়। যারা ভালো ইংরেজি জানেন তারা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে থাকেন।

৩. যে মার্কেটপ্লেসে কাজের জন্য বিড করা হবে সেখানে ফ্রিল্যান্সের প্রোফাইল যেন সমৃদ্ধ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রোফাইলটিকে ভালো ভাবে সাজানোর চেষ্টা করতে হবে।

৪. নিজেকে বায়ারের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরতে একজন ফ্রিল্যান্সারকে উন্নত কম্যুনিকেশন স্কিল দেখাতে হয়।

৫. কোনো বিডে জয়ী হয়ে কাজ পেলেই হলো না; সেই কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করে যথাসময়ে বায়ারের হতে তুলে দেবার মানসিকতা ও চেষ্টা থাকতে হবে।

৬. বায়ারকে ঠকানোর মানসিকতা পরিহার করতে হবে।

একটি আউটসোর্সিং প্রজেক্ট সম্পন্ন করার নিয়মাবলি/ধাপসমূহ

রেন্ট এ কোডার সাইটের আলোকে একটি প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

১. **প্রজেক্ট সার্চ করা :** সাইটে প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কাজ পোস্ট হয়। দক্ষতার ভিত্তিতে সিলেক্ট করা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফলে ওই ধরনের কাজে বায়ারদের চাহিদা এবং কাজের মূল্য সম্পর্কে ফ্রিল্যান্সারের সুস্পষ্ট একটি ধারণা তৈরি হবে। নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ধরনের কাজ খোঁজার জন্য সাইটের প্রজেক্ট ফিল্টার সেটিং–এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

২. **বিড করা :** কোন কাজ পর্যবেক্ষণ করার পর যদি মনে হয় কাজটি নিশ্চিত সফলতার সাথে সম্পন্ন করা যাবে তবে ওই কাজের জন্য বিড করতে হবে। বিড করার জন্য প্রথমে অবশ্যই সাইটে লগইন করতে হবে। বিডে ওই কাজটি কত ডলারে সম্পন্ন করা যাবে তা উল্লেখ করতে হবে তবে অবশ্যই তা বিডের উল্লিখিত মূল্যের মধ্যে হতে হবে। বিড করার পাশাপাশি কাজটি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানিয়ে বায়ারকে ম্যাসেজ দিতে হবে। যদি ওই সাইটে এর আগে কোন কাজ করা না থাকে তাহলে যতটুকু সম্ভব কম মূল্য উল্লেখ করতে হবে। নিজের র‍্যাংকিং বাড়ার সাথে সাথে বিডের মূল্য বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়াও প্রয়োজনে বিডের চেয়ে নিচের মূল্যে কাজ করতে চাইলে বায়ারকে পৃথক ম্যাসেজে তা উল্লেখ করে দেওয়া যেতে পারে। তবে কাজের মূল্য এতটা কম ধরাও উচিত হবে না যাতে বায়ারের মনে কাজের কোয়ালিটি সম্পর্কে সংশয় দেখা দিতে পারে।

৩. **কাজ শুরু করা :** বিড করা কোডারদের মধ্য থেকে বায়ার কর্তৃক নির্বাচিত হলে দেরি না করে কাজটি শুরু করতে হবে। বায়ার সাধারণত কাজ শুরুর সাথে সাথে সকল টাকা এসক্রোতে জমা রেখে দেয়। তবে কোন কারণে জমা দিতে দেরি হলে তাকে অনুরোধ করতে হবে। এরপর বায়ারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাজের

জন্য ফাইল, তাদের সার্ভার ও ডাটাবেজের তথ্য জেনে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিন বা একদিন পর পর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বায়ারকে অবহিত করতে হবে। বায়ারের কোন চাহিদা না বুঝতে পারলে যত দ্রুত সম্ভব তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। বায়ারকে এক্ষেত্রে সরাসরি ই–মেইল না করে সবসময় চেষ্টা করতে হবে ওই সাইটের ম্যাসেজ সিস্টেমের সাহায্যে যোগাযোগ করতে। এতে পরবর্তীতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলা করা সহজ হবে।

৪. **প্রতি সপ্তাহের স্ট্যাটাস রিপোর্ট :** রেন্ট–এ–কোডারে বড় কাজগুলোর জন্য প্রতি শুক্রবারে কাজের সর্বশেষ অবস্থা জানাতে হয়। এজন্য ওয়েবসাইটে প্রজেক্টের পাতায় গিয়ে File Weekly Status Report বাটনে ক্লিক করতে হবে। কোন কারণে যদি স্ট্যাটাস রিপোর্ট না দেওয়া হয় তবে র‍্যাংকিং–এর মোট স্কোর থেকে ১০০০ স্কোর বাদ দেওয়া হবে। ফলে র‍্যাংকিং–এ অন্যদের থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হবে।

৫. **কাজ জমা :** কাজ শেষ হবার পর দেরি না করে সাইটে গিয়ে সমস্ত কাজ Zip করে আপলোড করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ডেডলাইনে উল্লিখিত সময়ের পূর্বেই সমস্ত কাজ জমা দেওয়া যায়।

৬. **বায়রের কাজ গ্রহণ করা :** এরপর বায়ারের মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কাজে কোন পরিবর্তন থাকলে বায়ার তা ফ্রিল্যান্সারকে অবহিত করবে। আর বায়ার যদি কাজে সন্তুষ্ট হয় তাহলে সে সাইটে একটি বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে কাজটি গ্রহণ করবে যা ই–মেইলের মাধ্যমে সাথে সাথে জানিয়ে দিবে। একই সাথে এসক্রো থেকে টাকার একটি অংশ সাইটের অ্যাকাউন্টে জমা হবে। আরেকটি অংশ (১০% বা ১৫%) সাইটটির ফি হিসেবে রেখে দেবে।

১২.৪ আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস

আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস হলো এমন একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস যেটি অসংখ্য অনলাইন ফ্রিল্যান্স ওয়েবসাইট নিয়ে গঠিত। এই ওয়েবসাইটগুলো আসলে এক একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যেখানে দুই ধরনের ব্যক্তি সদস্য হতে পারে। এরা হলো বায়ার তথা যারা তাদের বিভিন্ন কাজ এই সাইটে আপলোড করে। অপরটি হলো ফ্রিল্যান্সার এমপ্লয়ি যারা বিড করার মাধ্যমে বায়ারের পছন্দ অনুযায়ী কাজ পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসের বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো কেননা এই ওয়েবসাইটে বায়ার যখন অ্যাকাউন্ট ওপেন করে তখন তার যেমন একটি প্রোফাইল এখানে যুক্ত হয় তেমনি ফ্রিল্যান্সার ওয়ার্কার যখন কোন অ্যাকাউন্ট ওপেন করে তারও একটি প্রোফাইল যুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কাজ দেওয়া এবং পাবার ব্যাপারটি অনেকাংশে উভয়েরই প্রোফাইলের উপর নির্ভর করে। এখানে ওয়েবসাইটগুলো যেমন বায়ারের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কমিশন পেয়ে থাকে তেমনি ফ্রিল্যান্সার এমপ্লয়িগণের কাছ থেকেও কাজ পাবার পর একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন কেটে নেয়। এককথায় এটি হলো এমন একটি ভার্চুয়াল মার্কেটপ্লেস যেখানে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে জনপ্রিয় কর্মসংস্থান আউটসোর্সিং জবগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসের কিছু বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় ওয়েবসাইট হলো

১. আপওয়ার্ক (https://www.upwork.com/)
২. ইল্যান্স ডট কম (https://www.elance.com/)
৩. ফ্রিল্যান্সার ডট কম (https://www.freelancer.com/)
৪. এনভাটো স্টুডিও (https://studio.envato.com/)
৫. রেন্ট এ কোডার (http://www.rent-acoder.com/)
৬. নাইনটি নাইট ডিজাইনস (http://99designs.com/)
৭. পিপল পার আওয়ার (http://www.peopleperhour.com/)
৮. এসইও ক্লার্ক (https://www.seoclerks.com/)

৯. গুরু ডট কম (http://www.guru.com/)
১০. প্রজ ডট কম (http://www.proz.com/)
১১. টপটাল (http://www.toptal.com/)
১২. ডিজাইন ক্রাউড (http://www.designcrowd.com/)
১৩. ফ্লেক্সজবস (https://www.flexjobs.com/)
১৪. টপকোডার (http://www.topcoder.com/)
১৫. টাস্করাবিট (https://www.taskrabbit.com/)
১৬. মিডিয়া বিস্ট্রো (http://www.mediabistro.com/)
১৭. ক্রাউডস্প্রিং (https://www.crowdspring.com/)
১৮. ক্লিকওয়ার্কার (http://www.clickworker.com/en)
১৯. ফ্রিল্যান্স রাইটিং (http://freelancewriting.com/)
২০. ফ্রিল্যান্স ডট কম (http://www.freelance.com/en/)
২১. ওয়ার্কমার্কেট (https://www.workmarket.com/)
২২. গেট এ কোডার (http://www.getacoder.com/)
২৩. ক্লাউড পিপস (https://www.cloudpeeps.com/)
২৪. জুমল্যান্সার ডট কম (http://www.joomlancers.com/)
২৫. এক্সপ্রেস ডট কম (http://www.joomlancers.com/)

প্রশ্নমালা—১২

■ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১. আউটসোর্সিং কী?
২. ফ্রিল্যান্সিং কী?
৩. ফ্রিল্যান্সার কাকে বলে?
৪. আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেস কী?
৫. ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস বলতে কী বোঝায়?

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১. অফশোর আউটসোর্সিং বলতে কী বোঝায়?
২. ফ্রিল্যান্সিং কাজে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।
৩. আউটসোর্সিং এর সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
৪. আউটসোর্সিং এর অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
৫. আউটসোর্সিং এ কাজ করার যোগ্যতাগুলো উল্লেখ কর।
৬. বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় ৪টি আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেস এর নাম লেখ।

■ রচনামূলক প্রশ্ন
১. আউটসোর্সিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
২. আউটসোর্সিং এ কাজ করার নিয়মাবলি বর্ণনা কর।

ব্যবহারিক

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি-২

দ্বিতীয় পত্র

জব নং–০১

জবের নাম : একটি কম্পিউটার সেটের পূর্ণাঙ্গ স্পেসিফিকেশন তৈরি কর।

বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার। নিচে একটি কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো :

মাদারবোর্ড–এর স্পেসিফিকেশন

বর্তমান বাজারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিভিন্ন কোম্পানির মাদারবোর্ড পাওয়া যায়। মাদারবোর্ড বাছাই করতে গেলে যেসব বৈশিষ্ট্য বা স্পেসিফিকেশন দেখা দরকার তাহলো :

১. মাদারবোর্ডটি কী কী প্রসেসর সাপোর্ট করে অর্থাৎ এর প্রসেসর সকেট কী?
২. কত গিগাবাইট র‍্যাম লাগানো যেতে পারে? কতটি স্লট থাকবে?
৩. এতে চিপসেট আছে কীনা?
৪. এর মধ্যে অডিও ভিডিও ইনপুট এবং আউটপুট পোর্টের অবস্থা কী?
৫. বাস স্পিড কত?
৬. ল্যান সাপোর্ট করে কীনা?
৭. পেরিফেরাল ইন্টারফেস।
৮. এক্সপানশন স্লট ইত্যাদি।

নিচে একটি আসুস M4A77TD PRO মডেলের মাদারবোর্ড–এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো।

Socket :
Socket AM3 Motherboard

CPU :
AMD Socket AM3; Phenom™II/Athlon™II/Sempron™ 100 Series Processors
AMD 140W CPU Support
AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 Technology (by CPU type)
Support 45nm CPU

Chipset :
AMD 770/SB710

System Bus :
Up to 5200 MT/s HyperTransport™ 3.0 interface

Memory :
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC, Non–ECC, Un–buffered Memory
Dual Channel memory architecture

Expansion Slots :
2 x PCIe 2.0 x16 (*blue@ x16 mode, black@ x4 mode)
1 x PCIe x1
3 x PCI

LAN :
Realtek 8112L PCIe Gb LAN

Storage :

SB710 Chipset
1 xUltraDMA 133/100
5 x Serial ATA 3Gb/s Support RAID 0,1,10
1 x eSATA 3Gb/s ports

Audio :
VT1708S High Definition Audio 8–lChannel CODEC
Supports Jack–detect and Multistreaming teconologies, and Front Panel Jack–Retasking
Optical S/PDIF Out ports at back I/O
USB :
12 USB 2.0 ports (6 ports at mid–board, 6 ports at back panel)
Overclocking Features :
Intelligent overclocking tools
Turbo Key
SFS (Stepless Frequency Selection)
FSB tuning from 200MHz up to 550MHz at 1MHz increment
PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

প্রসেসর—এর স্পেসিফিকেশন

পিসির প্রধান কাজ করে প্রসেসর। একে পিসির মস্তিষ্ক বলা হয়। প্রসেসরের উপর ভিত্তি করেই পিসির ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। যত বেশি ক্ষমতার (ক্ষমতা মাপার একক হলো মেগাহার্টস (MHz) প্রসেসর হবে পিসি তত দ্রুত কাজ করবে। প্রসেসর কেনার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচ্য :

- প্রসেসরটি কোন কোম্পানির?
- এর কোর স্পিড কত মেগা হার্টজ?
- ক্যাশ মেমরির কী অবস্থা?

নিচে একটি Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition মডেলের প্রসেসর—এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো।

Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition

- 3.20 GHz and 3.33GHz core speed
- 8 processing threads with Intel® HT technology
- 8 MB of Intel® Smart Cache
- 3 Channels of DDR3 1066 MHz memory

র‍্যাম—এর স্পেসিফিকেশন

নিচে একটি **Kingston HyperX Dual Channel Kit** মডেলের প্রসেসর-এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো। র‍্যাম এর ক্ষেত্রে র‍্যামটি কোন ধরনের এবং এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কত তা দেখতে হয়। নিচে একটি র‍্যামের স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করা হলো :

Model : KHX1333C7D3K2/2G

Storage Capacity : 2 GB (2 × 1 GB)
Upgrade Type : Generic
Technology : DDR3 SDRAM
Form Factor : DIMM 240-pin
Memory Speed : 1333 MHz
Data Integrity Check : Non-ECC
Latency Timings : CL7 (7-7-7-20)
Features : Unbuffered
Supply Voltage : 1.7 V
Lead Plating : Gold

হার্ডডিস্ক ড্রাইভ–এর স্পেসিফিকেশন

হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রে এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি এবং এর অন্যান্য পারফরমেন্স যেমন- এর ঘূর্ণন গতি, সিকটাইম, ডেটা ট্রান্সফার রেট, ইন্টারফেস ইত্যাদি দেখতে হয়। নিচে একটি স্যামসাং Spinpoint F3 মডেলের হার্ডডিস্ক ড্রাইভ - এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো।

Capacity : 500 GB
Interface : Serial ATA 3.0Gbps
Buffer DRAM Size : 16 MB
Byte per Sector : 512 bytes
Rotational Speed : 7,200 RPM
Average Seek time(typical) : 8.9 ms
Average Latency : 4.17 ms
Data Transfer Rate/Media to/from Buffer(Max.) : 250 MB/sec
Data Transfer Rate/Buffer to/from Host(Max.) : 300 MB/sec
Non-recoverable Read Error : 1 sector in 10^15bits
Start/Stop Cycles : 50,000
Idle : 2.5 Bel
Performance Seek : 2.8 Bel

ডিভিডি–রম ড্রাইভ–এর স্পেসিফিকেশন

সিডি/ডিভিডি ড্রাইভের গতিকে X দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বেশি X এর সিডি ড্রাইভ কেনা উত্তম। নিচে একটি SAMSUNG SH-S223F মডেলের ডিভিডি-রম ড্রাইভ -এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো।

Drive Type : DVDRW
Drive Height : 42mm
Interface : Serial-ATA
Drive Mounting : Horizontal/vertcal

Buffer Memory : 2MB
CD–R Write : 48X
CD–R Read : 40X
CD–RW Write : 32X
CD–RW Read : 32X
CD–ROM Read : N/A
CD–ROM Write : 48X
DVD–ROM Write : N/A
DVD–ROM Read : 16X
DVD+R Write : 22X
DVD+R Read : 16X

গ্রাফিক্স কার্ড–এর স্পেসিফিকেশন

গ্রাফিক্স কার্ডের মেমরিকে ভি র‍্যাম বা ভিডিও র‍্যাম বলা হয়। ভি র‍্যাম বেশি হলে রেজ্যুলেশন, কালার ডেপথ ও থ্রি–ডি ইমেজিং এর মান ভালো হয়। নিচে একটি SAMSUNG SH–S223F মডেলের একটি গ্রাফিক্স কার্ড–এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো।

Asus ATI PCI–Express Video Card

- **Model Number :** gr–27
- **Mfr part number :** EAH4350 SILENT/DI/512MD2
- **Chipset :** Radeon HD4350
- **Engine clock :** 600MHz
- **Video memory :** 512MB DDR2
- **Memory clock :** 800MHz
- **Memory interface :** 64–bit
- **Bus :** PCI–Express x 16 (supports PCI–Express 2.0)
- **RAMDAC :** 400MHz
- **Maximum resolution :** 2,560 x 1,600 pixels
- **Connectors :** VGA, DVI, HDMI
- **Thermal :** fansink

সাউন্ড কার্ড–এর স্পেসিফিকেশন

একটি ভালো সাউন্ড কার্ডের বিভিন্ন ফিচারের মধ্যে রয়েছে ওয়েভটেবিল সিনথেসিস, উন্নত স্টেরিও ইফেক্ট, থ্রি–ডি ইলিউশন, MIDI কম্পাবিলিটি ইত্যাদি। নিচে একটি মডেলের Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio একটি গ্রাফিক্স কার্ড -এর স্পেসিফিকেশন বর্ণনা করা হলো।

Sound Blaster X–Fi Xtreme Audio

Feature	Description
Playback :	24–Bit/96kHz 7.1
Signal–to–Noise Ratio :	>108dB (20kHz Low–pass filter, A–Weighted)
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz :	0.006% (20kHz Low–pass filter)
Recording :	24–bit/96kHz
X–Fi Technology :	• X–Fi Crystalizer • X–Fi CMSS–3D Virtual • X–Fi CMSS–3D Headphone
Connectivity :	• Speaker and Headphone connections for stereo to 7.1 (Line Out via three 3.5mm mini jacks) • Line In / Microphone In / Digital Out[1] / Digital I/O[2] (shared 3.5mm FlexiJack) • Auxiliary Line level Input (via 4-pin Molex connector) • Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x5pin)

জব নং–০২

জবের নাম : একটি মাদারবোর্ডে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। একটি মাদারবোর্ড

২। মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে এমন প্রসেসর, র‍্যাম, গ্রাফিক্স কার্ড, সাউন্ড কার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড

৩। স্ক্রু ড্রাইভার

৪। এন্টিস্টেটিক রিস্ট স্ট্র্যাপ

উদ্দেশ্য :

একটি মাদারবোর্ডে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন ।

ভূমিকা :

মাদারবোর্ড বা মেইনবোর্ড একটি কমপিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো যেমন– প্রসেসর, র‍্যাম, বিভিন্ন ডিস্ক ড্রাইভ এবং বিভিন্ন কার্ড ইত্যাদি যুক্ত থাকে। নিচে মাদারবোর্ডে এসব যন্ত্রাংশ সংযোজন করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো।

মাদারবোর্ডের প্রসেসর সকেটে প্রসেসরকে ইনস্টল করা

১. কম্পিউটারে এক্সপানশন কার্ড লাগানোর আগে কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে পাওয়ার লাইন থেকে ক্যাবল খুলে নিতে হবে। মাদারবোর্ড এবং এক্সপানশন কার্ড হাতে স্পর্শ করার আগে এন্টিস্টেটিক রিস্ট স্ট্র্যাপ হাতে লাগিয়ে নিলে ব্যবহারকারীর শরীর থেকে বাহিত ইলেক্ট্রোস্টেটিক থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করে।

২. প্রসেসরটিকে সবসময় পাশের অংশগুলোতে আঙুলের সাহায্যে ধরে রাখতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যেন কোনোভাবেই কনট্যাক্ট প্যাডে স্পর্শ না লাগে।

৩. মাদারবোর্ডে প্রসেসর সকেট এর প্লাস্টিকের কভারটি অপসারণ করতে হবে।

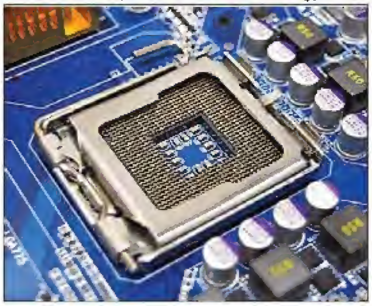

প্রসেসরের সকেট

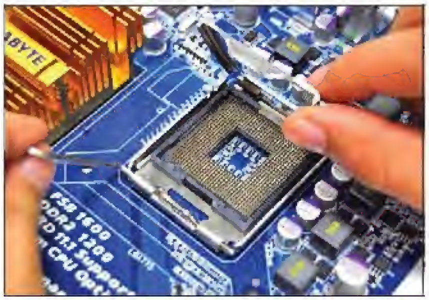

সকেটের লেভেল ও কভারকে আনলক করা

৪. সকেট এর ধাতব কভারটিকে হালকাভাবে টেনে উঠাতে হবে।

৫. প্রসেসরটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে। এ সময় নচগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটি যেন সকেটের মধ্যে সহজভাবে ফিট হয় এবং এজন্য খুব বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে না হয় ।

প্রসেসরকে বসানো হয়েছে

মেটাল কভারকে নামিয়ে ও আটকে দিয়ে প্রসেসরকে ঠিকভাবে বসানো হয়েছে

৬. মেটাল কভারটিকে নিচের দিকে নামিয়ে এনে লেভেলটিকে খানিকটা নিচের দিকে ধাক্কা দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লক করতে হবে।

প্রসেসরের কুলার

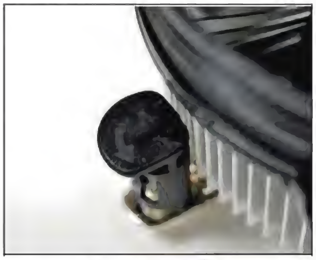

কুলারের খোলা পিন

৭. কুলারটি ইন্সটল করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যেন পুশ-পিনগুলো কুলারে ৯০ ডিগ্রি পজিশনে খোলা থাকে।

৮. এবার কুলারটিকে প্রসেসরের উপরে বসাতে হবে এবং মাদারবোর্ডের বিপরীতে পুশ-পিনগুলোকে সাজাতে হবে। এরপর পিনগুলোকে নিচের দিকে সজোরে ততক্ষণ পর্যন্ত ধাক্কা দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত 'ক্লিক' করে একটি শব্দ শোনা না যায়। এ শব্দ শুনলে বুঝতে হবে কুলারটি নিরাপদে বসেছে।

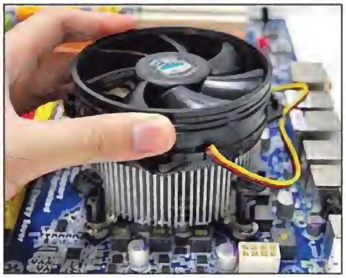

প্রসেসরের উপর কুলার স্থাপন

মাদারবোর্ড উল্টিয়ে দেখলে পুশ-পিনকে এমন দেখা যাবে

৯. কুলারটি থেকে পাওয়ার কানেক্টরটি নিয়ে সেটিকে মাদারবোর্ডে থাকা সংশ্লিষ্ট হেডারের মধ্যে যুক্ত করতে হবে। এটি সিপিইউ ফ্যানের মতো করে লেভেল করতে হবে।

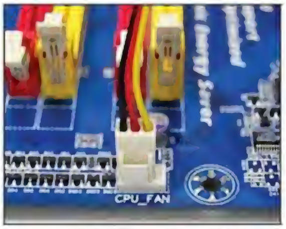

সিপিইউ ফ্যান কানেক্টর

কুলারের পাওয়ার কানেক্টরকে যথাযথভাবে পাওয়ারের সাথে যুক্ত করা

১০. এভাবে কুলারটি পরিপূর্ণভাবে প্রসেসরের উপর স্থাপিত হবে। আর এর মাধ্যমে মাদারবোর্ডের প্রসেসর সকেটে প্রসেসর ইন্সটল করার প্রক্রিয়াটি পূর্ণতা পাবে।

মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটে র‍্যাম মডিউল ইন্সটল করা

১. মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটের দুইদিকের নব দুইটিকে আঙ্গুল দিয়ে চেপে বাহিরের দিকে সরাতে হবে।

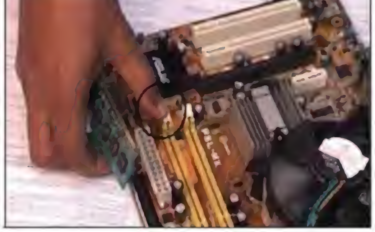

২. র‍্যামের পিনযুক্ত মাথাকে স্লটে সঠিকভাবে বসাতে হবে।

৩. স্লটে র‍্যাম বসানোর পর আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

৪. স্লটের দুইদিকের নব দুইটিকে আঙুল দিয়ে চেপে ভেতরের দিকে সরাতে হবে।

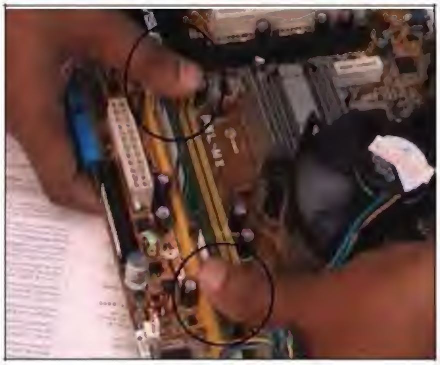

মাদারবোর্ডে সাউন্ড কার্ড ইন্সটল করা

আজকাল কম্পিউটারের অনেক মাদারবোর্ডে সাউন্ড কার্ড বিল্টইন থাকে। এর বাইরেও ভালো পারফরমেন্সের জন্য পৃথক সাউন্ড কার্ড লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে পৃথক সাউন্ড কার্ড লাগানোর আগে অবশ্যই বিল্টইন সাউন্ড কার্ডটি ডিজ্যাবল করে নিতে হবে। কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে সাউন্ড কার্ড ইন্সটলের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে।

১. কম্পিউটারটি বন্ধ করতে হবে। হার্ডওয়্যারটিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য কার্ডটি ইন্সটলের পূর্বে পাওয়ার আউটলেট থেকে পাওয়ার কর্ডটি খুলে রাখতে হবে।

২. কম্পিউটার কেসের ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে।

৩. কার্ডটি সাপোর্ট করে এমন একটি এক্সপ্যানশন স্লট চিহ্নিত করতে হবে। বর্তমানে অধিকাংশ সাউন্ড কার্ডই PCI ইন্টারফেসে ডিজাইন করা থাকে এবং মাদারবোর্ডের PCI স্লটে সংযুক্ত করা থাকে। তাই PCI স্লটটি খুঁজে বের করতে হবে। চেসিস ব্যাক প্যানেল থেকে মেটাল স্লট কভারটি অপসারণ করতে হবে।

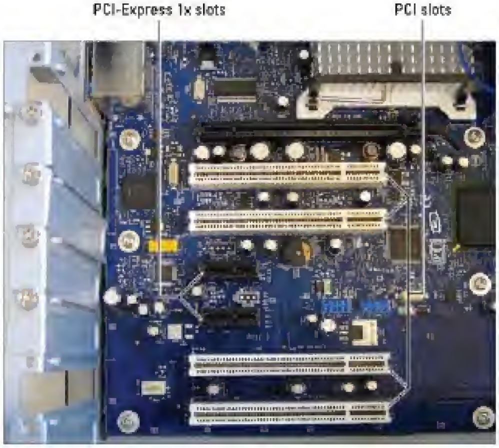

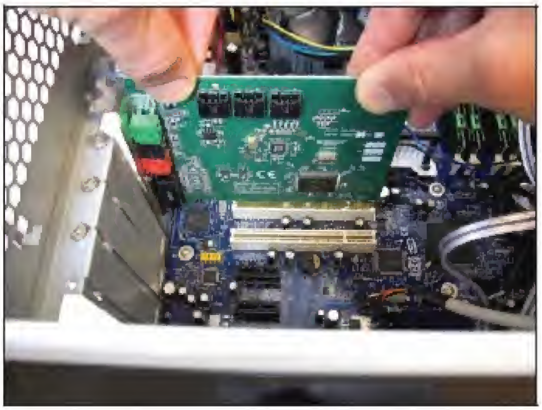

৪. কার্ডটিকে স্লটের সাথে অ্যালাইন করতে হবে এবং স্লটে ঠিকমতো বসে না যাওয়া পর্যন্ত কার্ডটিকে নিচের দিকে চেপে ধরে রাখতে হবে।

৫. কার্ডে থাকা মেটাল কনট্যাক্টগুলো পুরোপুরি স্লটে বসে গেছে কীনা সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

৬. একটি স্ক্রু দিয়ে চেসিস ব্যাক প্যানেলে কার্ডটির মেটাল ব্রাকেটকে সুরক্ষিত করতে হবে।

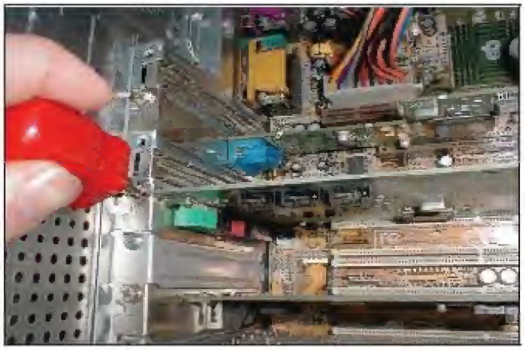

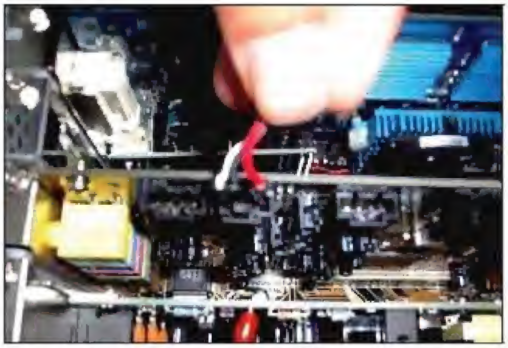

৭. এক্সপ্যানশন কার্ড ইনস্টলের পর চেসিস কভার রিপ্লেস করতে হবে।

৮. এবার CD–IN সকেটের মধ্যে অডিও ক্যাবল সংযোজন করতে হবে। এই ক্যাবলের অন্য প্রান্ত CD/DVD–ROM ড্রাইভের অডিও-আউট সকেটের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৯. কম্পিউটার কেসের ঢাকনাটি লাগাতে হবে।

১০. এবার কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে বায়োস সেটআপে গিয়ে এক্সপ্যানশন কার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বায়োস পরিবর্তনগুলো করে আসতে হবে।

১১. এক্সপ্যানশন কার্ডের সাথে সরবরাহ করা ড্রাইভারটি অপারেটিং সিস্টেমে ইনস্টল করতে হবে।

১২. সাউন্ড কার্ডটি ইনস্টল করার পর কম্পিউটার কেসের পেছনের দিকে সাউন্ড কার্ডের বেশ কিছু পোর্ট দেখতে পাওয়া যাবে যেগুলোতে স্পিকার, মাইক্রোফোন, হেডফোন প্রভৃতি সংযুক্ত করা হয়।

মাদারবোর্ডে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (নিক) ইন্সটল করা

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডকে (নিক) বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। নিক (NIC – Network Interface Card) এর জন্য যথাযথ স্লটটি নির্বাচন করে নিতে হবে। অধিকাংশ পিসিই নিক এর জন্য PCI বা PCIe স্লট ব্যবহার করে থাকে। পুরোনো পিসিগুলো ISA স্লট ব্যবহার করতো যা এখন আর খুব বেশি প্রচলিত নয়। যাই হোক ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় স্লটটি খুঁজে বের করার পর নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পিসির বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো খুলে ফেলতে হবে।

২. স্পর্শকাতর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হবে বলে সম্ভব হলে একটি এন্টি-স্ট্যাটিক রিস্টব্যান্ড পরে নেওয়া ভালো।

৩. কম্পিউটার কেসের এক পাশে ঢাকনা স্ক্রু ড্রাইভারের মাধ্যমে খুলে ফেলতে হবে। যেসব কেসে থাম্বস্ক্রু ব্যবহার করা হয় সেগুলো হাত দিয়েই খুলে ফেলা যাবে।

৪. নির্বাচিত PCI স্লটটির পাশের মেটাল ব্যাকিং প্লেটটি অপসারণ করতে হবে। এটি একটি স্ক্রু দিয়ে লাগানো থাকে সেটি খুলে ফেলে এটি অপসারণ করা যাবে। অনেক সময় কোনো ধরনের ব্যাকিং প্লেট নাও থাকতে পারে।

৫. নিকটিকে যথাযথভাবে স্লটের উপর রেখে নিচের দিকে আলতো করে চাপ দিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে মাউন্টিং ব্রাকেটটি স্লটের সাথে যথাযথভাবে অ্যালাইন করা হয়েছে।

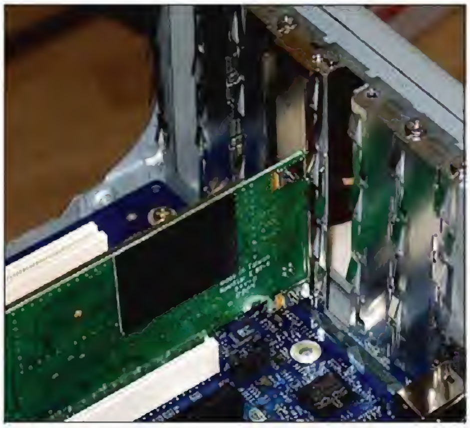

৬. নিকের মাউন্টিং ব্রাকেটটিকে নিরাপত্তা দিতে এটিকে কেসের সাথে একটি স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

৭. এবার কম্পিউটার কেসের ঢাকনাটি লাগিয়ে দিতে হবে।

৮. ইথারনেট ওয়্যারের কম্পিউটার কেসের পেছনের দিকে থাকা RJ-45 জ্যাকে লাগিয়ে নিতে হবে এবং ওয়্যারের অপরপ্রান্ত ব্যবহারকারীর ডিএসএল মডেম, হাব, রাউটার বা ক্রসওভার ওয়্যারে (যদি ব্যবহার করা হয়) যুক্ত করতে হবে।

৯. এরপর পিসিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ পুনরায় স্থাপন করে পিসিটি চালু করতে হবে।

১০. নিক এর সাথে একটি ডিস্ক দেওয়া হয় যেখানে যথাযথ ড্রাইভারটি থাকবে। ড্রাইভার সফটওয়্যারটি কম্পিউটারে ইন্সটল করে নিতে হবে। তাহলে উইন্ডোজ উক্ত নিক-টিকে শনাক্ত করতে পারবে।

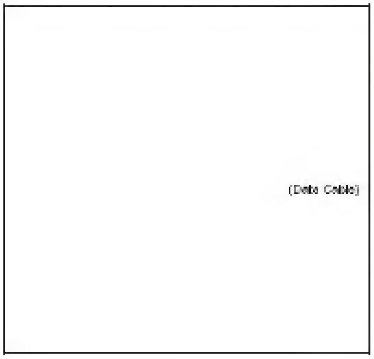

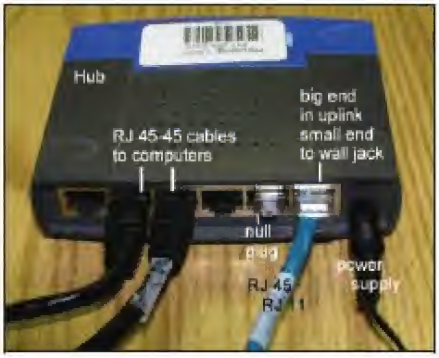

জব নং—০৩

জবের নাম : কেসিং ও মাদারবোর্ডে পেরিফেরালসমূহ সংযুক্তকরণে দক্ষতা অর্জন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১ । একটি সিস্টেম ইউনিট

২ । মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে এমন প্রসেসর, র‍্যাম, গ্রাফিক্স কার্ড, সাউন্ড কার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড

৩ । স্ক্রু ড্রাইভার

উদ্দেশ্য : কেসিং ও মাদারবোর্ডে পেরিফেরালসমূহ সংযুক্তকরণে দক্ষতা অর্জন

ভূমিকা :

কম্পিউটার পেরিফেরাল অথবা পেরিফেরাল ডিভাইস হলো এক্সটারনাল ডিভাইস যেগুলোর মাধ্যমে কম্পিউটারে ইনপুট এবং আউটপুট প্রদান করা হয়। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত ইনপুট পেরিফেরাল হলো কীবোর্ড, মাউস, মাইক্রোফোন এবং কয়েকটি আউটপুট পেরিফেরাল হলো মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার ইত্যাদি। কম্পিউটারের কেসিংয়ের পেছনে থাকা মাদারবোর্ডের কানেক্টরসমূহে পেরিফেরালসমূহকে যুক্ত করা হয়।

কেসিংয়ের পেছনে থাকা মাদারবোর্ডের কানেক্টরসমূহ যেখানে পেরিফেরালসমূহকে যুক্ত করা হয়

পিএস/২ পোর্ট কানেক্টর : যেসব পেরিফেরাল পিএস/২ পোর্ট যুক্ত তাদেরকে মাদারবোর্ডের পিএস/২ পোর্ট কানেক্টরে যুক্ত করতে হবে। যেমন– কীবোর্ড ও মাউস।

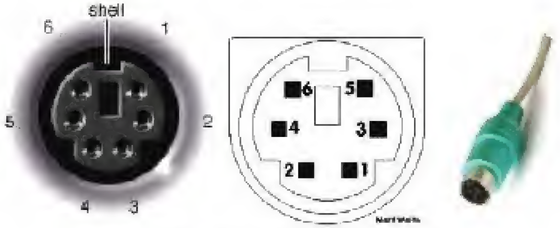

চিত্র : পিএস/২ পোর্ট কানেক্টর

ইউএসবি পোর্ট কানেক্টর : যেসব পেরিফেরাল ইউএসবি পোর্ট যুক্ত তাদেরকে মাদারবোর্ডের ইউএসবি কানেক্টরের সাথে যুক্ত করতে হবে। যেমন– কীবোর্ড, মাউস, ইউএসবি স্ক্যানার, ইউএসবি প্রিন্টার, ওয়েবক্যাম ইত্যাদি। আজকাল বেশিরভাগ পেরিফেরালই ইউএসবি পোর্টযুক্ত। কাজেই সেগুলোকে ইউএসবি কানেক্টরে লাগিয়ে খুব সহজেই কাজ করা যায়।

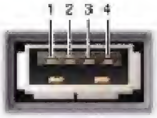

চিত্র : ইউএসবি পোর্ট কানেক্টর

ল্যান পোর্ট কানেক্টর : ল্যান কার্ডটির কানেক্টরের সাথে সাধারণত হাবের কাছে থেকে আসা তারের অপর প্রান্ত যেখানে আরজে-৪৫ কানেক্টরটি লাগানো থাকে সেটি মাদারবোর্ডের ল্যান কার্ডের কানেক্টরের সাথে যুক্ত করতে হবে।

ভিজিএ/ডিভিআই কানেক্টর : প্রচলিত মনিটরগুলো মাদারবোর্ডে যুক্ত গ্রাফিক্স কার্ডের অপরপ্রান্ত যেটি কেসিংয়ের বাইরে থেকে দেখা যায় সেই ভিজিএ কানেক্টর বা সকেটে যুক্ত করা হয়। তবে আজকাল ডিজিটাল ভিডিও ইন্টারফেস বা ডিভিআই সম্বলিত মনিটর পাওয়া যায় সেগুলোর ডিভিআই ক্যাবলটিকে সিপিইউ'র ডিভিআই কানেক্টর বা সকেটে যুক্ত করতে হয়।

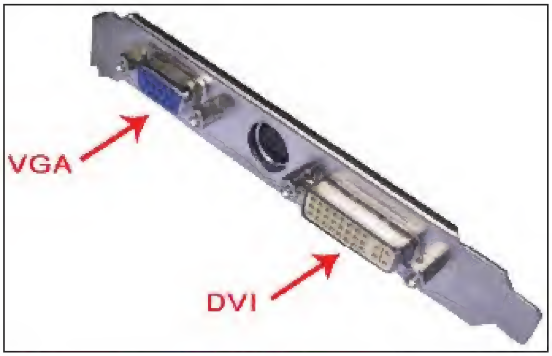

অডিও এবং মাইক্রোফোন জ্যাক : স্পিকার বা মাইক্রোফোন লাগানোর জন্য সিপিইউ'র পেছনে থাকা অডিও এবং মাইক্রোফোন জ্যাকগুলো ব্যবহার করা হয়। এসব জ্যাক ভিন্ন ভিন্ন কালারে চিহ্নিত করা থাকে। স্পিকার ও মাইক্রোফোনের সাথে যুক্ত তারটির শেষ প্রান্ত যে কালার থাকে সেই কালারের জ্যাকে তা যুক্ত করতে হয়।

মনিটরকে সিস্টেম ইউনিট এর সাথে সংযোগ করা

সিস্টেম ইউনিট এর মাদারবোর্ডে ভিজিএ কার্ডের পোর্টের সাথে মনিটরের কানেক্টরটি সংযুক্ত করা হয়। ভিজিএ কার্ডের পোর্টটি মাদারবোর্ডের ক্যাসিং এর বাহিরে প্রদর্শিত থাকে। ভিজিএ (ভিডিও গ্রাফিক্স এ্যারে) মনিটরের সংযোগক্ষেত্রে ১৫ পিনের ফিমেল সিরিয়াল পোর্টের সাথে মনিটরের মেইল কানেক্টরটি লাগানো হয়। এক্ষেত্রে মনিটরের মেইল কানেক্টরটি সঠিকভাবে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দুই পাশের দুইটি স্ক্রু এর মাথা ঘুরায়ে টাইড করে সংযোগ দিতে হবে যাতে সংযোগটি ঢিলা না হয়।

চিত্র : ভিজিএ কার্ডের বাহিরের ফিমেল পোর্ট
(এখানে মনিটরের কানেক্টর লাগানো হয়)

চিত্র : মনিটরের মেইল কানেক্ট

চিত্র : মনিটরের মেইল কানেক্টরটি ভিজিএ
কার্ডের ফিমেল পোর্টে লাগানো হচ্ছে

চিত্র : বেগুনী রঙের পিএস-২ কী-বোর্ড পোর্ট

সিস্টেম ইউনিটের সাথে কী-বোর্ড পোর্ট লাগানো

বর্তমানে পার্সোনাল কমপিউটারে ব্যবহৃত কী-বোর্ড পোর্টসমূহ ইউএসবি পোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তবে এখনো কিছু কিছু পিএস-২ কী-বোর্ড দেখা যায়। কী-বোর্ডটি যদি পিএস-২ পোর্ট এর হয় তাহলে সিস্টেম ইউনিটের পেছনের প্রান্তে অবস্থিত ৫ পিনবিশিষ্ট DIN পোর্টের মাধ্যমে পিএস-২ কী-বোর্ডকে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়। কী-বোর্ডের কানেক্টরটি ক্যাসিং এর পিছনে পিএস-২ ফিমেল পোর্টে সঠিকভাবে হালকা করে ঢুকিয়ে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে লাগাতে হয়।

চিত্র : বেগুনী রঙের কী-বোর্ড মেইল কানেক্টর যা কী-বোর্ডের ফিমেল পোর্টে লাগানো থাকে

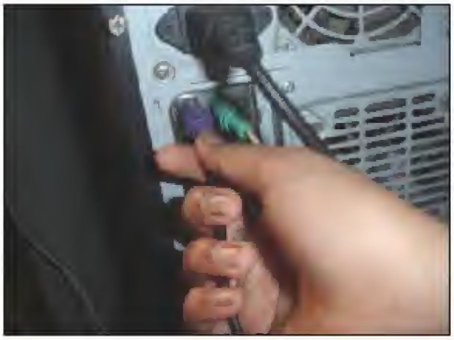

চিত্র : বেগুনী রঙের কী-বোর্ড মেইল কানেক্টরটি কী-বোর্ডের ফিমেল পোর্টে লাগানো হচ্ছে

কী-বোর্ডটি যদি ইউএসবি পোর্ট এর হয় তাহলে সিস্টেম ইউনিটের পেছনের প্রান্তে অবস্থিত ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে ইউএসবি কী-বোর্ডকে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়। কী-বোর্ডের কানেক্টরটি ক্যাসিং এর পিছনে ইউএসবি পোর্টে সঠিকভাবে হালকা করে সংযুক্ত করে আংগুল দিয়ে চাপ দিয়ে লাগাতে হয়।

সিস্টেম ইউনিটের সাথে মাউস সংযোগ দেওয়া

সিস্টেম ইউনিটের পিছনে মাউস সংযোগ করার জন্য পিএস-২, প্যারালাল এবং ইউএসবি পোর্ট থাকে। অধিকাংশ নতুন কমপিউটারে দুইটি USB পোর্ট । মাউসটি যদি পিএস-২ টাইপের হয় তাহলে মাউসের কানেক্টরটি ক্যাসিং এর পিছনে পিএস-২ ফিমেল পোর্টে সঠিকভাবে হালকা করে ঢুকিয়ে আংগুল দিয়ে চাপ দিয়ে লাগাতে হয়। যদি ইউএসবি হয় তাহলে ইউএসবি পোর্টে সঠিকভাবে লাগাতে হয়।

চিত্র : সিস্টেম ইউনিটের পিছনে ইউএসবি পোর্ট

চিত্র : মাউসের ইউএসবি কানেক্টর

চিত্র : মাউসের ইউএসবি কানেক্টরটি ইউএসবি পোর্টে লাগানো হচ্ছে

সিস্টেম ইউনিট এর সাথে স্পিকার সংযোগ করা

সিস্টেম ইউনিট এর মাদারবোর্ডে সাউন্ড কার্ড লাগানো থাকে। সাউন্ড কার্ডের পোর্টসমূহ ক্যাসিং এর পিছনে বাহিরের অংশে প্রদর্শিত হয়। এই পোর্টের সাথে স্পিকারের জ্যাক লাগাতে হয়।

চিত্র : সাউন্ড কার্ডের বাহিরের পোর্টসমূহ

স্পিকারের সবুজ রঙের পোর্টের সাথে স্পিকারের জ্যাক লাগাতে হয়।

চিত্র : সাউন্ড কার্ডের স্পিকার পোর্টে স্পিকারের কানেক্টর লাগানো হচ্ছে

সিস্টেম ইউনিট এর সাথে প্রিন্টার সংযোগ করা

প্রিন্টারের পাওয়ার ক্যাবলটি পাওয়ার বোর্ডে লাগাতে হবে ।

চিত্র : একটি লেজার প্রিন্টারের পিছনের অংশ

প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবলটির মাথা (প্যারালাল মেল পোর্ট) সিস্টেম ইউনিটের পিছনে প্যারালাল ফিমেল পোর্টে লাগাতে হবে ।

জব নং-৪

জবের নাম : কম্পিটারের বায়োস কনফিগার করণে দক্ষতা অর্জন

কম্পিউটারের বায়োসে প্রবেশ করতে হলে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচটি চেপে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। পর্দায় কিছু টেক্সট প্রদর্শিত হবে। এটিকে বুট স্ক্রিন বলে। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির মাদারবোর্ডে এসব টেক্সট তথা বুট স্ক্রিন ভিন্ন ভিন্ন আসতে পারে। তবে তাদের মূল বিষয়বস্তু একই ধরনের হয়ে থাকে।

২. বুট স্ক্রিনটি প্রদর্শিত হলে দেরি না করে তৎক্ষণাৎ কী-বোর্ড থেকে DEL কী চাপতে হবে (কোন কী চাপতে হবে সেটি নির্ভর করে মাদারবোর্ডের বায়োসের উপর। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই DEL কী চাপতে হয়)। মাদারবোর্ডের সাথে দেওয়া ম্যানুয়ালে এ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকে।

৩. একটু পরেই স্ক্রিনে বায়োস কনফিগারেশন মেনু প্রদর্শিত হবে।

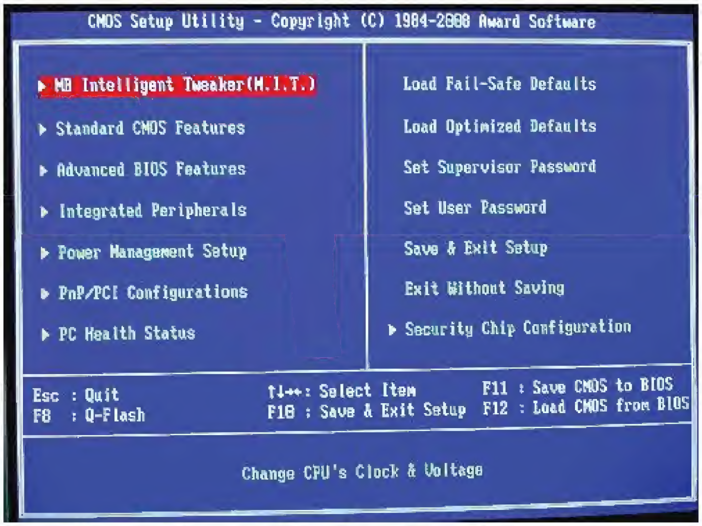

বায়োস কনফিগারেশন মেনু

১০. বায়োস কনফিগার মেনু থেকে Advanced BIOS Features নির্বাচন করতে হবে।

১১. স্ক্রিনে Advanced BIOS Features ফিচারগুলো প্রদর্শিত হবে।

১২. এখানে First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device ইত্যাদি অপশনগুলো পাওয়া যাবে।

১৩. ব্যবহারকারী যে ডিভাইসটিকে যে ধরনের বুট সিকুয়েন্সে রাখতে চান সে অপশনটি সিলেক্ট করে হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক বা সিডি-রম/ডিভিডি-রম সিলেক্ট করে দিতে হবে।

- **First Boot Device:** কম্পিউটার চালু হবার পর বুটআপ ফাইলগুলো প্রথম কোথায় খুঁজবে তা এখান থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। যেমন— সাধারণত কম্পিউটার চালু হবার পর বুটিং হয়ে থাকে হার্ডডিস্ক থেকে। তাই প্রথম বুট ডিভাইস হিসেবে HDD–0 দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো— কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটলের সময় সেটি সিডি/ডিভিডি থেকে বুট করে নিয়ে করতে হয়। কাজেই যখন অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করার প্রয়োজন হবে তখন আগেই বায়োসে গিয়ে হার্ডডিস্কের বদলে CD–ROM ড্রাইভটি সিলেক্ট করে দিতে হবে। নতুবা বুটেবল সিডি/ডিভিডি হলেও সিডি থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা যাবে না।

- **Second Boot Device :** কম্পিউটার চালু হবার পর প্রথম বুট ডিভাইসটি না পেলে তখন সেটি দ্বিতীয় বুট ডিভাইস থেকে বুট করার চেষ্টা করে। তাই দ্বিতীয় যে ডিভাইস থেকে বুট করাতে চাই সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেওয়া যায়। সাধারণত এটি CD–ROM বা HDD–0 সিলেক্ট করা থাকে।

- **Third Boot Device :** কম্পিউটার চালু হবার পর প্রথম বুট ডিভাইসটি না পেলে সেটি দ্বিতীয় বুট ডিভাইসটি খুঁজবে। সেটি পেতে ব্যর্থ হলে তৃতীয় আরেকটি বুট ডিভাইস খুঁজতে থাকবে। এই অপশনে সেটি নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে। এখানে কোনো এক্সটার্নাল ডিস্ক থেকে বুট করতে চাইলে SCSI নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। নতুবা HDD-0 সিলেক্ট রাখা যায়।

- **Boot Other Device :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Disabled থাকে। এই সেটিংয়ের মাধ্যমে পিসি First Boot Device ছাড়া অন্য কোনো ডিভাইস থেকে বুট করার চেষ্টা করবে না। তবে পিসি যখন First Boot Device থেকে বুট করতে অক্ষম হবে তখন যদি Second Boot Device বা Third Boot Device থেকে বুট করাতে চাই সেক্ষেত্রে এই অপশনটিকে Enabled করে দিতে হবে।

- **Swap Floopy Drive :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Disabled থাকে। এখন আর এটি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না।

- **Boot Up Floppy Seek :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Disabled থাকে। এখন আর এটি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না।

- **Boot Up NumLock Status :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত On থাকে। অধিকাংশ এন্ড ইউজারই চান তাদের পিসিটি বুট আপের সময় যেন নিউমেরিক লক সেটটি অন থাকে এজন্য যে যখন তাদের নিউমেরিক প্যাড ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে তখন নামলক অন করা আছে না অফ করা আছে সেটি নিয়ে তাদের চিন্তা করতে হয় না। বুট আপের সময় নামলক বন্ধ রাখতে চাইলে এটি Off হিসেবে সেট করে দেওয়া যায়।

- **IDE HDD Block Mode :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে।

- **Typematic Rate Setting :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে। এটি নির্ধারণ করা হলে এক্ষেত্রে কোনো কী চেপে ধরলে কেবল একটি ক্যারেক্টার তৈরি করবে।

- **Typematic Rate (Char/Sec) :** এটি Enabled থাকলে প্রতি সেকেন্ডে ৬, ৮, ১০, ১২, ১৫, ২০, ২৪, ৩০ ক্যারেক্টারের একটি টাইপমেটিক রেট (একটি ক্যারেক্টার চেপে ধরে রাখলে কতগুলো ক্যারেক্টার প্রিন্ট করবে তার হার) সিলেক্ট করা যাবে।

- **Typematic Delay (Msec) :** যখন টাইপমেটিক রেট সেটিং Enabled থাকে তখন ২৫০, ৫০০, ৭৫০ বা ১০০০ মিলিসেকেন্ডের একটি টাইপমেটিক ডিলে (কী স্ট্রোকসমূহ পুনরাবৃত্তি শুরুর আগের ডিলে) সিলেক্ট করা যায়।

- **Security Option :** যদি একটি পাসওয়ার্ড সেট করা থাকে তবে সেটি সিস্টেম বুট করার সময় প্রতিবার নাকি কেবল ব্যবহারকারী যখন সেটআপে প্রবেশ করবেন তখন প্রয়োজন হবে তা সিলেক্ট করে দেওয়া যায়। এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Setup থাকে।

- **OS Select For DRAM > 64MB :** যদি সিস্টেমে ৬৪ মেগাবাইটের চাইতেও বেশি র‍্যামসহ OS/2 অপারেটিং সিস্টেম চালানো হয় তবেই কেবল OS2 সিলেক্ট করতে হবে। নতুবা এর ডিফল্ট ভ্যালুটিই রেখে দেওয়া যেতে পারে।

- **Virus Warning :** এটি সাধারণত Disabled থাকে। এটি একটি ভালো ফিচার। এটি Enabled করা থাকলে কোনো প্রোগ্রাম (বিশেষ করে ভাইরাস) হার্ডডিস্কের বুট সেক্টর কিংবা পার্টিশন টেবিল রাইট করতে গেলে একটি সতর্কবার্তা প্রদান করে। তখন ব্যবহারকারীকে একটি এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম রান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই ফিচারটি কেবল বুট সেক্টরকে সুরক্ষিত রাখে পুরো হার্ডডিস্কটিকে নয়।

- **CPU Level 1 Cache :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে।
- **CPU Level 2 Cache :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে।
- **CPU Level 2 Cache ECC Checking :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে। Level 2 ক্যাশ মেমরিতে কোনো সমস্যা হলে এ অপশনটি দ্বারা এরর চেকিং কোড বা ECC পরীক্ষা করানো যায়।
- **Processor Number Feature :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে।
- **Quick Power On Self Test :** এর ডিফল্ট ভ্যালু সাধারণত Enabled থাকে। ফলে Power On Self Test (POST) চালাতে যে সময় লাগে তার পরিমাণকে কমিয়ে আনা যায়। কুইক POST বেশ কিছু স্টেপকে স্কিপ করে যায়। তবে পরামর্শ হলো এটি Enabled থাকলেও তা Disabled করে দেওয়া উচিত। POST চলাকালীন সমস্যা বের করাটাই ভালো।
    - বায়োসের কোন অপশন পরিবর্তন করে পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য কী-বোর্ড থেকে F10 কী চাপতে হবে। সেভ করে বের হয়ে যেতে চাই কীনা সে বার্তা প্রদর্শিত হবে। এ অবস্থায় কী-বোর্ড থেকে Y কী চাপতে হবে। তাহলে পরিবর্তনগুলো বায়োসে সেভ হয়ে যাবে এবং বায়োসের কনফিগার মেনু থেকে বেরিয়ে যাবে।

বায়োসে সময়, তারিখ সেট করা

বায়োসে সময় ও তারিখ সেট করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে :

১. প্রথমে কম্পিউটার চালু করার পর আগত বুট স্ক্রিনে DEL কী চাপতে হবে।
২. বায়োস কনফিগার মেনুতে প্রবেশ করবে।
৩. এখান থেকে Standard CMOS Features নির্বাচন করতে হবে।
৪. স্ক্রিনে Standard CMOS Features ফিচারগুলো প্রদর্শিত হবে।

৫. এসব ফিচারের একেবারে শুরুতেই Date (mm/dd/yy) এবং Time (hh/mm/ss) এর অপশন দুটি পাওয়া যাবে।

৬. প্রথমে Date (mm/dd/yy) অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। ফলে এটি কার্যকরি হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে আপ, ডাউন, লেফট ও রাইট অ্যারো চেপে উপরে-নিচে-ডানে বামে যাওয়া যাবে। Date এর মাস, দিন ও বছরের ঘরগুলোতে এসব কী এর সাহায্যে গিয়ে সেখানে বর্তমান তারিখ লিখে দিতে হবে।

৭. এরপর Time (hh/mm/ss) অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে এবং উপরের মতো একই উপায়ে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ড এর ঘরগুলোতে বর্তমান সময় লিখে দিতে হবে।

৮. এবার এইমাত্র করা পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য কীবোর্ড থেকে F10 কী চাপতে হবে। সেভ করে বেরিয়ে যেতে চাই কীনা সেই বার্তা প্রদর্শিত হবে।

৯. এই অবস্থায় কীবোর্ড থেকে Y কী চাপতে হবে। তাহলে পরিবর্তনগুলো বায়োসে সেভ হয়ে যাবে এবং বায়েসের কনফিগার মেনু থেকে বেরিয়ে যাবে।

বায়োস সেটআপ সিস্টেমে পাসওয়ার্ড প্রয়োগ

১. প্রথমে কম্পিউটার চালু করার পর আগত বুট স্ক্রিনে DEL কী চাপতে হবে।

২. বায়োস কনফিগার মেনুতে প্রবেশ করবে।

৩. এখান থেকে Advanced BIOS Features নির্বাচন করতে হবে।

৪. স্ক্রিনে Standard CMOS Features ফিচারগুলো প্রদর্শিত হবে। security option টি সিলেক্ট করতে হবে। setup পরিবর্তন করে system নির্বাচন করতে হবে।

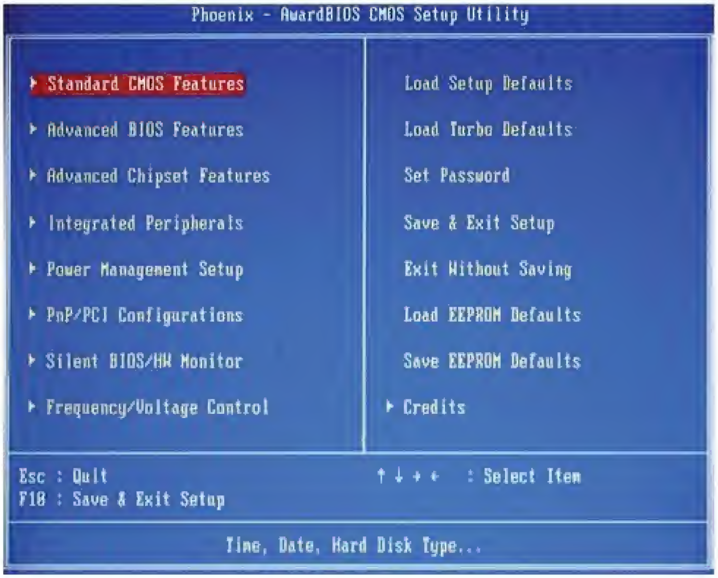

৫. F10 কী চেপে সেভ করতে হবে।

৬. বায়োস কনফিগার মেনুতে এসে Set user password নির্বাচন করে পাসওয়ার্ড ইনপুট করে F10 কী চেপে সেভ করতে হবে।

জব নং—০৫

জবের নাম : কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। একটি সিডি/ডিভিডি ড্রাইভসমৃদ্ধ কম্পিউটার

২। উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার সিডি/ডিভিডি

উদ্দেশ্য :

কম্পিউটারে উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন।

উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করার ধাপসমূহ

উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. BIOS এ প্রথম বুট ডিভাইস হিসেবে CD/DVD ড্রাইভ নির্বাচন করা আছে কীনা প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। যদি না থাকে তবে BIOS এ গিয়ে তা করে আসতে হবে। (ফ্লাস ডিস্ক থেকে ইন্সটল করতে হলে বুট ডিভাইস হিসেবে Flash Disk নির্বাচন করতে হবে।)

২. উইন্ডোজ সেভেন এর DVD টি কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করতে হবে।

৩. কিছুক্ষণ পর DVD থেকে বুটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিছু ফাইল লোড হতে থাকবে। কিছু আলোর রেখা স্ক্রিনে দেখা যাবে এবং উইন্ডোজ স্টার্ট হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আলোর ঝলকানি থেকে উইন্ডোজ সেভেনের লোগো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হবে।

৪. কিছুক্ষণ পর ল্যাংগুয়েজ সিলেক্ট করার অপশন পাওয়া যাবে। Language to install অংশে English নির্বাচন করতে হবে। এরপর Time and Currency format এর ঘরে English (United States) এবং Keyboard or input method এর ঘরে US লিখে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫. পরবর্তী উইন্ডো থেকে Install Now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৬. লাইসেন্স আইটেমের পেইজ আসবে। এখান থেকে I accept the license terms অপশনটি সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭. পরবর্তী উইন্ডো থেকে Custom (advanced) সেটআপ নির্বাচন করতে হবে।

৮. পরবর্তী উইন্ডোতে প্রবেশ করবে। এখানে থাকা Drive options (advances) লিঙ্কে ক্লিক করে পার্টিশন ও ফরমেটিংয়ের কাজগুলো করা যাবে। পার্টিশন ও ফরমেটিংয়ের কাজগুলো শেষ করার পর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৯. অনেকেই পুরনো অপারেটিং সিস্টেমের (উইন্ডোজ এক্সপি বা উইন্ডোজ ভিসতা) হার্ড ডিস্কে উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করতে পারে। সেক্ষেত্রে পার্টিশন পূর্বে থেকেই করা থাকে। যে পার্টিশনে উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল করতে হবে সেটি সিলেক্ট করতে হবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১০. উক্ত পার্টিশনে অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা থাকলে একটি সতর্কবার্তা দেখাবে যে ব্যবহারকারীর পুরনো ফাইলগুলোকে Windows.old নামের একটি ফোল্ডারে ব্যাকআপ রাখা হচ্ছে যা চাইলে তিনি অ্যাকসেস করতে পারলেও পুরনো ভার্সনের উইন্ডোজ ব্যবহার করতে পারবে না। Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১১. উইন্ডোজ সেভেন ইন্সটল প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং ফাইল কপি হওয়া শুরু হবে।

১২. এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক মিনিট সময় নেবে। ফাইলগুলো এক্সট্র্যাক্ট হবার পর সেটআপটির একটি রিস্টার্টের প্রয়োজন পড়বে। এটি নিজে থেকেই রিস্টার্ট হবে।

১৩. রিবুট হবার পর উইন্ডোজ সেভেন সার্ভিসসমূহ চালু করে দেবে এবং ইন্সটলেশন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখবে।

১৪. ইন্সটলেশন প্রগ্রেস বার দেখাবে যেখানে Completing Installation টেক্সট প্রদর্শিত হবে।

১৫. সেটআপটি আরেকবার রিস্টার্ট হবার স্ক্রিন প্রদর্শন করবে।

১৬. উইন্ডোজ রিস্টার্ট হবার পর ব্যবহারকারীকে একটি ইউজার নেম দিতে হবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৭. পরবর্তী উইজার্ড আসবে যেখানে ব্যবহারকারীকে পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে। প্রথমবার দেওয়া পাসওয়ার্ডটি পুনরায় দিতে হবে। এরপর নিচে একটি পাসওয়ার্ড হিন্ট প্রদান করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৮. উইন্ডোজ প্রোডাক্ট কী চাইবে। আপারেটিং সিস্টেমটির সাথে সরবরাহ করা প্রোডাক্ট কী এখানে লিখে দিতে হবে। এখানে থাকা "Automatically activate Windows when I'm online." অপশনটি নির্বাচন করে দিলে তা ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই কম্পিউটারটির জন্য উইন্ডোজ সেভেন এর অ্যাকটিভেশন করে দেবে। এরপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

১৯. Microsoft Windows Updates মেথডের স্ক্রিন প্রদর্শিত হলে "Ask me later" অপশনটি নির্বাচন করে দিতে হবে।

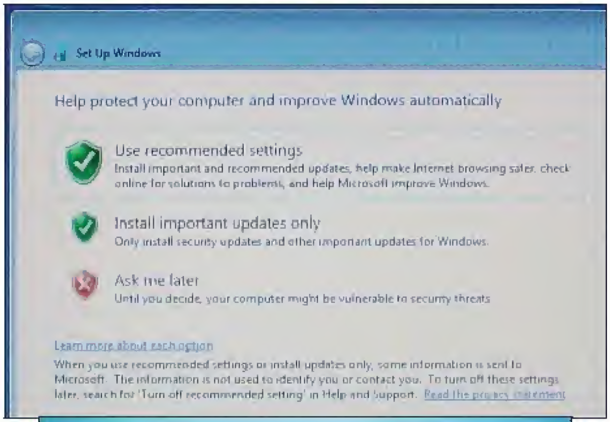

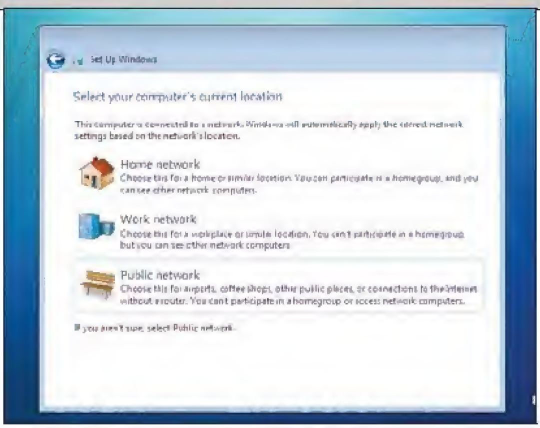

২০. টাইম ও ডেট সেটিং উইজার্ড আসবে। এখান থেকে টাইম ও ডেট সেট করে দিতে হবে। তারপর Next বাটনে ক্লিক করতে হবে।

২১. নেটওয়ার্ক সেটিংয়ের জন্য উইজার্ড আসবে।

২২. প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কটি সেট করার জন্য তালিকা থেকে সেটি সিলেক্ট করতে হবে। নেটওয়ার্ক তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

২৩. হোমগ্রুপ তৈরির উইজার্ড আসবে। এটি সেটআপ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় অপশনগুলো সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করা যাবে কিংবা এটি স্কিপ করতে চাইলে Skip বাটনে ক্লিক করতে হবে।

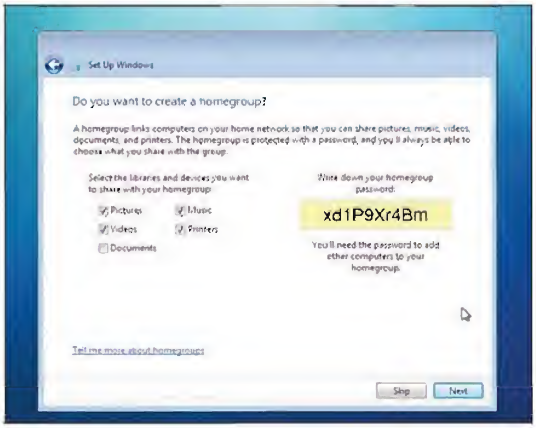

২৪. উইন্ডোজ সেভেন যাবতীয় সেটিংয়ের কাজ সম্পন্ন করার বার্তা দেখাবে। কিছুক্ষণ পর উইন্ডোজ সেভেন এর ওয়েলকাম স্ক্রিন আসবে।

২৫. ডেস্কটপটি তৈরি হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিছুক্ষণ পর উইন্ডোজ সেভেন এর ডেস্কটপ দেখা যাবে।

জব নং—০৬

জবের নাম : কম্পিউটারে এপ্লিকেশন প্যাকেজসমূহ ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেম সংবলিত একটি কম্পিউটার
২। মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ প্যাকেজ প্রোগ্রাম

উদ্দেশ্য :

কম্পিউটারে এপ্লিকেশন প্যাকেজসমূহ ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন।

ভূমিকা :

বিখ্যাত সফটওয়্যার ডেভলপার কোম্পানি মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের তৈরিকৃত এপ্লিকেশন প্যাকেজ প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭। এর মধ্যে ওয়ার্ডপ্রসেসিং সফটওয়্যার এমএস ওয়ার্ড, স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম এমএস একসেল, ডেটাবেজ প্রোগ্রাম এমএস একসিস, প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম এমএস পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি প্রোগ্রামসমূহ ইন্টিগ্রেডেট অবস্থায় রয়েছে। এমএস অফিস সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার সময় উক্ত সফটওয়্যারসমূহ ইন্সটল হয়। ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে তার অফিসভুক্ত অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বাদ রেখে শুধু পছন্দনীয় সফটওয়্যার ইন্সটল করতে পারে।

মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ ইন্সটল করা :

মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ প্রোগ্রাম যেমন— মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ প্যাকেজ প্রোগ্রামটি ইন্সটল করার জন্য বাজার থেকে 'মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭' এর সিডি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করে অফিস প্রোগ্রামিটি ইন্সটল করতে হবে :

১. কম্পিউটারের সিডি/ডিভিডি রম ড্রাইভে বাজার হতে সংগ্রহ করা ইন্সটলার সিডিটি প্রবেশ করাতে হবে।

২. কম্পিউটারের অটোরান এনাবল্ড থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচের উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। আর যদি অটোরান অফ করা থাকে তবে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে সিডিটি ব্রাউজ করে এর Setup.exe ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করতে হবে। নিচের মতো উইন্ডো আসবে।

৩. সিডির সাথে সরবরাহ করা ২৫ ক্যারেক্টারের প্রোডাক্ট কী এখানে লিখে দিতে হবে। ভুল কী প্রবেশ করালে তা জানাবে। আর প্রোডাক্ট কী সঠিক হলে নিচের উইন্ডোর মতো প্রোডাক্ট কী এর ডান পাশে একটি রাইট চিহ্ন দেখাবে। এই অবস্থায় Continue বাটনে ক্লিক করে পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করতে হবে।

৪. মাইক্রোসফট সফটওয়্যার লাইসেন্স টার্ম উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

৫. এখানে উইন্ডোর নিচের দিকে থাকা I accept the term of this agreement অপশনটি সিলেক্ট করে (টিক চিহ্নের মাধ্যমে চেক করে দিয়ে) Continue বাটনে ক্লিক করলে নিচের মতো উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

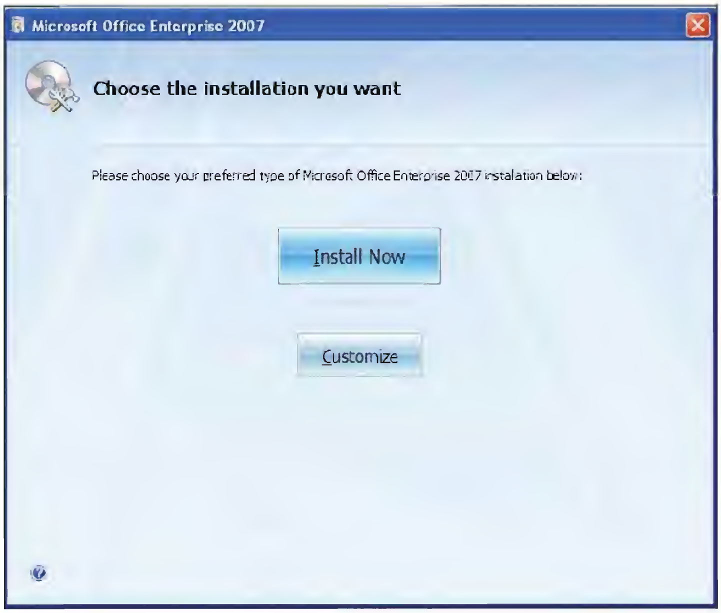

৬. Install Now বাটনে ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ এর অধীনে থাকা সকল প্রোগ্রাম ও টুলসমূহ ইনস্টল হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রোগ্রাম ও টুল নির্বাচন করে ইনস্টল করতে হলে Customize বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭. সবগুলো প্রোগ্রাম ও টুলের তালিকা প্রদর্শিত হবে। প্রতিটি প্রোগ্রাম ও টুলের নিচে একটি ডাউন অ্যারো প্রদর্শিত হবে যেখানে ক্লিক করলে বেশ কিছু অপশন পাওয়া যাবে। যে প্রোগ্রামটি ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই সেটির ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করতে হবে এবং আগত অপশন থেকে Not Available সিলেক্ট করতে হবে । তাহলে তার পাশে একটি ক্রস চিহ্ন বসে যাবে অর্থাৎ সেটি অনির্বাচিত হবে।

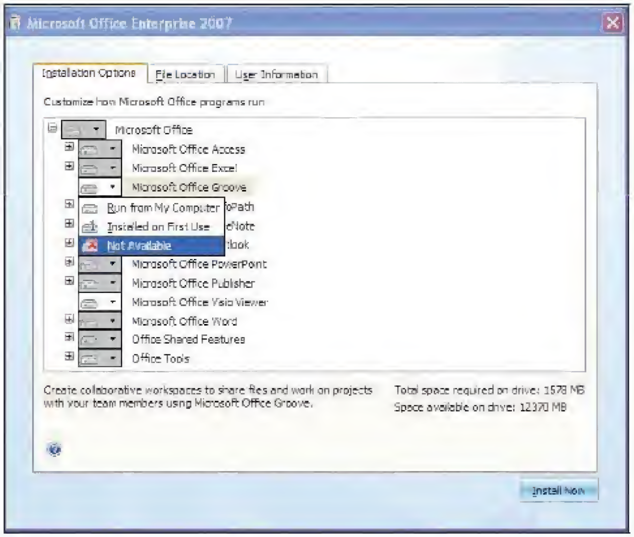

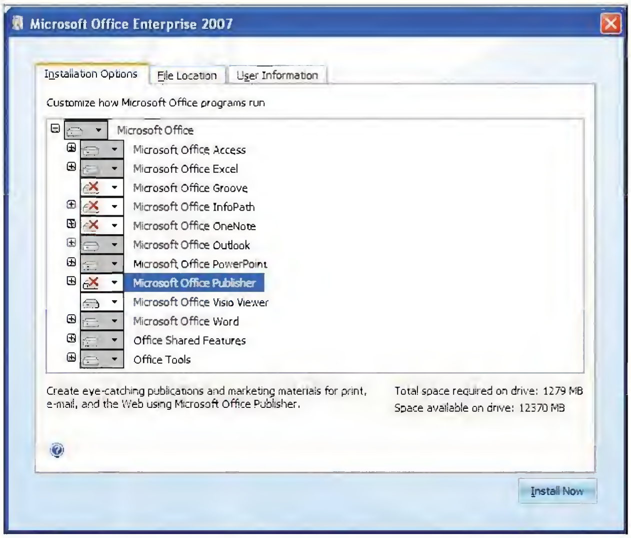

৮. এভাবে একে একে অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো ইনস্টলেশনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে Install Now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৯. ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং প্রোগ্রেস বারে সামগ্রিক প্রোগ্রেস প্রদর্শিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় খানিকটা সময় লাগবে।

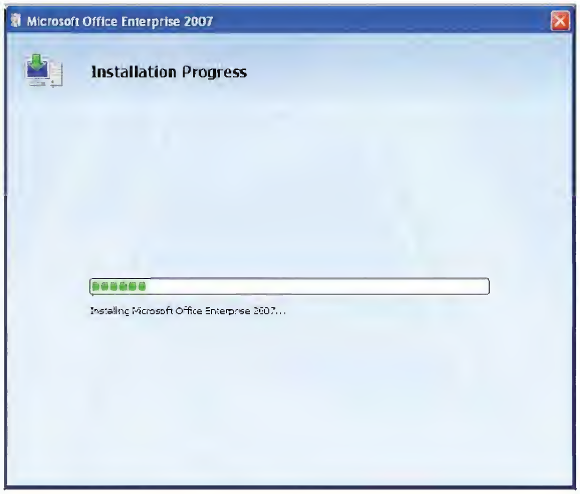

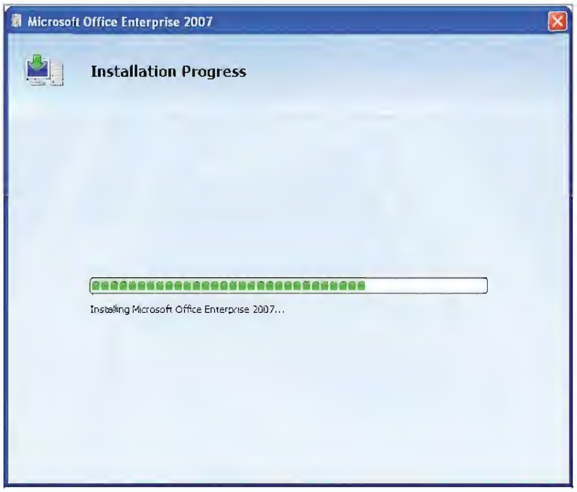

১০. এভাবে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে নিচের মতো উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। অর্থাৎ ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেল। এই অবস্থায় চাইলে Go to Office Online বাটনে ক্লিক করে মাইক্রোসফট অফিস অনলাইনে প্রবেশ করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ থাকতে হবে। তবে এটি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। সেক্ষেত্রে Close বাটনে ক্লিক করতে হবে। উইন্ডোটি বন্ধ হয়ে যাবে।

জব নং—০৭

জবের নাম : নেটওয়ার্কের মধ্যে ফাইল/ফোল্ডার শেয়ার করা

নেটওয়ার্কের মধ্যে ফাইল/ফোল্ডার শেয়ার করার জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. কমিপউটারে ল্যান কার্ড (নিক) স্থাপন করতে হবে।

২. উইন্ডোজে নিক কনফিগার করতে হবে।

৩. শেয়ার ফোল্ডার তৈরি করতে হবে।

৪. ল্যানের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিপউটারে তথ্য আদান প্রদান করতে হবে।

১. কম্পিউটারে ল্যান কার্ড স্থাপন করা ও কনফিগার করা

একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে স্থানীয়ভাবে নেটওয়ার্ক তৈরি করাকেই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) বুঝায়। কম্পিউটারে ল্যান স্থাপনের প্রক্রিয়াটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. প্রথমেই ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে একটি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (নিক) বা ল্যান কার্ড স্থাপন করতে হবে। মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট স্লটে এটি ঠিকঠাক লাগাতে হবে (যাদের মাদারবোর্ডে ল্যান কার্ড বিল্টইন থাকে তাদের নতুন করে আর ল্যান কার্ড কিনতে হবে না)।

২. এবার কম্পিউটারটি চালু করে ল্যানকার্ডের সাথে সরবরাহ করা সফটওয়্যারটি ইন্সটল করে নিতে হবে।

৩. কম্পিউটারে কার্ডটির অবস্থান শনাক্তকরণের জন্য ডেস্কটপে থাকা My Computer আইকনে মাউস পয়েন্টার রেখে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। আগত পপআপ মেনু থেকে Manage এ ক্লিক করলে Computer Management উইন্ডো খুলবে। সেখান থেকে Device Manager নির্বাচন করলে উইন্ডোর ডানপাশে কম্পিউটারের ডিভাইসগুলো প্রদর্শিত হবে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে Network Adapter দেখাচ্ছে। এটিকে এক্সপান্ড করলেই ল্যানকার্ডটির ডিটেইল দেখা যাবে যা থেকে বুঝা যাবে যে সঠিকভাবে এটি ইন্সটল করা হয়েছে।

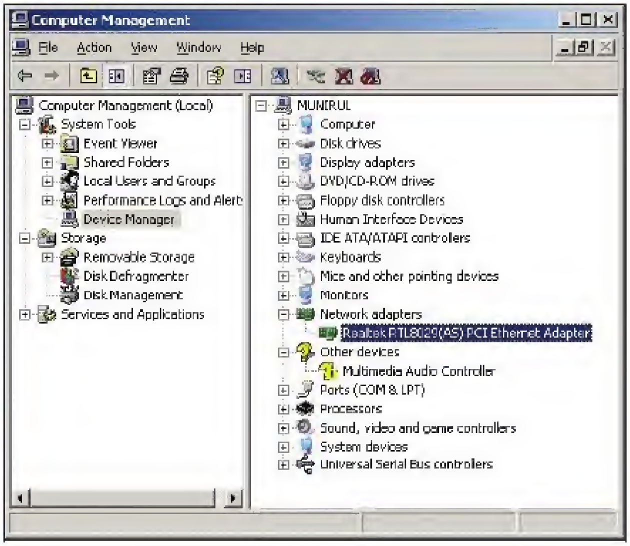

৪. Cancel বাটনে ক্লিক করে উইন্ডোটি বন্ধ করতে হবে।

৫. এবার কম্পিউটারের ডেস্কটপে গেলে My Network Places নামের একটি আইকন পাওয়া যাবে। আইকনটিতে মাউস পয়েন্টার রেখে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। আগত পপআপ মেনু থেকে Properties এ ক্লিক করতে হবে।

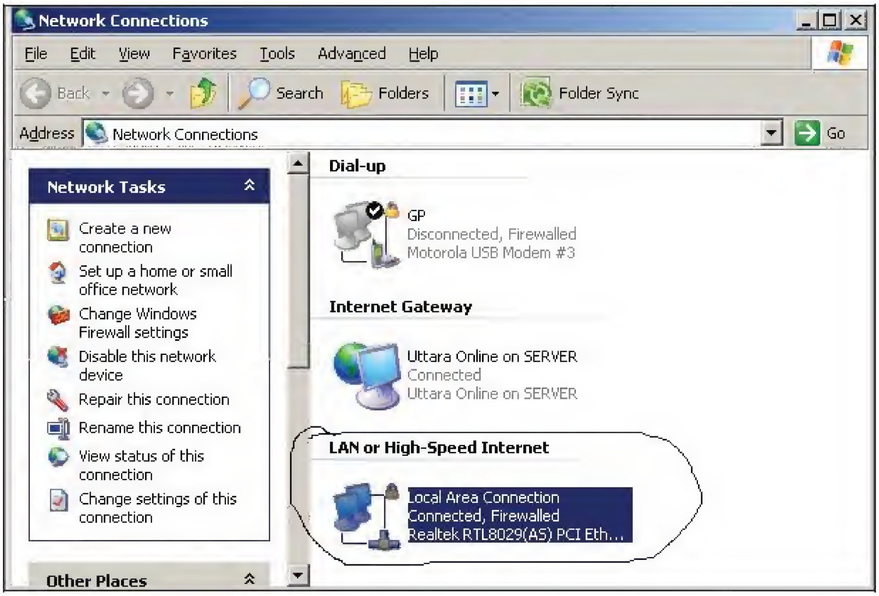

৬. নেটওয়ার্ক কানেকশনস উইন্ডো খুলবে। এখানে LAN or High-Speed Internet ক্যাটাগরির অধীনে একটি আইকন পাওয়া যাবে। আইকনটি সিলেক্ট করে এর উপর মাউস পয়েন্টার রেখে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং আগত পপআপ মেনু থেকে Properties সিলেক্ট করতে হবে। এর ফলে Local Area Connection Properties উইন্ডো আসবে।

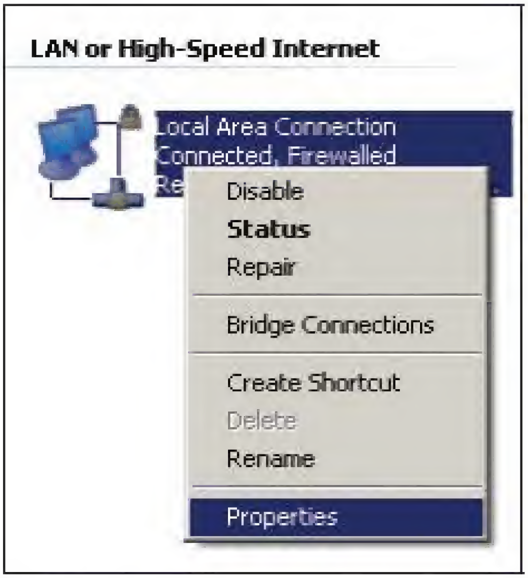

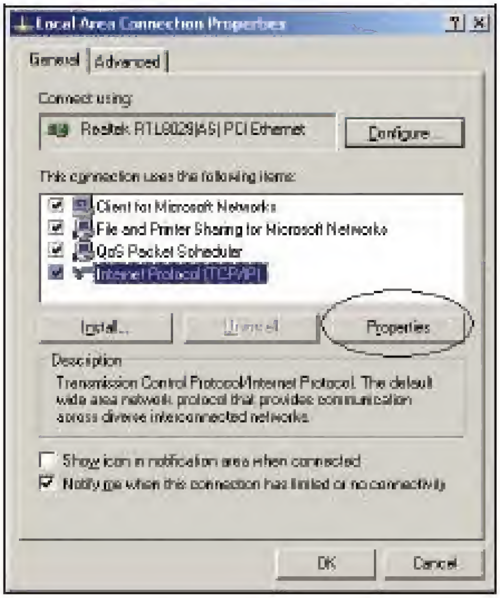

৭. এখানে Internet Protocol (TCP/IP) নির্বাচন করে Properties বাটনে ক্লিক করতে হবে। আইপি অ্যাড্রেস কনফিগার করার উইন্ডো আসবে।

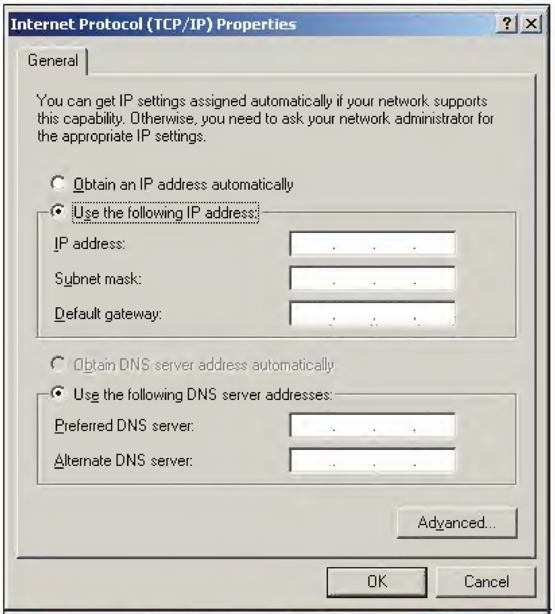

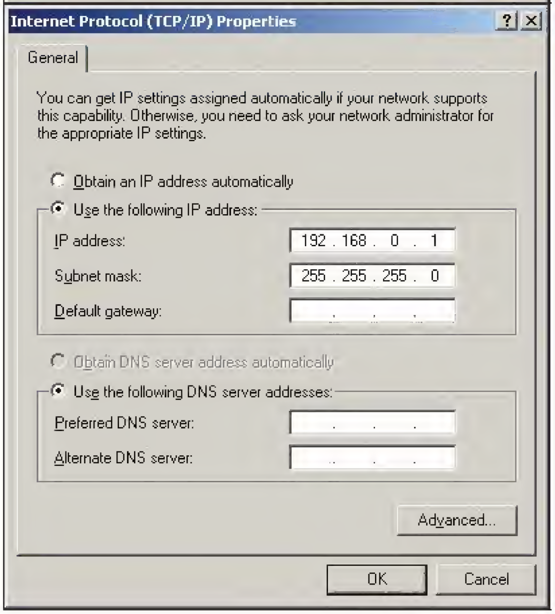

৮. এখানে Use the following IP address: অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। শুধু ল্যান সেটআপ করার জন্য এখানে IP address: এর ঘরে আইপি এড্রেস যেমন 192 . 168 . 0 . 1 লিখে দিতে হবে। অন্য কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এখানে শেষের ঘরে 1 এর স্থানে 2, 3, 4, 5 ... এভাবে পর্যায়ক্রমে সংখ্যা বসাতে হবে। তারপর Subnet Mask: এর ঘরে মাউস পয়েন্টার রাখলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে 255 . 255 . 255 . 0 সংখ্যাগুলো বসিয়ে দেবে।

৯. এবার OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। তাহলে পূর্ববর্তী উইন্ডোতে ফিরে যাবে। Close বাটনে ক্লিক করে সেই উইন্ডোটিও বন্ধ করতে হবে।

১০. এভাবে একাধিক কম্পিউটারে ল্যান স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে ল্যানের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলগুলো কম্পিউটার ও হাবের সাথে যথাযথভাবে যুক্ত রয়েছে কীনা সেটি দেখে নিতে হবে।

২. ল্যানের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানে নির্দিষ্ট কোনো ফোল্ডারকে শেয়ার প্রদান করা

ল্যানের মাধ্যমে একাধিক কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদান করতে হলে নির্দিষ্ট কোনো ফোল্ডারকে (নির্দিষ্ট ড্রাইভকেও শেয়ার দেওয়া যায়) শেয়ার দিতে হবে। এজন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. যে ফোল্ডারটি শেয়ারে দেওয়া হবে সেটি সিলেক্ট করতে হবে।

২. এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করতে হবে। একটি পপআপ মেনু আসবে। সেখান থেকে Sharing and Security... নির্বাচন করতে হবে।

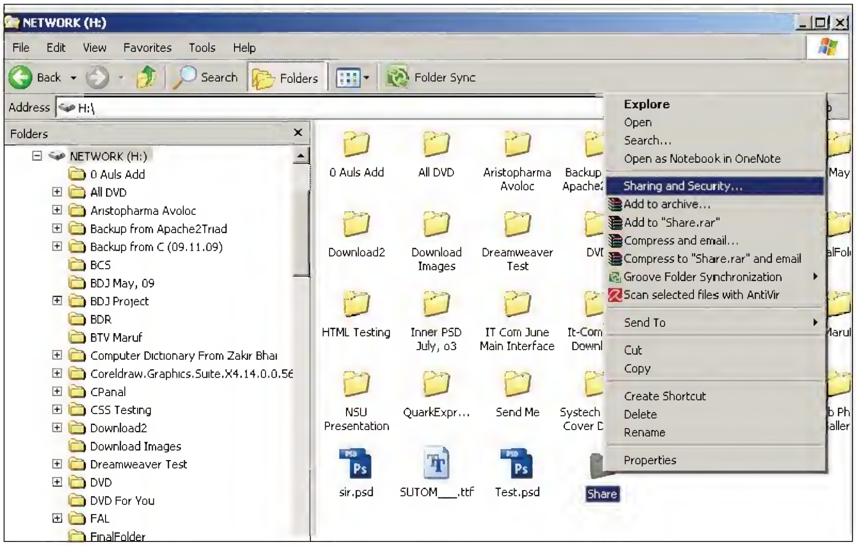

৩. Share Properties উইজার্ড আসবে। এখানে Sharing ট্যাবটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় Network sharing and security এর অধীনে থাকা Share this folder on the network চেকবক্সটি চেক করে দিতে হবে।

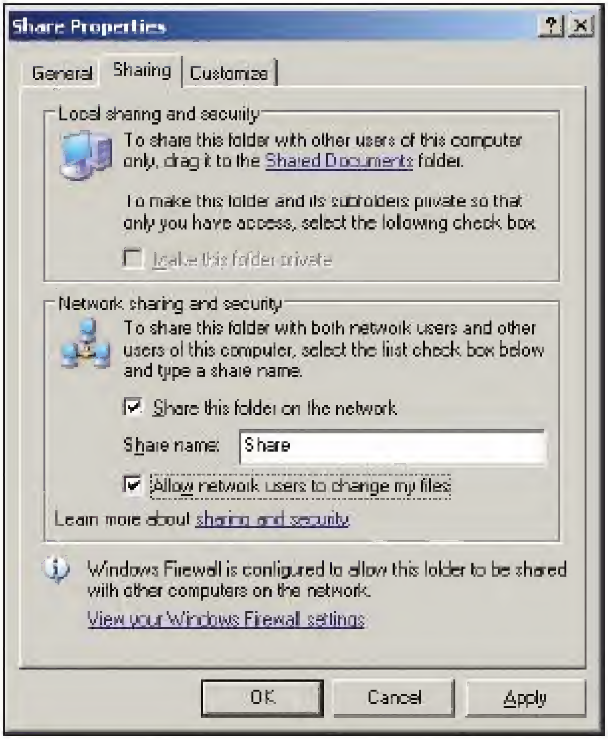

৪. ব্যবহারকারী যদি তার শেয়ারে থাকা ফাইলগুলোকে অন্য ব্যবহারকারীর জন্য পূর্ণ অ্যাকসেস দিতে চান বা সেগুলোতে অন্যকে পরিবর্তন ও পরিবর্তন সাধন করার সুযোগ দিতে চান তবে **Allow network users to change my files** চেকবক্সটি চেক করে দিতে পারেন। আর না চাইলে এ চেকবক্সটি ফাঁকা রেখে দিতে পারেন।

৫. এবার **Apply** বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর **OK** বাটনে ক্লিক করে উইন্ডোটি বন্ধ করে দিতে হবে।

৬. শেয়ার দেওয়া ফোল্ডারটিতে একটি হাতের চিহ্ন দেখা যাবে যা ফোল্ডারটিকে ধরে রাখবে। এ অবস্থায় ল্যানে যুক্ত অন্য কম্পিউটার থেকে উক্ত কম্পিউটারটির শেয়ার ফোল্ডারটি পাওয়া যাবে।

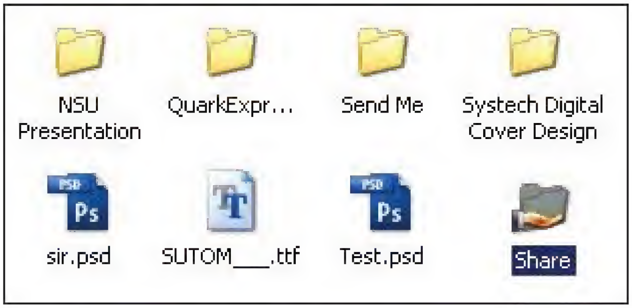

৩. ল্যানের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদান করা

একাধিক কম্পিউটারকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যানে যুক্ত করার পর এসব কম্পিউটারের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য (যেমন– বিভিন্ন ধরনের ফাইল) আদান প্রদান করা যায়। ফাইল আদান প্রদান করার জন্য নিচের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে :

১. কম্পিউটারে ব্যবহারকারী যখন উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেমটি ইন্সটল করেন তখনই সেখানে তিনি কম্পিউটারের জন্য একটি নাম লিখে দেন। এছাড়া নেটওয়ার্ক ও ওয়ার্কগ্রুপ সম্পর্কিত কিছু কাজ করে আসেন যেগুলো পরবর্তীতে তার কাজে লাগে (যেমন– এখন লাগছে)।

২. কম্পিউটারের ডেস্কটপে গিয়ে My Network Places আইকন ডাবল ক্লিক করতে হবে। একটি উইন্ডো আসবে। এর বামপাশ থেকে View workgroup computers লেখা লিঙ্কটিতে ক্লিক করতে হবে। যেসব কম্পিউটার ল্যানে যুক্ত আছে সেগুলো প্রদর্শিত হবে।

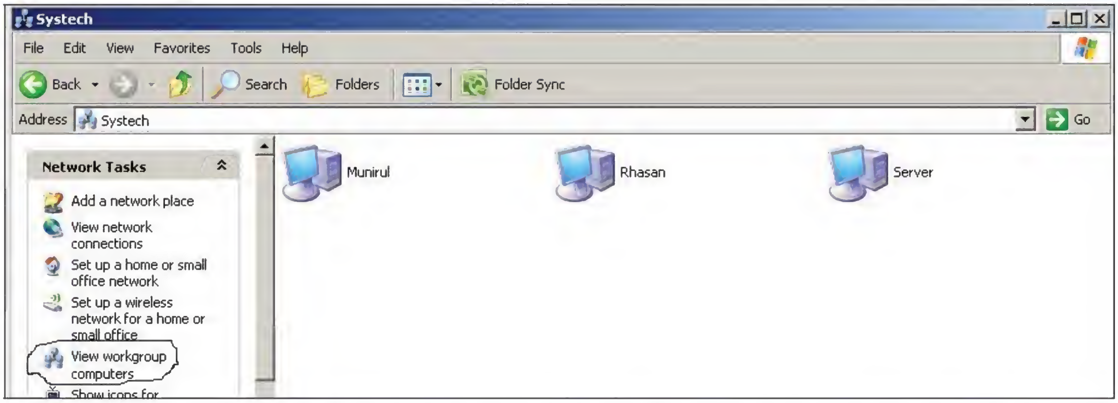

৩. যে কম্পিউটার থেকে ফাইল আদান প্রদান করা প্রয়োজন সেটি এখানে প্রদর্শিত হলে তাতে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ডাবল ক্লিক করতে হবে। তাহলে ওই কম্পিউটারের শেয়ার দেওয়া সবগুলো ফোল্ডার এখানে প্রদর্শিত হবে।

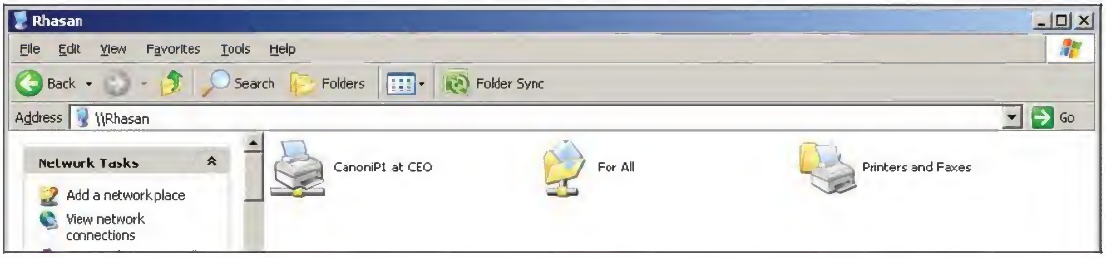

৪. কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডারটি পেলে সেখানে পুনরায় ডাবল ক্লিক করতে হবে। ফোল্ডারটির ভেতরে প্রবেশ করবে। এখানে রাখা যাবতীয় ফাইলই কপি করে অন্য কম্পিউটারে নেওয়া যাবে কিংবা অন্য কম্পিউটার বা ব্যবহারকারীর কম্পিউটার থেকে কপি করা কোনো ফাইলকে উক্ত স্থানে পেস্ট করে দেওয়া যাবে।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষ

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি-২

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য